কিরীটী অমনিবাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

প্রথম খণ্ড

কিরীটী অমনিবাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

৫

কিরীটী অমনিবাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

প্রথম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

অষ্টম মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪০০
—আশি টাকা—

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন : আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ : অটোটাইপ

KIRITI OMNIBUS VOL. I
An anthology of detective fictions by Niharranjan Gupta published
by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.
10, Shyama Charan Dey Street, Calcutta - 700 073

Price Rs. 80/-

ISBN : 81-7293-166-2

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রা: লি: ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ ১৫২ মাণিকতলা
মেন রোড কলিকাতা-৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

কিরীটী-তত্ত্ব (ভূমিকা) শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	...	[ক]
কিরীটীর আবির্ভাব	...	০১
রহস্যভেদী	...	৮৫
চক্রী	...	৯৯
বৌরাণীর বিল	...	২২১
হাড়ের পাশা	...	৩৭৭

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

কিরীটী-তত্ত্ব

কিরীটী রায় রোমাঞ্চ-অন্বেষী কিশোর মনের চিরন্তন নায়ক। বয়ঃসন্ধির বালক নিজেকে দুঃসাহসের পথে, সংগ্রাম ও বীরত্বের পথের নায়ক বলে চিরকাল কল্পনা করতে ভালোবাসে। কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবনে সে রহস্য, রোমাঞ্চ, সংঘাত, বীরত্ব ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অবকাশ কোথায়? তাই কল্পনাই তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে। এককালে সে হয়েছে পক্ষীরাজ-আরূঢ় রাজপুত্র, চলেছে শতবাধাকণ্টকিত পথে, রাক্ষসখোক্কস বিনাশ করে পাতালপুরীতে নিদ্রিতা অপরূপা রাজকন্যাকে লাভ করার উদ্দেশ্যে। সেকাল এখন ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত পথে। কিন্তু মানুষের মর্মজ প্রবৃত্তি যে অপরিবর্তনীয়। সুতরাং তাকে নূতনতর পন্থা খুঁজে বার করতে হয়েছে। এ রাজপুত্র সোনার মুকুট পরে না, পক্ষীরাজে চড়ে না, নিতান্তই এ সহজ সরল মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবক। বাইরে থেকে আর পাঁচজনের সঙ্গে তার প্রভেদ নেই। অথচ সে অন্তরে সেই চিরন্তন রাজপুত্তুর—নাইবা থাকলো তার সাজসরঞ্জাম, পক্ষীরাজঘোড়া। বিজ্ঞান আছে তার বাহন। মন্ত্রীপুত্র কোটালপুত্রের বদলে তারও আছে সুযোগ্য সহকারী। রাক্ষসও কি আজকের জগতে অপ্রতুল? নানা রূপে নানা ছদ্মবেশে সে রয়েছে। আশামুগ্ধ মানুষের জীবনে টেনে আনছে অনন্ত বেদনা। সেই ছদ্মবেশী রাক্ষস আজকের জগতে হয়ত নিষ্ঠুর হত্যাকারী, হয়ত অতুল সম্পদের লোভে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য।

তাদের নির্মোক মোচনই তার ব্রত। অবশ্য তার সম্মানমূল্য দিতে কোন রাজা তাঁর রাজকন্যা ও রাজমুকুট নিয়ে এগিয়ে আসবেন না এটা সত্য। পরিবর্তে নায়ক পাবে যে যশোমুকুট—তাও তুচ্ছ করার নয়। বরং আজকের বাস্তব জগতের অধিবাসী কিশোরের কাছে এটার মূল্যই বোধ হয় আগেরটির থেকে কিছু বেশি। আর তাছাড়া নিজেকে ভয়ত্রাতার ভূমিকায় দেখবার মোহই বা যায় কোথায়?

সুতরাং ভাবালু কিশোর মনের ছায়া অনুসরণ করে গড়ে ওঠে একজাতীয় রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী। কিরীটী রায় তাঁদের মধ্যে প্রথম সারির অধিবাসী। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বাঙালী কিশোর পাঠকমনকে এই সম্ভাব্য-অসম্ভাব্যতার আলোছায়া ঘেরা জগতে মোহমুগ্ধ করে রেখেছে রহস্যভেদী কিরীটী রায়।

"প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ চেহারা। মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল, ব্যাকব্রাশ করা।

চোখে পুরু লেন্সের কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমের চশমা।

দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো।

মুখে হাসি যেন লেগেই আছে, সদানন্দ, আমুদে।"

এই কিরীটী রায়ের পরিচয়। কলেজজীবনে শখের তাড়নায় যে নেশার শুরু, ক্রমে তাই তার বৃত্তি বা পেশায় পরিণত হয়েছে। কিরীটী রায়ের কলেজজীবনের প্রথম যুগের রহস্যভেদের কাহিনী আছে 'রহস্যভেদী' গল্পে। এছাড়াও আছে বিভিন্ন স্বাদের কাহিনী—চক্রী, বৌরাণীর বিল এবং সর্বপ্রধান

কাহিনী সেই সুবিখ্যাত কিংবা কুখ্যাত 'কালোভ্রমর' সম্পর্কিত কাহিনী 'কিরীটীর আবির্ভাবে'। গ্রন্থটির প্রথম কাহিনী 'কিরীটীর আবির্ভাব' হলেও, বস্তুতঃ রহস্যভেদীই এই সিরিজের প্রথম গল্প, অন্তত কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনে। 'কিরীটীর আবির্ভাব'-এ কিরীটী এই কাহিনীত্রয়ীর অন্যতম বিখ্যাত ভ্রাতৃত্রয় রাজু, সনৎ ও সুব্রতর সঙ্গে পরিচিত হন। এরপরই কালোভ্রমর কাহিনীর শুরু। বাংলা-রহস্য কাহিনীর নায়ক কিরীটীর সঙ্গে দুর্বৃত্ত কালোভ্রমরও বাঙালী পাঠকচিত্তে স্মরণীয় স্থান পেয়ে গেছে। বাঙালী পাঠকের আগ্রহ কালোভ্রমরের কাহিনী পর্বে পর্বে নানাভাবে কখনও দেশে কখনও বিদেশে টেনে নিয়ে গেছে। বিশেষ ভাবে বর্মার রেঙ্গুন শহর, কলকাতার চীনাপাড়া—আমাদের কাছে স্বল্প-পরিচয়ের অবকাশে একটা রহস্য-কুহেলীর আবরণ টেনে কাহিনীর শীতল ভয়াল পরিবেশ রচনায় সাহায্য করেছে। কিশোর মনে ইরাবতী নদীর তীরে মিয়াং-এর পরিত্যক্ত জীর্ণ বৌদ্ধ প্যাগোডা, তার সন্নিকটে ভগ্নমূর্তি, ড্রাগনের মুখে ঝোলানো বালায় গুপ্ত ধনাগারের চাবি, গুপ্তধনের সংকেতবাহী লিপিতে দুর্বোধ্য ইশারা—

"ড্রাগন দেখ বসে আছে
ধনাগারের চাবি কাছে
মুখে তার লোহার বালা
দুলছে তাতে চিকণ শলা।
দুইএর পিঠে শূন্য নাও
ত্রিশ দিয়ে গুণ দাও,
শূন্য যদি যায় বাদ
সেই কবারে পুরবে সাধ।"

'উত্তেজনা ও আবেগে' কিরীটীর বুকের মাঝে যখন 'ঢিবঢিব' করে ওঠে তখন তার মানসিক সঙ্গী পাঠক কিশোর বা বালকের মনেও এই একই প্রতিক্রিয়া। অবশেষে গুপ্তধন ভাণ্ডারের পাথর সরে গুপ্তপথ প্রকাশ পায়। পাতালপুরীর আঁধার কক্ষে দেখায়—

"ছোট একখানি ঘর। সেই ঘরের ছাদের ওপর হতে শিকলের মাথায় একটা কাঁচের প্রদীপদান ঝুলছে। সেই প্রদীপের স্বল্পালোকে দেখা যায় ঘরের চারিপাশে ছোট ছোট বেতের ঝাঁপিতে ভর্তি অসংখ্য গিনি। কে একজন আগাগোড়া কালো পোশাক-পরা লোক নীচু হয়ে এক-একটা ঝাঁপির কাছে আসছে আর দুহাত দিয়ে সেই ঝাঁপি হতে মুঠো করে গিনি তুলে নিয়ে পরক্ষণেই মুঠো আলগা করে ধরেছে—অমনি সুমধুর ঝনঝন শব্দ করে সেই সব গিনি কক্ষের রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ছে।

এই অতুল ঐশ্বর্যের লোভ মানুষকে চিরকালই পাগল করে রেখেছে। তবে বয়স্ক মানুষের কাছে সেই ঐশ্বর্যের অর্থমূল্য যতটা ছোটদের কাছে ততটা নয়। বরং তার অনুসন্ধান দ্বারা আবিষ্কারমূল্য, রহস্যের নেশাতে ছুটে যাবার মূল্যই বেশি। তাই স্বভাবতঃই তারা যেন কিরীটীর এই কৃতিত্বের সমান অংশীদার হয়ে পড়ে। পরে যদি এই গুপ্তধনের সমগ্র ধনভাণ্ডারটাই তাদের আয়ত্তের বাইরে চলেও যায় তাহলেও যেন তাদের দুঃখ নেই। কেন না সেই কুখ্যাত দস্যু কালোভ্রমর তো ধরা পড়েছে। বয়স্ক মানুষের হয়ত সেক্ষেত্রে একটি গোপন দীর্ঘনিঃশ্বাসই পড়ত।

'চক্রী'র পরিবেশেও একটা রহস্যময় আবহাওয়া গড়ে তুলতে পারা গেছে। সমুদ্রতীরবর্তী পাহাড়ের চূড়ায় খেয়ালী শিল্পীর পুরাতন অর্ধপরিত্যক্ত প্রাসাদ তার পটভূমি। সেখানে সাধারণের অজ্ঞাতে বহুভুজ প্রেম এবং ধন-সংক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ও গোপন প্রতিহিংসার লীলা চলেছে। এবং তার উপসংহারেও আছে আকস্মিকতার চমক।

'বোরাণীর বিল'-এ জীবন ও মৃত্যু যেন পাশাপাশি অন্তরঙ্গ দুই স্রোতে বহমান। একদিকে নিষ্ঠুর হত্যার লীলা অন্যদিকে নতুন করে গড়ে-ওঠা হৃদয়-সম্পর্ক। এখানেও কাহিনী বয়নে নূতনত্বের ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়।

সব কটি গল্পের কাহিনী ও স্থানকালপাত্র পৃথক হলেও সর্বত্র নায়ক রহস্যভেদী কিরীটী রায় ও তার সুযোগ্য সরকারী সুব্রত। কোথাও লেখকের জবানীতে কোথাও সহকারী সুব্রতের জবানীতে (চক্রী) কাহিনী বিবৃত করা হইয়াছে।

রহস্য কাহিনীর অস্তিত্বের মূল বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘদিনের নয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কোথাও অন্ততঃ ডিটেকটিভ উপন্যাস বা কাহিনীর ইঙ্গিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। সুতরাং অতি স্বাভাবিক ভাবেই এই জাতীয় কাহিনী যে সাহিত্যের থেকে উদ্ভূত তার প্রভাব থাকা সম্ভব। তবে তার অর্থ এই নয় যে বাংলা রহস্য-কাহিনী মাত্রই ইংরাজী বা মার্কিন কাহিনীর কঙ্কালে গঠিত। যে কোন উন্নতিশীল সাহিত্যেই অপর শক্তিশালী সাহিত্যের ছায়াপাত ঘটে থাকে। এক্ষেত্রেও সেরকম ছায়াপাত দুর্লক্ষ্য নয়। তবে এক্ষেত্রে তা অলংকারের মত শোভমানই হয়ে উঠেছে বলা চলে।

এছাড়া রহস্য উপন্যাসের প্রাণবন্ত যে 'সাসপেন্স' বা পূর্বাপর কৌতূহল বজায় রাখবার প্রয়োজনীয়তা—এখানে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাবে রক্ষিত হয়েছে। ফলে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসের দৃঢ়পিনদ্ধ কাহিনীর শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এক লক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের কল্পনাকে পরাজিত করে আকস্মিকভাবে অপ্রত্যাশিতজনকে অপরাধী বলে যখন উপস্থিত করা হয়—তখন কাহিনীর অন্যান্য পাত্রপাত্রীর সঙ্গে পাঠককেও বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। এবং কিরীটী রায় যখন সুশৃঙ্খল যুক্তিবিশ্বাসের দ্বারা অপরাধীর কার্যপরম্পরাকে বিশ্লেষণ করে তখন আমাদের মনে হয়, এ তো নিতান্তই সহজ ও সরল। সহজ মাত্রেই যে সরল নয় সেকথা তখন আমাদের স্মরণে থাকে না। এবং কাহিনী শেষ করার সঙ্গে কাহিনীর ঊর্দ্ধে জেগে থেকে পাঠকমনে রহস্যকাহিনীর রহস্যভেদী নায়ক কিরীটী রায়ের ব্যক্তিত্ব, তার তীব্রতীক্ষ্ণ যুক্তিবোধ, পরিমিতি বোধ, ক্ষুরধার বুদ্ধির মালিন্যমুক্ত ঔজ্জ্বল্য নিয়ে। যা কিরীটী রায়কে সমসাময়িক ডিটেকটিভ কাহিনীর নায়কদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছে এবং তার স্রষ্টাকে দিয়েছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রত্যক্ষ সাফল্য।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

কিরীটীর আবির্ভাব

প্রীতিভোজ উৎসব সুব্রতর বাড়িতে।

আমহার্স্ট স্ট্রীটে প্রকাণ্ড বাড়ি কিনেছে সুব্রতরা। সেই বাড়িতেই গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে এই প্রীতিভোজের উৎসব।

অনেক আমন্ত্রিতই এসেছেন, তাঁদের মধ্যে এসেছে বিশেষ একজন, কিরীটী রায়।

রহস্যভেদী কিরীটী রায়।

কিরীটী রায় প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ চেহারা, মাথা-ভর্তি কোঁকড়ানো চুল, ব্যাকব্রাশ করা।

চোখে পুরু লেন্সের কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমের চশমা। দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। মুখে হাসি যেন লেগেই আছে, সদানন্দ, আমুদে।

ওদের পাড়াতেই এক নবলব্ধ বন্ধুর গৃহে কিরীটীর সঙ্গে ওদের আলাপ-পরিচয় হয়।

প্রীতিভোজের পর বিদায়ের পূর্ব-মুহূর্তে কিরীটী বলে, এই কালো পাথরের ড্রাগনটি আমি চাই সুব্রতবাবু। অপূর্ব মূর্তিটির গঠন কৌশল। ঐটি আমি আমার মিউজিয়ামে রাখতে চাই।

বেশ তো, তা নিন না! সুব্রত বলে।

কিরীটী বলে, শুধু যে মূর্তিটিই তা নয়, ওর সঙ্গে যার নাম জড়িয়ে আছে, কেন জানি না, আপনাদের কাহিনী শুনে সেই নামটির প্রতিও আমার একটা দুর্বলতা জন্মে গেছে।

সুব্রত কিরীটীর কথায় হেসে ফেলে, জানেন না বোধ হয়, মা বলেন, ওটা নাকি একটা অমঙ্গলের চিহ্ন।

তবে তো ভালই হল। অমঙ্গলকে সাদরে আমার গৃহে বহন করে নিয়ে যাই আপনাদের ঘর থেকে। দেখা যাক কি অমঙ্গল আমার সঙ্গে ও নিয়ে আসে!

*   *   *

রাত্রি তার ঘন কালো পক্ষ বিস্তার করে দিয়েছে বিরাট এ কলকাতা মহানগরীর বুকে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি।

জনহীন রাস্তা যেন ঘুমন্ত অজগরের মত গা এলিয়ে পড়ে আছে। সাড়া নেই শব্দ নেই।...

কিরীটী একা একা পথ অতিক্রম করে চলেছে। পকেটের মধ্যে কালো পাথরের ড্রাগনটি।

আশ্চর্য, কিরীটীর যেন মনে হয়, নিঃশব্দে কে বুঝি আসছে কিরীটীর পিছু পিছু!

যে আসছে তার পায়ের শব্দ পাওয়া যায় না কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায়, সে আসছে।

এরকম নাকি ঘটে, শুনেছে কিরীটী অনেকের মুখেই এবং এও শুনেছে,

চোখ ফেরালেও নাকি তাকে দেখা যায় না। কেউ ওদের দেখতেও পায় না। অথচ বিশ্রী অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি যেন সমগ্র চেতনাকে ওরা ঘিরে থাকে। কখনও নিঃশব্দে মরা চাঁদের আলোয় জনহীন প্রান্তরেও ওরা এমনি করে হেঁটে বেড়ায়, অনুসরণ করে। কখনও বা অন্ধকারে পিছনে পিছনে আসে। তা আসে আসুক। অনুসরণ করে করুক।

কিরীটী এগিয়ে চলে। অভিশাপকে বরণ করে নিয়ে চলেছে নিজের গৃহে। কালো ভ্রমরের মৃত্যু-পরোয়ানা!

*   *   *

কালো পাথরের ড্রাগনটির কথা সকলে একরকম ভুলেই গিয়েছিল। তা হল না বলেই আবার এ কাহিনীর শুরু।

কালো ভ্রমর আবার ফিরে এল।

সেই তাদের মত বুঝি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে রাত্রির রহস্য-ঘন অন্ধকারে।

পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে পড়ে, নিঃসীম অতলান্ত অন্ধকারে চারিদিক যখন হয়ে আসে নিঝুম, মাথার ওপরে শুধু তারায় ভরা আকাশ বোবা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে, রাতের বাতাসের চুপিসাড়ে তখন যেন তাদের মতই আসে!

রহস্য দিয়ে ঘেরা কালো ভ্রমর। রহস্য-ঘন হয়েই ধরা দেয় যেন।

কতটুকুই বা পরিচয় সনৎ-এর! সনৎ ভাবেঃ কতটুকুই বা সে জানে কালো ভ্রমরের! মুখোশে ঢাকা ছিল। শুধু মুখোশের দুটি ছিদ্রপথে অন্তর্ভেদী দুটি চোখের দৃষ্টি।

কি সম্মোহন আছে ওই চোখের দৃষ্টিতে! একবার সে-চোখের দিকে যে তাকিয়েছে, সে ভুলবে না আর সে দৃষ্টি। ভুলতে পারে না।

চোখের তারা তো নয়, যেন দুটি জ্বলন্ত অঙ্গার খণ্ড!

এখনও কত রাত্রে ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্নের মত সেই চোখের দৃষ্টি সনৎকে যেন বিচলিত বিবশ করে দেয়। কি এক অজানিত আশঙ্কায় সর্বাঙ্গ শিউরে শিউরে ওঠে তার।

ভুলতে পারে না রাজু।

দস্যু কালো ভ্রমর।

শয়তান কালো ভ্রমর। কিন্তু সত্যিই কি তাই তার একমাত্র পরিচয়! সেই বলিষ্ঠ পেশল উন্নত গঠন! তেজোদৃপ্ত কণ্ঠস্বর!

রাজু শুনেছিল—মস্ত বড় নাকি একটা দল আছে কালো ভ্রমরের। অথচ আশ্চর্য, দলের লোকের কেউ নাকি আজ পর্যন্ত জানে না, কালো ভ্রমরের আসল ও সত্যিকারের পরিচয়। কে সে, কি সে এবং কেমন দেখতে সে!

দলের লোকেরা শুধু এইটুকুই জানে যে কঠোর তার অনুজ্ঞা। কঠোর তার নীতি। অপূর্ব তার সংযম। নির্লোভ। আজন্ম ব্রহ্মচারী। তবু সে শয়তান। তবু সে ডাকাত। তবু সে আতঙ্ক। তবু সে সমাজের বাইরে, সকলের ঘৃণা ও অভিশাপের পাত্র।

সুব্রত। সে ভাবেঃ একটা তেজোদৃপ্ত অহঙ্কার। অদ্ভুত কৌশলী, ডাকাত, দস্যু! কালো পাথরের ড্রাগনটির কথা মনে হলেই মনে পড়ে সেই দুঃস্বপ্ন! রূপকথার কাহিনীর মত সেই সম্পত্তি-প্রাপ্তি! তার পর সেই নীল পারাপার-হীন মহাজলধি! কি অপূর্ব বিরাট বিস্ময়! মগের দেশ! বেচারী অমরবাবু!

সত্যিই কি শয়তান কালো ভ্রমর তার ওপরে প্রতিশোধ নেবে?

আর ওদের সঙ্গে সঙ্গে ভাবে কিরীটী, রহস্যভেদী কিরীটী। রহস্য উদ্‌ঘাটনের ওর আছে একটা তীব্র নেশা। আছে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও উত্তেজনা। কালো ভ্রমর সাধারণ ছিঁচকে চোর নয়। প্রখর বুদ্ধি ও অমিত শক্তির অধিকারী সে।

কালো ভ্রমর সম্পর্কে তাই বুঝি কিরীটী এক অদৃশ্য সংকেত অনুভব করে, কি এক গভীর রহস্য যেন ওকে আকর্ষণ করে।

বিচিত্র এই জগৎ! আরও বিচিত্র এই জগতের মানুষ! কেন মানুষ এমনি করে অন্ধের মত ছুটে যায় সর্বনাশের পথে? অকারণে আপনাকে বিপদের মধ্যে ফেলে কেন নিজেকে করে ব্যস্ত? এও হয়তো একটা নেশা!

নেশা বৈকি। নেশা না হলে কি কেউ এমনি করে আপনাকে বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে পারে? সত্যি, বিচিত্র এই জগতের মানুষ! আরও বিচিত্র তার মতি-গতি।

॥ ১ ॥

বাদল-সন্ধ্যার আগন্তুক

শীতের সকাল নয়, এবারে বাদলার রাত্রি।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি ঝরছে বাইরে। মেঘ-মেদুর আকাশের গায়ে বিদ্যুতের সোনালী আলোর চকিত ইশারা উঠছে থেকে থেকে লকলকিয়ে।

মেঘনিবিড় রাত্রির অন্ধকার সূচীভেদ্য। রাত্রি সাড়ে সাতটা আটটার বেশী নয়।

সুব্রত, সনৎ ও রাজু পাশাপাশি তিনখানা চেয়ারের ওপরে বসে কি একটা বিষয় নিয়ে তর্কে মেতে উঠেছে ঐ বাদলার সন্ধ্যারাত্রে।

রাজুর মা এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। হাতে তাঁর ডিশে গরম গরম পাঁপর, বেগুনী ও মটরভাজা।

সুব্রত এক লাফে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে আসে। দু হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে বলে ওঠে, সত্যি মা, তোমাকে যে কি ভালবাসতে ইচ্ছা করছে, কেমন করে তুমি আমাদের মনের এই মুহূর্তের আসল কথাটি টের পেলে বল তো! এমন বাদলার রাতে তেলেভাজা! আমাদের এক বন্ধু কবি মণি দত্ত কবিগুরুর একটা কবিতার প্যারডি করেছিল একবার—

সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব,—
পাঁপর ভাজা দিয়ে মটর সাথে নিয়ে
জিহ্বা দিয়ে শুধু অনুভব...

সুব্রতর কবিতা শুনে মা হেসে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলেও।

রাজু হাসতে হাসতেই বলে, দাদাগো, বিশ্বকবিকে আর এভাবে স্মরণ করো না। তাঁর সর্বজনপ্রিয় বর্ষা কবিতাটির এই অদ্ভুত প্যারডি শুনে, আর

যাই হোক, তিনি নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত হবেন না তা এখন তিনি যেখানেই থাকুন।

কিন্তু এগুলো যে জুড়িয়ে গেল, বেশী রাত করিস্ নে! আজ মটরশুঁটির খিচুড়ি হচ্ছে। মা বলেন আবার মৃদু হেসে।

সত্যি! Three cheers for মা! সুব্রত বলে ওঠে। মা খোলা দরজাপথে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান।

সকলে আহার্যে মনোনিবেশ করে।

ঠিক এমনি সময় বাইরের দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ পাওয়া গেল, খুট খুট খুট।

রাজুই প্রথমে বলে, কে যেন কড়া নাড়ছে!

আবার কড়ানাড়ার শব্দ।

কে? সুব্রত উঠে দাঁড়ায় এবং দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

সুব্রত দরজাটা খুলে দিল। রাস্তার অদূরবর্তী গ্যাসের আলো বৃষ্টি-ভেজা পিচঢালা রাস্তার ওপরে পড়ে চিক্‌চিক্ করছে।

মধ্যে মধ্যে এক-এক ঝলক জলকণাবাহী হাওয়া গায়ে চোখে মুখে এসে ঝাপটা দেয়। সির্ সির্ করে ওঠে সর্বাঙ্গ।

দরজার ওপরেই গায়ে বর্ষাতি, মাথায় বর্ষা-টুপি, হাতে ঝোলানো একটি গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ এক অপরিচিত ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

এইটাই কি ১৮নং বাড়ি? মিঃ সুব্রত রায়?...আগন্তুক প্রশ্ন করেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিই, তা আপনি...

আমাকে চিনতে পারছেন না, এই তো? তা সে হবে'খন, আপাতত আমাকে এ বৃষ্টির মধ্যে না দাঁড় করিয়ে রেখে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দিলে—

বিলক্ষণ! আসুন আসুন।

সুব্রতর আহ্বানে আগন্তুক এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই রাজু ও সনৎ ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাল বিস্মিত ভাবে।

ভদ্রলোক প্রথমেই গায়ের ভেজা বর্ষাতিটা খুলে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করে ঘরের দেওয়ালে আলনায় ঝুলিয়ে রাখলেন। তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে জানালেন নমস্কার।

আগন্তুকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছিই বোধ হয় হবে, দেহের গড়ন দোহারা ও বলিষ্ঠ বলেই মনে হয়। ভদ্রলোক বেশ শৌখিন প্রকৃতির। মাথার চুল কাঁচায় পাকায় মেশানো। ভ্রূযুগলের নীচে একজোড়া তীক্ষ্ম অনুসন্ধানী চক্ষুতারকা। দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো।

আমায় চিনতে পারছেন না আপনারা কেউই, তাই সর্বাগ্রে পরিচয়টাই দিই, আমার নাম বনমালী বসু। ডিব্রুগড় থেকে আসছি। কলকাতায় এসেছি আপনাদের কাছেই একটি বিশেষ জরুরী পরামর্শের জন্য। সুব্রত, রাজেন ও সনৎবাবু সকলের নিকটই আমার বক্তব্য আমি পেশ করব। কিন্তু তারও আগে যদি এক কাপ চা পেতাম! বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে শরীর যেন একেবারে অবশ হয়ে গেছে।

নিশ্চয়ই, এই সামান্য ব্যাপারের জন্য এত কুণ্ঠা বোধ করছেন কেন? বলে তখনই সুব্রত ভৃত্যকে ডেকে এক কাপ চা আনতে দিল।

কিছুক্ষণ পরে চা এলে, গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ভদ্রলোক বললেন, শোনা যায় সত্যযুগে অতিথি-সৎকার করা গৃহস্থের একটা প্রধান ও

অবশ্য-করণীয় ধর্ম ছিল আর আজকাল ভিখারী ও প্রার্থীকে বাড়ি হতে তাড়িয়ে দেওয়াটাই হয়েছে একটা রীতি!

রাজু প্রতিবাদের সুরে বলল—হ্যাঁ, তার কারণও আছে। আজকাল সকলেই ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভ করতে চায়। পরের মাথায় যে যত সুন্দরভাবে হাত বুলাতে পারে তারই জয়জয়কার।

তা যা বলেছেন। বলতে বলতে ভদ্রলোক নিঃশেষিত চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখলেন।

বাইরে আবার জোরে বৃষ্টি নামল। সোঁ সোঁ করে হাওয়া বইতে শুরু করল।

আপনি কেন হঠাৎ এই ঝড়-বাদলের রাত্রে ডিব্রুগড় থেকে এত দূরে আমাদের কাছে এলেন তা তো কই শোনা হল না বনমালীবাবু এখনও? সুব্রত প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, সে-কথাই এবারে বলব। বলতে বলতে ভদ্রলোক একটু নড়েচড়ে বসে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আরম্ভ করলেনঃ তা হলে খুলেই বলি কথাটা সুব্রতবাবু, যে জন্যে এতদূর ছুটে এসেছি তাই বলছি। একটা বিশেষ দুর্ভাবনায় পড়েছি মশাই।

সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে বনমালী বসুর দিকে তাকাল।

বনমালী বলতে থাকেন, কেন আপনাদের কাছে আসতে হয়েছে জানেন? আমার কাকা অমর বসু ছিলেন রেঙ্গুনের বিখ্যাত কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী মিঃ চৌধুরীর ফার্মের ম্যানেজার ও প্রাইভেট সেক্রেটারী।

ছিলেন মানে?—সকলে একসঙ্গে একই প্রশ্ন করলে।

হ্যাঁ ছিলেন, কিন্তু এখন আর নেই। কারণ গত ৩১শে তারিখে কোন অদৃশ্য আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হয়েছেন।

নিহত হয়েছেন! অমরবাবু! এ আপনি কি বলছেন বনমালীবাবু? সুব্রত উৎকণ্ঠিত ভাবে বলে।

বলছি যা তার মধ্যে একবর্ণও মিথ্যা বা তৈরী নয়। কে বা কারা যে তাঁকে হত্যা করেছে তা অবিশ্যি এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। দিন দশেক আগের এই 'তার' আমি রেঙ্গুন থেকে পাই। এই দেখুন—, বলতে বলতে ভদ্রলোক বুকপকেট থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করে সকলের চোখের সামনে আলোর নীচে মেলে ধরলেন।

কাগজের ভাঁজ খুলে ধরবার সময় ভদ্রলোকের হাতের জামাটা একটু সরে যেতেই খোলা হাতের উপর সনৎ-এর নজর পড়ল মুহূর্তের জন্য। বিস্ময়ে আতঙ্কে চমকে উঠল সে, কিন্তু আর সকলে তখন সেই কাগজের লেখাগুলো পড়তেই ব্যস্ত, সেদিকে কারও নজর গেল না। কাগজে যা লেখা ছিল, তার বাংলা তর্জমা করলে এই রকম দাঁড়ায়—

গত শুক্রবার মিঃ চৌধুরীর প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ অমর বসুকে তাঁর শয়নঘরের মধ্যে মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তীক্ষ্ম ছুরি কিংবা ঐ জাতীয় কোন অস্ত্রের সাহায্যে তাঁর মুখখানি এমনভাবে বিকৃত করা হইয়াছে যে মিঃ বসুকে একেবারে চেনাই যায় না। অবশ্য মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হইয়াছে। সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টার মিঃ সলিল সেন তদন্তের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি 'তার' পাওয়া মাত্র এখানে আসিবেন।—ডি.

আই. জি.।

পড়া শেষ হলে ভদ্রলোক বললেন, সেদিনকার স্থানীয় সংবাদপত্রে যে সংবাদ বেরিয়েছে তারও কাটিং যোগাড় করেছি। এই দেখুন কাটিংটায় লেখা রয়েছে—

স্বর্গীয় মিঃ চৌধুরীর প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ অমর বসুর অভাবনীয় মৃত্যু!

আপনারা সকলেই জানেন, মাত্র মাসখানেক আগে মিঃ বসু মৃত মিঃ চৌধুরীর অন্যতম প্রধান সাক্ষীর কর্তব্য পালনের জন্য কিভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বিখ্যাত দস্যু 'কালো ভ্রমরে'র মুখের গ্রাস ছিনাইয়া লইয়া উইল-সংক্রান্ত সমস্ত গোলমাল মিটাইয়া সব কিছুর নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রভুভক্তি ও কর্তব্য-পরায়ণতার কথা এখনও শহরবাসী কেহই আমরা ভুলিতে পারি নাই। গতকাল তাঁহার মৃতদেহ তাঁহার শয়নকক্ষের মধ্যে পাওয়া যায়। তীক্ষ্ম ছোরা বা ঐ জাতীয় কোন অস্ত্রের সাহায্যে মুখচোখ এমনভাবে বিকৃত করা হইয়াছে যে তাঁহাকে আর শ্রীযুক্ত অমর বসু বলিয়া চেনাই যায় না। আগের দিন প্রায় রাত ১২টা পর্যন্ত তিনি অফিস-সংক্রান্ত কাজ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। ১২টার পর তিনি শয়নগৃহে ঘুমাইতে যান এবং ঐ দেশীয় ভৃত্যও আলো নিভাইয়া দিয়া শুইতে যায়। পরদিন প্রত্যুষে ভৃত্য প্রভাতী চা লইয়া মনিবের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া মনিবের রক্তাক্ত মৃতদেহ শয্যার উপর পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তখনই ফোনে পুলিসে সংবাদ দেয়। ইন্সপেক্টার মিঃ সলিল সেন তদন্তের ভার লইয়াছেন। কে বা কাহারা যে এইভাবে তাঁহাকে হত্যা করিয়া গেল, আজ পর্যন্ত তাহা জানা যায় নাই। তবে আমাদের মনে হয় কালো ভ্রমর সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ একটু মনোযোগী হইলে ক্ষতি কি!

শেষ পর্যন্ত সেই ড্রাগনের মৃত্যু-পরোয়ানাই সত্যি হল, একজন দুর্ধর্ষ ডাকাতের জেদই বজায় রইল!—সুব্রত বললে।

সনৎ কিন্তু একটিও কথা না বলে অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

॥ ২ ॥

গভীর নিশীথে

এত বড় একটা দুঃখের সংবাদ সকলের মনই যেন কেমন বিষণ্ণ করে দেয়। সেই উইল-সংক্রান্ত ঘটনাটা কি আজ পর্যন্ত কেউ ভুলতে পেরেছে? ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়। সুব্রত ভাবছিলঃ অজানা বন্ধু, কেমন করে ছায়ার মতই পাশে পাশে থেকে সেদিন তাদের সকলকে সকল বিপদের কবল হতে আড়াল করে রক্ষা করেছিল। এক কথায় বলতে গেলে মিঃ বসু না থাকলে ঐ বিপুল সম্পত্তিপ্রাপ্তি তাদের ভাগ্যে রম্ভা-প্রাপ্তিতেই পরিণত হত।

কতক্ষণ এভাবে নীরবে কেটে গেল। সর্বপ্রথম সনৎই সেই নীরবতা ভংগ করে বনমালীবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, তা আপনি এখনও বর্মা যাত্রা করেন নি কেন বনমালীবাবু?

সনৎ-এর প্রশ্নটা শুনে বনমালী বসু যেন প্রথমটা একটু চমকে উঠলেন;

কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, যাইনি তারও কারণ আছে। প্রথমতঃ সে বিদেশ-বিভুঁই মগের দেশঃ কাউকে জানি না, চিনিও না কাউকে। দ্বিতীয়তঃ মশাই, সত্যি কথা বলতে কি, আমি একটু ভীত প্রকৃতির লোক। খবরের কাগজে আপনাদের কথা ও কাকার সঙ্গে আপনাদের আলাপ-পরিচয়ের কথা পড়েছিলাম এবং পরে কাকাও আমাকে আপনাদের সম্পর্কে চিঠি দিয়েছিলেন। ডি. আই. জি-র 'তার' পাওয়ার পর প্রথমটা অনেক ভাবলাম এবং ভাবতে ভাবতে কেন জানি না, আপনাদের কথাই আমার মনে পড়ল। তার পর অনেক কষ্টে আপনাদের ঠিকানা যোগাড় করে এখানে আসছি। এখন যদি আপনাদের সহানুভূতি ও সাহায্য পাই! এই পর্যন্ত বলে বনমালীবাবু থামলেন।

সনৎই আবার প্রশ্ন করে, আচ্ছা বনমালীবাবু, ঠিক কি ধরনের সাহায্য আপনি আমাদের কাছে আশা করে এখানে এসেছেন বলুন তো? কারণ এক্ষেত্রে যে ঠিক কি ভাবে আপনাকে আমরা সাহায্য করতে পারি, সত্যি কথা বলতে কি, যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

সাহায্য অবিশ্যি আপনারা আমাকে অনেক ভাবেই করতে পারেন, তবে যেজন্য আমি এতদূর আশায় ছুটে এসেছি, যদি আপনারা একটিবার দয়া করে আমার সঙ্গে রেঙ্গুনে যান, তা হলে আপনাদের সকলের সাহায্যে হয়তো ব্যাপারটার একটা ভাল করে অনুসন্ধান করে দেখতে পারতাম। তাছাড়া আত্মীয় বলতে আমার ঐ কাকাই যা একজন বেঁচেছিলেন। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে যেন। একটু থেমে আবার বলতে শুরু করেন, অবিশ্যি বলাই বাহুল্য যে আপনাদের যাতায়াতের সর্ববিধ খরচ আনন্দের সঙ্গেই আমি বহন করব।

খরচের কথা বাদ দিন বনমালীবাবু। যেভাবে আমরা, বিশেষ করে আমি অমরবাবুর কাছে ঋণী, সামান্য অর্থের কথা সেখানে উঠতেই পারে না। কথাটা বলে সুব্রত।

তাছাড়া আমার কেন যেন মনে হচ্ছে মিঃ রায়, আমার খুড়ো মশাইয়ের এই নিষ্ঠুর হত্যার ব্যাপারে কোথাও যেন বেশ একটু গোলমাল আছে।

গোলমাল আছে মানে? সুব্রত প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, গোলমাল। ভেবে দেখুন, হত্যাই যখন তাঁকে করা হল, তখন অমন করে হত্যাকারী অস্ত্রের সাহায্যে মৃত ব্যক্তির মুখ বিকৃত করে গেল কেন? কি তার উদ্দেশ্য ছিল? তারপর সংবাদপত্রে ঐ যে দস্যু কালো ভ্রমরের কথা ইঙ্গিত করেছে, কারণ ভেবে দেখুন, আপনাদের উইলের ব্যাপার আমার কাকা আপনাদের সাহায্য করায় ঐ কালো ভ্রমরের বিপক্ষে তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছিল, সে ব্যাপারে কালো ভ্রমরের একটা আক্রোশ কাকার ওপর থাকাটাও অসম্ভব নয়—তাতে করে ঐ দস্যুকেই আবার সন্দেহ হয়। তাছাড়া আপনাদের উইলের ব্যাপার নিয়ে কালো ভ্রমরের দলের সঙ্গে বহু সংঘর্ষ হয়েছে বলে ও বিষয়েও আপনাদের খানিকটা সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাও তো আছে। এই সব কারণেই আমি আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছি।

সনৎ বললে, কিন্তু এ হত্যার ব্যাপারে আদপেই কালো ভ্রমরের কোন হাত নাও তো থাকতে পারে। কালো ভ্রমরের ঘাড়েই বা দোষটা চাপাচ্ছেন কেন? হত্যার ব্যাপারে কালো ভ্রমর যে জড়িত আছে, এমন কোন নিদর্শন কি পাওয়া

গেছে? কিংবা সে কি কিছু রেখে গেছে? সবটাই তো সংবাদপত্রের অভিমত—

সনৎ-এর কথায় বাধা দিয়ে সুব্রত ও রাজু বলে উঠল, সে তুমি যাই বল সনৎদা, আমরা একেবারে হলফ করে বলতে পারি—কালো ভ্রমর ছাড়া এ ব্যাপারে অন্য কারও হাত নেই। মনে পড়ে তোমার, সেই রেঙ্গুনের বাড়িতে একদিন সন্ধ্যাবেলা বাক্সে করে সেই চিঠি ও ড্রাগন পাঠাবার কথা? সে-সব কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি তুমি এত তাড়াতাড়ি?

না ভুলিনি এত তাড়াতাড়ি। কিন্তু সেই ব্যাপারের সঙ্গে এর এমন কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে সুব্রত, সেটাই ভাই যেন বুঝে উঠতে পারছি নে!

কেন? সেই চিঠি ও ড্রাগন পাঠানোর পর অমরবাবুর এইরূপ শোচনীয় মৃত্যু, এর পরও কি তোমার বোঝবার অসুবিধা হচ্ছে?

অসুবিধাটা ঠিক কালো ভ্রমরের এই ব্যাপারে জড়িত থাকার সম্ভাবনাটাই নয়, অন্য কিছু!

কি?

সময় হলে বলব, এখন না। সনৎ যেন ইচ্ছা করেই চুপ করে যায়।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না সনৎদা, এই সোজা ব্যাপারটাকে তুমি ঘুরিয়েই বা দেখছ কেন?

আপনার বুঝি এ মৃত্যু-ব্যাপারে সন্দেহ হচ্ছে সনৎবাবু? সহসা বনমালী-বাবু প্রশ্ন করলেন।

ভৃত্য এসে ঘরের মধ্যে ঐ সময় প্রবেশ করল; বললে, মা বললেন, খিচুড়ি তৈরী হয়ে গেছে। দেরি করলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আপনাদের কি খাওয়ার জায়গা করা হবে?

সনৎ জবাব দিল, হ্যাঁ, জায়গা করে দিতে বল গে...তা হলে বনমালীবাবু, আপনিও এই গরীবদের ঘরে দুটো খুদকুঁড়ো যা হয়—, আশা করি আপত্তি নেই!...

বিলক্ষণ, একথা আবার জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন? আপনারা না বললেও আমি সেধে খেতাম। আমার আবার হোটেলের খাওয়াও তেমন সহ্য হয় না।

আহারের স্থান হলে সকলে গিয়ে একত্রে খেতে বসল। এবং বেশ তৃপ্তি সহকারেই খাওয়া-দাওয়া শেষ হল।

বাইরে তখন মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে। প্রমত্ত বায়ুর হাহাকারে দিগন্ত ঝঙ্কৃত ও কম্পিত হচ্ছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎঝলকে চোখ যেন ঝলসে যায়। সেই ঝড়বাদলের রাত্রে সুব্রতই যেচে বনমালীবাবুকে সেখানে থাকতে অনুরোধ জানালে। তিনিও সম্মত হলেন। একতলার বৈঠকখানার পাশের ঘরে বনমালী-বাবুর শয়নের বন্দোবস্ত করে দেওয়া হল।

রাত যত বাড়তে থাকে, সেই সঙ্গে ঝড় ও জলের প্রকোপও যেন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বনমালীবাবুকে এইভাবে যেচে বাড়িতে স্থান দেওয়াটা গোড়া হতেই যেন সনৎ-এর মনঃপূত হয়নি। তার পরামর্শ না নিয়েই কেন যে সুব্রত বনমালী-বাবুকে গৃহে স্থান দিল! সনৎ-এর চোখে ঘুম আসছিল না। তাই সে এক সময় ঘর থেকে বের হয়ে বাইরের টানা বারান্দায় রেলিংয়ে ভর দিয়ে নিশীথ রাতের তাণ্ডব-লীলা দেখছিল। বাইরের রুদ্র তাণ্ডব কি তার মনের মধ্যেও তাণ্ডব শুরু করেছে? পাশের ঘরেই সুব্রত ও রাজু অঘোরে নিদ্রা দিচ্ছে।

আর তার পাশের ঘরে শুয়ে বনমালীবাবু।

এলোমেলো চিন্তা করতে করতে একসময় বুঝি সনৎ কেমন একটু অন্য-মনস্ক হয়ে গিয়েছিল, সহসা কে যেন নিঃশব্দে সনৎ-এর কাঁধের উপর হাত রাখলে!

কে? চমকে উঠে সনৎ ফিরে তাকায়।

বারান্দায় সিলিংয়ে ঝোলানো ম্রিয়মাণ বৈদ্যুতিক আলোর খানিকটা তির্যগ্‌গতিতে এসে এদিকে পড়েছে।

আগন্তুক বললে, আমায় চিনতে পেরেছ, সনৎবাবু?

সনৎ যেন আগন্তুকের কথায় এতটুকু ভয়ও পায়নি এমনি ভাবে ঠোঁটের কোণে মৃদু একটুকরো হাসি টেনে এনে বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বললে, তোমার কি মনে হয় বন্ধু?

বন্ধু, বন্ধু! চমৎকার! কিন্তু তোমার নামে যে একটা পরোয়ানা আছে।

পরোয়ানা? কিসের পরোয়ানা তা শুনতে পাই না?

নিশ্চয়ই। কালো ভ্রমরের মৃত্যু-গুহায় হাজিরা দেওয়ার।

তাহলে বলব তুমি বা তোমার দলপতি এখনও সনৎ রায়কে ঠিক চিনতে পারনি!

চিনিনি তোমাকে? কে বললে? পাশ হতে চাপা কণ্ঠে অপর কেউ যেন বলে উঠল অকস্মাৎ।

অস্পষ্ট আলো-ছায়ায় বারান্দাটা যেন আশু এক ভৌতিক সম্ভাবনায় থম্‌ থম্‌ করে ওঠে সহসা।

আকাশ ভেঙে যেন আজ রাতে বৃষ্টি নেমেছে...ঝম্‌...ঝম্‌ ...ঝম্‌...ঝম্‌।

সেই অবিশ্রাম একটানা শব্দেও পার্শ্ববর্তী আগন্তুকের কণ্ঠস্বরটা শুনতে কষ্ট হয় না সনৎ-এর।

অতর্কিতে সেই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গে চমকে সনৎ ফিরে তাকায়। ইতি-মধ্যে ঠিক তার পশ্চাতে কখন যে আরও চারজন এসে নিঃশব্দে উপস্থিত হয়েছে তা সে টেরও পায়নি। প্রথমটা সে অতর্কিতে এতগুলো লোকের আবির্ভাবে বিস্মিত ও বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নিমেষে নিজেকে সামলে নেয়।

একটু বেচাল বা অসতর্ক হলেই লোকগুলো যে তার ওপরে চোখের নিমেষে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সনৎ ভেবেই পায় না, কি উপায়ে সে নিজেকে এই মুহূর্তে রক্ষা করতে পারে!

তোমাদের কি উদ্দেশ্য তা জানতে পারি কি?

কেন বন্ধু? এখনও কি তোমার সে কথা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে? নিশ্চয়ই এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওনি যে, কালো ভ্রমরের প্রতিশ্রুতির টাকা বা কালো ভ্রমরের ন্যায্য পাওনা এখনও শোধ করনি তুমি?

কালো ভ্রমরের ন্যায্য পাওনা! হুঁ, তা পাওনাই বটে!

এত বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েও সনৎ-এর কণ্ঠস্বর অবিচলিত। বলে, বেশ, সে টাকা আমি কালই দিয়ে দেব।

অনেক দেরি করে ফেলেছ সনৎবাবু, সুদে-আসলে এখন সে টাকার অঙ্ক তোমার ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। কি ভাবে যে এখন তোমাকে সেটা শোধ করতে হবে, সে কথা কালো ভ্রমরই তোমায় যথাসময়ে বাতলে দেবে—। রূঢ় বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে লোকটি বলে।

লোকটার শেষ কথাগুলি যেন মুখেই আটকে গেল। বিদ্যুৎগতিতে সনৎ-এর বজ্রমুষ্টি ভীমবেগে এসে লোকটার চোয়ালে আঘাত করল।

সনৎ দ্বিতীয়বার মুষ্টি উত্তোলনের আগেই দুজন তাকে পশ্চাৎ দিক থেকে চকিতে জাপটে ধরল।

আক্রান্ত হয়ে সনৎ নিজেকে মুক্ত করবার জন্য প্রথমেই সামনে যে ছিল তাকে পা দিয়ে লাথি বসাল।

ধর শয়তানটাকে। শক্ত করে চেপে ধর। কে যেন বলে।

সনৎ ইতিমধ্যে নিজেকে তাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে এবং সংগে সংগে ক্ষিপ্রগতিতে সিংহবিক্রমে সম্মুখের লোকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তে সংগে সংগে পাশের লোক দুটিও সনৎকে দু পাশ হতে আক্রমণ করল।

অন্ধকার জলে-ভেজা বারান্দায় ওদের হুটোপুটি চলতে লাগল। এমন সময় কোথা থেকে ছায়ার মত আরও দুজন লোক এসে সেখানে হাজির হল। কাজেই সনৎকে শীঘ্রই বিপক্ষ দলের কাছে হার মানতে হল। এতগুলো লোকের মিলিত আক্রমণে পরাজিত সনৎ-এর মুখটা ততক্ষণে আক্রমণকারীদের মধ্যে একজন ক্ষিপ্রহস্তে বেঁধে ফেলেছে, এবং দুজনে মিলে তাকে কাঁধে তুলে নিয়েছে। বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ভিজতে ভিজতে সকলে সনৎকে বয়ে রাস্তায় এসে নামল।

ওদের বাড়ির অল্প দূরেই রাস্তার ওপর বৃষ্টির মধ্যে একখানা মোটর-গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। লোকগুলো তাড়াতাড়ি সনৎকে নিয়ে সেই গাড়ির মধ্যে তুলল।

পরমুহূর্তে গাড়িটা ছেড়ে দিল।

* * *

পরদিন সকালে যখন রাজুর ঘুম ভাঙল, সে দেখলে সুব্রত তখনও ঘুমোচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে সুব্রতকে ডেকে বললে, এই সুব্রত, ওঠ্ ওঠ্, বেলা অনেক হয়েছে।

রাজুর ডাকে সবে সুব্রত চোখের পাতা রগড়াতে রগড়াতে শয্যার ওপরে উঠে বসেছে, ভৃত্য এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।—বড়দাদাবাবু উঠেছেন শিবু? সুব্রতই প্রশ্ন করে।

তিনি তো তাঁর ঘরে নেই!

নেই? আর কালকের সেই বাবুটি?

না, তিনিও নেই।

সে আবার কি! এত সকালে গেল কোথায় তারা? বাইরে তখনও টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, বর্ষাসিক্ত প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে রাজু বলে, এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় আবার গেল তারা?

মা এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন, হ্যাঁ রে, সনৎ কোথায় গেছে জানিস? তাকে দেখলাম না তার ঘরে?

না তো মা! রাজু জবাব দেয়।

চল তো রাজু, ওদের ঘর-দুটো একবার ঘুরে দেখে আসি।

প্রথমেই রাজু ও সুব্রত এসে সনৎ-এর ঘরে প্রবেশ করল। নিভাঁজ শয্যা

দেখে মনে হয় রাত্রে শয্যা স্পর্শ পর্যন্ত করা হয়নি।

হঠাৎ সামনের টী-পয়ের ওপর সুব্রতর নজর পড়ে, জলের গ্লাসটা চাপা দেওয়া একটা ভাঁজকরা হলুদবর্ণের তুলট কাগজ। সুব্রত এগিয়ে এসে কাজগটা তুলে চোখের সামনে মেলে ধরতেই, বিস্ময়ে আতঙ্কে যেন স্তব্ধ হয়ে যায় ও।

সেই ভ্রমর-আঁকা চিঠি!

নমস্কার। চিহ্ন দেখেই চিনবে। সনৎকে নিয়ে চললাম। ভোরের জাহাজেই বর্মা যাব। ইচ্ছা হলে সেখানে সাক্ষাৎ করতে পার।

—কালো ভ্রমর

কিরে ওটা? রাজু এগিয়ে আসে।

সুব্রত চিঠিটা রাজুর হাতে তুলে দেয় নিঃশব্দে।

আবার সেই কালো ভ্রমর! মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী! উঃ, কি বোকাটাই সকলকে বানিয়ে গেল! শয়তান! ডিব্রুগড় থেকে আসছি, অমরবাবুর ভাইপো! ধাপ্পাবাজ! সনৎদা কি তবে শয়তানটাকে চিনতে পেরেছিল?

গতরাত্রের আগাগোড়া ব্যাপারটার মধ্যে তার এতটুকু উৎসাহও ছিল না। সে যেন এড়াতেই চাইছিল। বলে রাজু।

রাগে দুঃখে অনুশোচনায় সুব্রতর নিজেরই চুল যেন নিজেরই টানতে ইচ্ছে করে।

উঃ, এত বড় আপসোস সে রাখবে কোথায়?

দেওয়ালে টাঙানো ওয়াল-ক্লকটার দিকে তাকিয়ে সুব্রত দেখল বেলা তখন আটটা বেজে পনেরো মিনিট। সাতটা তিরিশে জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। বাইরের দিকে তাকায়। বৃষ্টি থেমেছে, মেঘ-ভাঙা আকাশে সূর্যের আত্মপ্রকাশ, স্নিগ্ধ-সুন্দর।

এখন তাহলে কি করা যায় বল তো সু?

আর দেরি করা নয়। চল, এখনই গিয়ে আগে তো থানায় একটা ডাইরি করিয়ে আসি!

তাতে কি সুবিধা হবে?

তাহলে অন্তত 'বেতারে' জাহাজের ক্যাপ্টেনকে একটা সংবাদ দেওয়া যেতে পারে, যদি আজকের জাহাজেই তারা গিয়ে থাকে!

তারপর?

তারপর সামনের শনিবারে জাহাজে সীট পাই ভাল, না হয় পরের মঙ্গলবার আমাদের রেঙ্গুনের জাহাজ ধরতেই হবে, তা যে উপায়েই হোক। শুধু রেঙ্গুনে কেন, সনৎদার খোঁজে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে যেতে হলেও যাব। আমি খুঁজে বের করবই, আর একবার সেই শয়তান-শিরোমণির সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াব। সে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে, স্কাউণ্ড্রেল!

মা এসে ঘরে প্রবেশ করলেন, তোদের চা জুড়িয়ে গেল। পরক্ষণেই ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে রে?

সুব্রত মার হাতে চিঠিটা তুলে দেয়।

চিঠিটা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে এক অস্ফুট কাতরোক্তি মার কণ্ঠ হতে নির্গত হয়ে আসে, সর্বনাশ! কালো ভ্রমর!

সুব্রত দাঁতে দাঁত চেপে কঠিনস্বরে বললে, হ্যাঁ মা, আবার সেই কালো

ভ্রমর। কিন্তু এবার সত্যিসত্যিই তার পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে।

কথাবার্তায় আর সময় নষ্ট না করে, কিছু জলখাবার ও চা খেয়ে, রাজু ও সুব্রত তাড়াতাড়ি লালবাজারের দিকে ছুটল।

লালবাজারে গিয়ে সোজা তারা একেবারে ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে সব বললে।

ওদের সমস্ত কথা মনোযোগ সহকারে শুনে সাহেব আবশ্যকীয় সব কথা নোট করে নিলেন এবং বললেন, বাবু, তোমাদের কথা শুনে আমি আশ্চর্য! এ একেবারে miracle (অত্যাশ্চর্য)! যা হোক, আমি এখনই জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বেতারে সংবাদ প্রেরণের সব বন্দোবস্ত করছি।

সুব্রত লালবাজার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পোষ্ট-অফিসে গিয়ে রেঙ্গুনে সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টার সলিল সেনকে একটা 'তার' করে দিল—সনৎ সম্পর্কিত সকল ব্যাপার জানিয়ে।

তারপরই দুজনে গেল জাহাজের বুকিং অফিসের দিকে। জাহাজ ছাড়বে শনিবার—পরশুর পরের দিন, এবং সেই জাহাজে দুখানা সীট্ রিজার্ভের সব বন্দোবস্ত করে যখন ওরা বাড়ির দিকে পা বাড়াল, তখন প্রখর রৌদ্রে সারা পৃথিবী যেন ঝলসে যাচ্ছে। কর্মচঞ্চল শহরের বুকে অগণিত নরনারী ও বাস-ট্রামের আনাগোনার শব্দ।

ফিরতি-পথে ওরা যে রাস্তাটা দিয়ে আসছিল, তার দু পাশে চীনা পট্টি। সেই চীনা পট্টি দিয়ে চলতে চলতে একসময় রাজু চাপা, গলায় সুব্রতকে বললে, একটা লোক অনেকক্ষণ থেকে আমাদের পিছু নিয়েছে সুব্রত!

সুব্রত পিছনপানে না তাকিয়েই বললে, তাই নাকি?

অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হয়।

লোকটা কি বাঙালী?

না, বর্মী বলে মনে হয়।

কি করে বুঝলে যে লোকটা আমাদের পিছু নিয়েছে?

রাজু প্রত্যুত্তরে একটু হাসলে মাত্র, তারপর বললে—তুই ভুলে যাচ্ছিস্ যে, একদিন এ দলে আমি বহু ঘোরাফেরা করেছি। শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখলেই আমাদের চিনতে কষ্ট হয় না।

আচ্ছা ওকে অনুসরণ করতে দে। দেখা যাক, লোকটার দৌড় কতদূর পর্যন্ত!

একটা কাজ করলে হয় না?

কি?

আয়, শ্যামবাজারের একটা ট্রামে এখন উঠি; খানিকটা ঘুরে-ফিরে পরে বাড়ি যাওয়া যাবে।

মন্দ কি, বেশ তো!

চট্ করে তারা একটা শ্যামবাজার-গামী ট্রামে চেপে বসল।

* * *

আমহার্ট স্ট্রীটের যেখানটায় সুব্রতর বাড়ি, তার পিছনে একটা খালি মাঠ। তারই ওপাশে বহুদিনকার একটা চারতলা বাড়ি।

শোনা যায় এককালে নাকি বাড়িটা ছিল এক মস্ত ধনী ব্যবসায়ীর। ব্যবসায়ী মারা যাবার পর, তার ছেলে যখন সমস্ত অর্থের মালিক হয়ে বসল,

তখন বিপুল অর্থ হাতে পেয়ে তার মনে হল (বেশীর ভাগ লোকের যা হয়), দুনিয়া তো তারই। এখনকার রাজাই তো সে। স্ফূর্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে সে চোখ বুজে আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখতে শুরু করলে। আর হতভাগ্য পিতার বহু কষ্টার্জিত অর্থরাশি দু'দিনের জন্য তাকে নিয়ে পুতুল-খেলা খেললে, পরে তাকে হাত ধরে পথের ধুলোয় বসিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুখের দিনে একদিন যারা ছিল দিবারাত্র পাশাপাশি বন্ধুর মত, পরমাত্মীয়ের মত, সর্বনাশের নেশায় একদিন যারা ছিল তার মুখোশপরা একনিষ্ঠ বন্ধু, তারাই আজ অচেনার ভান করে অলক্ষ্যে বিদায় নিয়ে গেল। কেউ বা যাবার বেলায় দিয়ে গেল শুষ্ক সহানুভূতির সোনালী হাসি।

যার মুখে একদিন সোনার বাটিতে জমাটবাঁধা দুধ উঠত, আজ তার মুখে ভাঙা কাঁসার বাটিতে জলটুকুও ওঠে না।

সৌভাগ্যের শৈলশৃঙ্গ হতে সে দুর্ভাগ্যের নরককুণ্ডে নেমে এল। এতকাল সে শুধু হেসে-গেয়েই এসেছে, আজ তার দু চোখে জল উঠল ছলছলিয়ে।

তারপর অভাবের তাড়নায় অধীর হয়ে একদিন সে নিজের শয়নগৃহেরই কড়িকাঠের সঙ্গে পরনের কাপড় গলায় দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে এ দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিল। অভিমানে না দুঃখে কে জানে!

এদিকে একজন ধনী মারোয়াড়ী লোকটার জীবিতকালেই বাড়িখানা ক্রয় করে নিয়েছিল দেনার দায়ে, কিন্তু ঐ কেনা পর্যন্তই। কারণ বাড়িখানা সে কোন কাজে লাগাতে পারলে না। সমস্ত রাত্রি ধরে নাকি বুভুক্ষিত অশরীরীর দল সারা বাড়িময় হাহাকার করে বেড়াত। লোক এসে একদিনের বেশী দু'দিন ও বাড়িতে টিকতে পারে না। সারারাত্রি ধরে কারা নাকি সব সময়ে কেঁদে কেঁদে ফেরে। অসহ্য তাদের সেই বুকভাঙা বিলাপ।

ক্রমে একদিন বাড়িটা জনহীন হয়ে ধীরে ধীরে শেষটায় পোড়ো বাড়ি বা ভূতের বাড়িতে পরিণত হল।

তারপর আজ প্রায় দশ বৎসর ধরে বাড়িটা পড়ে আছে। ভাড়াও কেউ নেয়নি, ক্রয় করতেও কেউ চায়নি।

সুব্রত গভীর রাত্রে ঘরে শুয়ে শুনত, রাতের বাতাসে নির্জন বাড়িটার খোলা আধভাঙা কপাটগুলো বার বার শব্দ করে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। কখনও বা দেখত জ্যোৎস্নারাত্রে চাঁদের নির্মল আলো বাড়িটার সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে দুঃস্বপ্নের মত করুণ বিষণ্ণে।

সেদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙতেই সুব্রত চমকে উঠল—সেই মাঠের ওপারে পোড়ো বাড়ির জানালার খোলা কপাটের ফাঁক দিয়ে যেন একটা আলোর শিখা দেখা যাচ্ছে। পোড়ো বাড়িতে আলোর শিখা! আশ্চর্য কৌতূহলী চোখের পাতা দুটো রগড়ে নিল। তারপর আপন মনে বলল—না, ঐ তো মাঝে মাঝে হাওয়া পেয়ে আলোর শিখাটা কেঁপে কেঁপে উঠছে!

সুব্রত বিছানা থেকে উঠে খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। সহসা এমন নিশীথ রাত্রির জমাট স্তব্ধতা ভেদ করে জেগে উঠল একটা তীক্ষ্ণ বাঁশীর আওয়াজ। তারপর আর একটা, আরও একটা ; পর পর তিনটে।

আকাশে মেটে-মেটে জ্যোৎস্না উঠেছে। স্বল্প আলো-আঁধারিতে পোড়ো বাড়িটা যেন একটা মৃত্যু-বিভীষিকা জাগিয়ে তুলেছে! চারিদিক নিস্তব্ধ। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ পর্যন্ত নেই। জীব-জগৎ সুপ্তির কোলে বিশ্রাম-

সুখ লাভ করছে। দিবাভাগের জনকোলাহল মুখরিত জগৎ যেন এখানকার এই স্তব্ধ ঘুমন্ত পৃথিবী থেকে দূরে—অনেক দূরে।

এমনি সময়ে হঠাৎ পোড়ো বাড়ির দোতলার দক্ষিণ দিককার একটা ঘরের একটা জানালার কপাট খুলে গেল এবং সেই খোলা জানালার পথে একটা টর্চের সুতীব্র আলোর রশ্মি মাঠের ওপর এসে পড়ল।

সুব্রতর দু চোখের দৃষ্টি এবারে তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে। রহস্যঘন পোড়ো বাড়ির মধ্যে যেন হঠাৎ প্রাণ-স্পন্দন!

ইতিমধ্যে কখন একসময়ে রাজু এসে ওর পাশেই দাঁড়িয়েছে সুব্রত তা টেরও পায় নি। হঠাৎ কাঁধের ওপর মৃদু স্পর্শ পেয়ে সে চমকে ফিরে তাকাল, কে? ও রাজু!

হ্যাঁ, কিন্তু কি অমন করে দেখছিলি বল্ তো?

চেয়ে দেখ না। মাঠের ওদিকে ঐ ভাঙা বাড়িটা!...

আলোটা ততক্ষণে নিভে গেছে,—নির্জন মাঠের মাঝে অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে সহসা যেন একটা বিভীষিকার আবছা ছায়া নেমে এসেছে।

তাই তো! নির্জন পোড়ো বাড়িতে হঠাৎ কারা আবার এসে হাজির হলেন?—এতক্ষণে বললে রাজু।

হ্যাঁ, তোমার কথাই বোধ হয় ঠিক রাজু

কি বলছিস?

শিকারী বিড়াল?

হ্যাঁ, তার গায়ের গন্ধ পেয়েছি। তারপর হঠাৎ চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে সুব্রত বললে, চল, একবার ওদিককার পথটা ঘুরে দেখে আসা যাক।

এই রাত্রে?

ক্ষতি কি, চল না!

বেশ, চল।

তাড়াতাড়ি গায়ে একটা শার্ট চাপিয়ে দেওয়াল-আলমারি থেকে সিল্ককর্ডের মইটা ও একটা টর্চ নিয়ে সুব্রত ও রাজু রাস্তায় এসে নামল।

মাথার ওপর রাত্রির কালো আকাশ তারায় ভরা। অস্তমিত চাঁদের আলো তখন আরো ম্লান হয়ে এসেছে। চারিদিকে থমথমে জমাট রাত্রি, যেন এক অতিকায় বাদুড়ের সুবিশাল ডানার মত ছড়িয়ে রয়েছে। বড় রাস্তাটা অতিক্রম করে দুজনে এসে গলির মাথায় দাঁড়াল।

কিরীটী রায়কে মনে পড়ে? সুব্রত সহসা একসময় প্রশ্ন করে।

কোন্ কিরীটী রায়?

ঐ সে আমাদের এখানে ফিরে আসার পর প্রীতিভোজের নিমন্ত্রণে যিনি এসেছিলেন? সাড়ে ছয় ফুট লম্বা গৌর বর্ণ, পাতলা চেহারা, মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল, চোখে পুরু লেন্সের কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমের চশমা!

ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ঐ যে শখের ডিটেক্‌টিভ, গোয়েন্দাগিরি করেন, টালিগঞ্জে না কোথায় থাকেন? যিনি ড্রাগনটা তোর কাছ হতে চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, নির্জলা শখেরই গোয়েন্দাগিরি! কাকার প্রকাণ্ড কেমিকেল ল্যাবোরেটারী আছে। আর সে তাঁর একমাত্র ভাইপো।

ওর নামও তো খুব শুনি।

আমাদের পাশের বাড়ির শান্তিবাবুর বিশেষ বন্ধু উনি। তিনিই আমাদের কিরীটীবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। আমরা শান্তিবাবুর সঙ্গে কিরীটী-বাবুকেও নিমন্ত্রণ করেছিলাম। মনে নেই, কিরীটীবাবু আমাদের সব কাহিনী শুনে কি বলেছিলেন? আবার কোন আপদ-বিপদ ঘটলে তাঁকে যেন আগেই খবর দেওয়া হয়। ওঁর কথাটা আমার একেবারেই মনে ছিল না। কাল সকালে উঠেই একবার তাঁর ওখানে যেতে হবে, মনে করো।

ইতিমধ্যে ওরা চলতে চলতে দুজনে গলিটার মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়েছে। আর অল্প একটু এগোলেই পোড়ো বাড়িটার পেছনের দরজার কাছে এসে পড়বে। এমন সময় ক্রিং ক্রিং করে সাইকেলের ঘণ্টি শোনা যায়। পরক্ষণেই দুজনের দৃষ্টি পড়ল আবছা আলো-আঁধারে কে একজন তীব্র বেগে সাইকেল চালিয়ে গলির ভিতর দিয়ে ঐদিকেই এগিয়ে আসছে। সাইকেলের সামনের আলোটা টিম্‌টিম্‌ করে জ্বলছে।

রাজু বা সুব্রত সাবধান হয়ে সরে যাবার আগেই সাইকেল-আরোহী হুড়মুড় করে এসে একেবারে অতর্কিতে রাজুর গায়ের ওপরই সাইকেল সমেত পড়ল।

সরি, আপনার লেগে গেল নাকি? দুঃখিত—

রাজুর পায়ে বেশ লেগেছিল। সে উষ্মস্বরে বললে, ঐ ভাঙ্গা আলো লাগিয়ে বাইক চালানো! চলুন আপনাকে hand over করে দেব।

আহা, আপনার কোথাও লেগেছে নাকি? কিন্তু আপনিই বা এত রাত্রে এই চোরাগলির মধ্যে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন কেন?

কেন হাওয়া খেতে বের হয়েছি শুনতে চান? বলেই ক্রুদ্ধ রাজু লোকটার দিকে লাফিয়ে এসে সজোরে লোকটার নাকের ওপরে একটা লৌহ-মুষ্ট্যাঘাত করে।

লোকটা অতর্কিত ঐ প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে প্রথমটা বেশ হকচকিয়েই গিয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে রাজুকে আক্রমণ করল।

কেউ শক্তিতে কম যায় না।

দুজনে জড়াজড়ি করে ঐ সরু গলির মধ্যেই লুটিয়ে পড়ে। সুব্রত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়।

হঠাৎ এমন সময় তীব্র একটা অস্ফুট যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে রাজু এক-পাশে ছিটকে পড়ল।

সুব্রতও কম বিস্মিত হয়নি। এক কথায় সে সত্যই হতভম্ব হয়ে গিয়ে-ছিল। ইতিমধ্যে আক্রমণকারী তড়িৎ বেগে উঠে পড়ে, সাইকেলে আরোহণ করে চালাতে শুরু করেছে।

রাজু যখন উঠে দাঁড়াল, সাইকেল-আরোহী তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সুব্রত এগিয়ে এসে বলে, কি হল রাজু?—

॥ ৪ ॥

কিরীটী রায়

রাজ্ব যন্ত্রণায় কাতর ক্লিষ্ট স্বরে জবাব দিল, হাতের পাতায় কি যেন ফুটল সুব্রত।

সুব্রত পকেট থেকে টর্চটা বের করে বোতাম টিপল। কিন্তু আশ্চর্য, হাতের পাতায় কিছুই তো ফোটেনি! কিছু বিঁধেও নেই, এমন কি এক-ফোঁটা রক্ত পর্যন্ত পড়েনি। হাতটা ভালো করে টর্চের আলোয় ঘুরিয়ে দেখা হল—কোন চিহ্নই নেই। অথচ রাজুর হাতের পাতা থেকে কনুই পর্যন্ত ঝিম্ ঝিম্ করছে অসহ্য যন্ত্রণায়। যেন অবশ হয়ে আসছে হাতটা।

কই, কিছু তো তোমার হাতে ফুটেছে বলে মনে হচ্ছে না! কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না! সুব্রত বলে।

কিন্তু মনে হল হাতে যেন কি একটা ফুটল, ফোটার সঙ্গে সঙ্গে মাথা পর্যন্ত ঝিম্ ঝিম্ করে উঠেছে, এখনও হাতটায় যেন কোন জোর পাচ্ছি না। বললে রাজু।

চল ফেরা যাক। সুব্রত আবার বলে।

কিন্তু ঐ বাড়িটা দেখবি না? যে জন্য এলাম!

না, কাল সকালের আলোয় ভাল করে একসময় এসে বাড়িটা না হয় খোঁজ করে দেখা যাবে। কিন্তু আমি ভাবছি ঐ সাইকেল-আরোহী লোকটা কে? কেনই বা এ পথে এসেছিল? লোকটা আচমকা এ পথে এসেছে বলে তো মনে হয় না। ও নিশ্চয়ই আমাদের ফলো করেই এসেছিল।

যা হোক দুজনে আপাতত বাড়ির দিকে অগ্রসর হল।

রাতের আকাশ ফিকে হয়ে আসছে। শেষ রাতের আঁধার তরল ও ম্লান হয়ে এসেছে। নিশিশেষের ঠাণ্ডা হাওয়া ঝিরঝির করে বয়ে যায়। রাজু আর সুব্রত বাড়ি ফিরে এসে নিজেদের ঘরে প্রবেশ করে শয্যায় আশ্রয় নিল এবং শীঘ্রই দুজনের চোখের পাতায় ঘুম জড়িয়ে আসে।

সুব্রতর যখন ঘুম ভাঙল, রাজু তখনও ঘুমিয়ে ।

পূর্ব রাত্রের ব্যাপারটা সুব্রতর একে একে নতুন করে আবার মনে পড়ে। আজই একবার কিরীটীবাবুর ওখানে যেতে হবে। চাকরকে ডেকে চা আনতে বলে সুব্রত বাথরুমের দিকে পা বাড়াল।

বাথরুমে ঢুকে ঝর্ণা নলটা খুলে দিয়ে সুব্রত তার নীচে মাথা পেতে দাঁড়াল। ঝাঁঝরির অজস্র ছিদ্রপথে জলকণাগুলো ঝিরঝির করে সারা গায়ে ও মাথায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সুব্রত সমস্ত শরীর দিয়ে স্নানটা উপভোগ করল। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করার পর শরীরটা বেশ ঠাণ্ডা হল। পূর্বরাত্রের জাগরণ-ক্লান্তি যেন অনেক পরিমাণে কমে গেছে।

ভিজে তোয়ালেটা গায়ে জড়িয়ে সোজা রাজুর কক্ষে এসে সুব্রত দেখে রাজু হাতের মুঠো মেলে কি যেন একটা একাগ্র দৃষ্টিতে দেখছে।

সুব্রত বললে, কি দেখছ অত মনোযোগ দিয়ে?

রাজু সে কথার কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে একটা কার্ড সুব্রতর দিকে তুলে ধরে।

কার্ডটার গায়ে কালি দিয়ে ছোট ছোট করে লেখা—

'কালো ভ্রমরের হুল, এমনি মিষ্টি-মধুর। কেমন লাগল বন্ধু!

কোথায় পেলে এটা? সুব্রত শুধাল!

রাজু বলল, জামার পকেটে ছিল এটা।

কার্ডটা রাজুর হাত থেকে টান মেরে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিতে দিতে সুব্রত তাচ্ছিল্যভরে বললে, বড় আর দেরি নেই, হুলের খোঁচা হজম করবার দিন এগিয়ে এল। চল চল, একবার টালিগঞ্জে কিরীটীবাবুর ওখানে যাওয়া যাক। এর পর গেলে হয়তো আবার তাঁকে বাড়িতে নাও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমি ভাবছি, ওরা জানলে কি করে যে অত রাত্রে আমরা গলিপথে যাব?

চর আছে সর্বত্র, যারা হয়তো সর্বদা আমাদের ওপর নজর রেখেছে—এ কি, তুই যে স্নান পর্যন্ত সেরে ফেলেছিস! রাজু বলে।

হ্যাঁ, শরীরটা বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছিল।

তবে দাঁড়া, আমিও স্নানটা সেরে নিই চট্ করে।

*　　　　*　　　　*

টালিগঞ্জে সুন্দর একখানা দোতলা বাড়ি। সেই বাড়িখানিই কিরীটী রায়ের।

কিরীটী রায়
রহস্যভেদী

দ্বিতল বাড়িখানি বাইরে থেকে দেখতে সত্যই চমৎকার, আধুনিক প্যাটার্নের নয়, পুরাতন স্টাইলে সবুজ রংয়ের বাড়িখানি।

বাড়ির সামনে ছোট একটা ফুলফল তরিতরকারির বাগিচা। ওপরে ও নীচে সবসমেত বাড়িতে চারখানি মাত্র ঘর। ওপরের একখানিতে কিরীটী শয়ন করে, একটিতে তার রিসার্চ ল্যাবোরেটারী। নীচে একটায় লাইব্রেরী ও আর একটায় বৈঠকখানা ; তিনজন মাত্র লোক নিয়ে সংসার—কিরীটী নিজে, একটা আধাবয়সী নেপালী চাকর—নাম তার জংলী ও পাঞ্জাবী শিখ ড্রাইভার হীরা সিং।

ভৃত্য জংলীর যখন মাত্র ন বছর বয়স, তখন একবার কার্শিয়াং বেড়াতে গিয়ে কিরীটী তাকে নিয়ে আসে।

মা-বাপ-হারা জংলী এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের কাছে থাকত। সেবারে কিরীটী যখন কার্শিয়াং বেড়াতে গেল, তখন সব সময়ে তার ছোটখাটো ফাই-ফরমাশ খাটবার জন্য একটা অল্প বয়সের চাকরের খোঁজ করতেই তার এক বন্ধু জংলীকে এনে দেয়।

দীর্ঘ পাঁচ মাস কার্শিয়াং-এ কাটিয়ে কিরীটী যেদিন ফিরে আসবে, জংলীকে মাহিনা দিতে গেলে সে হাত গুটিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করলে। তাকে ঐ অবস্থায় দাঁড়াতে দেখে কিরীটী সস্নেহে শুধায়, কি রে? কিছু বলবি জংলী?

জংলী কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিরীটী বলে, হ্যাঁ রে, কিছু বলবি?

জংলীর মনে এবার বুঝি আশা জাগে, তাই ধীরে ধীরে মুখটা তোলে। তার চোখের কোল দুটি তখন জলে উবুচুবু।

কি হয়েছে রে জংলী?

বাবুজী!, আর কি আপনার চাকরের দরকার হবে না?

ও এই কথা!

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা যেন কিরীটীর কাছে জলের মতই পরিষ্কার হয়ে যায়। হাসতে হাসতে বলে, তোর দেশ, তোর আত্মীয়স্বজন—এদের সবাইকে ছেড়ে তুই আমার কাছে কলকাতায় গিয়ে থাকতে পারবি?

চোখের কোলে অশ্রুমাখা হাসি নিয়ে খুশীর উচ্ছলতায় গদ্‌গদ হয়ে জংলী জবাব দেয়, কেন পারব না বাবু, খুব পারব। আর এখানে থেকে আমি কি করব। এখানে আমার কেই বা আছে। মা-বাপ তো আমার কতদিন হল মারা গেছে। আমার তো কেউ নেই।...শেষের দিকটা বালকের কণ্ঠস্বর কেমন যেন জড়িয়ে যায়।

তাই কার্শিয়াং ছেড়ে আসবার সময় কিরীটী জংলীকে তার আত্মীয়দের কাছ হতে চেয়ে নিয়ে আসে। তারাও ঘাড়ের বোঝা নামল ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

সে আজ দীর্ঘ সাত বছর আগের কথা। এখন জংলীর বয়স ষোল বৎসর। সে এখন বলিষ্ঠ যুবা; কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই ছায়ার মত ঘোরে সে। অনেক সময় কিরীটীর সহকারী পর্যন্ত হয়। যেমনি বিশ্বাসী তেমনি প্রভুভক্ত।

পাহাড়ের দেশ থেকে কুড়িয়ে আনা অনাথ বালক, স্নেহের মধুস্পর্শ পেয়ে আপনাকে নিঃস্ব করে বিলিয়ে দিয়েছে। মানুষ বুঝি অমনিই স্নেহের কাঙাল!

*   *   *

সেদিন সকালবেলায় একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে কিরীটী সেদিনকার দৈনিকটার ওপর চোখ বুলোচ্ছিল। এমন সময় পত্রিকার দ্বিতীয় পাতায় বড় বড় হেডিংয়ে ছাপা সনৎ-এর উধাও হওয়ার সংবাদটা তার চোখে পড়ল।

কিরীটী কাগজের লেখাগুলোর উপর সাগ্রহে ঝুঁকে পড়েছে, ঠিক এমনি সময়ে সিঁড়িতে জুতোর শব্দ তার কানে এসে বাজল। জুতোর শব্দ আরোও এগিয়ে একেবারে দরজার গোড়ায় এলে কাগজ হতে মুখ না তুলেই হাসিমুখে সংবর্ধনার সুরে বললে, আসুন সুব্রতবাবু! আমি জানতাম আপনি আসবেন, তবে এত শীঘ্র—বলতে বলতে কিরীটী হাঁক দিলে, জংলী, বাবুদের চা দিয়ে যা।

কিরীটী রায়ের কথা শুনে, সুব্রত ও রাজু যেন হতবাক্ হয়ে গেছে। লোকটা কি সবজান্তা, তা না হলে না দেখেই জানতে পারে কি করে কে এল!

প্রথমটায় যে কি বলবে তা ওরা যেন ভেবেই পেলে না! বিস্ময়ের ভাবটা কাটবার আগেই কিরীটী কাগজের ওপর হতে চোখ সরিয়ে নিয়ে ওদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, নমস্কার সুব্রতবাবু, রাজেনবাবু, আরে দাঁড়িয়েই রইলেন যে! বসুন বসুন।

দুজনে এগিয়ে এসে দুখানা সোফা অধিকার করে বসল।

তারপর হঠাৎ এই সকালেই কি খবর বলুন শুনি? কিরীটী রায় সাগ্রহে শুধায়। সোফার ওপর বসতে বসতে সুব্রতই বলে, বলছি, কিন্তু তার আগে বলুন তো, কেমন করে আমাদের না দেখেই বুঝলেন যে আমরাই এসেছি! আপনি কি পায়ের শব্দেই লোক চিনতে পারেন নাকি?

কিরীটী মৃদু হেসে বাল, কতকটা হ্যাঁও বটে, আবার নাও বটে। এইমাত্র খবরের কাগজ খুলতেই চোখে পড়ল সনৎবাবুর গায়েব হওয়ার চাঞ্চল্যকর সংবাদ। আর আপনাদের সঙ্গে তো আমার কথাই ছিল, আবার কোন রকম গোলমাল হলে আপনারা দয়া করে আমাকে একটু খবর দেবেন। সহজ নিয়মে দুয়ে দুয়ে চার কষে ফেলতে দেরী হয়নি। এত সকালে জুতোর শব্দ পেয়ে প্রথমেই তাই আমার আপনাদের কথাই মনে পড়ল, আর সেই আন্দাজের ওপরে নির্ভর করে আপনাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছি এবং আপনারাও যখন আমার অভ্যর্থনা শুনে চুপ করে রইলেন, তখন আমি স্থিরনিশ্চিত হলাম, আমার অনুমান মিথ্যা হয়নি।

চমৎকার তো।—রাজু বললে।

না, এর মধ্যে চমৎকারের বা আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কতকটা সত্যি, কিছুটা মিথ্যে আর বাকিটা অনুমান—এই রীতির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের কার্যপদ্ধতি। বলতে পারেন কমন্‌সেন্স-এর মারপ্যাঁচ মাত্র। একজন শয়তানকে তার দুষ্কর্মের সূত্র ধরে খুঁজে বের করা এমন বিশেষ কিছু একটা কঠিন বা আজব ব্যাপার নয়। দুষ্কর্মের এমন একটি নিখুঁত সূত্র সর্বদাই সে রেখে যায় যে, সে নিজেই আমাদের তার কাছে টেনে নিয়ে যায় সেই সূত্রপথে। এ সংসারে পাপ-পুণ্য পাশাপাশি আছে। পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের তিরস্কার—এইটাই নিয়ম। আজ পর্যন্ত পাপ করে কেউই রেহাই পায়নি। দৈহিক শাস্তি বা দশ বছর জেল হওয়া অথবা দ্বীপান্তর যাওয়াটাই একজন পাপীর শাস্তিভোগের একমাত্র নিদর্শন নয়; ভগবানের মার এমন ভীষণ যে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরও তার কাছে একান্তই তুচ্ছ। বিবেকের তাড়নায় মানসিক যন্ত্রণায় চোখের জলের ভিতর দিয়ে তিল তিল করে যে পরিতাপের আত্মগ্লানি ঝরে পড়ে, তার দুঃসহ জ্বালায় সমস্ত বুকখানাই যে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। স্থূল চোখে আমরা অনেক কিছুই দেখতে পাই না বটে, কিন্তু তাই বলে তার অস্তিত্বটাই একেবারে অস্বীকার করে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতাই বা আমাদের কোথায় বলুন? গায়ের জোরে সব কিছুকে অস্বীকার করতে চাইলেই কি মন আমাদের সব সময় প্রবোধ মানে সুব্রতবাবু?

হয়তো সব ময় মানে না।

হয়তো কেন, নিশ্চয়ই। আচ্ছা যাক সে-কথা: তারপর আগে সব ব্যাপারটা খুলে বলুন তো, শোনা যাক।

সুব্রত তখন ধীরে ধীরে এক এক করে সমস্ত ব্যাপারটাই খুলে বলল।

সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে কিরীটী কিছুক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে বসে রইল, তারপর সোফা থেকে উঠে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করতে করতে বললে, হ্যাঁ, জাহাজে দুটো সীট্ তো রিজার্ভ করেছেন। আরও দুটো সীট্ রিজার্ভ করুন সুব্রতবাবু। পরশু সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়ছে তা হলে, কি বলেন? কিন্তু আমি ভাবছি, লোকটা আপনাদের চোখে বেশ স্বচ্ছন্দেই ধুলো দিয়ে গেল; আপনারা টেরও পেলেন না?

সুব্রত বললে, বনমালী বসু তো?

না, কালো ভ্রমর স্বয়ং।

হ্যাঁ, আমিও তাই বলছি, বনমালী বসুই স্বয়ং কালো ভ্রমর।

না, বনমালী বসু কালো ভ্রমর নয়।

সে নয়! তবে?

আপনাদের পোড়ো বাড়ির সামনে শিকারী বিড়ালই স্বয়ং কালো ভ্রমর।

কি করে এ কথা আপনি বুঝলেন?

পরে বলব, তবে বনমালী বসুও কালো ভ্রমরের দলের লোকই বটে এবং সে বিষয়েও কোন ভুল নেই। এতে করে এও প্রমাণিত হচ্ছে যে তারা আট-ঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছে এবারে। অবশ্য বনমালী বসুর কথাবার্তাতেই আপনাদের বোঝা উচিত ছিল, অনেক কিছু অসংগতি তাঁর কথার মধ্যে আছে, ভদ্রলোক ডিব্রুগড়ে বসেই সি. আই. ডি.-র 'তার' পেয়েছিলেন মাত্র দিন দশেক আগে, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে ডিব্রুগড়ে বসে 'তার' পেলেও, ঐদিনকার রেঙ্গুনের সংবাদপত্রের কাটিংটা পাওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে! সন্দেহ তো ঐখানেই ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

আশ্চর্য, এটা কিন্তু আমাদের আপদেই মনে হয়নি! বলে সুব্রত।

না হওয়াটাই স্বাভাবিক।

এরপর সুব্রত ও রাজু কিরীটীর নিকট বিদায় নিয়ে রাস্তায় এসে নামল।

॥ ৫ ॥

১৮ নম্বরের হানাবাড়ি

দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে সমস্ত শহরটা ঝাঁ-ঝাঁ করছে। প্রচণ্ড তাপে রাস্তার পিচ নরম হয়ে উঠেছে। একটা অস্বাভাবিক উষ্ণতা অনুভূত হয়। ট্রাম-বাস-গুলো খড়খড়ি এঁটে যে যার গন্তব্যপথে ছুটছে। রিক্সাগুলো ঠং ঠং আওয়াজ করে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রদগ্ধ নিস্তব্ধতা ভংগ করছে।

সুব্রত দরজা-জানালা এঁটে মেঝেয় একটা মাদুর পেতে তার উপর রেঙ্গুনের একটা ম্যাপ প্রসারিত করে ঝুঁকে পড়ে দেখছিল, এমন সময় বাইরে কড়ানাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। রাজু পাশেই শুয়ে দিব্যি নাক ডাকছে। এত গ্রীষ্মেও তার ঘুমের কোন ব্যাঘাত হচ্ছে না।

সুব্রত চোখ ফিরিয়ে নিদ্রাভিভূত রাজুর দিকে একবার চাইল, তারপর উঠে দরজা খুলবার জন্য ঘর হতে বেরুল।

তখনও সদর দুয়ারে কড়ানাড়ার শব্দ হচ্ছে খট্-খট্-খট্। দরজা খুলতেই ও দেখলে সামনে দাঁড়িয়ে একজন এদেশীয় উৎকলবাসী।

কি চাই? সুব্রত লোকটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

দণ্ডবৎ। রাজেনবাবুড় গলি কৌঁটি পড়িব বাবু? মতে নূতন কটক হইতে আইছন্তি। কলকাতার শহর এমতি সে মু কিমিতি জানিব? অঃ, গোট্টা শহর কত্ত ঘুরিল ; ঘুরিতে ঘুরিতে এক বাবু বলি দিলা, গুটে রাজেন-বাবুর গলি এক রাস্তা অছি বটে ; আমহার স্ট্রীটের ধারে।

সুব্রত একদৃষ্টে শ্রীমান্ উৎকলবাসীর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। লোকটা লম্বায় প্রায় সাড়ে ছয় ফুট। চোখ দুটো উজ্জ্বল—ঝক্-ঝক্ করছে অসাধারণ বুদ্ধির দীপ্তিতে, ছোট ছোট করে কদম-ছাঁট চুল। জুলপিটাকে খুর দিয়ে কামিয়ে একেবারে রগ পর্যন্ত তোলা হয়েছে। একটা গোলাপী রংয়ের জাপানী সিল্কের জামা গায়ে, বহুদিনের ব্যবহারে তেলচিটচিটে হয়ে কেমনতর যেন হয়ে উঠেছে। পরনে একটা নূতন চওড়া লালপাড় কোরা ধুতি। গলায় একটা পাকানো চাদর গিঁট দেওয়া, কতকালের ময়লা যে তার ভাঁজে জমে উঠেছে, সঠিক নির্ণয় করাটা একান্তই দুষ্কর। মুখে একগাল পান ; দুই কষের কোলে পানের রস ও সুপারির গুঁড়া আটকে রয়েছে। বগলে পুরাতন একখানি ছাতা ও বাঁ-হাতে বটুয়া।

তোর নাম কি ? সুব্রত শুধাল।

শ্রীল শ্রী শ্রীমান্ জগরনাথ।

এই বাঁ-ধারের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলেই ডান দিকে যে সরু গলি সেটাই রাজেনবাবুর গলি।

দণ্ডবৎ! বলে জগন্নাথ চলে গেল।

সুব্রত লক্ষ্য করলে লোকটা একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। লোকটাকে যতক্ষণ দেখা যায় সুব্রত বেশ ভাল করেই দেখল। তারপর যখন সে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে চলে গেল। মনে মনে কিন্তু জগন্নাথের কথাই ভাবছিল।

* * *

গত রাত্রের সরু গলিপথ ধরে সুব্রতর নির্দেশমত অবশেষে জগন্নাথ ১৮নং বাড়ির পিছন দিককার ভাঙা দরজাটার কাছে এসে দাঁড়াল। এইটাই সেই পোড়ো বাড়ি। দু-একবার শ্যেন দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে আস্তে আস্তে বাড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়ল চট্ করে।

আগেই বলেছি বাড়িটা বহুদিনকার। দেওয়ালে দেওয়ালে চুনবালি ঝরার সমারোহ। ইঁটগুলো দেওয়ালের গায়ে গায়ে বিশ্রীভাবে বেরিয়ে পড়েছে। জানালার কপাটগুলো খিলানের গায়ে কোথাও অর্ধ-ভগ্ন, কোথাও বা জর্জরিত হয়ে ঝুলছে —মাঝে মাঝে বাতাসের ধাক্কায় এদিক-ওদিক নড়ে ওঠে। জগন্নাথ সামনের একটা দরদালান পার হয়ে একতলার উঠোনের সামনে এসে দাঁড়াল।

উঠোনের সিমেণ্ট চটে এবড়ো-খেবড়ো হয়ে গেছে, তার মাঝে মাঝে শ্যাওলা জাতীয় আগাছাগুলো গজিয়ে উঠেছে। উঠোনের ওধারে একই ধরনের গোটা পাঁচ-ছয় ঘর সারিবন্ধ ভাবে আছে। কোনটির কপাট বন্ধ, কোনটির কপাট হা-হা করছে—একেবারেই খোলা। জগন্নাথ এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। বারান্দায় দক্ষিণের কোণ ঘেঁষে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। সহসা দোতলার বারান্দায় কাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। শব্দটা ক্রমে জোরই শোনা যাচ্ছে। কে যেন দুম্ দুম্ করে সিঁড়িপথেই নেমে আসছে।

জগন্নাথ চট্ করে সিঁড়ির পাশের একটা বড় থামের পেছনে সরে দাঁড়াল। কে যেন সিঁড়ি দিয়ে নামছে, তারই শব্দ। জগন্নাথ কান পেতে রইল। থামের আড়ালে থেকে সে দেখলে, আধাবয়সী একজন বেঁটেমত লোক নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। লোকটার গায়ে একটা সাধারণ বার্মিজ কোট। মাথায় একটা ফেজ। লোকটির একটা পা কাঠের। বগলে তার একটা কাঠের ক্রাচ। সে

সিঁড়ি বেয়ে নেমে কাঠের পায়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করতে করতে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলল এবং ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল।

আকাশে বোধ হয় মেঘ করেছে। মেঘের আড়ালে সূর্য গেছে ঢেকে, তাই অবেলাতই নেমে এসেছে অন্ধকারের একটা ধূসর ছায়া সর্বত্র। বাড়ির ভিতরটা হয়ে উঠেছে আরো অস্পষ্ট।

জগন্নাথ পা টিপে টিপে ওপরের সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায়। সিঁড়ির ধাপগুলো প্রশস্ত হলেও ভেঙে ক্ষয়ে গিয়ে একেবারে ইঁট সব বের হয়ে পড়েছে। জগন্নাথ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। সামনেই একটা প্রশস্ত টানা বারান্দা। এখানটাও আবছা মেঘে ঢাকা আলোয় অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মেঘলা আকাশে বোধ হয় বিদ্যুৎ চমকে গেল, মুহূর্তের জন্য আবছা অন্ধকারের বুকে একটা হঠাৎ আলোর ঢেউ তুলে। জনহীন এই বাড়িটার সর্বাঙ্গে যেন একটা পুরু ধূলার আস্তরণ বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ধূলোবালির কেমন একটা তীব্র কটু গন্ধ নাসারন্ধ্রকে পীড়িত করে তোলে।

দোতলায় বারান্দার জমাট ধূলোর ওপরে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে বহু পদচিহ্ন। পদচিহ্নগুলো অল্পদিনের বলেই মনে হয়। বর্তমানে যে এই জনহীন পোড়ো বাড়িতে অনেকের নিয়মিত আনাগোনা শুরু হয়েছে, সেটা বুঝতে কারুরই বিশেষ তেমন কষ্ট হবে না। জগন্নাথ তার তীক্ষ্ম অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে এদিক-ওদিক লক্ষ্য করে—একটু আগে কাঠের ক্রাচের সাহায্যে যে লোকটা নীচে নেমে গেল, কে ও? কি জন্যই বা এখানে এসেছিল?

লোকটা নিম্নশ্রেণীর—তার বেশভূষা চালচলন থেকেই বোঝা যায়।

বাইরে বোধ হয় টিপ টিপ করে বৃষ্টি নামল। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া চোখে-মুখে এসে ঝাপটা দেয়।

সহসা একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ জগন্নাথের কানে এসে প্রবেশ করে।

অতি সতর্ক জগন্নাথের শ্রবণেন্দ্রিয় মুহূর্তে সজাগ হয়ে ওঠে।

মৃদু গোঙানির শব্দ না? হ্যাঁ, ঐ তো অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে!

বৃষ্টিটা কি এবারে জোরেই নামল ঐ সময়!

আবছা আলোছায়ার মধ্যে সেই গোঙানির শব্দটা যেন আরও সুস্পষ্ট হয়ে হানাবাড়ির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে বুঝি অশরীরীর বুক-ভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাসের মতই মনে হয়। সহসা এমন সময় পাশ থেকেই ফিস-ফিস করে একটা অস্পষ্ট চাপা কণ্ঠস্বর জগন্নাথের কানে এল। চট্ করে সিঁড়ির কপাটের আড়ালে সরে এল সে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনতে পেল কে যেন বলছেঃ না, কর্তার হুকুম। আগামী শনিবারের পরের শনিবারের মধ্যে যেমন করেই হোক ও তিন বেটাকেই ওখানে হাজির করাতে হবে। শির জামিন দিয়ে এসেছি।

আরে বাবা, এ তো তোমার মগের মুলুক নয় যে যা খুশি তাই করবে। এদিকে এক বেটা 'ফেউ' জুটেছে কিরীটী রায়। বাছাধন শুনি নাকি আবার শখের টিকটিকি।

কিরীটী রায়? লোকটা কিন্তু খুব সুবিধের নয় বলেই শুনেছি। তা সে কথা থাক্। দেখ একটা সন্দেহ আমার মনে জাগছে, কর্তাও যেন এখানে এসেছেন। তবে এ আমার অনুমান মাত্র।

অনুমান কেন? সত্যিও তো হতে পারে!

অসম্ভব কিছুই নেই। উনি যে কোথায় কি ভাবে যান তো বোঝাই দায়! উঃ, সেবার পাশাপাশি এক হোটেলে সারারাত কাটিয়েও টের পাইনি যে কর্তা আমার পাশেই আছেন। নিজেই যখন ধরা দিলেন, চমকে উঠলাম। সে কথা যাক, পরশুর জাহাজেই তো যাওয়া ঠিক?

এখন পর্যন্ত তো তাই ঠিক আছে, তবে শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, কে বলতে পারে বল্?

এমন সময় আবার সেই করুণ গোঙানির শব্দটা শোনা গেল।

প্রথম ব্যক্তি বললে, নাঃ, বেটা জ্বালালে দেখছি! আর ছাই বর্মা-মুলুকেই বা টেনে নিয়ে লাভ কি? এখানে শেষ করে দিলেই তো হয়, যত সব ঝামেলা! কণ্ঠে বেশ বিরক্তির ঝাঁজ।

জানিস তো, কর্তা খুনোখুনির ব্যাপারটা তেমন পছন্দ করেন না! জানিস তো!

কিন্তু পরে ঠেলা সামলাবে কে? আজ রাত্রি আটটায় আমাদের আড্ডায় যাবার কথা। সেখানে কাজের ফিরিস্তি সব ঠিক হবে। এখন চল্ সেদিকেই যাওয়া যাক।

প্রথম ব্যক্তি জবাবে বললে, তুই এগিয়ে যা। সেই চীনাপাট্টির—নং বাড়ি-টাতেই তো? আমি একটু পরে যাচ্ছি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

কথা শেষ হতেই লোকটা এগিয়ে আসে। জগন্নাথ যেখানে দাঁড়িয়েছিল লোকটা সেদিকেই আসছে দেখে জগন্নাথ একেবারে দেয়াল ঘেঁষে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়াল। পোড়ো বাড়িতে সাঁঝের আঁধারটা যেন থরে থরে চাপ বেঁধে উঠেছে তখন চারিদিকে।

বহুদিনকার বন্ধ আবহাওয়ার বিশ্রী একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। জগন্নাথের যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

জনহীন হানাবাড়ির কঠিন মৌনতা যেন সেই সন্ধ্যার আঁধারে এক অশরীরী বিভীষিকার মায়াজাল রচনা করেছে চারিদিকে। কাদের অশ্রুত চাপা শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ যেন আঁধারের গায়ে গায়ে বেঁধে উঠেছে। বাতাস নেই। এমন কি চতুঃসীমায় নেই একবিন্দু আলো। অভিশপ্ত পুরী...

লোকটা যে শেষ পর্যন্ত কোন পথে গেল জগন্নাথ বুঝতে পারলে না। আরও কিছুক্ষণ পরে জগন্নাথ যেদিক হতে কথার আওয়াজ আসছিল, নিঃশব্দে পা টিপে টিপে সেইদিকেই এগিয়ে চলল। খানিক দূর এগোতেই দেখা গেল, অদূরে একটা ঘরের ভেজানো কপাটের ফাঁক দিয়ে একটুখানি অস্পষ্ট আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সন্তর্পণে জগন্নাথ এগিয়ে গিয়ে কপাটের ফাঁকে চোখ দিয়ে দাঁড়াল। আশেপাশে কেউ নেই। কপাটের ফাঁক দিয়ে জগন্নাথ দেখতে পেল ছোট একখানি ঘর। ভিতরে একটা মোমবাতির সামনে কে একটা লোক যেন ঝুঁকে পড়ে মোমবাতির আলোয় কি একটা পড়ছে।

লোকটার চোখ-মুখের রেখায় রেখায় গভীর একাগ্রতা ফুটে উঠেছে।

জগন্নাথ ধীরে অতি ধীরে ডান হাতের একটা আঙুল দরজার ভেজানো কপাটের গায়ে ছোঁয়ালে, তারপর ঈষৎ একটু চাপ দিতেই আপনিই কপাটটা একটু সরে গেল। কিন্তু লোকটার সেদিকে খেয়াল নেই; সে আপন মনে

কাগজটার ওপর ঝুঁকে পড়ে সেটা পড়ছে তখন।

আরও একটু ঠেলা দিতেই দরজার কপাট দুটো বেশ খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল। আরও একটু—ব্যস। এবার ধীরে অতি ধীরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে জগন্নাথ বিড়ালের মতই যেন নিঃশব্দে সেই ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। লোকটা তখনও একমনে সেই কাগজখানির ওপর ঝুঁকে পড়ে কি দেখছে। সে কিছুই টের পেল না।

নিঃশব্দে পা টিপে অতি সন্তর্পণে জগন্নাথ এগোতে লাগল। যখন আর মাত্র হাতখানেকের ব্যবধান উভয়ের মধ্যে, সহসা জগন্নাথ ঝুপ করে একলাফে লোকটার পিঠের ওপর পড়ে দু হাতে তাকে দৃঢ়ভাবে জাপটে ধরল।...

॥ ৬ ॥

সাঙ্কেতিক লেখা

লোকটা এত গভীর মনোযোগের সংগে কাগজখানি দেখছিল যে অতর্কিত ভাবে পশ্চাৎ দিক থেকে সহসা আক্রান্ত হওয়ায় প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণের জন্যই, পরক্ষণে সে শরীরের সমস্ত বলটুকু প্রয়োগ করে আক্রমণকারীর কবল থেকে আপনাকে মুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু আক্রমণকারীর সুকঠিন আলিঙ্গন তখন লৌহদানবের মতই লোকটাকে নিষ্পেষিত করছে।

সেই স্বল্প আলো-আঁধারে ঘরের ধূলিমলিন মেঝের ওপরেই আরম্ভ হল দুজনের তখন প্রবল হুটোপুটি। শক্তির দিক দিয়ে উভয়ের কেউ কম যায় না। ধস্তাধস্তিতে পায়ের ধাক্কায় মোমবাতিটা উল্টে নিভে গেল ও সংগে সংগে নিশ্ছিদ্র আঁধারে সমস্ত ঘরখানি জমাট বেঁধে উঠল। শীঘ্রই জগন্নাথের আসুরিক শক্তির কাছে লোকটাকে পরাভব স্বীকার করতে হল ও ক্রমে ক্রমে সে নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল। জোরে জোরে নিঃশ্বাসের শব্দ হতে লাগল। ধীরে অতি ধীরে লোকটা একসময় শেষ পর্যন্ত জগন্নাথের শক্তির কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত হল।

ক্লান্ত অবসন্ন পরাভূত লোকটাকে মাটির ওপর ফেলে বুকের ওপরে চেপে বসে জগন্নাথ পকেট থেকে একটা সিল্ক কর্ড বের করে ক্ষিপ্রহস্তে লোকটার হাত-পা বেঁধে ফেলল।

গভীর শ্রান্তিতে জগন্নাথের সমগ্র শরীর তখন অবসন্ন ও ক্লান্ত। ঘামে জামাকাপড় সব ভিজে উঠেছে। সে হাত দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিল। পকেট থেকে অতঃপর টর্চটা বের করে টিপতেই উজ্জ্বল একটা আলোর ইশারায় ঘরের জমাট আঁধারের খানিকটা যেন জট্ পাকিয়ে সরে গেল।

এতক্ষণে টর্চের আলোয় লোকটাকে বেশ ভাল করে দেখা গেল। দোহারা বলিষ্ঠ চেহারা। গায়ে একটা পার্টাকিলে-রংয়ের মের্জাই। মাথার চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা। মুখটা গোল। নাকটা চ্যাপটা। চোখ দুটো ছোট ছোট। লোকটা পিট্ পিট্ করে জগন্নাথের দিকে তাকাচ্ছিল।

অদূরে একটা কাগজ পড়ে আছে। জগন্নাথ ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে কাগজটাকে তুলে নিল, তারপর টর্চের আলোয় কাগজটাকে মেলে ধরল।

কাগজটা সাধারণ কাগজ নয়। নীল রংয়ের একটা অয়েল-পেপার। কাগজটার গায়ে একটা মানচিত্র আঁকা এবং তার নীচে কতকগুলো সাঙ্কেতিক চিহ্ন পর পর সাজানো রয়েছে। কাগজটার এক কোণে একটা ড্রাগনের মূর্তি—মূর্তিটি রক্তের মত টক্‌টকে লাল কালিতে আঁকা।

ড্রাগনের মূর্তির নীচে ছোট ছোট অক্ষরে লাল কালি দিয়ে ইংরাজী-বাংলা মিশিয়ে কি একটা লেখা আছে। লেখাটা অনেকটা কবিতার মত করে সাজানো। যদিও কবিতাটার মাথামুণ্ডুতে যেমন কোন কিছু মিল নেই, তেমনি সমস্তটা একেবারে দুর্বোধ্য।

মিয়াং—ভাঙা বুদ্ধদেবের মূর্তি। প্যাগোডার দক্ষিণে তার ডানদিকে চন্দন গাছ—মূর্তির গায়ে গোল চিহ্ন—ভ্রমর আঁকা।

—সেই গাছের
৯০ সোপা পিঠের পরে
দুই DK ০ ০ ০ হাত
পারা সস্তা আছে
চিহ্ন যত বাদ গেছে
তার BAMT ধরে
হাত ০ ০ ০ ০ যাও যদি মাত।
ড্রাগন দেখ বসে আছে
ধনাগারের চাবি কাছে
মুখে তার লোহার বালা
দুলছে তাতে চিকন শলা ;
দুইয়ের পিঠে শূন্য নাও
ত্রিশ দিয়ে গুণ দাও,
শূন্য যদি যায় বাদ
সেই কবারে পুরবে সাধ॥

জগন্নাথ বার দুই-তিন কাগজটা আগাগোড়া পড়ে ফেলল। কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না।

অথচ এটা বুঝতে তার কষ্ট হয় না যে জিনিসটা একটা সাঙ্কেতিক লিপি, একটা-না-একটা কিছু এর অর্থ আছেই।

আরও ভাল করে চিন্তা করলে হয়তো তখন অর্থ ধরা যেতে পারে।

কিন্তু এইভাবে এখানে আর দেরী করাও সমীচীন হবে না।

একটু আগে যে অস্ফুট কাতরোক্তি শোনা গিয়েছিল, সে ব্যাপারটার একটা খোঁজ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এবং ক্ষণপূর্বে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে যে কথাবার্তা ও শুনেছিল তা থেকে স্পষ্টই মনে হয়, এখান এই পোড়ো বাড়ির কোন কক্ষে নিশ্চয়ই কাউকে এরা ধরে নিয়ে এসে বন্দী করে রেখেছে।

জগন্নাথ ভূপতিত রজ্জুবদ্ধ লোকটার দিকে একবার তাকাল।

লোকটা যেন একেবারে নির্বিকার, যেন ভালমন্দ কিছুই জানে না, নেহাৎ একেবারে গোবেচারী গোছের।

জগন্নাথ তাড়াতাড়ি কাগজটা ভাঁজ করে জামার ভিতর দিককার পকেটে

রেখে লোকটার সামনে এগিয়ে এল।

লোকটার মুখের ওপরে টর্চের আলো ফেলে কঠিন আদেশের স্বরে ভাঙা ভাঙা হিন্দুস্থানীতে প্রশ্ন করলে, এই, যে লোকটাকে তোরা এখানে ধরে এনে আটক করে রেখেছিস, সে কোন্ ঘরে শীঘ্র বল্, না হলে গলা টিপেই তোকে এখানে শেষ করে রেখে যাব।

লোকটা যে জগন্নাথের কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারেনি তা স্পষ্টই বোঝা গেল ; সে ওর কথার কোন জবাবই দিল না, কেবল নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে থেকে শুধু জগন্নাথের মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে বোকার মতই তাকাতে লাগল।

এবারে লোকটাকে পা দিয়ে একটা ঠেলা দিয়ে জগন্নাথ বললে, এই, চুপ করে আছিস কেন? জবাব দে না বেটা!

ঐ সময় আবার সহসা পূর্বের সেই গোঙানির শব্দটা শোনা গেল। জগন্নাথ এবারে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে বললে, এই, বল্!

লোকটি তথাপি নীরব। সে আগের মতই বোকা-চাউনি নিয়ে চেয়ে আছে।

না, এর কাছ হতে জবাব পাওয়া যাবে না দেখছি। জগন্নাথ মনে মনে বললে। তারপর সে একটা রুমাল বের করে লোকটার মুখ চেপে বেঁধে দিল, যাতে করে লোকটা চিৎকার বা কোন শব্দ করলেও কেউ শুনতে না পায়।

থাক্ বেটা, যেমন কুকুর তার তেমনি মুগুর। বলতে বলতে জগন্নাথ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাইরে থেকে ঘরের শিকলটা তুলে দিল।

অন্ধকার বেশ জমাট হয়ে উঠেছে। দেওয়ালের কোন ফাটলে বুঝি একটা ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ঝিঁ-ঝিঁ করে একটানা বিশ্রী শব্দে ডেকে চলেছে তো চলেছেই।

॥ ৭ ॥

খোঁড়া ভিক্ষুক

বাইরের অন্ধকার বারান্দায় এসে জগন্নাথ হাতের টর্চটা টিপতেই দেখলে, উপরেও নীচের তলার মতই বারান্দার গায়ে পর পর চার-পাঁচটি ঘর। উঃ, কি নিস্তব্ধ! সারা বাড়িটা মৃত্যুর মতই বিভীষিকাময় যেন। মনটা সত্যি কেমন যেন সিরসির করে ওঠে। আশঙ্কায় থমথম করে। বারান্দায় কতকালের ধুলো যে পড়তে পড়তে জমে উঠেছে তার ঠিক নেই।

জগন্নাথ টর্চ হাতে একে একে উপরের সব ঘরগুলোই পরীক্ষা করে দেখলে, কিন্তু কোন ঘরেই জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ বা চিহ্ন পর্যন্ত নেই। যুগ যুগ ধরে যেন এখানে কেউ বাস করেনি। কারও পায়ের স্পর্শও যেন পড়েনি।

কই, কেউ তো এখানে নেই! তবে কার অস্ফুট কাতর শব্দ কানে আসছিল? কে অমন করুণ স্বরে গোঙাচ্ছিল? মনে মনে বলতে বলতে জগন্নাথ দোতলার সিঁড়ি বেয়ে একসময় ছাদে গিয়ে উঠল। ছাদও নির্জন জমাট আঁধারে থমথম করছে।

উপরে তারায় ভরা কালো আকাশ। সামনেই চোখে পড়ে সেই পোড়ো মাঠটা। সেটাও রাতের আঁধারে অস্পষ্ট অবছা হয়ে উঠেছে। ওদিকটার তাল-গাছটার পাতায় পাতায় নিশীথের হাওয়া কেমন একরকম সিপ্ সিপ্ শব্দ তুলেছে।

ছাদে মাত্র চিলে-কোঠা। সে ঘরের দুটো কপাটই খোলা, হাওয়ায় মাঝে মাঝে ঢপ্ ঢপ্ করে বন্ধ হচ্ছে আর খুলছে। আর কেউ নেই।

জগন্নাথ নীচে নেমে এল আবার। নীচের তলার ঘরগুলো আর একবার ভাল করে দেখল। কিন্তু বৃথা। সেখানেও কিছু পাওয়া গেল না। আর তো দেরি করা সঙ্গত নয়, যদি দলের কেউ আবার এসে পড়ে! অতঃপর জগন্নাথ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল।

গলিটা এর মধ্যে বেশ নির্জন হয়ে উঠেছে। জগন্নাথ সন্ধানী দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে গলিপথ ধরে এগোতে লাগল।

গলিটা যেখানে এসে বড় রাস্তার সঙ্গে মিশেছে, সেখানে গ্যাস-পোস্টের নীচে মৃদু আলোয় একজন খোঁড়া ভিক্ষুক-শ্রেণীর লোক লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে করুণ স্বরে পথিকের করুণা ভিক্ষা করছেঃ বাবু গো, দয়া করে এই খোঁড়াকে একটি পয়সা দিয়ে যান। কত দিকে কত পয়সা আপনাদের যায়, মা-জননী গো!

জগন্নাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভিক্ষুককে দেখতে লাগল। তার মনে সহসা জাগে, কে—কে এই ভিক্ষুক? কোথায় যেন ওকে দেখেছে! কোথায়?

জগন্নাথ চিন্তা করতে লাগল এবং চিন্তা করতে করতেই একসময় তার মনে হয়, লোকটাকে সে সেদিনই দেখেছে। ঐ পোড়ো বাড়িতে লোকটাকে দেখেছে সে। বগলে ক্রাচ ছিল লোকটার; জগন্নাথ এবার দৃষ্টি আরও প্রখর ও অনুসন্ধিৎসু করে ভিক্ষুকটাকে দূর থেকে দেখতে লাগল।

তারপর একসময় জগন্নাথ ধীরে ধীরে গা-ঢাকা দিয়ে ওপাশের ফুটপাত দিয়ে পা চালিয়ে এগিয়ে গেল। এবং সোজা এসে সে সুব্রতদের বাড়ির দরজায় কড়া ধরে নাড়া দিলঃ খট্-খট্-খটা-খট্।

কে? সুব্রতর গলা শোনা গেল ভিতর থেকে।

আমি। দরজাটা খুলুন।

দাঁড়ান, খুলছি।

দরজাটা খুলতেই জগন্নাথ-বেশী কিরীটী রায় হাসতে হাসতে মাথায় বসানো রবারের পরচুলাটা খুলতে খুলতে বললে, মতে জগন্নাথ সাহু। কত্ত ঘুরি ঘুরি কটক জিলা কো মতে কলকাতার—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, সুব্রত হা হা করে হেসে বললে, উঃ, কি বিভীষণ লোক আপনি মশাই!

না মশাই, বিভীষণের মত আমি স্বজাতিদ্রোহী নই।

বিভীষণ স্বজাতিদ্রোহী? কি বলেন আপনি?

তা বৈকি। যে নিজের মায়ের পেটের ভাইয়ের মৃত্যুবাণ ও তার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতির স্বাধীনতা মানসম্ভ্রম অপরের হাতে তুলে দিতে পারে, তাকে শ্রীরামচন্দ্র যতই পূত আশীর্বাদ দিয়ে গরীয়ান করে তুলুন না কেন, তথাপি আমি বলব সে নীচ; সে কলঙ্ক—সে সমাজদ্রোহী—স্বজাতিদ্রোহী—বিশ্বাস-ঘাতক। উত্তেজনায় ও ভাবের দোলায় কিরীটীর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এল;

কিন্তু সে কথা থাক্, তার চাইতেও বড় কাজ আমাদের সামনে। খোশগল্প করে আসর জমাবার মত অবকাশ আমাদের এখন এতটুকুও নেই।—বলতে বলতে ক্ষিপ্রহস্তে কিরীটী রায় গায়ের ছদ্মবেশগুলো খুলে ফেলতে লাগল।

ব্যাপার কি বলুন তো মিঃ রায়? কণ্ঠস্বরে সুব্রতর খানিকটা উদ্বেগ ও কৌতূহল প্রকাশ পায়।

তাড়াতাড়ি একটা চাদর আর একটা লাঠি আনতে পারেন?

কি হবে? কাউকে লাঠ্যৌষধির ব্যবস্থা করছেন নাকি?

রহস্যচ্ছলে জবাব দিল কিরীটীঃ

শুণু শুণু রে বর্বর!
দেরি যদি কর, বিপদ হবে বড়।
শীঘ্র আন লাঠি ও চাদর।

সুব্রত হাসতে হাসতে লাঠি ও চাদর সংগ্রহ করতে উপরে চলে গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা বাঁশের লাঠি ও সাদা চাদর এনে কিরীটীর হাতে দিল।

এবারে পকেট থেকে একটা টিকিওয়ালা পরচুলা বের করে কিরীটী মাথায় বেশ করে বসিয়ে নিল, তারপর চাদরটা গায়ে জড়িয়ে লাঠিটা হাতে নিয়ে দাঁড়াল সোজা হয়ে, সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে। কার সাধ্য এখন তাকে একটু আগের কিরীটী রায় বলে চিনতে পারে! এখন সে অতি নিরীহ-গোছের একটি পূজারী ব্রাহ্মণ।

মৃদু হেসে ব্রাহ্মণোচিত গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে কিরীটী রায় বলল, বৎস, তোমার কল্যাণ হোক। ক্ষণেক অপেক্ষা কর। তারপর কি মনে করে বললে, হ্যাঁ ভাল কথা, আপনাদের পা-গাড়ি আছে?

হ্যাঁ আছে, কেন বলুন তো?

আপনি বাইকটা নিয়ে, বড় রাস্তাটা যেখানে ট্রাম রাস্তার গায়ে গিয়ে মিশেছে সেখানে অপেক্ষা করবেন। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে যাব। বলতে বলতে কিরীটী রায় ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তায় নেমে কিরীটী ধীরে ধীরে লাঠি হাতে গলির পথ দিয়ে এগোতে থাকে।

রাত্রি তখন সাতটার বেশী হবে না। মাঝে মাঝে দু-একটা মোটরগাড়ি রাস্তা দিয়ে হুস্ হুস্ শব্দে ছুটে যাচ্ছে। দু-একটা রিকশার মৃদু ঠুং-ঠাং আওয়াজ শোনা যায়। সামনেই একটা মস্তবড় ফটকওয়ালা বাড়িতে কোন উৎসব হচ্ছে বোধ হয়। রকমারী আলোতে আর লোকজনের গোলমালে বাড়িটা সরগরম। রাস্তার দু-পাশে সারি সারি নানা রংয়ের ও নানা আকারের মোটর-গাড়ি দাঁড়িয়ে।

কিরীটী এগিয়ে চলে।

খোঁড়া ভিক্ষুকটা তখনও চেঁচাচ্ছে—বাবা গো! এই খোঁড়া ভিখারীকে একটি আধলা দাও বাবা। কত দিকে, কত ভাবে, কত পয়সা নষ্ট হয় বাবা গো। দয়া কর মাগো জননী—

কিরীটী একটা পয়সা হাতে নিয়ে ভিক্ষুকের দিকে এগিয়ে বলল, এই নে, পয়সা নে।

ভিক্ষুক বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিল। আর একবার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে কিরীটী

ভিক্ষুকটাকে দেখে নিয়ে পয়সাটা ভিক্ষুকের হাতে ফেলে দিল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

ভিক্ষুক তখনও একই ভাবে চেঁচিয়ে চলেছে। হঠাৎ কিরীটী দেখলে আর একজন ভিক্ষুক যেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে উল্টো দিক থেকে ওদিকেই আসছে।

কিরীটী চলার গতিটা একটু শ্লথ করে দিল এবং আড়চোখে ভিক্ষুকটাকে লক্ষ্য করতে লাগল দূর থেকেই।

দ্বিতীয় ভিক্ষুকটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে আগের ভিক্ষুকটার কাছাকাছি আসতেই দুজনে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলাবলি করতে লাগল পরস্পরের মধ্যে।

কিরীটী আর অপেক্ষা না করে পা চালিয়ে চলল বড় রাস্তার মোড়ের দিকে এবারে।

মোড়ের পানের দোকানটার কাছে এক হাতে বাইক ধরে সুব্রত একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু অনভ্যাসের দরুন মাঝে মাঝে কাশিতে তার দম আট্‌কে আসতে চায়।

কিরীটী সুব্রতর কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর সুব্রতর হাত থেকে বাইকটা নিয়ে বাগিয়ে ধরতে ধরতে তাড়াতাড়ি বললে, ট্রামে চেপে লালবাজারের মোড়ে চলে যান সোজা। সামনেই যে রাস্তাটা বরাবর নয়া রাস্তায় মিশেছে, তার দু'পাশে চীনাদের জুতোর দোকান আছে, ঐখানেই আমি যাচ্ছি। একটা ছুরি, সিল্ক কর্ড ও একটা টর্চ নিতে ভুলবেন না যেন।

কথাগুলো বলেই কিরীটী একলাফে বাইকে চেপে সজোরে প্যাডেল করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিরীটীর নির্দেশমত তখনই সুব্রত ক্ষিপ্রপদে বাড়ির দিকে চলে গেল।

কিছুদূর এগিয়ে কিরীটী রাস্তার মোড়ে বাইক থেকে নেমে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সহসা একসময় তার নজরে পড়ল দ্বিতীয় খোঁড়া ভিক্ষুকটা ঐদিকেই আসছে।

মহাপ্রভু নিশ্চয়ই এতক্ষণ যাত্রা করেছেন! কিরীটী বাইকে চেপে গলির দিকে চলল এবারে। কাছাকাছি আসতেই ক্রিং ক্রিং আওয়াজ পাওয়া গেল এবং পরক্ষণেই গলির মুখ দিয়ে একজন সাইকেল-আরোহী দ্রুত বেরিয়ে এল।

লোকটার পরনে ঢিলা পায়জামা, গায়ে ঢোলা কাবুলী জামা, মাথায় কালো টুপি—কপাল পর্যন্ত টেনে দেওয়া হয়েছে ; চোখে কালো কাচের গগল্‌স।

গলিপথ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে লোকটা ট্রাম রাস্তার দিকে সাইকেল চালাতে লাগল। কিরীটীও তার পিছু পিছু সাইকেল নিয়ে অনুসরণ করলে।

লোকটা সোজা আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে বৌবাজার স্ট্রীটে পড়ে বরাবর গিয়ে চিৎপুরে পড়ল।

দু'পাশে যত সব ছবি আর আয়নার দোকান। কাচের গায়ে গায়ে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর রশ্মিগুলি প্রতিফলিত হয়ে বিচিত্র রঙের রামধনু জাগিয়েছে।

রাত্রি কতই বা হবে! বড় জোর আটটা, তার বেশী নয়। কলকাতা শহরে

সন্ধ্যা বললেই চলে। দোকানে লোকের ভিড়। পথে ট্রামে ঢং ঢং ঘণ্টার আওয়াজ আর রিকশাওয়ালাদের ঠুং ঠুং শব্দ ও মোটরের হর্ন।

লোকটা যে একজন পাকা সাইকেল-চালিয়ে, তা ওর গতি দেখেই বোঝা যায়। লোকটা অতি দ্রুত ভিড় বাঁচিয়ে লালবাজার ডাইনে ফেলে সোজা চীনাপট্টির মধ্যে ঢুকল।

রাস্তার দু'পাশে সারি সারি চীনাদের জুতার দোকান। মোড়ের একটা লাইটপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষমাণ সুব্রতকে দেখতে পেল কিরীটী।

সাইকেল চালিয়ে কিরীটী সুব্রতর পাশে এসে নামল।—যে লোকটিকে এতক্ষণে কিরীটী অনুসরণ করছিল, সে তখন খানিকটা দূরে সাইকেল থেকে নেমে সাইকেল হাতে করে এগোচ্ছিল।

এটা নিয়ে এখানে অপেক্ষা করুন। এই বলে কিরীটী বাইকটা সুব্রতর হাতে দিয়ে লোকটিকে অনুসরণ করল তাড়াতাড়ি। লোকটি বাইক নিয়েই সামনের অন্ধকার গলিটার মধ্যে গিয়ে পড়ল। কিরীটীও আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে শিকারী বিড়ালের মত লোকটাকে অনুসরণ করল।

গলিটা বেশ প্রশস্ত। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই ঠাওর করা যায় না। দু'-পাশে বাড়ির খাড়া দেওয়াল উঠে গেছে। হাত দশেক উঁচুতে একটা জানালার ফাঁক দিয়ে খানিকটা আলো এসে গলির অন্ধকারে ছিটকে পড়েছে যেন। অন্ধকার এত বেশী যে পাশের লোক পর্যন্ত নজরে আসে না। পচা মাছ ও চামড়ার বিশ্রী গন্ধে দম বন্ধ হবার যোগাড়।

কিরীটী অতি সন্তর্পণে দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে এগিয়ে চলল। আগের লোকটাকে তখন আর দেখা যাচ্ছে না। সম্মুখে পশ্চাতে ডাইনে বামে সব দিকেই অন্ধকার। অন্ধকার যেন স্তরে স্তরে জমাট বেঁধে উঠেছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। অন্ধকার গলির মধ্যে বুঝি বাতাসও আসতে ভয় পায়। কিরীটী বুঝল, আর এগিয়ে চলা বৃথা, তাই দাঁড়িয়ে রুদ্ধনিঃশ্বাসে কান পেতে রইল। হঠাৎ একসময়ে একটা আওয়াজ কানে এল খট্-খট্-খট্।

তারপরই খানিকক্ষণ চুপচাপ, আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। আবার শব্দ হল—খট্-খট্-খট্।

এবার যেন কাছেই কোথায় একটা দরজা খোলার শব্দ হল। অন্ধকার গলি-পথে একটা ম্লান আলোর শিখা দেখা গেল। তার পরেই ঈষদুন্মুক্ত একটা দরজাপথে একটা কুৎসিত চীনা বুড়ীর চেপ্টা মুখ দেখা গেল। হাতে তার কেরোসিনের বাতি। বাতিটা যেন আলোর চাইতে ধূমোদ্গিরণই বেশী করছে।

বুড়ী বাতিটি লোকটির মুখের উপর তুলে ধরল। অমনি লোকটা বাঁ-হাতের দুটো আঙুল কোণাকুনি করে দেখালে। সেই বিশ্রী বুড়ীটার কুৎসিত মুখে ততোধিক কুৎসিত এক টুকরো হাসি জেগে উঠল। বুড়ী রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াল।

লোকটি বাড়ির মধ্যে ঢোকবার সংগে সংগেই দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তে কিরীটী নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে নেয়, এবং ত্বরিৎপদে গলির ভিতর থেকে বের হয়ে গিয়ে সুব্রত যেখানে অপেক্ষা করছিল সেখানে এসে বললে, এখনই আপনি বাড়ি যান সুব্রতবাবু এবং যত শীঘ্র পারেন রাজেন-

বাবুকে নিয়ে এখানে চলে আসবেন। ঐ যে দেখছেন, হংকং সু ফ্যাক্টরীর পাশ দিয়ে একটা গলি দেখা যাচ্ছে, ওরই আশে-পাশে কোথাও অন্যের সন্দেহ বাঁচিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। একেবারে শূন্য হাতে আসবেন না।

কি হাতিয়ার সঙ্গে আনি বলুন তো? সুব্রত প্রশ্ন করে।

একটা ছুরি বা একটা অন্ততঃ লোহার রড্ হলেও চলবে। ব্রিটিশ রাজত্বে তো আর পিস্তল বা রিভলবার চট করে পাওয়া যাবে না। কাজে কাজেই আমাদের ভগবানপ্রদত্ত বুদ্ধিকেই কাজে লাগাতে হবে।

সুব্রত হেসে ফেলে।

হাসছেন সুব্রতবাবু! প্রায় পৌনে দুই শত বৎসরের পরাধীনতায় আমরা যে একেবারে পঙ্গু ও অথর্ব হয়ে আছি। কিন্তু থাক সে-সব কথা, পরাধীন দেশের দুঃখের শেষ কোথায়! হ্যাঁ শুনুন, আপনি আর রাজেনবাবু এসে ঐ হংকং সু ফ্যাক্টরীর কাছে অপেক্ষা করবেন, পর পর দুটো বাঁশীর আওয়াজ পেলেই ঐ গলির মধ্যে ছুটে যাবেন। বাঁশীর আওয়াজ না পাওয়া পর্যন্ত কোথাও যাবেন না। আচ্ছা আমি চললাম।

কিরীটী কথাগুলো বলে দ্রুতপদে গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

সুব্রত আর ক্ষণমাত্র দেরি না করে, সামনেই একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে হাতের ইশারায় থামিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসে বললে, আমহার্স্ট স্ট্রীট!

ট্যাক্সি নির্দিষ্ট পথে ছুটে চলল।

এদিকে গলির মধ্যে ঢুকে কিরীটী কিছুক্ষণ যেন কি ভাবলে, তারপর আঁধারে আন্দাজ করে ক্ষণপূর্বের দেখা সেই দরজাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মুহূর্তমাত্র চিন্তা করে টুক্-টুক্-টুক্ করে দরজার গায়ে তিনটে টোকা দিল।

কিন্তু কোন সাড়া নেই। অল্পক্ষণ পরে আবার টোকা দিল—টুক্-টুক্-টুক্।

এবারে ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল এবং পরক্ষণেই দরজাটা খুলে গেল। আগের সেই চীনা বুড়ী বাতি হাতে বেরিয়ে এল।

কিরীটী আঙুল দিয়ে পূর্বের লোকটির মত ইশারা করতেই বুড়ী পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। সে বুড়ীর পাশ দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল তখন।

সরু একটা অত্যন্ত স্বল্পপরিসর অন্ধকার গলিপথ—বরাবর খানিকটা চলে গেছে। তার মধ্যে দিয়ে বুড়ী আলো নিয়ে এগিয়ে চলে আর কিরীটী পিছন পিছন চলে।

কিছুদূর অগ্রসর হতেই আচমকা কিরীটী হঠাৎ দুই হাত দিয়ে পিছন থেকে বুড়ীর মুখটি চেপে ধরল এবং ক্ষিপ্রহস্তে পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে বুড়ীর মুখে গুজে দিল; তারপর সিল্ক কর্ড দিয়ে বুড়ীকে বেঁধে ফেললে।

॥ ৮ ॥

চীনা আড্ডায়

বুড়ীকে বাঁধতে কিরীটীর দু'মিনিটও সময় লাগে না।

বুড়ীকে বেঁধে ফেলে কিরীটী উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঝাপটে ধরবার সময় বুড়ীর হাতের বাতিটা ছিটকে পড়ে নিভে গিয়েছিল। কিরীটী পকেট থেকে দেশলাই বের করে একটা জ্বালাল ; তারপর সেই অন্ধকার গলিপথ দিয়ে খানিকটা অগ্রসর হতেই দেখা গেল, অদূরে একটা ঘরের দরজার পাশে টুলে বসে একটা চীনা যুবক্ ঝিমুচ্ছে। দেওয়ালে একটা ওয়াল-ল্যাম্প পিট-পিট করে জ্বলছে। তারই ম্লান আলো তন্দ্রাচ্ছন্ন চীনাটির মুখের উপর এসে পড়েছে। লোকটা কিছুই টের পায়নি তাহলে। সামনের ঘরের দরজাটা ভেজানো। ঘরের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কথাবার্তার দু-একটা টুকরো আওয়াজ শোনা যায়। কিরীটী একেবারে দেওয়ালের গায়ে গা লাগিয়ে অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। তারপর চীনা লোকটির কাছাকাছি এসে হঠাৎ পিছন দিক থেকে দু'হাত দিয়ে খুব জোরে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

আধো ঘুমন্ত অবস্থায় অতর্কিত আক্রান্ত হয়ে লোকটি যেমন চমকে উঠেছিল তেমনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল এবং সেই অবস্থাতেই লোকটাকে ঝাপটে ধরে মাটিতেই গড়িয়ে গড়িয়ে খানিকটা পিছন দিকে চলে এল কিরীটী।

অতর্কিত আক্রমণে চীনা লোকটা প্রথমটা বিশেষ হকচকিয়ে গিয়েছিল সত্যিই, কিন্তু একটু পরেই নিজেকে সে কিরীটীর বাহুবেষ্টন থেকে ছাড়াবার জন্যে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু কিরীটীর দৈহিক শক্তির কাছে পেরে ওঠে না এবং পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

প্রথম থেকে কিরীটী লোকটা যাতে কোনরূপ শব্দ না করতে পারে, সেজন্য সতর্ক হয়ে লোকটার মুখে হাত চাপা দিয়েছিল, পরে একটা রুমাল ঠেলে ধরল মুখের মধ্যে। তারপর পকেট থেকে একটা সিল্ক কর্ড বের করে লোকটার হাত-পা বেঁধে ফেলল। তার পর ক্ষিপ্রগতিতে লোকটার জামা ও মাথার টুপি খুলে নিয়ে নিজে সেগুলো পরে নিল।

পরাজিত রজ্জুবদ্ধ লোকটা তার ছোট কুৎসিত চোখ দুটো মেলে অন্ধকারে হয়তো কিরীটীকে দেখবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সেদিকে কিরীটীর আদৌ লক্ষ্য ছিল না। মাথার কালো চীনা টুপিটা কপালের নীচে ভুরু পর্যন্ত কিরীটী টেনে দেয়। এই সমস্ত কাজ করতে কিরীটীর দশ-পনেরো মিনিটের বেশী সময় লাগেনি। আর দেরি না করে কিরীটী ঘরের ভেজানো দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। অতি ধীরে দু আঙুলে চাপ দিয়ে এবারে দরজাটায় একটু ঠেলা দিল। দুটো কপাট সরে গিয়ে সামান্য একটু ফাঁক হয়ে গেল। দেখা গেল, একটা ভাঙা টেবিলের পাশে তিনজন লোক গভীর মনোযোগ সহকারে বসে বসে কি সব কথাবার্তা বলছে। মুখের হাবভাবে মনে হয় যেন অত্যন্ত জরুরী

কিছুর গোপন পরামর্শ চলেছে ঘরের লোকগুলোর মধ্যে।

দুজনের মুখ দেখা যায় না, তারা দরজার দিকে পিছন ফিরে বসেছে। যার মুখ দেখা যায়, সেরকম বীভৎস মুখ কিরীটী জীবনে দেখেছে কিনা সন্দেহ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি কোন শ্মশানচারী প্রেতলোকবাসী! প্রেতলোকের বিভীষিকায় মুখখানা বীভৎস! কি একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন যেন ওর মুখের প্রতি রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে।

লোকটার ডান দিকটার কপাল ও গাল বোধ হয় কবে পুড়ে গিয়েছিল। সর্বগ্রাসী হুতাশন যেন তার নির্মম চিহ্ন রেখে গেছে ডান দিককার কপাল ও গালটাকে টেনে কুঁকড়ে বীভৎস করে দিয়ে। সেই সঙ্গে ডান দিককার চোখটাও যেন ঠেলে কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। সেই বীভৎস কুৎসিত মুখের ওপরে আলোর ম্লান শিখা পড়ে আরও ভয়াবহ মনে হয়।

লোকটার হাতে একটা তীক্ষ্ণ বাঁকানো ছুরি। সে সেটিকে দু আঙুলে দোলাতে দোলাতে কাকে যেন লক্ষ্য করে বললে, সনৎবাবু, আবার ভেবে দেখ। এখনও সময় আছে।

সনৎবাবু নাম শুনেই কিরীটী চমকে উঠল।

লোকটি আবার বললে, হ্যাঁ, এখনও সময় আছে। আমাদের এইভাবে কলকাতায় আসতে বাধ্য করার জন্য খেসারত দশ হাজার না হোক—অন্ততঃ আমার দাবির দশ হাজার এবং কথার খেলাপের জন্য দশ হাজার টাকা—সর্বসমেত কুড়ি হাজার দিলেই মুক্তি পাবে।

আমি তো তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি—টাকা তুমি পাবে না। তোমার যা খুশি আমাকে নিয়ে করতে পার।

সনৎবাবু, তোমার দুঃসাহস দেখে সত্যিই অবাক হয়ে যাচ্ছি। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কেমন করে যে তুমি নিশ্চিন্ত থাকার ভাব করছ তা তুমিই জান। একটু থেমে আবার বলল, সেবারে বড্ড ফাঁকিটা দিয়েছিলে। রেঙ্গুনে তোমার বাড়িতে সেই অপমান, শুধু তাই নয়, এত দুঃসাহস তোমার, আমার প্রেরিত মৃত্যুদূত ড্রাগনকে ঘৃণাভরে মাটিতে আছড়ে ফেলেছিলে। কিন্তু দেখছি তার চেয়ে ঢের বেশী দুঃসাহস ঐ টিকটিকি কিরীটী রায়ের। বলতে বলতে সহসা সে কথার মোড় ফিরিয়ে হাতের তীক্ষ্ণ ছুরিখানা একবার ঘুরিয়েই বোঁ করে চোখের নিমেষে দরজার দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। সোঁ করে ছুরির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগটা এসে কপাটের গায়ে বিঁধে থর-থর করে কাঁপতে লাগল।

ব্যাপারটা এত চকিতে ঘটে গেল যে, কিরীটী ক্ষণপূর্বে স্বপ্নেও তা ভেবে উঠতে পারেনি।

কত বড় খরসন্ধানী দৃষ্টি চারিদিকে সজাগ রেখে লোকটা সদাসতর্ক থাকে, সে কথা ভাবলেও বুঝি সত্যি শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যেতে হয়। কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছ থেকে সরে পড়বার পূর্বেই—ক্ষুধিত নেকড়ের মত দুই হাত দিয়ে টেবিলের ওপর ভর দিয়ে, সামনে উপবিষ্ট লোক দুটোর ঘাড়ের ওপর দিয়েই, সেই কুৎসিত-দর্শন লোকটি দরজার গোড়ায় এসে পড়ল মুহূর্তে এবং এক ঝট্‌কা মেরে দরজাটা খুলেই সে কিরীটীর কাঁধে একটা হাত দিয়ে চীনা ভাষায় কঠোর স্বরে বললে, কি শুনছিলি হতভাগা!

তারপর বিরাট এক ঝাঁকুনি দিয়ে ঘাড় ধরে তাকে সামনের টুলটির ওপর

বসাতে যেতেই ঘরের আলোয় অদূরে দড়ি-বাঁধা সেই চীনা যুবকটার দিকে তার নজর পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে দু পা পিছিয়ে গেল।

আর দেরি করা সংগত নয়, শুধু বোকামি—ভেবেই কিরীটী মুহূর্তে জোরে এক ধাক্কা মেরে লোকটাকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে চকিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ভিতর থেকে খিল তুলে দিল।

অদূরে মেঝেয় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে সনৎ। ওদিকে ঘরের মধ্যে উপবিষ্ট লোক দুটো কিরীটীর খিল বন্ধ করার শব্দে চমকে ফিরে তাকাল। ততক্ষণে কিরীটী দরজার গা থেকে সেই ছুরিটা এক টান মেরে তুলে নিয়ে সনৎ-এর কাছে গিয়ে পটাপট করে তার বাঁধন কাটতে শুরু করে দিয়েছে।

লোক দুটো সত্যিই বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণেই তারা দুজনেই একসঙ্গে ছুটে এল কিরীটীর দিকে। কিরীটী ফিরে দাঁড়িয়ে প্রথম লোকটির হাতে ছুরি দিয়ে ভীষণভাবে এক আঘাত করলে। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে পিছিয়ে গেল।

এদিকে দরজার গায়ে মুহুর্মুহু ধাক্কা পড়ছে। আর বাঁধন কেটে দিতেই বাকী বাঁধনগুলো পট-পট করে ছিঁড়ে ফেলে সনৎ এসে উঠে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে সেই লোক দুটো ছুটে এসে আবার ওদের আক্রমণ করল। কিরীটী আর সনৎ কায়দা করে লোক দুটোর কবল থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল।

ওদিকে বাইরে থেকে তখন মুহুর্মুহু ধাক্কায় দরজাটা প্রায় ভেঙে পড়বার যোগাড়, আর লোক দুটো তখন ওদের ধরবার জন্য প্রায় মরীয়া হয়ে উঠেছে। তাদের চোখ-মুখে সে কি ব্যাকুল আগ্রহ!

কিরীটী স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, এইভাবে বেশীক্ষণ আত্মরক্ষা করা মোটেই চলবে না। বাইরে থেকে দরজা ভেঙে ফেলবেই, তাছাড়া এদের দলে কজন আছে, তাই বা কে জানে! এখান থেকে বাঁশি হাজার জোরে বাজালেও বাইরে অপেক্ষমাণ সুব্রত বা রাজেনবাবু কেউই শুনতে পাবেন না।

সহসা এমন সময় মড়মড় করে প্রচণ্ড শব্দে দরজাটার খিলটা ভেঙে গেল এবং ভাঙা দরজাপথে অল্প আয়াসেই ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল একটু আগেই আক্রমণকারী কুৎসিত-দর্শন সেই লোকটা পুচ্ছ-মর্দিত ক্রুদ্ধ শার্দুলের প্রচণ্ড জিঘাংসায়।

কিরীটী স্থির হয়ে দাঁড়াল।

॥ ৯ ॥

সংকট মুহূর্ত

কেবল কিরীটীই নয়।

ভীষণ-দর্শন লোকটা দরজার কপাট ভেঙে ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের অন্য দুজনও একেবারে চুপ করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল মুহূর্তের জন্য।

যেন মন্ত্রপূত বারি ছিটিয়ে সকলকে মোহাচ্ছন্ন করা হয়েছে।

কয়েক সেকেন্ড ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কিরীটীর দিকে পলকহারা দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটা আচমকা একটা বাজের মত তীক্ষ্ণ হাসি হেসে ওঠে। বীভৎস হাসিতে ঘরটা যেন ঝম্ ঝম্ করে ওঠে। সেই ভীষণ-দর্শন লোকটি হাসছে হা হা করে। হাসির ধমকে যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ছে। পরক্ষণেই সহসা ঝন্ ঝন্ করে কাঁচ ভাঙার শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে জমাট অন্ধকারে সমস্ত ঘরটা ভরে গেল। কিরীটী পকেট হতে পিতলের ভারী সিগারকেসটা নিক্ষেপ করে ঘরের বাতি ভেঙে দিয়েছে বলেই কাঁচ-ভাঙার শব্দ উঠেছে।

আচমকা অন্ধকারে যেন মুহূর্তের জন্য সব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে আবার। কিন্তু সেও অতি অল্পক্ষণের জন্যই।

ততক্ষণে অন্ধকারে ঘরের মধ্যে একটা বিশ্রী হুটোপুটি বেধে গিয়েছে। কিরীটী বাঁ হাত দিয়ে সনৎ-এর একটা হাত আগে থেকে ধরে রেখেছিল, এখন গোলমালের মধ্যে সনৎকে নিয়ে ঘর থেকে বেরোবার চেষ্টা করল এবং চাপা গলায় সনৎকে বললে, সনৎবাবু, চেষ্টা করুন পালাবার।

কিন্তু সহসা কে যেন এমন সময় পিছন থেকে তাকে দু হাতে জাপটে ধরল।

অন্ধকারেই কিরীটী একটা প্রবল ঝটকা দিয়ে আততায়ীর আক্রমণ থেকে আপনাকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতেই বুঝতে পারে আততায়ীর দৈহিক শক্তি অপরিসীম। কাজেই সনৎ-এর হাতটা ছেড়ে দিয়ে দু' হাতে সবলে আপনাকে মুক্ত করে নেবার জন্য সচেষ্ট হল।

দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে কেউ কম যায় না। উভয়েই প্রাণপণে যুদ্ধে চলেছে।

কিরীটী যত যুযুৎসুর প্যাঁচ প্রয়োগ করে, আততায়ী ঠিক তার উল্টোটি দিয়ে আপনাকে অক্লেশে মুক্ত করে নেয়। ওদিকে ঘরের মধ্যে ক্রমে আরও গোলমাল বেড়ে উঠেছে। সহসা ঐ সময় অন্ধকারে একটা ক্ষীণ যন্ত্রণা-কাতর চিৎকার শোনা গেল।

সেই চিৎকারের শব্দে সকলেই চমকে উঠল। সেই যন্ত্রণা-কাতর শব্দে মুহূর্তের জন্য কিরীটী ও তার আক্রমণকারীর শক্ত মুষ্টিও বোধ হয় শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

কিরীটী ঐ সুযোগ হেলায় হারালে না। আততায়ীকে জোরে এক ধাক্কা দিয়ে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই, খোলা দরজাপথে বাইরের সরু গলিপথের মধ্যে এসে ছিটকে পড়ল। সেই চীনা যুবকটি তখনও তেমনি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়েছিল সেইখানেই।

এক লাফ দিয়ে সেই লোকটিকে ডিঙিয়ে কিরীটী দরজার দিকে ছুটল। ছুটতে ছুটতে সদর দরজার কাছাকাছি এসে দেখতে পেল চেপ্টা-মুখ বুড়ীটা তখনও দরজার কাছে তেমনি ভাবে পড়ে আছে।

কিরীটী যেমন দরজার খিলটায় হাত দিতে যাবে, ঠিক সেই সময় দরজার বাইরে শুনতে পেল খুট্-খুট্-খুট্ একটা শব্দ।

দরজা খোলবার সাংকেতিক শব্দ। খিল খুলতে উদ্যত হাতখানি যেন সহসা অর্ধপথেই থেমে যায়। কিরীটী অল্পক্ষণের জন্য রুদ্ধনিঃশ্বাসে স্থির অচঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হল—এক-একটি মুহূর্ত যেন এক-

একটি যুগ।

কি ব্যাকুল প্রতীক্ষা! প্রতি লোমকূপ—প্রতি রক্তকণা—দেহের ও মনের সমগ্র বোধশক্তি যেন এক অসীম প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে। এমন সময় অদূরে একই সঙ্গে অনেকগুলো দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। শব্দ শুনে মনে হয়, কারা যেন শশব্যস্তে ঐদিকেই ছুটে আসছে।

কিরীটী চঞ্চল হয়ে ওঠে। আবার বাইরে থেকে শব্দ হল—খুট্-খুট্-খুট্ ঐ সময়।

ওদিকে পায়ের শব্দ তখন একেবারে কাছে এসে পড়েছে। আর অপেক্ষা করা বিপজ্জনক, সময়ও এল না। এক ঝটকায় খিলটা খুলেই সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিরীটী।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ঐ আড্ডারই বোধ হয় একজন লোক কপাটে সংকেত-ধ্বনি করছিল। দরজা খুলে কিরীটী আঁধারে আচমকা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই লোকটা হুড়মুড় করে ধরাশায়ী হল। কিরীটীও মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তড়িৎবেগে উঠে দাঁড়িয়েই পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাতমাত্র না করে গলিপথে বড় রাস্তার দিকে দৌড় দিল। ততক্ষণে আড্ডার সকলে দরজার কাছে এসে জড়ো হয়েছে।

কিরীটী গলিটার প্রায় শেষাশেষি এসে পড়েছে, ঠিক এমন সময় একটা তীক্ষ্ম ছুরির অগ্রভাগ এসে তার বাঁ হাতের মাংসপেশীর উপর বিঁধে গেল। বিষম যন্ত্রণায় অস্পষ্ট শব্দ করে দাঁড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের জন্য কিরীটী।

কিন্তু এইভাবে অন্ধকার গলিপথে শত্রুর সীমানার মধ্যে আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাও নিরাপদ নয় ভেবে কিরীটী অতি কষ্টে ডান হাত দিয়ে ছুরিটাকে টান দিয়ে খুলে, ডান হাতের পাতা দিয়ে ক্ষতস্থানটা সজোরে চেপে ধরে টলতে টলতে এগিয়ে চলল বড় রাস্তার দিকে।

সুব্রত ও রাজু নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করছিল বটে, কিন্তু কিরীটী তাদের খোঁজ করলে না। সম্ভবতঃ নিদারুণ পরিশ্রমে এবং বারংবার আক্রান্ত হয়ে সে-সব কথা চিন্তা করবারও বুঝি তার দেহের বা মনের অবস্থা ছিল না।

বড় রাস্তার ওপরে এসেই প্রথমে সে রুমাল দিয়ে ক্ষতস্থানটা চেপে ধরল। প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে, মাথাটাও গুরু পরিশ্রমে ঝিমঝিম করছে তখন।

॥ ১০ ॥

অনুসন্ধান

রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা।

বেণ্টিংক স্ট্রীট প্রায় জনশূন্য হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে শুধু দু-একটা মোটরগাড়ির হর্ন কিংবা রিকশার ঠুং ঠুং আওয়াজ পাওয়া যায়।

জনহীন শহরে যেন ক্ষীণ প্রাণস্পন্দন।

দোকানপাট প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। দু-একটা জুতোর দোকান তখন অবিশ্যি খোলা। কোন দোকানে খদ্দের নেই, কেবল দোকানে ক্যাশিয়ার খাতার

ওপর ঝুঁকে পড়ে সারা দিনের বেচাকেনার জমাখরচ ঠিক করছে। এক দোকানের পাশে কয়েকটি চীনা জটলা পাকিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্ক করছে।

একটা তেতলা বাড়ির নীচে বাঁধানো রোয়াকে কতকগুলো ভিখারী জড়ো হয়ে নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা বলছে। তাদের কেউ কেউ আবার দেয়াল থেকে প্ল্যাকার্ড ছিঁড়ে নিয়ে শোবার ব্যবস্থা করছে।

কিরীটী সে-সব দিকে লক্ষ্য না করে এগিয়ে চলল। লালবাজার থানাটা ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে এসেই কিরীটী কি ভেবে দাঁড়াল।

একখানা ট্যাক্সি সেদিকে আসছে। ট্যাক্সিটাকে হাত-ইশারায় দাঁড় করিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বললে, টালিগঞ্জ—

ক্লান্ত অবসন্ন কিরীটী চলমান ট্যাক্সির নরম গদিতে গা এলিয়ে দেয়।

ঠাণ্ডা হাওয়া চোখে-মুখে এসে যেন শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে যায়। ট্যাক্সি ছুটে চলেছে টালিগঞ্জের দিকে।

নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রি।

মাথার ওপরে সীমাহীন কালো আকাশ যেন সর্বাঙ্গে তারার রত্নখচিত ওড়না জড়িয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন।

চৌরঙ্গীর দীপমালা-শোভিত পিচঢালা রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ি বেগে ছুটে চলেছে। গাড়ির সীটে দেহভার এলিয়ে দিয়ে কিরীটী চোখ বুজে পড়ে থাকে।

বাড়িতে পেঁৗছে কড়া নাড়তেই জংলী এসে দরজা খুলে দেয়।

ট্যাক্সির ভাড়াটা দিয়ে দেয় জংলী।

ভাড়া মিটিয়ে ওপরে এসে জংলী দেখে কিরীটী একটা সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে। জংলী ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে কিরীটীর জামায় রক্ত দেখে সবিস্ময়ে বলে, ও কি বাবুজি, এমন করে জখম হল কি করে বাবুজি!

পিছন হতে অন্ধকারে ছুরি মেরেছে রে! তুই এক কাজ কর্—ইলেকট্রিক স্টোভে খানিকটা জল গরম করে নিয়ে আয়। আর ঐ পাশের ঘরের সেলফে আইডিন আর তুলো আছে, নিয়ে আয়।

জখম খুব গুরুতর হয়নি। ক্ষতস্থান বেশ ভাল করে চেপে বেঁধে দিয়ে জংলী কিরীটীকে হাত ধরে এনে শয্যায় শুইয়ে দিল। ফার্স্ট এইড দেওয়া কিরীটীর নিকটেই জংলীর শিক্ষা।

পরের দিন সকালে যখন কিরীটীর ঘুম ভাঙল তখন ভোরের সোনালী রোদে সুনীল আকাশ যেন ঝক্‌ঝক্ করছে। খোলা জানালা দিয়ে খানিকটা প্রভাতী রোদ পায়ের ওপর এসে পড়েছে। বারান্দায় খাঁচায় পোষা ক্যানারী পাখিটা থেকে থেকে শিস দিচ্ছে। বাগানে বোধ হয় রজনীগন্ধা তার মধুর মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ভাসিয়ে আনে।

কিরীটীর গা-হাত-পায়ে অল্প অল্প বেদনা আছে, মাথাটাও যেন একটু ভারী-ভারী মনে হয়। শয্যার উপর চোখ বুজে শুয়েই কিরীটী গত-রাত্রের সমস্ত কথা আগাগোড়া একবার ভাববার চেষ্টা করে। গতরাত্রের দুঃসাহসিক অভিযানের ব্যাপারটা এখনও মনের উপর ছায়াবাজির মত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

নিঃশব্দে জংলী এসে ঘরে প্রবেশ করে। বললে, বাবুজি! তবিয়ত আচ্ছি হ্যায় তো?

হ্যাঁ, বহুৎ তন দুরুস্তি মালুম হোতা, এক কাপ চা নিয়ে আয় তো বাবা।

শয্যা ত্যাগ করে কিরীটী বাথরুমে গিয়ে প্রবেশ করল।

মুখ হাত ধুয়ে মাথাটা বেশ করে জলে ভিজিয়ে, স্নানের ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে শিস দিতে দিতে কিরীটী বসবার ঘরে এসে ঢুকতেই সুব্রত ও রাজুকে সেখানে বসে থাকতে দেখল। অভ্যর্থনার পরে হাসতে হাসতে বলে ওঠে, সুপ্রভাত—সুপ্রভাত! কতক্ষণ এলেন?

অল্পক্ষণ। তারপর কেমন আছেন? শুনলাম কাল রাত্রে নাকি হাতে জখম হয়েছেন। প্রশ্ন করে সুব্রত।

হ্যাঁ, ও কিছু নয়। চলুন চা-পর্বটা শেষ করে একবার কালকের আড্ডাটায় হানা দিয়ে আসা যাক, যদি কিছুর সন্ধান মেলে।

তাতে কি কোন ফল হবে, আপনি মনে করেন?

বলা যায় না, তাছাড়া যদি—

সুব্রত ও রাজু কিরীটীর কথায় হো হো করে হেসে উঠল। সুব্রত বলল, —যদি কি? যদি একপাটি ছেঁড়া জুতো বা একটা ভাঙা ছুরির বাঁট—নিদেন-পক্ষে দেওয়ালের গায়ে একটা হাতের ছাপ পাওয়া যায়?

কিরীটী ওদের কথার ভঙ্গিতে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। বললে, হ্যাঁ, ডিটেক্‌টিভরা নাকি ঐ সব সূত্র ধরেই অনেক সময় বড় বড় পাপানুষ্ঠানেরও কিনারা করে ফেলেন শুনতে পাওয়া যায়।

জংলী এসে চায়ের ট্রে হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। এবং সামনের ত্রিপয়ের ওপর ট্রে-টা নামিয়ে রাখল।

চা-পানের পর তিনজন রাস্তায় এসে নামল।

এর মধ্যেই বাইরে রৌদ্রের তাপ বেশ প্রখর হয়ে উঠেছে। একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে তিনজনে উঠে বসল।

একসময় কিরীটী বললে, আমরা তো কালই রওনা হচ্ছি! কি বলেন, সুব্রতবাবু?

হুঁ। কিন্তু সনৎদার কোন একটা কিনারা তো হল না এখনও! বললে সুব্রত।

সনৎবাবু আপাততঃ কলকাতাতেই আছেন।

কিরীটীর কথায় রাজু ও সুব্রত চমকে উঠে বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে শুধাল, সে কি!

হ্যাঁ। কাল রাত্রে সামান্য একটু ভুলের জন্য তাঁকে সেই শয়তানের আড্ডায় ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত আছি।

কি?

তাঁকে তারা প্রাণে মারবে না।

তাদের আপনি চেনেন না মিঃ রায়। এ সংসারে তাদের অসাধ্য কিছুই নেই। এমন কোন পাপ কাজ বা দুষ্কর্ম নেই যা ওদের বিবেকে বাধে। ওরা নেকড়ের চেয়েও হিংস্র, সাপের চেয়েও খল।

কিরীটী মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। পরে গম্ভীরভাবে বললে, কিন্তু এক্ষেত্রে মেরে ফেললে যে ওদের কাজ হাসিল হবে না সুব্রতবাবু। যে ফাঁদ

ওরা পাততে চায় সে বড় বিষম ফাঁদ। কিন্তু ওদের হিসাবেই সামান্য একটু ভুল হয়ে গেছে এবং সেইটুকু শুধরে নেওয়ার জন্য ওরা বোধ হয় সনৎবাবুকে নিয়েই কালকের জাহাজে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রেঙ্গুন রওনা হবে, এই পর্যন্ত বলে কিরীটী একে একে গতরাত্রের সমস্ত ঘটনাই আগাগোড়া খুলে ওদের বলে গেল।

সুব্রত কিরীটীর মুখে গতরাত্রের আনুপূর্বিক কাহিনী শুনে বললে, তা হলে দেখছি সত্যসত্যই আপনি ভাগ্যবান! প্রথম যাত্রাতেই মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ মিলে গেল!

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, না, এবারেই প্রথম সাক্ষাৎ নয়। ইতিপূর্বে আরও একবার দর্শন মিলেছিল।

সে কি! দুজনেই একসঙ্গেই প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, খোঁড়া ভিক্ষুকই স্বয়ং মহাপ্রভু। বলে আবার কিরীটী খোঁড়া ভিক্ষুকের কাহিনীটাও ওদের বললে।

ট্যাক্সি ছুটে চলেছে চীনাপট্টির উদ্দেশে। রাজপথে অসংখ্য লোক। পিপীলিকার সারির মত যে যার গন্তব্যপথে চলেছে। অফিস টাইম। বাস-ট্রামগুলো যাত্রীতে যেন একেবারে ঠেসা।

কিরীটী বললে, একটা কথা ভাবছি, চীনাপট্টিতে হুট করে গিয়ে আগেই ওঠা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আটঘাট বেঁধে কাজে নামতে হবে।

কি করবেন তাহলে? সুব্রত প্রশ্ন করে।

আমরা প্রথমে লালবাজারে যাব, সেখানে চৌধুরী বলে একজন সি. আই. ডি. ইন্সপেকটারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ-পরিচয় আছে। তাকে সব কথা খুলে বলে লালপাগড়ির সাহায্য নিতে হবে।

লালপাগড়ি!

হ্যাঁ, জানেন না তো, চোর-ডাকাত-গুণ্ডা মহলে লালপাগড়ির মহিমা অপরিসীম।

লালবাজারের কাছাকাছি এসে ওরা ট্যাক্সিটা বিদায় করে দিল ভাড়া মিটিয়ে।

চৌধুরী অফিসেই ছিল। কিরীটী তাকে সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলবার পর চৌধুরী সানন্দে কিরীটীকে সাহায্য করতে রাজী হয়ে গেল। এবং চৌধুরীর নির্দেশমত তখনই থানা থেকে দুজন কনস্টেবল কিরীটী তার সাহায্যের জন্য পেল।

থানা থেকে বের হয়ে কিরীটী সদলবলে যখন হুংকং সু ফ্যাক্টরীর সামনে এসে হাজির হল, বেলা তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে।

দোকানের ঠিক সামনে একজন প্রৌঢ়বয়সী চীনা একটা কাঠের টুলের ওপরে বসে একটা লম্বা পাইপ মুখে গুঁজে ঝিমোচ্ছিল। ওদের জুতোর শব্দে লোকটা হঠাৎ চমকে মুখ তুলে তাকাল এবং পরক্ষণেই সাদরে আহ্বান জানাল, জুতি সাব! আচ্ছা জুতি!

দোকানের ভিতরে একটি অল্পবয়সী চীনা যুবতী কাঁচি দিয়ে চামড়া কাটছিল আর মেসিনে বসে একজন আধাবয়সী চীনা যুবক কি যেন সেলাই করছিল।

কিরীটীদের সকলকে দোকানে প্রবেশ করতে দেখে ওরা দুজনেই মুখ

তুলে একবার মাত্র চেয়ে আবার যে যার কাজে মন দিল। দোকানটি যে খুব বড়গোছের তা নয়—

নাতিপ্রশস্ত একখানা হলঘর। ওপরে প্ল্যাটফরমের মত কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা। একপাশে পুরানো চামড়ার টুকরো স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে। অন্য একপাশে দেখা যায় ওপরে ওঠবার জন্য একটা কাঠের সিঁড়ি। কিরীটী তার খরসন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে চারিদিকে ভাল করে দেখতে লাগল।

কনস্টেবল দুজন কিরীটীর নির্দেশেই দোকানের ভিতর ঢোকেনি। তারা ওদিককার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল।

কি জুতি চাই বাবু?—প্রশ্ন করলে চীনা যুবকটি আধো আধো বাংলায়।

কিরীটী গম্ভীর হয়ে বলল, আমরা তোমাদের দোকানঘরটা একবার সার্চ করব বলে এসেছি।

কথাটা শোনামাত্র চীনা যুবকটি মেশিন ছেড়ে উঠে এল এবং বেশ পরিষ্কার ইংরাজীতে শুধাল, কেন, কি কারণে জানতে পারি কি?

কিরীটী দোকানের ভিতর চারিদিকে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করতে করতে উদাস স্বরে জবাব দেয়, সরকারের হুকুম।

চীনা যুবক রুক্ষ স্বরে জবাব দিল, তোমার ও হুকুম আমি মানি না বাবু। এখনই তুমি আমার দোকান থেকে বেরিয়ে যাও, তা না হলে বিপদে পড়বে।

কিরীটী গম্ভীরভাবে জবাব দেয়, বিপদে আমি পড়ব না, আমায় না দেখতে দিলে তুমিই বিপদে পড়বে সাহেব।

ইতিমধ্যে ওদের কথা-কাটাকাটির আওয়াজ পেয়ে পাশের একটা দরজা খুলে আরও দুজন হোমরাচোমরা গোছের চীনা বেরিয়ে এল। তারা বললে, কি হল বাবু?

কিরীটী ওদের দিকে একান্ত তাচ্ছিল্যভরে চেয়ে জবাব দিল, এই দোকানটা একবার আমরা ভাল করে দেখতে চাই।

কেন? রুক্ষ স্বরে একজন প্রশ্ন করে।

কিরীটী যেন ওদের ভ্রূক্ষেপমাত্রও না করে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বললে, চলুন সুব্রতবাবু, আমরা আমাদের কাজ করি।

কিরীটীর মুখের কথা শেষ হল না, চোখের পলকে ওদের একজন সুব্রতর সামনে এসে দাঁড়াল এবং মুহূর্তে সেই পরিষ্কার দিবালোকেই একখানা সুতীক্ষ্ম বাঁকানো ছুরি ওদের গতিপথ রোধ করে।

॥ ১১ ॥

কালো ভ্রমরের হুল

চোখের পলক ফেলার আগেই কিরীটী চীনা লোকটির ছুরিসমেত হাতখানা ধরে এক হেঁচকা টানে নিজের দিকে টেনে নিয়ে কনুইটা চেপে ধরে লোকটার হাতটা মুচড়ে দিল।

একটা অস্ফুট চীৎকার করে চীনাটা ছুরিখানা ফেলে দিল। আর ঠিক সেই

মুহূর্তে কিরীটী বাম হাত দিয়ে ছোট্ট একটা বাঁশি বের করে তাতে সজোরে ফুঁ দিল।

বাঁশির আওয়াজ পেয়ে দ্রুতপদে অপেক্ষমান কনেস্টবল দুজন এসে দোকানে প্রবেশ করল। 'লালপাগড়ি'র শুভাগমন দেখে চীনাদের মুখের ভাব যেন নিমেষে বদলে যায়। তারা একান্ত নিরীহ পোষা জীবটির মত এক-পাশে সরে দাঁড়াল মাথা নীচু করে সঙ্গে সঙ্গে।

কিরীটী একজন কনস্টেবলকে চোখের ইশারায় ডেকে নিয়ে, দরজাটা খুলে একটু আগে সেই চীনা লোক দুটো ঢুকেছিল সেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল নির্ভীক পদবিক্ষেপে।

দরজা খুলে কিরীটী, সুব্রত ও একজন কনস্টেবল গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। সামনেই একটা মাঝারিগোছের ঘর। ঘরটা দিনের বেলাতেও বেশ অন্ধকার। উপরে ছোট ছোট দুটো স্কাইলাইট বসানো আছে বটে এবং ওদিকে আর একটা দরজাও আছে, কিন্তু সেটার কপাট ভেজানো থাকার জন্য ঘরটা অন্ধকার।

বাইরের আলো আসবার কোন পথ তো নেই-ই, কৃত্রিম আলোরও তেমন কোন বন্দোবস্ত নেই ঘরটার মধ্যে। স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে সামান্য যে আলো-টুকু ঘরে আসে তাতেই সামান্য যেন এক মৃদু আলো-আঁধারির সৃষ্টি হয়েছে।

কিরীটী খরসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে চারিদিকে দেখতে লাগল। ঘরের এক কোণে স্তূপাকার করা একগাদা কাগজের তৈরী জুতোর বাক্স। আর এক কোণে একটা জুতো সেলাইয়ের কল। দেওয়ালে একটা ওয়াল-ল্যাম্প। ল্যাম্পটার চিমনির গায়ে একরাশ কালি জমেছে। কতকাল পরিষ্কার করা হয়নি কে জানে!

ওরা এগিয়ে এসে প্রথমেই ওদিককার দরজাটা খুলে ফেলল। সামনেই একফালি বারান্দা। সেখানে তবু যা হোক খানিকটা আলো এসে পড়েছে বাইরে।

বারান্দার সংলগ্ন পর পর দুখানা ঘর। প্রথম ঘরটা নেহাৎ ছোট নয়। সেখানে কতকগুলো চেয়ার-টেবিল ওলট-পালট হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। মনে হয় কারা বুঝি ঘরটার মধ্যে এসে হুটোপুটি করে গেছে। ঘরের মেঝেয় একটা টেবিল ল্যাম্প উল্টে পড়ে আছে, খানিকটা জায়গায় কেরোসিন তেলের দাগ। ভাঙা চিমনির টুকরোগুলো ঘরময় ইতস্তত ছড়ানো। কিরীটী ভাল করে সব দেখতে দেখতে বুঝতে পারে, এই ঘরটিই গতরাত্রের সেই ঘটনাস্থল। এই ঘরেই গতরাত্রের খণ্ডপ্রলয় ঘটে গেছে। শূন্য ঘরখানি যেন প্রলয়কাণ্ডের মৌন সাক্ষী হয়ে রয়েছে এখনও।

ঘরের বাতাসটা যেন কেরোসিনের তেলের উগ্র গন্ধে ভরে আছে। নাক জ্বালা করে। কিরীটী আরও একবার ভাল করে ঘরের চতুষ্পার্শ্বটা দেখে নিল। ভাঙা চেয়ার-টেবিলগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই। কিরীটী অতঃপর ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পাশের ঘরে এসে প্রবেশ করল।

এ ঘরটা অবশ্য আগের চাইতে অনেক ছোট এবং আগের ঘরটার চাইতে এ ঘরটা যেন আরো একটু বেশী অন্ধকার। মুক্ত দরজাপথে সামান্য যে আলো এসে ঘরে প্রবেশ করেছে, তাতে দেখা গেল একটা ভাঙা খাটিয়ার ওপরে

আপাদমস্তক একটা মলিন দুর্গন্ধ চাদর মুড়ি দিয়ে কে একজন পড়ে আছে।

কিরীটীই এগিয়ে এসে চাদরটা টেনে তোলে।

একটা অস্ফুট কাতর শব্দ শোনা গেল।

কিরীটী দেখলে একটা চীনা বুড়ী।

ভাল করে শায়িত বুড়ীটার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই কিরীটী যেন চমকে ওঠে।

চিনতে এতটুকুও কষ্ট হয় না।

বুড়ীটার বোধ হয় সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটছিল, সে তার অসহিষ্ণু ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে পিটপিট করে কিরীটীর দিকে চেয়ে থাকে।

বুড়ীর জীবনে এ ধরনের উৎপাত হয়তো খুব কম দেখা দিয়েছে।

কিরীটী চমকে উঠেছিল বুড়ীটাকে চিনতে পেরেই। এই তো সেই চ্যাপ্টা-মুখ বুড়ী যাকে সে গতরাত্রে দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল।

হঠাৎ বুড়ী কিচির-মিচির করে যেন কি বলতে বলতে উঠে বসল। কিরীটী ওর মুখের দিকে একবার চেয়ে সুব্রতকে বললে, চলুন সুব্রতবাবু, দেখা যাক আর কোন ঘরটর আছে কিনা!

বারান্দাটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা টিনের বেড়া। বেড়ার গায়ে একটা দরজা ; সেই দরজায় একটা দুর্গন্ধ পুরনো চটের পর্দা ঝুলছে।

কিরীটী এগিয়ে এসে হাত দিয়ে পর্দাটি তুলে ধরল। ঘরের ভিতর দেখা গেল তিনটি চীনা মেয়ে। তাদের একজন উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে কি যেন রাঁধছে, একজন একটা ছুরি দিয়ে তরকারি কেটে কেটে একটা ভাঙা সানকিতে রাখছে। অন্যজন একটা ভাঙা মোড়ার উপরে বসে একটা জামা সেলাই করছে। কিরীটীদের এমনি অতর্কিত ভাবে প্রবেশ করতে দেখে তিনজনেই বিস্মিত ও চমকিত হয়ে একই সময়ে যে যার হাতের কাজ ফেলে উঠে দাঁড়াল।

কিরীটী আফসোসের সুরে বললে, না, কোন ফল হল না। চলুন।

কিরীটীর কণ্ঠে রীতিমত একটা হতাশার সুর যেন ফুটে ওঠে।

সকলে আবার দোকান থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তায় নেমে সুব্রত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কিছুই পাওয়া গেল না, এখন কি করবেন ঠিক করলেন, মিঃ রায়?

কনস্টেবল দুজনকে বিদায় দিয়ে কিরীটী অন্যমনস্ক ভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বললে, কালকের জাহাজে আমাদের রওনা হতেই হবে সুব্রত-বাবু। সেভাবেই আমরা যেন প্রস্তুত হই।

সুব্রত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, সেখানে যাওয়ার কি কোন প্রয়োজন আছে, মিঃ রায়? সনৎদাকে যখন ওরা এখানেই রেখেছে, তখন শুধু শুধু অত দূর দৌড়ে কি হবে?

সনৎবাবুকে অক্ষত দেহে ফিরে পেতে হলে আমাদের কালকের জাহাজে যেতেই হবে। কেননা একটু আগেই আপনাদের বলেছি, ওরা কালকের জাহাজেই রওনা হবে।

কিন্তু—

এর মধ্যে আর কোন কিন্তুই নেই সুব্রতবাবু। পাশার দান উল্টে গেছে, এ কথা খুবই সত্যি। কিন্তু আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর পাশার ঘুঁটি আবার নূতন

করে সাজাবার মত বুদ্ধি বা ক্ষমতা বেশ আছে। এবং এবারে তার প্রথম ও প্রধান চেষ্টাই হবে, যাতে গতবারের মত ভুলের জের আর তাকে না টানতে হয়। সে যে একজন দস্তুরমত শয়তান সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধই নেই। সেই সঙ্গে এ কথাটাও যেন আমরা মুহূর্তের জন্য না ভুলি যে, বুদ্ধি তার অসম্ভব রকম তীক্ষ্ম। কাজেই বুদ্ধির কৌশলে তাকে পরাস্ত করতে হলে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের একান্তই প্রয়োজন। বলতে বলতে হঠাৎ চমকে উঠে উৎকণ্ঠা-মিশ্রিত কণ্ঠে কিরীটী বলে উঠল, সরে যান সরে যান!

কিন্তু সরে যাওয়ার আগেই সাইকেল-সমেত একজন আরোহী এসে হুড়-মুড় করে একেবারে সুব্রতর ঘাড়ের ওপর পড়ল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সুব্রত 'উঃ' করে একটা অস্ফুট চিৎকার করে একদিকে ছিটকে পড়ল।

সকলে মিলে ভূপাতিত সুব্রতকে সামলাবার আগেই সাইকেল-আরোহী সাইকেল ফেলে একছুটে সামনের একটা সরু গলিপথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিরীটী এগিয়ে এসে সুব্রতকে তুলতে তুলতে স্নেহ ও উদ্বেগপূর্ণ স্বরে প্রশ্ন করল, লেগেছে কি? কোথায় লাগল?

সুব্রত ডান হাত দিয়ে বাম দিককার কোমরটা চেপে ধরে উঠতে উঠতে কাতর-স্বরে বললে, কোমরে একটু লেগেছে।

ততক্ষণে রাস্তায় কৌতূহলী পথিকদের মধ্যে অনেকেই সেখানে এসে জুটেছে। নানারকম প্রশ্ন ও মন্তব্যে স্থানটি বেশ মুখর হয়ে উঠেছে। ভিড় ও অবান্তর প্রশ্নোত্তর এড়াবার জন্য কিরীটী হাতের ইশারায় একখানা চলন্ত ট্যাক্সি ডাকল এবং সকলে ট্যাক্সিতে উঠে বসে বললে, আমহার্স্ট স্ট্রীট।

ট্যাক্সি ছুটে চলল।

কৌতূহলী হুজুগপ্রিয় পথিকেরা এমন একটা সরল ব্যাপার সহসা বিনা গোলমালে থেমে যেতে বেশ একটু মনঃক্ষুণ্ণ হল এবং অগত্যা যে যার গন্তব্য-পথে চলে গেল।

চলমান ট্যাক্সিতে বসে গম্ভীরভাবে বললে কিরীটী, চারিদিকে চেয়ে পথ চলতে হয় সুব্রতবাবু!

সুব্রত সে কথায় কান দিল না। সে ততক্ষণে বাঁ হাত দিয়ে একটা মোটা পিন্‌সমেত একখানি গোল কার্ড কাপড় থেকে টেনে বের করে হাতের পাতার উপর মেলে দেখছিল। এ সেই রকমের একখানি কার্ড, যেমনটি রাজুর গায়ে পরশু রাতে বিঁধেছিল। তাতে খুব ছোট ছোট অক্ষরে কি যেন লেখা। কার্ড-খানা চোখের কাছে নিয়ে সুব্রত পড়লে—

বন্ধু, কালো ভ্রমরের হুল শুধু হুলই নয়, এতে বিষের জ্বালাও আছে। সেই বিষ একবার শরীরে ঢুকলে আর নামে না। সাবধান!

॥ ১২ ॥

আবার যাত্রা শুরু

পিনটা কালো রংয়ের—দেখতে একটা মোটা বেলের কাঁটার মতই। তার এক দিক সূচের আগার মত তীক্ষ্ম ও ধারালো, অন্য দিকটা ভোঁতা। পিন্‌টা যেখানে বিঁধেছিল, সেখানে হাত বুলোতে বুলোতে সুব্রত কাতর স্বরে বললো,

উঃ, এখনও জ্বালা করছে!

ট্যাক্সিটা তখনও হ্যারিসন রোড ধরে পূর্বদিকে ছুটে চলেছে। ট্যাক্সি-চালক মুখ ফিরিয়ে শুধাল, আমহার্স্ট স্ট্রীট মে কিধার বাবুসাব?

তুমি চল। আমি বলব খন। কিরীটী ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বলল।

হ্যারিসন রোড ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের সংযোগস্থলে এসে কিরীটী ড্রাইভারকে বললে, গাড়ির মোড় ফিরিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে এগিয়ে যেতে।

সুব্রতদের আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে পৌঁছে কিরীটী সেখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করল। তারপর বিকেলের দিকে আবার আসবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাস্তায় গিয়ে নামল।

বেলা প্রায় তখন দেড়টা হবে। আবার যাত্রার উদ্যোগে সুব্রত একটা একটা করে আবশ্যকীয় জিনিসপত্র রাজুর দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, আর রাজু সেগুলো একটা চামড়ার সুটকেসের মধ্যে সাজিয়ে-গুছিয়ে ভরে রাখছে।

একটা বড় তোয়ালে ভাঁজ করে সুটকেসের মধ্যে রাখতে রাখতে একসময় রাজু বললে, কিন্তু তোমরা যতই বল ভাই, মনের মধ্যে থেকে কিছুতেই যেন আমি সাড়া পাচ্ছি না সুব্রত। সনৎদা এখানে পড়ে রইল, আমরা চলেছি রেঙ্গুনের দিকে। এমনি ভাবে বৃথা অন্দুর ছুটে গিয়ে যে কি লাভ হবে, তা মিঃ রায়ই জানেন।

সুব্রতও মন থেকে সায় পাচ্ছিল না। সে বললে, মিঃ রায়ের মত তো শুনলে।

শুনলাম তো, যা ভাল বোঝ কর।

তিনি নিশ্চয়ই ভাল বুঝেই রেঙ্গুনে চলেছেন।

এমন সময় মা এসে ঘরে ঢুকলেন, বললেন, হ্যাঁ রে, তা হলে সত্যিই কাল ভোরের জাহাজেই আবার তোরা সেই মগের মুল্লুকে চললি?

এখন পর্যন্ত তো তাই ঠিক মা, তবে জাহাজে চাপবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বলা যায় না।

কিন্তু সনৎ-এর তো কোন খোঁজখবর মিলল না!

খোঁজ পাওয়া গেছে মা। সনৎদা প্রাণে বেঁচে আছে, এই পর্যন্ত জেনে রাখ।

আহা, বেঁচে আছে তো? ঠিক খবর পেয়েছিস তো?

হ্যাঁ, মা। মিঃ রায় খবর এনেছেন।

আহা, ভগবান তার ভাল করুন। বলতে বলতে মার চোখের কোণ দুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তিনি আবার বললেন, কোথায় তিনি তার দেখা পেলেন?

তা তো জানি নে মা, জিজ্ঞাসা করিনি সে কথা।

তা বাছাকে আমার নিয়ে এল না কেন?

সুব্রত মার কথায় মৃদু হেসে বলল, তারা ছেড়ে দেবে বলে তো আর কত কষ্ট করে চুরি করে নিয়ে যায়নি মা?

তা সে এইখানে পড়ে রইল, আর তোরা চললি রেঙ্গুনে?

ভয় নেই মা, এখানে থেকে তাকে উদ্ধার করা যাবে না, তাই আমরা রেঙ্গুন যাচ্ছি কাল।

হঠাৎ সকলে ঘরের মধ্যে অন্য একজনের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ফিরে তাকায়। দেখলে দরজার কপাটে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে কিরীটী রায়।

রাজু বললে, মিঃ রায়, কতক্ষণ এসেছেন?

কিরীটী ঘরের মধ্যে ঢুকে এগিয়ে আসতে আসতে বললে, আপনাদের সকলেরই মনে একটা সংশয় জেগেছে যে, সনৎবাবু এখানে পড়ে রইলেন, অথচ আমরা বর্মা চলেছি। আমার কথা যদি বিশ্বাস করতে না পারেন, তবে এই-টুকুই এখন শুধু জেনে রাখুন যে, সনৎবাবুকে যেমন করেই হোক ওরা কালকে রেঙ্গুনগামী জাহাজে তুলবেই। আমি আপনাদের আগেও বলেছি, এখনও বলছি কালো ভ্রমর যেমনি শয়তান তার চাইতেও ঢের বেশী তীক্ষ্ণধী। তার ওপর আরও একটা কথা হচ্ছে এই যে, সনৎবাবুকে ওরা প্রাণে মারবে না। তাই সনৎবাবু যেখানেই থাকুন না কেন, আমাদের দুর্ভাবনার আপাততঃ তেমন কিছু নেই। কালো ভ্রমর দুর্ধর্ষ হলেও তার শত্রুর অভাব নেই, এমনি দুনিয়ার নিয়ম। এই দেখুন—বলতে বলতে কিরীটী জামার পকেট থেকে সেই সকালের ১৮নং বাড়িতে পাওয়া সাংকেতিক কাগজখানা বের করে সকলের চোখের সামনে ধরল।

সুব্রত ও রাজু উভয়েই একান্ত কৌতুহলে দেখি দেখি বলে কাগজটার ওপরে ঝুঁকে পড়ল।

কিরীটী আবার বলতে লাগল, সমস্ত জীবনভরে কালো ভ্রমর হয়তো প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করেছে; কিন্তু তা থেকে তার ভোগে একটি পাইপয়সাও বোধ হয় লাগাতে পারেনি। আজ পর্যন্ত যতদিন সে বেঁচে আছে এবং ভবিষ্যতে আরও যতদিন সে বেঁচে থাকবে, সে শুধু সেই সংগৃহীত অর্থ যখের মত আগলেই থাকবে। এ জীবনের অর্থপিপাসা মৃত্যুর পরও হয়তো তাকে এই পৃথিবীর মাটির বুকে টেনে আনবে। যে হাহাকার নিয়ে সে সারাজীবন কাটিয়ে গেল, সেই হাহাকারই থেকে যাবে তার বায়ুভূত দেহে!

কিরীটীর কথাগুলো যেমনি দরদভরা তেমনি সতেজ। সকলেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে কথাগুলো শুনছিল, উত্তরে কেউ একটি কথাও বলতে পারে না।

রাজু বললে, আমি কটা দিনই বা ওদের দলে ছিলাম, কিন্তু যে দলের সর্দার, তার দেখা মাত্র একবারের বেশী দুবার মেলেনি, তাও ছদ্মবেশে মুখোশের অন্তরালে অন্ধকার ঘরে। শুনেছি ওদের দলের কেউ নাকি আজ পর্যন্ত সর্দারকে স্বাভাবিক বেশে একদিনও দেখেনি। সে হরেক রকমের রূপ ধরে সকলের মাঝে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, পাশে থেকেই তার হুকুম চালায় সকলের ওপরে, অথচ তাকে দেখলেও চেনা যায় না। একটা কথা ওদের মুখে আমি বরাবর শুনেছি, সর্দারকে নাকি রাত্রি ছাড়া দিনের আলোয় আজ পর্যন্ত কেউই দেখেনি এবং তাও ছদ্মবেশে। যে মুহূর্তে দিনের আলো নিভে গিয়ে রাতের অন্ধকার চারিদিকে নেমে আসে, ঠিক সেই মুহূর্তে সর্দারও তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। আবার যেমনি পূব আকাশে ভোরের আলো প্রকাশ পায়, সর্দার যে কোন্ ফাঁকে কোথা দিয়ে আপনাকে লুকিয়ে ফেলে, শত চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত কেউ তা ধরতে পারেনি।

*　　*　　*

রাত্রি দশটা হবে।

আকাশ বেশ পরিষ্কার। কালো আকাশের কোলে—দূরে, অনেক দূরে

মেঘপুরীর বাতায়নে যেন তারার প্রদীপ জ্বালিয়েছে। তারই আলো সৃষ্টি করেছে পৃথিবী ও আকাশের মাঝে এক অপূর্ব আলো-ছায়া-ঘেরা পথ। ওপরে একখানা মাদুর পেতে মার পাশে বসে সুব্রত ও রাজু আসন্ন বিদেশযাত্রা সম্বন্ধে নানা গল্প করছে।

সনৎদার বাড়ির সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে, রাজু? সেই ড্রাগন—কালো ভ্রমরের মৃত্যুদূত! একসময় বললে সুব্রত।

রাজু হাসতে হাসতে বললে, মনে নেই আবার? কিন্তু যাই বল, ড্রাগনের সত্যসত্যই ক্ষমতা আছে বলতে হবে। অন্য কোন ক্ষমতা না থাকলেও আকর্ষণী ক্ষমতা যে আছে—সে বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ!

হুঁ, ক্ষমতা আছে বৈকি। কিন্তু একজনের কথা আমার বারবারই মনে হচ্ছে রাজু। সেবার আমাদের বিদেশযাত্রার সময় এমন একজন বন্ধু ছিলেন আমাদের পাশে পাশে সর্বদা, যাঁর সদাসতর্ক স্নেহদৃষ্টি সারাক্ষণ আমাদের নিরাপদে রেখেছিল। তিনি না থাকলে সেই মগের মুল্লুক থেকে ফিরে এসে বাংলার মাটিতে পা দেওয়া হয়ত এ জীবনে আর আমাদের কারোরই ঘটে উঠত কিনা সন্দেহ। আবার সেই বিদেশের পথে চলেছি। সেবারে যেমন অচেনা ছিল, এবারেও ঠিক তাই। সেদিনকার সেই পরম বন্ধুটি আজ আর আমাদের সঙ্গে নেই। এ পৃথিবী হতে তিনি চিরবিদায় নিয়ে গেছেন। আর সত্যি সত্যি কথা বলতে গেলে সেজন্য দায়ী তো আমরাই।...

শেষের দিকে সুব্রতর কণ্ঠস্বর যেন বুজে এল অশ্রুতে।

সত্যি, অমরবাবুর ঋণ আমরা আর এ জীবনে শোধ করার সুযোগ পেলাম না। রাজু বললে।

* * *

তখনও রাতের আকাশ থেকে ভাল করে আঁধারের ঘোর কেটে যায়নি। সবেমাত্র পূর্বদিক লালচে আভায় রঙিন হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

সুব্রতর ঘুমটা ভেঙে গেল রাজুর ডাকে। রাজু ডাকছিল, এই সুব্রত, ওঠ্ ওঠ্। কত রবি জ্বলে রে, কে বা আঁখি মেলে রে! এরপর ব্যায়াম করবিই বা কখন, আর যাবিই বা কখন? জাহাজের সময় তো হয়ে এল।

সুব্রত চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল। পাশের ঘর থেকে স্টোভের গর্জন কানে আসে।

আসন্ন যাত্রার জন্য মা নিশ্চয়ই খাবার তৈরী করছেন।

সুব্রত তাড়াতাড়ি শয্যা ছেড়ে উঠে বাথরুমে গিয়ে মুখটা ধুয়ে ছাদে চলে গেল এবং খোলা বাতাসে বারবেলটা নিয়ে ব্যায়াম করতে শুরু করে দিল। তাড়াতাড়ি ব্যায়াম শেষ করে স্নানটাও সেরে নিল। স্নান শেষ করে জামাকাপড় পরে নীচের ঘরে এসে দেখে, ইতিমধ্যে কিরীটী ওদের বাড়িতে পেঁছে গেছে।

কিরীটীবাবু এসে গেছেন দেখছি!

আগের দিন কথা হয়েছিল যে সকলে মিলে সুব্রতদের বাড়ি থেকে রওনা হবে।

কিরীটী বলে, হ্যাঁ, জাহাজের আর বেশী দেরি নেই, একটু তাড়াতাড়ি করুন।

অদূরে একটা মোড়া পেতে রাজু বসেছিল। সে ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়ে

নিয়েছিল।

মা গরম গরম লুচি ভেজে একটা পাত্রে রাখছিলেন। সকলে মিলে সেগুলোর সৎকার করতে লেগে গেল।

মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সকলে এসে গাড়িতে চেপে জাহাজঘাটে এসে পৌঁছে দেখলে, জাহাজ ছাড়তে তখন আর বেশী দেরি নেই। জাহাজের ঘন ঘন হুইসেল চারিদিক প্রকম্পিত করে তুলছে। যাত্রী এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনে জাহাজঘাটে বেশ ভিড়।

একটা সেকেণ্ড ক্লাস কেবিন রিজার্ভ করা হয়েছিল। সুব্রত, কিরীটী, রাজু ও চাকর জংলী সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে গিয়ে উঠল।

নির্দিষ্ট সময়েই জাহাজ ভোঁ দিতে দিতে জেটি ছেড়ে এগিয়ে চলল।

নবোদিত সূর্যের রঙিন আলোয় গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি যেন গলিত রূপোর মতই ঝকঝক করে জ্বলছে।

গঙ্গাবক্ষ থেকে বয়ে আসছে প্রথম ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া মৃদু মৃদু, যেন স্নেহের স্নিগ্ধ করপ্রলেপ কারও।

নির্মেঘ নীলাকাশ সূর্যালোকে যেন ঝল্‌মল করছে।

বর্ষার গঙ্গার গৈরিক জলরাশি ভেদ করে ধীরে মন্থরগতিতে জাহাজ এগিয়ে চলেছে। গঙ্গার দুপাশে সদ্য ঘুম ভাঙার সাড়া পড়ে গেছে। এদিক-ওদিকে বড় জাহাজ নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট স্টীমলঞ্চগুলো এদিক-ওদিক যাতায়াত করে। ছোট বড় নানা আকারের নৌকো অনেক দেখা যায়। মাঝে মাঝে শোনা যায় জাহাজের ইঞ্জিনঘরের ঘণ্টা।

রাতের রহস্যজনক অন্ধকার কেটে গিয়ে আবার নতুন দিনের যাত্রা হয় শুরু। দিনের শেষে ঘুমের দেশের পথের বাঁকে সাঁঝের আঁধার আবার বিদায় নেয় শেষদিনের আলোর কাছে। রাত্রি আবার ফিরে আসে তার রহস্য নিয়ে।

এই তো নিয়ম।

আকাশের প্রতি গ্রহতারাও এগিয়ে চলেছে অনন্ত যাত্রাপথে। মানুষও তেমনি দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাদের নব নব যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে।

কালো ভ্রমর ওদের ডাক দিয়েছে।

সুব্রত ভাবেঃ কালো ভ্রমর!

কিরীটী ভাবেঃ কালো ভ্রমর!

রাজুও ভাবেঃ কালো ভ্রমর!

ডেকের উপর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে কিরীটী, সুব্রত ও রাজু ক্রমাবলীয়মান কূলের দিকে চেয়ে।

কিরীটী বললে একসময়, মাটি আর জলের মধ্যে যেন একটা স্নেহের বাঁধন আছে সুব্রতবাবু। দেখুন কূলের মাটি যেন বুক পেতে দিয়েছে জলের স্পর্শটুকু পেতে।

জাহাজ কূল ছেড়ে অনেকখানি এগিয়ে চলে। ক্রমে বজবজ উলুবেড়িয়া পশ্চাতে পড়ে গেল।

হঠাৎ একসময় সুব্রত রাজুর দিকে ফিরে বললে, গেলবার নীতীশটা আমাদের সঙ্গে ছিল।

এবারেও নীতীশকে চিঠি দিয়ে নিয়ে এলে হত!

এখন তো সে হোস্টেলে থাকে না, রাধানগরে তার মামার ওখানে থাকে। ওদের রাধানগরের বাসার ঠিকানাও আমার জানা নেই। সুব্রত জবাব দেয়।

॥ ১৩ ॥

ডাঃ সান্যাল

পরের দিন।

সন্ধ্যা হতে তখন আর খুব বেশী দেরি নেই। সাগরের কালো জলে সাঁঝের ধূসর ছায়া ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। মেঘপুরীর বাতায়নে বাতায়নে সবেমাত্র দিগাঙ্গনারা দু-একটি করে তারার প্রদীপ জ্বালিয়ে গেল বুঝি।

বঙ্গোপসাগরের উত্তাল জলরাশির ওপর দিয়ে ঢেউয়ের তালে তালে নেচে চলেছে বিরাট অর্ণবপোত কত যাত্রী বুকে নিয়ে!

সাগরের বুক থেকে কেমন একটা যেন ঠাণ্ডা হাওয়া আসে, শীত-শীত করলেও তা বেশ আরামদায়ক।

ডেকে সেই বিকেল চারটে হতে এতক্ষণ পর্যন্ত অনেক যাত্রীই সাগরের সান্ধ্যশোভা উপভোগ করছিল। সবাই এখন কেবিনে চলে গেছে ; শুধু যায়নি কিরীটী সুব্রত রাজু ও একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

ভদ্রলোকের চেহারা যেমন প্রশান্ত, তেমনি ধীর ও গম্ভীর, দার্শনিকের মত এলোমেলো কাঁচা-পাকা চুল, চোখে একজোড়া সোনার ফ্রেমের চশমা। পরনে একটা ঢোলা জাপানী সিল্কের পায়জামা। গায়ে স্ট্রাইপ-দেওয়া কিমনো। সেলুন ডেকের উপর পাতা একটা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে ভদ্রলোক এতক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা কি মোটা ইংরাজী বই পড়ছিলেন। ডেকের ওপর সমবেত বহু লোকজনের নানা জাতীয় কণ্ঠস্বরে একটিবারের জন্যও তাঁর মনযোগ নষ্ট হয়নি।

সাঁঝের আঁধার গাঢ় হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক হাতের বইখানি মুড়ে সামনের অস্পষ্ট আলো-ছায়া-ঘেরা সাগরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

কিরীটী আপনমনে গুনগুন করে গাইছিল—

বনের ছায়ায়, জল ছল ছল সুরে
হৃদয় আমার, কানায় কানায় পুরে
ক্ষণে ক্ষণে ঐ গুরু-গুরু তালে তালে
গগনে গগনে গভীর মৃদঙ্গ বাজে
আমার দিন ফুরাল!

সহসা কিরীটী চমকে উঠল। ঠিক পাশ থেকে কে যেন বললে, চমৎকার গলাটি তো আপনার! যেমন মিষ্টি, তেমনি দরদভরা। আহা, থামলেন কেন? শেষ করুন না গানটা?

কিরীটী মুখ ফিরিয়ে দেখে—কথা বলছেন সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি, যিনি

এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে বই পড়ছিলেন।

আপত্তি যদি না থাকে, তাহলে শেষ করুন গানটা। ভদ্রলোক পুনরাবৃত্তি করলেন।

কিরীটী মৃদু হাসলেন, তারপর ধীরে ধীরে আবার শুরু করেঃ

কোন দূরের মানুষ এল আজ কাছে
মনের আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে!

সত্যি, কিরীটীর গলাটি ভারী মিষ্টি!

কিরীটী তিন-চারবার সমগ্র গানটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গেয়ে থামল।

ভদ্রলোক বললেন, সত্যি বড় ভাল লাগল আপনার গান। বসেছিলাম ওখানটায়, হঠাৎ গানের সুর কানে যেতেই উঠে এসেছি।

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক যেন কেমন একটু আনমনা হয়ে যান। তারপর আবার ধীরে ধীরে বলে চললেন, সংসারের কোলাহল, জীবনের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি, প্রতিহিংসা, কর্তব্য-অকর্তব্য—সব যেন মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয় এই গানের সুর। গানের সুরে আমি ভুলে যাই আমার নিজেকে।...কেউ বোঝে না, কেউ জানে না, কত দুঃখ আমার সমস্ত বুকখানায় জমাট বেঁধে আছে।

আমি কাঁদতে চাই ; কিন্তু কই, কাঁদতে যে পারি না!...শেষের কথাগুলো যেন অনেকটা স্বগতোক্তির মতই শোনায় এবং শেষদিকে ভদ্রলোকের গলার আওয়াজও ক্রমে যেন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে জড়িয়ে যায়।

সহসা ভদ্রলোক আরও কি বলতে বলতে যেন চমকে উঠে থেমে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর একটুকরা মৃদু হাসিতে মুখখানি ভরিয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না যেন ; আমার কেমন একটা স্বভাব যে কথা বলতে বলতে হঠাৎ এমনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি...আপনারাও বুঝি বর্মাতেই চলেছেন?

হ্যাঁ। সুব্রত ও কিরীটী একসঙ্গেই জবাব দিল।

বেড়াতে? না অন্য কোন কাজে? ভদ্রলোক ফিরে প্রশ্ন করলেন।

না, ঠিক বিশেষ কোন কাজেও নয়—আবার কাজেও বটে। আমাদের এক ছেলেবেলার বন্ধু ওখানে থাকে। অনেকদিন থেকে সে আমাদের তার ওখানে যাওয়ার জন্য লিখছিল, কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। সময়ের অভাব। এখন পরীক্ষা হয়ে গেছে, সামনে লম্বা ছুটি। ভাবলাম বিদেশ বেড়াবার এই তো সুযোগ। তাই রওনা হয়ে পড়া গেল।

বেশ বেশ। পাশ্চাত্ত্য দেশের ছেলেমেয়েরা ছুটির সময় কখনও আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মত দিনদুপুরে পড়ে পড়ে শুধু ঘুমিয়ে অথবা আড্ডা দিয়ে দিনগুলো কাটায় না—দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়।...মন ওদের বহুমুখী। দিবারাত্র অজানা ও অচেনার হাতছানি ওদের দেহ ও মনকে আকুল করে। নিত্য নূতনকে জানবার জন্য ওদের দেহ ও মনে ইচ্ছার অন্ত নেই। ঘরের চাইতে ওরা পথকেই ভালবাসে, তাই তো ওরা ঘরের বাধন ছিঁড়ে সাতসমুদ্র তেরো নদী ডিঙিয়ে দিকে দিকে ছোটে। কখনও আকাশপোতে চেপে সুদূরের পথে পাড়ি জমায়, কখনও বা সাঁতার কেটে দুরন্ত সাগর পার হয়, কিংবা সুউচ্চ পর্বত-শৃঙ্গের উদ্দেশে অভিযান চালায়। ওরা এমনি দুরন্ত, এমনি দুর্বার, এমনি সদা-চঞ্চল। জীবন আর মরণ তো ওদের কাছে ছেলেখেলা। আর আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা দেখুন, সযতনে জীবনীশক্তিকে বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে প্রতি

মুহূর্তে জীবনকে ক্ষয় করে ফেলে। ছোটবেলার কথা আমার এখনও বেশ মনে পড়ে। স্কুলের ছুটি হলেই বাবা আমাকে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। খুব ছোট বয়সেই মাকে হারাই, সংসারে আমরা দুটি ভাই-বোন, বাবাকেই শুধু জানতাম ও চিনতাম। বলতে বলতে ভদ্রলোক আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

আপনিও রেঙ্গুনে চলেছেন বুঝি? সহসা কিরীটী প্রশ্ন করে।

রেঙ্গুনে আমি প্র্যাকটিস করি। আমার নাম সৌরেন্দ্র সান্যাল। সকলে আমায় 'ডাক্তার সান্যাল' বলে ডাকেন। জন্ম হতেই আমি রেঙ্গুনে, বাবার মস্ত বড় ব্যবসা ছিল রেঙ্গুনে।

বাড়িতে আপনার আর কে কে আছেন?

কেউ না। আমি নিজে ও আমাদের এক পুরনো চাকর ভোলা। একটিমাত্র বোন ছিল, আমার চাইতে বয়সে প্রায় দশ বৎসরের বড়, তা তিনিও অনেকদিন হল আমার মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন। আর কোন বন্ধনেরই বালাই নেই—একা। ছোটবেলায় মা মরে যাবার পর দিদিই আমায় বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছিলেন মায়ের মত করে।

আচ্ছা, রেঙ্গুন শহরটা আপনার কেমন লাগে ডাক্তার সান্যাল? প্রশ্ন করল কিরীটী।

জন্ম হতেই ওখানে আছি। দীর্ঘদিনের পরিচয় ঐ শহরের প্রতি ধূলিকণার সঙ্গে, কেমন যেন একটা মায়ার বাঁধন গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে কি কোনও দিন আর ফিরবেন না?

ফিরব নিশ্চয়ই, অন্ততঃ মনে মনে সেই আশাই তো রাখি। চির শস্যশ্যামল, দোয়েল শ্যামার কলকাকলী-মুখরিত আমার বাংলাদেশ। ওরই শীতল মাটির বুকে যেন আমার শেষ শয্যা রচনা করতে পারি—এটাই আমার জীবনের শেষ সাধ। কিন্তু মৃত্যু তো কারও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। যদি বর্মার মাটির কোলেই আমার জীবনের শেষের দিনটি ঘনিয়ে আসে, তবে কি আর করব বলুন?...কিন্তু দেখেছেন, নিজের কথাতে মশগুল হয়ে আছি। আপনাদের পরিচয়টি পর্যন্ত নেবার কথা মনে নেই।

কিরীটী মৃদু হেসে বলল, আমার নাম ধূর্জটি রায়, এর নাম সত্যব্রত সেন, আর ওর নাম জীবেন্দ্রপ্রসাদ রায়। আমরা সকলেই স্টুডেণ্ট।

ইচ্ছা করেই কিরীটী নিজেদের নাম ও পরিচয়ের মধ্যে খানিকটা গোপনতার আশ্রয় নিল।

বেশ বেশ, আপনারা যখন বন্ধুর ডাকে চলেছেন, তখন ওখানে গিয়ে সেই বন্ধুর বাড়িতেই তো উঠবেন। যাবেন আমার ওখানে, ভুলবেন না তো! কমিশনার রোডেই আমার বাড়ি, তাছাড়া যাকে জিজ্ঞেস করবেন, সে-ই ডাঃ সান্যালের বাড়ি দেখিয়ে দেবে। ডাক্তার থামলেন।

নিশ্চয়ই যাব, বিশেষ করে যখন পরিচয় হয়ে গেল। কিরীটী জবাব দেয়।

রাত্রি বোধ করি আটটা হবে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। বিশ্বচরাচরে কালো আঁধার ছড়িয়ে পড়েছে।

জাহাজের সার্চলাইট সমুদ্রের কালো জলে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। মাঝে মাঝে সেই আলো সমুদ্রবক্ষে চারিদিকে ঘোরানো হচ্ছে।

কিছুক্ষণ আগে থেকেই কিরীটী লক্ষ্য করছিল, ডাক্তার সান্যাল কেমন যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন।

সুব্রত প্রশ্ন করলে, আপনার শরীরটা কি অসুস্থ ডাঃ সান্যাল?

ডাক্তার জবাব দিলেন, হ্যাঁ, না—মানে, বছরখানেক থেকে রাত্রির দিকে শরীরের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করি। মানে আমার মনে হয় যেন কারা আমার চারিপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আপন মনে কত কি বলে—আবার সময় সময় আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। তাদের গরম শ্বাস-প্রশ্বাসে আমার সমস্ত শরীর জ্বলতে থাকে। কত চেষ্টা করি তাদের ভুলতে, কিন্তু পারি না।...উঃ, আমি যাই—আমি যাই! বলতে বলতে ডাক্তার সান্যাল অনেকটা মাতালের মতই একরকম টলতে টলতে যেন ডেক থেকে কেবিনের দিকে চলে গেলেন দ্রুত চঞ্চল পদবিক্ষেপে।

সুব্রতরা আশ্চর্য হয়ে ডাক্তারের গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

॥ ১৪ ॥

সলিল সমাধি

গভীর রাত্রি।

সুব্রত আর রাজু অঘোরে ঘুমিয়ে।

অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই ঘুম এল না বলে কিরীটী শয্যা হতে উঠে বসল। স্লিপিং গাউনটা গায়ে চাপিয়ে কেবিনের দরজাটা খুলে সে বেরিয়ে এল এবং আস্তে আস্তে সেলুন ডেকের দিকে চলল।

ডেকের কাছাকাছি আসতেই হাওয়াইন গিটারের একটা মধুর বাজনার শব্দ কানে এল।

কিরীটী ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়াল।

ডেকের ওপর যে আলোটা রয়েছে সেটা খুব শক্তিশালী নয়। সেই ম্রিয়মাণ আলোয় ডেকের ওপর এক অপূর্ব আলো-ছায়ার সমন্বয় হয়েছে।

সেই আলো-ছায়া-ঘেরা ডেকের ওধার থেকেই বাজনার অপূর্ব আওয়াজটা ভেসে আসে।

কিরীটী পায়ে পায়ে ডেকের ওপর এসে দাঁড়াল।

নিশীথের নিঝুম আঁধারে সাগরবক্ষ থেকে অপূর্ব এক গুমগুম শব্দ ভেসে আসে।

মাথার ওপর তারায় ভরা আকাশের ছায়া সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ের মাথায় কেঁপে কেঁপে ওঠে যেন।

বিচিত্র! অপূর্ব!

চারিদিকে ঘুমের ছোঁয়ায় সব বুঝি নিঝুম হয়ে গেছে। সেই অতল মৌনতার মাঝে গিটারে মধুর বাজনা স্বপ্নালোক থেকে যেন ভেসে আসছে বলেই মনে হয়। এ বুঝি কোন ব্যথিতের বুকছরা কান্না নিশীথ রাতের মৌনতার বুকে হাহাকার জাগিয়ে তুলছে।

রেলিংয়ের কোল ঘেঁষে যে চেয়ারখানা রয়েছে, কে যেন তার ওপর বসে

আপন মনে গিটার বাজাচ্ছে।

কিরীটী পায়ে পায়ে চেয়ারের ঠিক পিছনটিতে এগিয়ে এসে দেখে—এ কি, এ যে ডাক্তার সান্যাল?

কিরীটী সবিস্ময়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। শুনতে লাগল বাজনা।

অনেকক্ষণ বাজিয়ে বাজিয়ে ডাক্তার একসময় বাজনাটা কোলের ওপর নামিয়ে রাখলেন।

আর একটু পরে কিরীটী আস্তে আস্তে ডাকলে, ডাক্তার সান্যাল!

কে?—বলে ডাক্তার ফিরে তাকালেন।

ধূর্জটিবাবু! ঘুমোননি?

না। বলে কিরীটী একটু মৃদু হাসল, তারপর বললে, আপনিও তো দেখছি ঘুমোননি!

না। অন্ধকার আমার বড় ভাল লাগে। অন্ধকার রাতে একা একা চুপটি করে বসে থাকলে মনটা যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে। যেন নিজেকে খুঁজে পাই।

আপনার বাজনার হাত বড় চমৎকার। কতক্ষণ থেকে যে আপনার বাজনা শুনছি!

ডাক্তার কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন, কিছু বললেন না।

ডাক্তারের কেবিনটা একেবারে জাহাজের ঐ ধারে। একসময় ডাক্তার বিদায় নিয়ে কেবিনের দিকে চলে গেলেন।

কিরীটী কিন্তু তার পরেও অনেকক্ষণ ডেকের ওপর ঘুরে ঘুরে বেড়াল। রাতের অন্ধকারে সমুদ্রের বুকে ঢেউগুলো ভেঙে ভেঙে গড়িয়ে পড়ছে। ঢেউয়ের বুকে সাদা সাদা ফেনা ফুস্‌ফরাসের আলোয় যেন শুভ্র রজনীগন্ধার স্তবকের মতই মনে হয়। হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে কিরীটী দেখল রাত্রি তখন দেড়টা। আর বেশীক্ষণ জাগলে শরীর খারাপ হবে ভেবে কিরীটী কেবিনের দিকে পা বাড়াল।

কেবিনের দরজার কাছাকাছি আসতেই একটা অস্পষ্ট শিস্‌ শোনা গেল।

কিরীটী থমকে দাঁড়াল।

আবার একটা শিস্‌ শোনা গেল। এবারের শিস্‌টা আগের চাইতেও অনেক স্পষ্ট।

আবার একটা শিস্‌!

পর পর তিনটে শিস্‌ শোনা গেল। কিরীটীর আর কেবিনে ঢোকা হল না। আন্দাজে ভর করে শিসের আওয়াজটা যেদিক হতে আসছে, প্রথমে সেই-দিকেই সে এগিয়ে গেল। তারপর আবার যেন কি ভেবে ফিরে গিয়ে কেবিনে প্রবেশ করে সুটকেস থেকে টর্চটা নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল।

দোতলার ডেকের সিঁড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে কতকগুলো প্যাকিং-করা কাঠের বাক্স স্তূপাকারে সাজানো রয়েছে। তারই ওধার থেকে কাদের যেন তর্কবিতর্কের চাপা স্বর শোনা গেল।

কিরীটী বিস্ময় ও কৌতূহলে প্যাকিং-করা বাক্সগুলোর আড়ালে এগোতে এগোতে কথাগুলো শুনতে পেল—

এখনও বল্‌, সেই নোট-বইটা কি করেছিস? বক্তার কণ্ঠে কঠিন আদেশের

সুর।

জানি না—আমি জানি না। কার যেন কাতরোক্তি শোনা গেল।

হ্যাঁ জানিস। আমার কালো ঢোলা জামাটার পকেটে ছিল। সেদিন রাতে সব ফ্যাক্টরীর মধ্যে জামাটা একটা লোহার গায়ে ঝুলিয়ে রেখে ঘুমিয়েছিলাম, সে কথা তো তুই ছাড়া আর কেউ জানত না।...ভোরবেলা উঠে পকেটে আর নোটবইটা পাইনি। পরের দিন নানা গোলমালে ছিলাম, সেজন্য ওদিকে নজর দিতে পারিনি। তুই ভেবেছিলি খুব আমার চোখে ধুলো দিলি, না?

অন্য পক্ষ বোধ হয় চুপ করে রইল, কোনো জবাব শোনা গেল না।

গর্দভ! তুই আমার চোখে ধুলো দিবি? সেই লোকটা যেন কাউকে আদেশ দিল—এই, বুকে হুল ফোটা!

পরমুহূর্তেই একটা অস্পষ্ট যন্ত্রণা-কাতর শব্দ নিশীথের অন্ধকারে জেগে উঠল।

উঃ, লোকটা কি পিশাচ!

উঃ! থাম্, থাম্, ফোটাসনি, বলছি বলছি।

বল্।

লোকটা বোধ হয় গভীর যন্ত্রণায় হাঁপাতে থাকে।

*   *   *

কিরীটী বাক্সগুলোর গায়ে গায়ে পা দিয়ে উঠতে লাগল। ওপাশের একটা আলোর খানিকটা রশ্মি তির্যকভাবে এদিকে এসে পড়েছে। সেই মৃদু আলোয় কিরীটী দেখলে—সেখানে তিনজন লোক।

একজনের হাত-পা বেঁধে একপাশে ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছে। আর দুজন এক পাশে দাঁড়িয়ে।

হাত-পা-বাঁধা লোকটা বললে, আমার কাছে নোট-বইটা আছে বটে, কিন্তু তার ভিতরে যে একটা ছক আঁকা কাগজ ছিল, সেটা নেই।

কি করেছিস সে কাগজটা?

লোকটা তখন ভয়ে ভয়ে—সেদিন কেমন করে তার হাত থেকে ১৮নং বাড়িতে সেই সাংকেতিক কাগজটা চুরি হয়ে গিয়েছিল, সে-সব কথা একে একে খুলে বললে।

কেন তুই আমার নোট-বুক চুরি করেছিলি?

তুমি কে—আজ ছ বছর তোমার পাশে আছি, তোমার সমস্ত আদেশ নীরবে বিনা বিচরে সর্বদা মাথা পেতে নিয়েছি, পালন করছি, তোমারই আদেশে কতদিন নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে বিনা দ্বিধায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছি, কিন্তু যার জন্য দিবারাত্র এমনি করে জীবন-মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলে চলেছি সে যে কে—আজ পর্যন্ত হাজার চেষ্টাতেও তা জানতে পারিনি। তোমার ধন-সম্পত্তির ওপরে আমার এতটুকুও লোভ নেই, কেননা তুমি তো না চাইতেই যথেষ্ট দাও। আমি জানতে চাই—তুমি কে—তুমি কে? লোকটা বলতে বলতে গভীর উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগল।

যে দুজন দাঁড়িয়েছিল, তাদের একজন চাপা গলায় খিল খিল করে হেসে উঠল, তারপর সহসা গম্ভীর হয়ে বললে, আমি কে? অ্যাঁ! আমি কে?... তোর দুরাকাঙ্ক্ষাই শেষ পর্যন্ত তোর মৃত্যুর কারণ হল। সেই সাংকেতিক ছক আঁকা কাগজটা কে নিয়েছে তাও আমি জানি, সেটা আমি উদ্ধার করবই।

হতভাগা কিরীটী রায় আজও বুঝতে পারেনি যে, হিংস্র কেউটে সাপ নিয়ে সে খেলতে শুরু করেছে!...তোর আগেও দলের আর দুজন আমায় জানবার চেষ্টা করেছিল, শেষ পর্যন্ত তাদের সে ইচ্ছা বুকে নিয়েই মৃত্যুকে বরণ করতে হয়েছে।

তারপর সহসা সে পাশে দাঁড়ানো লোকটার দিকে ফিরে কঠিন নির্মম আদেশের সুরে বললে, ফেলে দে হতভাগাটাকে এখনই সমুদ্রের জলে! জলের অন্ধকারে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যখন ও তিল তিল করে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাবে, হতভাগা তখন জানতে পারবে, কে আমি! কি আমার পরিচয়!

না না, আমায় এমনি করে জলের মধ্যে ডুবিয়ে মেরো না। এবারের মত আমায় ক্ষমা কর, প্রতিজ্ঞা করছি, এ জীবনে আর তোমার পরিচয় জানবার চেষ্টা করব না।

আবার সেই নিষ্ঠুর হাসি।

হিংস্র হাঙরে যখন তোর দেহ ধারালো দাঁতে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে, তখন জানবি আমি কে!

ক্ষমা কর আমায়! ক্ষমা কর!

ফেলে দে! দে!

পাশে দণ্ডায়মান লোকটি বিনা বাক্যব্যয়ে নীচু হয়ে লোকটাকে অবলীলাক্রমে তুলে উঁচু করে তখনই রেলিং টপকে নীচের গর্জমান অতল পারাপারহীন সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করল।

একটা বুক-ভাঙা আকুল চিৎকার নিশীথ রাত্রির গভীর স্তব্ধতাকে মুহূর্তের জন্য যেন আলোড়িত করে তোলে। ঝপাং করে একটা শব্দ শোনা যায় মাত্র।

সমগ্র ব্যাপারটা এত চকিত ও এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল যে, কিরীটী বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। একটা টু শব্দ পর্যন্ত তার মুখ ফুটে বের হল না। স্থাণুর মতই কিরীটী প্যাকিং বাক্সটার ওপরে দাঁড়িয়ে রইল। পা দুটো যেন পাথরের মত ভারী ও অনড় হয়ে গেছে।

কেউ জানলে না, কেউ শুনলে না, রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারে একজনের জীবন্ত সলিল সমাধি হয়ে গেল। সাগরের কালো জলের তলে চিরনিদ্রায় সে অভিভূত হল। কিরীটীর যেন দম আটকে আসে।...

হতভাগা ভেবেছিল, আমার চোখে ধুলো দেবে। কিন্তু কি করব, এ ছাড়া উপায় ছিল না। বলতে বলতে লোকটার কণ্ঠস্বর কেমন যেন জড়িয়ে আসে। তারপর যেন কতকটা জোর করেই আপনাকে সামলে নিয়ে দ্বিতীয় লোকটির দিকে ফিরে বললে, ওই লোকটাকে বরাবর 'মৃত্যুগুহা'য় নিয়ে যাবে। জাহাজে আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। বলেই লোকটা ফিরে দাঁড়াল।

ফিরে দাঁড়াতেই সামনের একটা আলোর খানিকটা বাঁকা হয়ে এসে তার মুখের উপর পড়ল।

কিরীটী বিস্ময়ে আতঙ্কে চমকে উঠল। অন্ধকারে চলতে চলতে সামনে বিকটাকার ভূত দেখলেও বুঝি মানুষ এতটা চমকে ওঠে না।

॥ ১৫ ॥

নিশাচর ভূত

চিনতে কষ্ট হয় না কিরীটীর ঐ মুহূর্তের দেখাতেই। লোকটা আর কেউ নয়, সেই চীনা আড্ডায় দেখা ভীষণ-দর্শন লোকটিই এই পৈশাচিক অনুষ্ঠানের হোতা।

কিরীটী ভাবলে, তবে আমার হিসাব ভুল হয়নি। দলের নেতা ইনিই! স্বনামধন্য দস্যুরাজ 'কালো ভ্রমর'! হ্যাঁ, লোকটার শক্তি আছে বটে। তাহলে দস্যুরাজ আমাদেরই সহযাত্রী!

প্যাকিং-করা বাক্সগুলোর আড়ালে কিরীটী স্তম্ভিত ভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তা নিজেই বুঝতে পারেনি। যখন খেয়াল হল তখন সে আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে এল।

রাতও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। চোখ দুটো জ্বালা করছে। বেশ ঘুমও পেয়েছে।

কিরীটী ধীরে ধীরে এসে কেবিনে প্রবেশ করল এবং দরজাটা বন্ধ করে শয্যার ওপরে এসে গা এলিয়ে দিল। সাগরের দোলায় দোলায় অল্পক্ষণের মধ্যেই কিরীটী ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

পরের দিন যখন কিরীটীর ঘুম ভাঙল, বেলা তখন প্রায় সাড়ে আটটা হবে, প্রভাতী চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

সুব্রত ও রাজু তখন কেবিনে ছিল না—সম্ভবত ডেকে বেড়াতে গেছে।

একটু পরেই জংলী কেবিনে ঢুকে বলল, চা বোধ হয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বাবুজি!

হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। আমি একেবারে স্নানটা সেরে আসি। বলে কিরীটী তোয়ালে ও একটা ঢোলা পায়জামা নিয়ে স্নানঘরের দিকে পা বাড়াল।

স্নান সমাপ্ত করে আসতে আসতেই ব্রেকফাস্টের ঘণ্টা শোনা গেল। ব্রেকফাস্ট সেরে আবার ওরা সকলে যখন ডেকের ওপর এল, তখন একে একে অনেক যাত্রীই ডেকের ওপর এসে জড় হতে শুরু করেছে।

একটি বছর সাতেকের মেয়ে ডেকের ওপর স্কিপিং করছিল।

ডাঃ সান্যালও ডেকেই ছিলেন। সুব্রত ও রাজু ডাঃ সান্যালের দিকে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে কিরীটী যখন ওদের দলে এসে মিশল, ডাঃ সান্যাল, সুব্রত ও রাজু তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। কিরীটী ওদের একপাশে এসে দাঁড়াল।

সুপ্রভাত! কিরীটী জবাব দিল।

একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে একটু মৃদু হেসে ডাক্তার বললেন, কাল বুঝি রাতটুকু আপনার না ঘুমিয়েই কেটে গেছে, মিঃ রায়?

কিরীটী আনমনা ভাবে জবাব দিল, না, বেশ ঘুম হয়েছিল তো!

আর বিশেষ কোন কথাবার্তা হল না।

সবাই একমনে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল।

চারিদিকে কেবল জল। জল আর জল। নীল জলরাশি গভীর উচ্ছ্বাসে ঢেউয়ের তালে তালে নেচে ফিরছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন অস্ফুট স্বরে কি সব বলাবলি করছ।

সুনীল আকাশ রূপালী রোদের আভায় ঝিলমিল করছে।

* * *

সন্ধ্যায় ডাঃ সান্যালের কেবিনে সুব্রত, রাজু ও কিরীটী চা-পান করতে করতে ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করছিল। কেবিনের মধ্যে স্টোভে চা তৈরী হয়েছে।

ডাক্তার বলছিলেন, বিশ্বাস জিনিসটা মানুষের মনের সহজ প্রবৃত্তি। যুক্তি দিয়ে তাকে খাড়া করা যায় না। এই দেখুন না, আমি সকলকেই বিশ্বাস করি, আবার কাউকেই বিশ্বাস করি না। এক-এক সময় আমাদের এক-একটা ব্যাপারে বিশ্বাস না করা ছাড়া আর উপায়ই থাকে না। মন না মানলেও আমরা তাকে মেনে নিতে বাধ্য হই। তেমনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দুরকমের প্রবৃত্তি ঘুমিয়ে থাকে। অতি বড় শয়তান যে, তার বুকেও ভাল প্রবৃত্তি আছে। আবার সত্যসত্যই যে অতি নিরীহ ও একান্ত ধীরস্থির, তারও বুকে হয়তো শয়তান-প্রবৃত্তি ঘুমিয়ে থাকে। গাছের গোড়ায় জল ঢালতে ঢালতে যেমন সেটা ক্রমশঃ বড় হতে হতে শেষটায় শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, আমাদের মনের ভিতরেও যে প্রবৃত্তিটা নিয়ে আমরা বেশী নাড়াচাড়া করি—যেটাকে আমরা বেশী প্রশ্রয় দিই, সেইটাই শেষ পর্যন্ত আমাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। যে চোর, যে ডাকাত, তার অন্তরেও হয়তো একটা নিরীহ প্রবৃত্তি ঘুমিয়ে আছে।

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, কিন্তু দুষ্কর্ম করতে করতে দুর্জনের এমন একটা স্বভাব হয়ে দাঁড়ায় যে, কিছুতেই সে আর ভাল পথে চলতে চায় না। পেঁচা যেমন আলো পরিহার করে চলে, দুর্জনেরাও তেমনি ভাল যা কিছু তা এড়িয়ে চলে।

আগের দিন সন্ধ্যার মত সেদিনও ডাঃ সান্যাল ক্রমশ যেন কেমন একটু চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন। সেটা লক্ষ্য করে সুব্রত শুধাল, আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে, ডাঃ সান্যাল?

ডাক্তার কেমন একপ্রকার অন্যমনস্কের মত যেন জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, সন্ধ্যার দিকে 'মরফিয়া' ইনজেক্‌শন নেওয়া আমার একটা বদ অভ্যাস, আপনারা যদি কিছু মনে না করেন তবে..., বলে ডাক্তার উঠে গিয়ে সুটকেস থেকে সিরিঞ্জ বের করে ইনজেক্‌শন নেবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

সিরিঞ্জের মধ্যে ঔষধ ভরে ডান হাতটা বৈদ্যুতিক আলোর কাছে তুলে ধরে তিনি ঔষধটা শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

সিরিঞ্জটা যথাস্থানে রেখে ডাক্তার যেন অনেকটা হৃষ্টচিত্তেই নিজের আসনে এসে উপবেশন করলেন।

ডাক্তারের সেই অস্থির-অস্থির ভাবটা ক্রমশঃ ঠিক হয়ে পূর্বের প্রফুল্লতা ধীরে ধীরে ফিরে আসতে লাগল।

এই দেখুন। বলতে বলতে ডাক্তার বাঁ হাতের আস্তিনটা গুটিয়ে সেটা

আলোর নীচে সকলের চোখের সামনে প্রসারিত করে ধরলেন—হাতে অসংখ্য কালো কালো দাগ। একটু পরে তিনি আবার বলতে লাগলেন, দেখুন, মরফিয়া নিয়ে নিয়ে হাতটা একেবারে ভরে গেছে। কিন্তু কি করব বলুন, শরীরের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করি সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, আর সেই যন্ত্রণায় আমার সমগ্র শরীরটা যেন বিষের মত জ্বলতে থাকে। তাই মরফিয়া নিতে হয়।

সুব্রত প্রশ্ন করল, আচ্ছা এতে কি শরীরের কোন ক্ষতি হয় না, ডাঃ সান্যাল ?

ডাক্তার হেসে বললেন, ক্ষতি হয় বৈকি। আমাদের মস্তিষ্কে যন্ত্রণাবোধের যে স্নায়ুকেন্দ্র আছে, সেখানকার স্নায়ুকোষে 'যন্ত্রণা-বোধ-বাহী স্নায়ু যন্ত্রণা-বোধকে বহন করে নিয়ে যায় এবং তাতেই আমরা দেহের কোন না কোন স্থানে যন্ত্রণা হচ্ছে বুঝতে পারি। এ মরফিয়া সেই যন্ত্রণা-বোধ-বাহী স্নায়ুকে অবশ করে দেয়। তার ফলে যন্ত্রণা-বোধ-স্নায়ু দিয়ে যন্ত্রণাটা প্রবাহিত হয়ে মস্তিষ্কে আর উপস্থিত হতে পারে না বলেই যন্ত্রণার উপশম হয়।

কিন্তু এইভাবে মরফিয়া নেওয়াটা কি একটা নেশা নয় ?

ডাক্তার একটু হাসলেন, তারপর বললেন, নিশ্চয়ই নেশা বৈকি ! নেশা...বদ অভ্যাস। বুঝতে কি আমি পারি না, পারি বুঝতে পারি সব, কেননা আমি একজন ডাক্তার। তবু নিজেকে সংযত করতে পারি না। কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমার সমস্ত দেহমনকে অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সিরিঞ্জ ও মরফিয়ার দিকে ঠেলতে থাকে। আমি পারি না, কিছুতেই নিজেকে রোধ করে রাখতে পারি না।

ডাক্তারের মুখে একটা করুণ অসহায় ভাব ফুটে ওঠে।

রাত্রি বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর দেহ ও মন কি জানি কেন সেই প্যাকিং-করা বাক্সগুলোর দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। আকর্ষণটা কিছুতেই রোধ করতে পারে না কিরীটী, তাই গায়ে একটা ধূসর বর্ণের নিদ্রাবস্ত্র চাপিয়ে, মাথায় একটা নাইট-ক্যাপ এঁটে সেটাকে টেনে একেবারে কপালের নীচ পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে, কিরীটী কেবিন থেকে বেরিয়ে পড়ল। রেডিয়াম দেওয়া হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, রাত্রি তখন দেড়টা।

অতি সন্তর্পণে নীচে দোতলায় ডেকের দিকে চলল কিরীটী।

প্যাকিং-করা বাক্সগুলো যেখানে একটার ওপর একটা সাজানো আছে, তার আড়ালে এসে কিরীটী থমকে দাঁড়াল। আর ঠিক ঐ সময়ে কতকগুলো ফিস ফিস আওয়াজ তার কানে এল। মনে হল, দুজন লোক যেন নিম্নকণ্ঠে কথা-বার্তা বলছেঃ

কেউ কিছু টের পেয়েছে ?

না।

ঠিক জান ?

হ্যাঁ।

এই ঔষধটা আজও আবার শেষরাত্রে লোকটার শরীরে ইনজেকশন্ করে দেবে। আর যেমন বলে রেখেছি ঠিক তেমনি ব্যবস্থা করবে। কোন গণ্ডগোল হবে না ; ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সে বাধা দেবে না।

এর পরে আর কোন কথা শোনা গেল না। লোক দুটো তখন চলে গেছে

বোধ হয়। মাঝে মাঝে শুধু সাগরের একটানা গর্জন আঁধারের বুকে ভেসে আসে।

তারপর সহসা একসময় একটা অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ শুনে কিরীটী চমকে উঠল। ঐ পাশে সিঁড়ির নিচেটা যেখানে এসে শেষ হয়েছে, সেদিক থেকে আওয়াজটা আসছে বলে মনে হল। কিরীটী দ্রুতপদে এগিয়ে গেল।

সিঁড়ির নীচে সে জায়গাটায় তত আলো নেই। সিঁড়ির গায়ে যে বৈদ্যুতিক আলোটা জ্বলছে, তার ক্ষমতাও খুব বেশী নয়। সেই অস্পষ্ট আলোতে দেখা গেল সিঁড়ির নীচে একটা লোক পড়ে গোঁ গোঁ করছে।

কিরীটী লোকটার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখল, লোকটা কোন কারণে অজ্ঞান হয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ির ধারে যে কলিং বেল ছিল, সেটা টিপে দিলে।

দেখতে দেখতে জাহাজের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হতে আরম্ভ করে খালাসীরা পর্যন্ত অনেকেই এসে হাজির হল।

সকলের মুখেই শঙ্কিত ভাব।

একজন খালাসী ক্যাপ্টেনের আদেশে লোকটির চোখ-মুখে জল দিতে শুরু করলে। জাহাজের ডাক্তার খবর পেয়ে ছুটে এলেন এবং নাড়ি দেখে বললেন, ও কিছু নয়, কোন কারণে হয়তো অজ্ঞান হয়ে গেছে।

লোকটি অল্পক্ষণ পরেই জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসল। চোখ-মুখে তার তখনও একটা ভয়ার্ত ভাব। চারিদিক চকিত দৃষ্টিতে দেখে লোকটা অস্ফুট স্বরে কেবল বললে, ভূত ভূত!

জাহাজের মেট শুধায়, ভূত! কি বলছিস রে?

হ্যাঁ কর্তা, ভূত! আমি দেখেছি, স্বচক্ষে দেখেছি। এই দেখুন আমার গলা টিপে ধরেছিল। উঃ, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে!—বলে লোকটি আবার হাঁপাতে লাগল।

লোকটার কথা শুনেই সকলে যেন একটু ভয় পেয়ে গেছে। বুড়োগোছের একজন খালাসী এগিয়ে এসে বলল, আমিও কাল রাত্রে এমনি সময় ওই বাক্স-গুলোর পিছনে কি একটা দেখেছিলাম। উঃ, কী ভীষণ মুখ তার! এই পর্যন্ত বলেই বুড়ো ভয়ে চোখ বুজল।

সমবেত সমস্ত লোকের মনেই কেমন একটা অস্পষ্ট আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। সকলেই একটা শঙ্কিত চাউনি নিয়ে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। ক্যাপ্টেনের মুখটাও গম্ভীর হয়ে গেল।

রাত্রি আর বেশী নেই। একটি দুটি করে আকাশের তারাগুলো নিভতে শুরু করেছে।

॥ ১৬ ॥

আবার মগের মুল্লুকে

রেঙ্গুন শহর।

জাহাজ তখনও জেটিতে লাগেনি।

সুব্রত, কিরীটী, রাজু ও ডাঃ সান্যাল জাহাজের রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে

জেটির দিকে তাকিয়ে আছে।

লোকজন, কুলী, কর্মচারী প্রভৃতির সমাগমে স্থানটি একেবারে সরগরম।

প্রভাতী সূর্যের সোনালি আলো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। জাহাজে বসে রেঙ্গুন নদীর পারে ভাসমান অবস্থায় শহরটিকে যেন একটি ছবির মতই দেখায়।

ডাক্তার বলছিলেন, কাল দুপুরে আমার ওখানে আপনাদের মাধ্যাহ্নিক নিমন্ত্রণ রইল। এই নিন আমার কার্ড। বলতে বলতে ডাক্তার কোটের পকেট থেকে একটা ছোট কার্ড বের করে সুব্রতর হাতে দিলেন। তাতে লেখা আছেঃ

ডাঃ এস্ সান্যাল
এম. বি. এম. সি. পি (লণ্ডন)
৩০, কমিশনার রোড, রেঙ্গুন।

সুব্রত কার্ডটা পকেটে রেখে দিল।

জাহাজ ততক্ষণে জেটিতে লেগেছে। ক্রমে যাত্রী একে একে নামতে শুরু করে।

কিরীটীর পরামর্শমত ঠিক হয়েছিল সর্বশেষে ওরা নামবে। তাড়াতাড়ি কিছু নেই।

সুব্রত আনমনে রেলিংয়ে ভর দিয়ে যাত্রীদের অবতরণ দেখছিল।

একটা স্ট্রেচারে করে বোধ হয় একজন রোগীকে নামানো হচ্ছিল। দুটো খালাসী স্ট্রেচারটা ধরে নামাচ্ছিল। স্ট্রেচারে শায়িত ব্যক্তির কপাল পর্যন্ত কাপড়ে ঢাকা।

সহসা একজন যাত্রীর হাত লেগে লোকটার মুখের কাপড় সরে যেতেই সুব্রত চমকে উঠল, সেদিকে হাত বাড়িয়ে কি বলতে যেতেই তার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল যেন, কে? কে?

কিরীটীর চোখেও সে দৃশ্য এড়ায়নি। কিন্তু ততক্ষণে আর একটা লোক, যে স্ট্রেচারের সংগে সংগে চলছিল, ক্ষিপ্রহাতে মুখের কাপড়টা আবার টেনে দিয়েছে স্ট্রেচারে শায়িত লোকটার।

সহসা সুব্রত অদৃশ্যে নিজের হাতের ওপরে একটা চাপ অনুভব করে পাশের দিকে তাকাতেই কিরীটীর সংগে চোখাচোখি হয়ে যায়। কিরীটীর চোখে অদৃশ্য কিসের যেন সংকেত।

সুব্রত নিজেকে সামলে নেয় মুহূর্তে।

কিরীটীর মুখে কোন কিছু চিন্তার ছায়া পর্যন্ত যেন নেই, একান্ত নির্বিকার সে মুখ।

পাশেই দণ্ডায়মান ডাক্তারও সুব্রতর সেই অস্ফুট শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, কি হল মিঃ রায়?

কিরীটী ততক্ষণে নীচে নামবার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেছে। রাজু কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়নি, তাই সে হঠাৎ বলে ওঠে, সনৎদা!

সনৎদা? ডাক্তার প্রশ্ন করেন।

কিন্তু ততক্ষণে রাজু সুব্রতর চোখের দিকে দৃষ্টি পড়ায়, নিজেকে সামলে নিয়ে একটু মৃদু হেসে বললে, না কিছু না, আমাদের একজন চেনা লোককে যেন জেটিতে দেখলাম।

চেনা লোক! ডাক্তার বিস্মিত ভাবে তাকান।

হ্যাঁ। মানে, খবর পেয়েছিলাম, তিনি যেন, এই—

তিনি যেন কি? ক্ষমা করুন, যদি বিশেষ কোন গোপনীয় কিছু থাকে, তবে অবিশ্যি আমি শুনতে চাই না।

সুব্রত হেসে বললে, না, এমন বিশেষ কিছু গোপনীয় নয়, আচ্ছা বলব'খন আপনাকে। চলুন এবারে নামা যাক।

জাহাজ-ঘাটের বাইরে কিরীটী একটা লাইট-পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফিরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল।

সুব্রত এসে পিছনে দাঁড়িয়ে ডাকল, মিঃ রায়!

দেরি হয়ে গেছে। পেলাম না সুব্রতবাবু।

পেলেন না?

না, চলুন।

ডাক্তারের প্রকাণ্ড কালো রংয়ের সুদৃশ্য হাম্বার গাড়িটা তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

ডাক্তার সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে চেপে বসলেন। গাড়ি ছেড়ে দিল।

একটা গাড়িতে সমস্ত মালপত্র চাপিয়ে ওরা চালককে মিঃ চৌধুরীর বাড়ির ঠিকানা বলে দিয়ে গাড়িতে চেপে বসল।

চলমান গাড়ির মধ্যে বসে একসময় সুব্রত বলে, ডাক্তার সান্যাল চমৎকার লোক, কি বলেন মিঃ রায়?

কিরীটী চলন্ত গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে রাস্তার দু'পাশের নানা-জাতীয় অগণিত লোকজনের দিকে খরদৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

সুব্রতর কথায় চমকে উঠে বললে, অ্যাঁ! কিছু বলছিলেন সুব্রতবাবু?

কি ভাবছেন মিঃ রায়?

না, কিছু না।

একসময় গাড়ি ডাঃ চৌধুরীর বাড়ির সামনে এসে থামল। চৌধুরীর পুরনো চাকর দাশু দরজার গোড়াতে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল, কারণ তাকে আগেই তার করা হয়েছিল।

ওদের সকলকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে ব্যাকুল কণ্ঠে দাশু প্রশ্ন করে, আমার দাদাবাবু—সনৎবাবু আসেননি বাবু?

সুব্রত আমতা আমতা করে বললে, না দাশু, সনৎবাবু আসেননি তো এ জাহাজে, পরের জাহাজে আসছেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর কিরীটী একসময় বললে, আজকের দিনটা একেবারে পূর্ণ বিশ্রাম। পাদমেকং ন গচ্ছামি।

কথা শেষ করেই সে কলহাস্যে গান ধরল...

আজ আমাদের ছুটি রে ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।

সুব্রত কিরীটীর হঠাৎ হাসিখুশীর কারণ বুঝতে পারল না, তবু হাসতে হাসতে বললে, ছুটি নয়, বরং এই তো সবে শুরু!

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, না। তারপরই আবার আগের মত গান গেয়ে চলল।

গান থামিয়ে কিরীটী আবার একসময় বললে, এখন একটা লম্বা ঘুম,

তারপর জাগরণ। চা-পান ও জলখাবার ভক্ষণ, মোটরে চেপে রেঙ্গুন শহরটা ভ্রমণ, প্রত্যাগমন, স্নান-আহার, অতঃপর সারাটি রজনী ঘুম—এই হল আমার কর্মতালিকা অদ্য।

কিরীটী যেন দুবছরের শিশু। আনন্দে আর কলহাস্যে সে যেন মশগুল হয়ে উঠেছে।

সুব্রত হাসতে হাসতে বলে, ব্যাপার কি বলুন তো মিঃ রায়?

ব্যাপার কিম্ভিতমাত!

বলেন কি?—রাজু ও সুব্রত ব্যাকুল হয়ে উঠল।

কিরীটী ডান হাতের একটা আঙুল ওষ্ঠের উপর রেখে গম্ভীর ভাবে মাথাটা দোলাতে দোলাতে বললে, চুপ করুন, চুপ করুন। সর্বদা মনে রাখবেন এটা কলকাতা শহর নয়, এটা কালো ভ্রমরের নিজের এলাকা। কিন্তু দেখলেন তো শেষ পর্যন্ত, আমার অনুমান মিথ্যা হয়নি! সনৎবাবুকে ওরা নিয়ে এল। যাক, তাঁর পক্ষে এ একপ্রকার ভালই হল, কি বলেন? বিনা খরচায় সাগর-যাত্রাটা হয়ে গেল তাঁর।

কিন্তু তার উদ্ধারের কি করা যায়?

মা ভৈ ...হবে হবে, সব হবে। জানেন তো সবুরে মেওয়া ফলে!

কিরীটী মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

॥ ১৭ ॥

কিরীটীর যুক্তি

সমস্ত দ্বিপ্রহর একটা টানা দিবানিদ্রা দিয়ে সকলেই যেন শরীরটা বেশ সুস্থ বোধ করে।

কয়েক দিন ধরে জাহাজে অবিশ্রাম ঢেউয়ের দোলায়, মনে হয় এখনও যেন দেহটা দুলছে।

বৈকালিক চা-পানের পর রাজু শহর দেখতে বের হয়েছিল, কিরীটী আর সুব্রত দোতলার ব্যালকনিতে পাশাপাশি দুখানা চেয়ার পেতে বসে গল্প করছিল।

সুব্রত বলছিল, যদিও আমি মুহূর্তের জন্য স্ট্রেচারে শায়িত সনৎদাকে দেখেছি, তবু—

কিরীটী বাধা দেয়, যদিও বলছেন কেন এখনও? আপনার মনে কি কোন সন্দেহ আছে সুব্রতবাবু? আপনি আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন তা হলে জানবেন, সকালবেলার সেই স্ট্রেচারে শায়িত ব্যক্তি আর কেউ নন, আমাদের সনৎবাবুই।

কিন্তু কেন যে আপনি ভাবছেন কালো ভ্রমর সনৎদাকে প্রাণে মারবে না, এটা আমি ঠিক যেন এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।

প্রাণে যে মারবেই না বা প্রাণে মারা একেবারেই অসম্ভব, সে কথা তো আমি বলিনি সুব্রতবাবু। আপনারা আমার কথার ঠিক অর্থ ধরতে পারেননি। আমি বলতে চেয়েছি, বর্তমানে তারা সনৎবাবুর প্রাণহানি করবে না, করতে

পারে না।

কেন?

আচ্ছা আপনার প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই সুব্রতবাবু!

বলুন?

আচ্ছা আপনার অমরবাবুর মৃত্যু সম্পর্কে কি ধারণা? আপনি কি মনে করেন সত্যিই কোন আততায়ীর হাতেই অমরবাবুর মৃত্যু ঘটেছে?

না।

না কেন?

কারণ তাই যদি হবে, তা হলে অন্ততঃ কালো ভ্রমর নিশ্চয়ই মৃতদেহের মুখটা ওভাবে বিকৃত করে রেখে যেত না।

তা হলে আপনি ধরেই নিচ্ছেন যে, এই হত্যা-ব্যাপারের সংগে কালো ভ্রমর সুনিশ্চিত ভাবেই জড়িত আছে?

হ্যাঁ।

ঠিক তাই সুব্রতবাবু। সেইজন্যই সনৎবাবুকে বর্তমানে কালো ভ্রমর প্রাণে মারতে পারে না। কালো ভ্রমরের বিশ্বেষ শুধু সনৎবাবুর ওপরেই নয়, আপনার ওপরে অমরবাবুর ওপরেও। তবে সেই সংগে আরও একটা কথা আমার মনে হচ্ছে, সনৎবাবুর ওপরে কালো ভ্রমরের রাগ বা বিশ্বেষ থাকাটা স্বাভাবিক এবং তার কারণও আমাদের চোখের সামনে আছে। কিন্তু আপনার ওপরে তার বিশ্বেষের কারণ যে কেবলমাত্র গতবারের লজ্জাকর পরাজয়ের ব্যাপারটাই, এটা মানতে যেন কিছুতেই আমার মন চায় না সুব্রতবাবু!

কেন? এ কথা বলছেন কেন কিরীটীবাবু?

তাই যদি বুঝতে পারতাম, তা হলে কালো ভ্রমরের এবারের অভিযানের অর্থটাও আমার নিকট পরিষ্কার হয়ে যেত। এই ঘটনা ঘটবার কিছুদিন আগে থেকেই কালো ভ্রমর সম্পর্কে আমি যথাসাধ্য খোঁজ নিয়েছি। একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, কালো ভ্রমর আর যাই হোক ছিঁচকে চোর-ডাকাত নয়। কারণ বিশেষ করে তাহলে ধনিক সম্প্রদায়ের প্রতিই তার যত কিছু বিশ্বেষ, যত বিতৃষ্ণা থাকত না এবং বিশেষ বিশেষ কতকগুলি কুকীর্তি ছাড়া সাধারণ আরও পাঁচটা দুর্ধর্ষ ডাকাত বা চোরের মতই হাংগামা, ডাকাতি ও খুন-খারাপি করে করে বেড়াত।

কিরীটীর শেষের কথায় কান না দিয়েই সুব্রত বলে, কিন্তু একটা কথা এখনও আমি বুঝে উঠতে পারছি না কিরীটীবাবু, এই এত বড় রেংগুন শহরে কোন্ পথে আপনি সনৎদার সন্ধান করবেন?

সুব্রতর কথায় কিরীটী মৃদু হেসে বলে, তার জন্যও চিন্তা নেই সুব্রত বাবু। কালো ভ্রমরকে আমাদের গৃহেই আসতে হবে।

এ আপনি কি বলছেন?

ঠিকই বলছি, এমন একটি বহুমূল্য সম্পদ হতে সে বঞ্চিত হয়েছে এবং বর্তমানে যা সম্পূর্ণ আমার অধিকারে, তারই আকর্ষণে সে আসবে। হ্যাঁ, কালো ভ্রমর আসবে। আসতে তাকে হবেই।

কিরীটীর কথাগুলো সুব্রতর নিকট যেন কেমন রহস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। যেন পূর্ণ হেঁয়ালি।

আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারলাম না কিরীটীবাবু।

ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই সুব্রতবাবু। সময় এলেই সব বুঝতে পারবেন।

এমন সময় সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। কিরীটী যেন হঠাৎ উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, ঐ রাজেনবাবু আসছেন, আর তাঁর সঙ্গে বোধ হয় সলিলবাবুও আসছেন—যদি আমার অনুমান মিথ্যা না হয়ে থাকে।

সত্যিই কিরীটীর কথা শেষ না হতে হতেই প্রথমে রাজু এবং তার পশ্চাতে সলিলবাবু এসে ব্যালকনিতে প্রবেশ করলেন।

আসুন মিঃ সেন। কিরীটী আহ্বান জানায়, আপনাকে ডাকতে রাজেনবাবুকে পাঠিয়েছিলাম বটে, তবে ভাবিনি এখনই আপনি আসবেন।

জানেন তো বিদেশে স্বজাতি—, সলিলবাবু হাসতে হাসতে চেয়ারে উপবেশন করলেন। তারপর প্রাথমিক পরিচয়-পর্ব শেষ করে সলিলবাবু বললেন, রাজেনবাবুর মুখেই সব শুনলাম মিঃ রায়।

এখন আপনি আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা মিঃ সেন, কিরীটী বলে, আচ্ছা অমরবাবুর মৃত্যু সম্পর্কে আপনার মতামত কি জানতে পারি কি?

নৃশংস হত্যা সন্দেহ নেই। বরং এ যে সেই আগের ঘটনারই জের, তাও আমাদের ধারণা।

তারপর আবার একসময় কিরীটী কথায় কথায় সলিল সেনকে প্রশ্ন করে, আচ্ছা মিঃ সেন, অমরবাবু যে কক্ষে শয়ন করতেন, সেখান থেকে চিৎকার করলে বা কোন গোলমাল হলে, নীচের ভৃত্যদের ঘরে কি শোনা যায়?

না। আমি সেটা পরীক্ষা করে দেখেছি, শোনা যায় না।

ভৃত্য তাহলে কোন চিৎকার বা গোলমালই শুনতে পায়নি সে-রাত্রে?

না।

আচ্ছা লোকটা এদেশীয় কি?

হ্যাঁ।

লোকটা এখন কোথায়, নিশ্চয়ই হাজতে? ভাল কথা, করোনারের ভারডিক্‌ট কি?

কেউ বা কারও দ্বারা অমরবাবু নিষ্ঠুর ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন।

আচ্ছা আপনাদের ডি, আই, জি, লোকটা ইউরোপীয়ান নিশ্চয়ই?

অ্যাংলো-বার্মিজ।

আপনাদের ডিপার্টমেণ্টে কালো ভ্রমরের একটা full details নিশ্চয়ই আছে?

আছে।

সেটা আমি একবার দেখতে পারি কি?

নিশ্চয়ই, কাল আমার ডিপার্টমেণ্টে আসবেন, দেখাব। তাছাড়া আমাদের সুপারও আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছুক।

রাত্রি প্রায় নটার সময় ইন্সপেক্টার সলিল সেন ওদের নিকট হতে বিদায় নিলেন।

ভৃত্য ঐ সময় সংবাদ দিল আহার্য প্রস্তুত।

আহারাদির পর সকলে এসে যে যার শয্যায় আশ্রয় নিল।

সুব্রত ভাবছিল কিরীটীর কথাগুলিই। কিরীটীর অদ্ভুত বিচার ও বিশ্লেষণ শক্তি সত্যই তাকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু তবু কিছুতেই সে যেন

বুঝে উঠতে পারছিল না, কেন কিরীটীর ধারণা কালো ভ্রমর সনৎদাকে এখনই প্রাণে মারবে না!

কি জানি, সুব্রত আবার ঐ সঙ্গে ভাবে, সব কথা যে কিরীটীবাবু খোলসা করে খুলে বলতে চান না!

উনি কি সুব্রতকে বিশ্বাস করেন না?

রাজুকে যে সলিলবাবুর সন্ধানে পাঠিয়েছেন, সে কথা পর্যন্ত উনি তার নিকট গোপন করে রেখেছিলেন, কিন্তু কেন?

আর কিরীটী ভাবছিল সম্পূর্ণ অন্য কথা।

কালো ভ্রমর নিজে থেকে ধরা না দিলে কোনমতেই তাকে ধরা যাবে না।

সনৎ-এর উধাও হওয়ার দিন থেকে পর পর এই কদিনের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে যেন তাই মনে হচ্ছে।

অবিবেচকের মত কোন কাজই কালো ভ্রমর করতে পারে না। প্রতিটি পদবিক্ষেপ সে হিসাব করে ফেলে।

এত বড় দলের যে দলপতি, অথচ কেউ আজ পর্যন্ত তার আসল পরিচয়টা পর্যন্ত জানে না এবং জানাতেও কালো ভ্রমর শুধু ইচ্ছুকই নয় তাই নয়, যাতে অন্য কেউ তার সত্যকারের পরিচয়টা না জানতে পারে, তার জন্য সে অত্যন্ত সচেষ্ট ও যত্নবান। কিন্তু কেন?

॥ ১৮ ॥

রাতের আঁধারে অনুসরণ

রাত্রি কত হবে কে জানে? সুব্রত আর কিরীটী পাশাপাশি এক শয্যায় শুয়ে। সুব্রত বোধ হয় অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। তার গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ বেশ স্পষ্ট শোনা যায়।

ও-পাশের একটা খাটে ঘুমিয়ে আছে রাজু। সেও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

গত দু রাত্রি কিরীটীর ভাল করে ঘুম হয়নি। কাজেই দু চোখের পাতা এবারে ঘুমে ভারী হয়ে আস্তে আস্তে বুজে আসে।

কিন্তু সহসা মাঝরাত্রে অত্যন্ত গরম বোধ হওয়ায় কিরীটীর ঘুম ভেঙে গেল।

রাত্রি কত হয়েছে ঠিক নেই। কিসের যেন একটা অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মনে হল যেন পাশের অন্ধকার ঘর থেকে শব্দটা আসছে!

কিরীটী উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। পাশেই সুব্রত গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তার নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হয়েছে বলে তো মনে হয় না।

হ্যাঁ, কার যেন সাবধানী পায়ের নিঃশব্দে চলাচলের অস্পষ্ট মৃদু আওয়াজ। এত রাত্রে পাশের ঘরে কে?

খানিক পরে সে শব্দটা আর শোনা গেল না।

কিন্তু আবার! হ্যাঁ, ঐ তো আওয়াজটা আবার পাওয়া যাচ্ছে। কেউ নিশ্চয়ই নিঃশব্দে ঘরে হেঁটে বেড়াচ্ছে! না, দেখতে হল!

কিরীটী উঠে বসে। শয্যা ত্যাগ করে দু ঘরের মধ্যবর্তী যে দরজাটা

আছে তার সামনে গিয়ে সে কান পেতে দাঁড়াল। তারপর দরজাটার গায়ে হাত দিয়ে ঠেলতে গিয়ে দেখল দরজাটা ওদিক হতে বন্ধ। আশ্চর্য, শোয়ার সময়ও তো দরজাটা খোলাই ছিল! তবে? কিরীটী আরও একটু জোরে দরজাটা ঠেলা দিল। কিন্তু দরজা খুলল না। কিরীটী বিস্মিত, বিমূঢ়।

সহসা মনে পড়ে ওদিককার বারান্দার দিকেও ঘরটার দুটো জানালা আছে। সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী এ ঘরের দরজা দিয়ে ওদিককার বারান্দায় গেল।

অন্ধকার বারান্দা।

নীচের বাগান থেকে ঝিঁঝিঁ পোকার একঘেয়ে ঝিঁঝিঁ শব্দ ভেসে আসে। রাতের হাওয়া নিঃশব্দে চোরের মতই আনাগোনা করে ফেরে। নাম-না-জানা একটা মিষ্টি ফুলের গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়ায়।

কিরীটী পায়ে পায়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দেখে জানালাটি খোলা! দেওয়ালের গা ঘেঁষে চোরের মত চুপি চুপি এসে সে জানালাটার আড়ালে দাঁড়াল।

অন্ধকারে ঘরের মধ্যে একটা সরু আলোর রশ্মি এদিক-ওদিক ঘুরছে। চোখের দৃষ্টি যতটা সম্ভব প্রখর করে কিরীটী ঘরের ভিতরের সব কিছু দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

যেখানে ওদের সুটকেস ও বাক্সগুলো সাজানো আছে, সেখানে একটা ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে টর্চের আলো ফেলে কি যেন দেখছে। লোকটা কে? কিই বা দেখছে?

কিরীটী উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে।

খট্ করে একটা শব্দ হল—হ্যাঁ, বাক্সের ডালা খোলার শব্দ বটে! বাক্সের মধ্যে আঁতিপাঁতি করে লোকটা কি খুঁজছে অমন করে?

কিরীটী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সব ব্যাপার দেখতে লাগল।

ওপরের বাক্সটা নামিয়ে রেখে লোকটা আর একটা বাক্স খোলবার জন্য তার হাতের চাবির গোছার এক-একটা চাবি দিয়ে চেষ্টা করতে লাগল। আবার খট্ করে একটা শব্দ হল—সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের ডালাটাও খুলে গেল।

এবারে অল্পক্ষণ হাতড়াতে কি একটা কাগজ পেয়ে লোকটা টর্চের আলোয় সেটা মেলে ধরে দেখলে এবং সেটা পকেটে পুরে টর্চ নিবিয়ে ওদিককার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর জানালা টপকে ওদিকে চলে গেল।

কিরীটীও সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে জানালা টপকে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। জানালাটার কাছে ছুটে এসে সে দেখে জানালার গায়ে একটা দড়ির মই ঝুলছে, আর লোকটা নিঃশব্দে সেই দড়ির মই বেয়ে নীচের বাগানে নেমে যাচ্ছে দ্রুত।

আর দেরি না করে কিরীটী একপ্রকার ছুটেই বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে বাগানের দিকে চলে যায়।

রাতের অন্ধকারে বাগানটি অস্পষ্ট। ভাল করে কিছু দেখাও যায় না—বোঝাও যায় না।

বাগানের পিছন দিক দিয়ে একটা স্বল্পপরিসর রাস্তা ঘুরে এসে এদিক-কার বড় রাস্তায় মিশেছে। যেতে হলে লোকটিকে বাগানের প্রাচীর টপকে ওই রাস্তা দিয়ে এই বড় রাস্তায় আসতেই হবে। কিরীটী মনে মনে এই চিন্তা করে দ্রুতপদে সদর দরজার দিকে চলল, তারপর দরজা খুলে রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়াল।

সহসা তার নজরে পড়ে রাস্তার ঠিক ওপরেই ছোট একটা 'টু-সীটার' মোটরগাড়ি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

একটু পরে কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। শব্দটা বাগানের পিছনের সরু রাস্তার দিক থেকেই যেন আসছে মনে হয়। শব্দটা ক্রমে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর মনে হয়।

কিরীটী দরজার কপাটের আড়ালে একটু সরে দাঁড়িয়ে দেখল, সরু রাস্তা দিয়ে একটা লোক বড় রাস্তার দিকে আসছে। লোকটার গায়ে একটা কালো রংয়ের কিমনো চাপানো, মাথায় একটা 'নাইট ক্যাপ'। লোকটা আস্তে আস্তে মোটরটির কাছে এসে দরজা খুলে গাড়ির ভিতর গিয়ে বসল।

কিরীটী দ্রুতপদে এগিয়ে এসে গাড়ির পিছনে যে চাকার ক্যারিয়ারটা ছিল, সেটার ওপর চট করে উঠে বসে কোনমতে, তারপর গাড়ির হুড আটকাবার জন্য পিছনে যে দুটো লোহার হুক ছিল, দু হাতে সে দুটোকে বেশ শক্ত করে চেপে ধরল।

গাড়ি ততক্ষণে স্টার্ট দিয়ে চলতে শুরু করেছে। গাড়ির বেগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সামান্য একটা চাকার ওপর ঠিক হয়ে বসে থাকা সত্যি বড় কণ্টকর। গাড়ি রাত্রির অন্ধকারে রেংগুন শহরের বিভিন্ন পথ ধরে ছুটে চলেছে।

সামান্য জায়গায় একই ভাবে বসে থেকে কিরীটীর হাত-পা সব টনটন করছে। অনেকক্ষণ পরে গাড়িটা এসে একটা বাগানের মধ্যে প্রবেশ করল। গাড়ির গতি ধীরে ধীরে কমে আসতেই কিরীটী লাফ দিয়ে গাড়ির পিছন থেকে নেমে পড়ল। গাড়িটা আরও একটু গিয়ে ছোট গাড়িবারান্দার নীচে দাঁড়াল।

কিরীটী অন্ধকারে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। খানিক পরেই গাড়িবারান্দার আলোটা জ্বলে উঠল। সেই আলোয় কিরীটী দেখতে পেল, মোটর থেকে সেই কিমনো পরিহিত লোকটি বেরিয়ে দেওয়ালের গায়ে একটি বোতাম টিপতেই সামনের একটি দরজা ফাঁক হয়ে রাস্তা করে দিল। লোকটি দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকার সংগে সংগেই প্রায় দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। আলোটাও নিভে গেল।

কিরীটী উঠে গাড়িবারান্দায় এল, কিন্তু অন্ধকারে গাড়িবারান্দাটা ভাল করে দেখা যায় না। কোনমতে দেওয়াল ধরে ধরে আন্দাজে ভর করে কিরীটী সেই বোতামটি খুঁজতে লাগল, কিন্তু কিছুই ঠাওর করে উঠতে পারলে না। একটি দরজা যদিও বা হাতের কাছে পাওয়া গেল, কিন্তু হাত দিয়ে ভাল করে দেখতে গিয়ে কিরীটী বুঝল, একই রকমের দরজা পর পর আরও দুটো আছে। তার সব কিছু যেন গুলিয়ে যায়। কোন্ দরজাটা দিয়ে এক মুহূর্ত আগে যে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল তা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। কিরীটী ভাবল বড্ড ভুল হয়ে গেছে, আসবার সময় যদি টর্চটাও অন্তত নিয়ে আসতাম! রাগে দুঃখে কিরীটীর নিজের হাত নিজেরই কামড়াতে ইচ্ছা করে। কিন্তু উপায় কি? কি এখন করা যেতে পারে? এতদূর এসে সে কি বিফল হয়ে ফিরে যাবে শেষটায়?

এমন সময় সামনেই কোথাও একটা ওয়াল-ক্লক ঢং ঢং ঢং ঢং করে রাত্রি চারটে ঘোষণা করলে। কিরীটী চেয়ে দেখল পূবের আকাশে রাত্রিশেষের লালচে আভা জেগে উঠেছে। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। আর এভাবে এখানে

দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন নয়। কিরীটী নিঃশব্দে গেট পার হয়ে রাস্তায় চলে আসে।

॥ ১৯ ॥

ডাঃ সান্যালের গৃহে

রাস্তায় নেমে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ কিরীটী যেন কি ভাবে, তারপর আবার সে বাড়ির গেটের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে, স্বল্প আলো-আঁধারে সে গাড়ির নম্বরটা দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখল যে গাড়ির নাম্বার-প্লেটই নেই—সেটা খুলে রাখা হয়েছে। গাড়িবারান্দায় যেখানে গাড়িটা দাঁড় করানো ছিল সেখানে কাঁকর বিছানো। কিরীটী একটা কাঁকর তুলে নিয়ে গাড়ির বডির উপর ঘষে ঘষে ইংরাজীতে লিখল 'K'। তারপর আবার বের হয়ে রাস্তায় এসে নামল।

রাত্রি প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। চারিদিকে অল্প অল্প আলো ফুটে উঠেছে। সবেমাত্র দু-একজন করে লোক রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেছে।

কিরীটী নিশ্চিন্ত মনে হাঁটতে শুরু করল। আনমনা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে ভুলপথে এসে পড়েছে তা সে নিজেও টের পায়নি। যখন খেয়াল হল তখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। লোকজন গাড়িঘোড়া চলতে শুরু করেছে।

কিরীটী সামনেই একটা রেস্টুরেণ্টে ঢুকে কিছু জলখাবার ও চা খেয়ে নিল। তারপর রাস্তায় এসে নামতেই হঠাৎ ওর কানে এসে বাজল, মিঃ রায়!

কিরীটী চমকে উঠে ফিরে দেখলে সামনেই দাঁড়িয়ে ডাঃ সান্যাল ও মিঃ সলিল সেন।

সুপ্রভাত! কোথায় চলেছেন? ডাক্তারই প্রথমে প্রশ্ন করলেন।

এই...মানে সকালবেলা বেড়াতে বেড়াতে...। কিরীটী আমতা আমতা করে জবাব দিল।

ডাক্তার মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন, তারপর বললেন, একেবারে রাত্রিবাস চাপিয়েই বেড়াতে বেরিয়েছেন দেখছি যে!

কিরীটী নিজের বেশভূষার দিকে সহসা এতক্ষণে তাকিয়ে লজ্জিত হল, একটু অপ্রস্তুতও হল। সত্যি, এ খেয়াল তো তার মোটেই হয়নি। তাড়াতাড়ি সে কথাটা ঢাকবার জন্য কিরীটী হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলে, আপনিও মর্নিং-ওয়াকে বুঝি?

হ্যাঁ, না মানে, ভোরবেলা গেছলাম আমার এই বন্ধুর বাড়ি। এঁর পায়ে হেঁটে বেড়ানোর শখ। তাই বেড়াতে বেরিয়েছি। আমার এ বন্ধুটিকে বোধ হয় চিনতে পারছেন না! ইনি সি. আই. ডি ইনস্পেক্টার মিঃ সলিল সেন।

বিলক্ষণ! আগেই এঁর সঙ্গে পরিচয় লাভের সৌভাগ্য হয়েছে, সুপ্রভাত মিঃ সেন। বলে কিরীটী হাত তুলে নমস্কার জানাল।

মিঃ সেনও প্রতি-নমস্কার দিলেন মৃদু হেসে।

ডাঃ সান্যাল সলিল সেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ও তাই নাকি, বেশ বেশ।...কিন্তু মিঃ সেন, ধূর্জটিবাবুর আসল পরিচয়টুকু পেয়েছেন তো? ভদ্রলোক চমৎকার গান গাইতে পারেন। আসছেন তো আজ আমার ওখানে, শুনবেন এঁর গান...এবার জাহাজে ওঁর সঙ্গে আলাপ হল।

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, শুনবেন না মিঃ সেন ডাক্তার সান্যালের কথা, বিনয় করে বড্ড বেশী বাড়িয়ে বলছেন। বরং ওঁরই বাজনার সুর এখনও আমার দু কান ভরে আছে।

যা বলেছেন মিঃ রায়। সত্যি অতি অদ্ভুত ওঁর বাজনার হাত—যেন সুধা-বর্ষণ করে। মিঃ সেন বললেন।

মিঃ সেন, আপনি তো এদিকেই চলেছেন, চলুন আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে যাব। বলে যেন একপ্রকার জোর করেই কিরীটী মিঃ সেনকে সঙ্গে করে এগিয়ে যায়।

পথে যেতে যেতে কিরীটী সংক্ষেপে ডাঃ সান্যালের কাছে যে কেন পরিচয়টা তার গোপন করেছে সবই বলে।

* * *

দ্বিপ্রহরে ডাঃ সান্যালের গৃহে সকলেই এসে হাজির হয়েছে—কিরীটী, সুব্রত, রাজু ও মিঃ সলিল সেন।

কমিশনার রোডে ডাক্তার সান্যালের বাড়ি। মস্ত বড় দোতলা বাড়ি, বাড়ির পিছনে ফুলের বাগান ও গ্যারেজ। দোতলায় একটি ল্যাবরেটরী। তার পাশেই লাইব্রেরি ঘর। দশ-বারোটা আলমারিতে ঠাসা ইংরাজী, বাংলা, ফ্রেঞ্চ, জার্মান ভাষার সব ডাক্তারীর বই। শয়নঘরে একটা ছোট ক্যাম্পখাটে সামান্য একটা কম্বল বিছানো। তার ওপরে একটা কাশ্মীরী চাদর পাতা। ঝালর-দেওয়া পরিষ্কার দুটি মাথার বালিশ। মাথার কাছে টী-পয়ের ওপরে একটা টেবিল-ল্যাম্প ও তার পাশে ধ্যানস্থ বুদ্ধের ছোট্ট একটি পিতল-মূর্তি।...

ঘরে তিনটি ফটো—একটি ডাক্তারের মার এবং অন্য দুটি তাঁর বাবার ও বোনের। ডাক্তার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওদের সবাইকে সব বাড়ি-ঘর দেখালেন।

খেতে বসে নানা গল্প করতে করতে ডাঃ সান্যাল একসময়ে প্রশ্ন করলেন, মিঃ অমর বসুর মৃত্যুর কোন কিনারা হল মিঃ সেন?

না, এখনও তো কোন সন্ধান পাইনি।

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বললেন, কিন্তু খবরের কাগজওয়ালারা তো খুব বলছিল যে, এর মধ্যে কালো ভ্রমরেরও নাকি হাত আছে!

কালো ভ্রমরের নাম শুনেই মিঃ সেন সহসা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, চাপা কণ্ঠে বলতে লাগলেন, কালো ভ্রমর! উঃ, একটিবার যদি সেই শয়তানকে —সেই দুশমনকে হাতের কাছে পেতাম, তবে তার কাঁচা মাথাটাই চিবিয়ে খেতাম বোধ হয়!

মিঃ সেনের ভাব দেখে ডাক্তার সান্যাল হেসে বললেন, কালো ভ্রমরের ওপরে আপনার যে ভয়ানক রাগ দেখছি মিঃ সেন!

রাগ কি আর সাধে হয় ডাক্তার! সভ্য সমাজের মধ্যে সে একটা গলিত কুষ্ঠ। সর্বত্র এমন বিভীষিকা সে জাগিয়ে তুলেছে যে আঁতকে শিউরে উঠতে হয়।...শয়তান!

ডাক্তার এবারে যেন একটু গম্ভীর হলেন, বললেন, সত্যি সে বেটা বড়

বাড়িয়ে তুলেছে। আর আশ্চর্য লোকটার ক্ষমতা! ভয়ডর বলে কি কিছু ওর শরীরে নেই? আপনাদের ডিপার্টমেণ্টটাই বা কেমন? সামান্য একটা ডাকাতের দলের আজ পর্যন্ত কিনারা করে উঠতে পারল না! দিনের পর দিন সে তার অত্যাচার চালিয়ে চলেছে!

পাপের ভরা তার পূর্ণ হয়েছে। এবার তার সকল কিছুর হিসাবনিকাশ হবে দেখুন না, বললে রাজু।

এ কথাই হতে পারে না। একটা ডাকাতের দলকে খুঁজে বের করা যায় না! আপনাদেরও সে রকম চেষ্টা নেই মিঃ সেন। নইলে—, বললেন ডাক্তার মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে।

আহারাদির পর সলিল সেন বললেন, আমি এখন ঘণ্টা-দুয়েকের জন্য বিদায় নেব। আবার চারটে সাড়ে চারটার মধ্যে ফিরব, জরুরী একটা কাজ আছে।

মিঃ সেন উঠে পড়লেন।

কিরীটী বললে, আমারও একটু কাজ আছে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব। সুব্রত, তোমরা এখানেই থেকো।

কিরীটীও মিঃ সেনের সঙ্গে উঠে গেল।

ছোট টু-সীটার গাড়িখানি মিঃ সেনের। একজন ভৃত্য গাড়ির মধ্যে বসেছিল। সে গিয়ে ভিতরের সীটে বসল, মিঃ সেন গিয়ে স্টিয়ারিংয়ে বসলেন।

মিঃ সেন কিরীটীর দিকে ফিরে গুডবাই বলে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। গাড়ি চলতে শুরু করল। এমন সময় গাড়ির বডির পিছনদিকটায় নজর পড়তেই কিরীটী চমকে উঠল। কারণ সে দেখলে গাড়ির গায়ে ঘষে ঘষে 'K' অক্ষরটি তখনও স্পষ্ট রয়েছে!

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটবার আগেই গাড়িটা সাইলেন্সার পাইপ দিয়ে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে স্থানটা ধূমায়িত ও পেট্রলের গন্ধে ভরিয়ে দিয়ে গেটের বাইরে চলে গেছে।

সহসা কিরীটীর চমক ভাঙল ডাক্তারের কণ্ঠস্বরে। ইতিমধ্যে কখন যে একসময় ডাঃ সান্যাল নীচে নেমে একেবারে ওর পাশটিতে দাঁড়িয়েছেন সে টেরই পায়নি। ডাক্তার বললেন, মিঃ রায়, আপনি যাবেন না বলছিলেন?

কিরীটী ততক্ষণে আপনাকে সামলে নিয়েছে, বললে, হ্যাঁ, এই যে যাই! বলে সে গিয়ে রাস্তায় নামল।

*   *   *

সন্ধ্যার তখন আর খুব বেশী দেরি নেই।

দিনের আলোর বিলীয়মান রশ্মিগুলো আকাশের মেঘের গায়ে গায়ে ইন্দ্রধনু রচনা করছে।

ঘরের মাঝখানে একটা গোল টেবিলের চারপাশে হেলানো বেতের চেয়ারে বসে সুব্রত, কিরীটী, ডাক্তার সান্যাল, রাজু ও মিঃ সলিল সেন।

কিরীটী গাইছিল—

'দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ঐ ছায়া
ভুলাল রে ভুলাল মোর প্রাণ!
ওপারের ঐ সোনার কূলে আঁধার মূলে কোন মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান।...'

কিরীটীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর সান্ধ্য-প্রকৃতির গায়ে যেন মায়াজাল রচনা করে চলেছে। মুগ্ধ বিস্ময়ে সকলে শুনেছে।

কিরীটী তখন গাইছে—

'ফুলের বাহার নেইকো যাহার
ফসল যাহার ফলল না,
অশ্রু যাহার ফেলতে হাসি পায়।
দিনের আলো যার ফুরালো
সাঁঝের আলো জ্বললো না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়—
ওরে আয়। আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনের শেষে শেষ খেয়ায়—

ধীরে ধীরে কিরীটী গানটা শেষ করল।

ইতিমধ্যে ডাক্তারের ভৃত্য ভোলা এসে ঘরের বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে।

ওরা সবিস্ময়ে দেখল, ডাক্তারের দুচোখের কোলে দু ফোঁটা জল টলমল করছে।

ডাক্তার মৃদুস্বরে যেন কি বলছেন আত্মগতভাবে। তাঁর মনের মাঝে যেন বিষম ঝড় উঠেছে।

হঠাৎ একসময় ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে অশান্ত অস্থির পদে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করেন।

॥ ২০ ॥

ডায়েরী কার?

ডাক্তার! ডাক্তার!

সহসা যেন সলিল সেনের ডাকে ডাক্তারের সম্বিৎ ফিরে এল।

তিনি বললেন, না, কিছু না। মাঝে মাঝে মনটা আমার কেন যে উতলা হয়ে ওঠে বুঝি না। একটু অপেক্ষা করুন আপনারা, এখনই আসছি। বলে দ্রুত পদবিক্ষেপে ডাক্তার ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

বোঝা গেল ডাক্তার তাঁর ল্যাবরেটারী ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, কারণ সে ঘরের দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল।

লোকটা এদিকে একেবারে চমৎকার। কিন্তু রাত্রি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি যেন ওঁর ঘাড়ে চাপে—পাগলের মত যা-তা বকেন। অস্থির চঞ্চল হয়ে ওঠেন।...আশ্চর্য! মিঃ সেন বললেন।

রাজু বললে, মাথায় কোন গণ্ডগোল আছে বোধ হয়। অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হয়।

কি জানি! এত বড় জ্ঞানী ডাক্তার এ শহরে আর দুজন নেই। কিন্তু লোকটা এমন খামখেয়ালী যে সন্ধ্যার পরে লক্ষ টাকা দিয়েও ডেকে পাওয়া যায় না! সন্ধ্যা হয়েছে কি সদর দরজা একেবারে পরের দিন সকালের মত

বন্ধ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে শুধু গভীর রাতে গিটারের করুণ সুর-মূর্ছনা শোনা যায়। আমার মনে হয় মাথা খারাপ-টারাপ কিছু নয়, হয়তো জীবনে বড় রকমের কোন আঘাত পেয়ে থাকবেন, তারই জন্য এইরকম মানসিক অবস্থা হয়েছে।

রাত্রে কি সত্যি সত্যি ডাক্তার কোথাও বের হন না মিঃ সেন? কিরীটী শুধাল।

না। আমার সঙ্গে ওঁর আজ সাত বছরের আলাপ। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে একটি দিনের জন্যও শুনিনি যে রাত্রে বাড়ির বাইরে গেছেন। তবে এক-দিন জিজ্ঞাসা করায় উনি বলেছিলেন, রাত্রে উনি নিরিবিলিতে ল্যাবরেটারী ঘরে বসে নাকি ডাক্তারী সম্বন্ধে রিসার্চ করেন।

হ্যাঁ, সত্যি রিসার্চ করি।

কথাটা শুনে সকলে চমকে ফিরে দেখল খোলা দরজার ওপরে দাঁড়িয়ে সহাস্যমুখে ডাক্তার সান্যাল।

ডাক্তার বলতে লাগলেন, আপনারা হয়ত জানেন 'টিউবারকল ব্যাসিলি' বলে একরকম জীবাণু আছে, প্রতি বছর এই ভীষণ জীবাণুর প্রকোপে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। শুধু সভ্য সমাজই নয়, সমগ্র মানবজাতির এত বড় শত্রু আর দ্বিতীয়টি নেই। আপনাদের ঐ কালো ভ্রমরের হাতে পড়লে তবুও অনেক সময় নিস্তার পাওয়া যায় শুনেছি, কিন্তু এই ভীষণ দুশমনের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া সত্যই বড় দুরূহ ব্যাপার। কালো ভ্রমর আসে রাতের আঁধারে লুকিয়ে চুপিচুপি, কিন্তু এ শয়তান দিন-রাত্রি কিছু মানে না—এ তিল তিল করে মানুষের জীবন-শক্তি শুষে নেয়। আমি আজ দীর্ঘ এগারো বছর এই অদৃশ্য শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পাবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমার জীবনের সমস্ত শক্তি তিল তিল করে এর পায়ে ঢেলে দিতে প্রস্তুত আছি। দেখি এ আমার কাছে হার মানে কিনা!

ডাক্তারের স্বরে উত্তেজনা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার আভাস ঝরে পড়ল যেন। ভাবাতিশয্যে মাঝে মাঝে তাঁর সমস্ত দেহ যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

একটু থেমে ডাক্তার আবার বললেন, কিন্তু আর নয়, আজকের মত আপনাদের কাছ থেকে আমি বিদায় চাই।

সকলে উঠে পড়লেন।

ঘরের ওয়াল-ক্লকটা ঢং ঢং করে রাত্রি সাতটা ঘোষণা করলে।

পথে নেমে কিছুদূর এগিয়ে একসময় সলিল সেনের মুখের কাছে মুখ এনে ঈষৎ চাপা গলায় কিরীটী ডাক দিল, মিঃ সেন!

সলিল সেন ফিরে বললেন, অ্যাঁ, আমায় ডাকলেন?

হ্যাঁ মিয়াং এখান থেকে কত দূর হবে?

মিয়াং! বলে বিস্মিত দৃষ্টি তুলে মিঃ সেন কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ, মিয়াং। কিরীটী জবাব দিল।

সে তো অনেক দূর হবে। টোয়াণ্টে খাল ধরে কুড়ি মাইল উজানে গেলে পথে পড়ে মৌবিন, আরও এগুলে ইয়াণ্ডুন; তারপর পড়বে ডোনাবিয়ু—তারপর হেনজাদা শহর। হেনজাদার পরেই ইরাবতী নদী। যেখানে টোয়াণ্টে খাল ইরাবতীর সঙ্গে মিশেছে সেইখানেই মিয়াং শহর।...কিন্তু হঠাৎ মিয়াং সম্বন্ধে

প্রশ্ন কেন মিঃ রায়?

আপনি কালো ভ্রমরকে ধরতে চান?

কালো ভ্রমর! শুনেই একরাশ বিস্ময় যেন মিঃ সেনের কণ্ঠ দিয়ে ঝরে পড়ল। তিনি যেন বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। প্রথম দু-চার মিনিট মিঃ সেনের কণ্ঠ দিয়ে কোন কথা বেরুল না।

কিরীটী চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে বললে, রাত্রি এখন সাতটা কুড়ি, হাতে আর মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টা সময় আছে। যেমন করেই হোক আজ রাত্রি সাড়ে এগারোটার মধ্যে মিয়াং পৌঁছতে হবে আমাদের!

কিন্তু—, মিঃ সেন কি যেন বলতে গেলেন। কিন্তু কিরীটী তাঁকে একরকম বাধা দিয়েই থামিয়ে বললে, আজকের রাত যদি হারান, তবে এ জীবনে আর কালো ভ্রমরকে ধরতে পারবেন না। সে চিরদিনের মত মুঠোর বাইরে চলে যাবে। তাকে হাতেনাতে যদি ধরতে চান তো আজকের রাত পোহাতে দেবেন না!

আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না কিরীটীবাবু!

বুঝবেন, সময় হলেই সব বুঝতে পারবেন। আপনাদের দ্রুতগামী পুলিস-লঞ্চ আছে না?

হ্যাঁ আছে।

এখন সেটা পাওয়া যাবে?

যাবে।

তবে চলুন, আর একটি মুহূর্তও দেরি নয়।

* * *

অন্ধকারে সার্চলাইট জেবলে পুলিস-লঞ্চখানা টোয়াণ্টে খালের মধ্য দিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

লঞ্চে আরোহী আছে ছজন—সুব্রত, রাজু, কিরীটী, মিঃ সলিল সেন ও দুজন আর্মড বর্মী পুলিস।

কিরীটী একটা লেদার বাঁধানো ডায়েরী হাতে করে নাড়তে নাড়তে বললে, মিঃ সেন, আপনি হয়তো সমগ্র ব্যাপারটার আকস্মিকতায় আশ্চর্য হয়ে গেছেন! এই ডায়েরী পড়লেই ব্যাপারটা সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। শুনুন পড়ছি—

লঞ্চের কেবিনের আলোয় ডায়েরীখানা মেলে ধরে কিরীটী বললে, আমি অবিশ্যি ডায়েরীর সব কথা এখন আপনাদের পড়ে শোনাব না, কয়েকটা পাতা মাত্র পড়ব। শুনুন।

কিরীটী ছোট একখানা ডায়েরী খুলে পড়তে শুরু করল—

বাবা!—আমার স্নেহময় বাবা আর ইহজগতে নেই! বিলাত থেকে শেষ পরীক্ষা দিয়ে দেশে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ সংবাদে আমার বুকখানা একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলে।

তারপর বাবার ডায়েরী পড়ে বুঝতে পারলাম, বাবার অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী তিনটি লোক। দুজনের নাম তাঁর ডায়েরীতেই পেলাম। তারা দুজনেই বর্মায় এখন বিপুল সম্পত্তির অধিকারী—একজন মিঃ চৌধুরী, আর একজন বিখ্যাত তামাক ব্যবসায়ী বিপিন দত্ত। তৃতীয়জনের নাম কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। বাবা, বিপিন দত্ত, মিঃ চৌধুরী ও আর একজন মিলে কাঠের ব্যবসা

করেন। বিপিন দত্তের দুই ছেলে ও বৌ ছিল, মিঃ চৌধুরী অবিবাহিত। আমরা দুই ভাই-বোন ছাড়া বাবার আর কেউ ছিল না। বাবার ব্যবসায় উন্নতি হওয়ার আগেই মা মারা যান। বাবা ছিলেন যেমন সরল, তেমনি নিরীহ-প্রকৃতির। এ জগতে কাউকেই তিনি অবিশ্বাস করতেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বিশ্বাসই তাঁর কাল হল।

মা মারা যাবার পর থেকে বাবা কেমন যেন উদাস প্রকৃতির হয়ে গিয়েছিলেন। এ দুনিয়ার কোন কিছুর ওপরই তাঁর আর তেমন কোন আকর্ষণই যেন ছিল না। ব্যবসা সংক্রান্ত সকল কিছুই দত্ত ও চৌধুরী তাঁর ব্যবসার অন্য দুই অংশীদার দেখাশুনা করতেন। বাবার কাছে কোন কিছুর সম্বন্ধে মত নিতে গেলে বলতেন, ওর মধ্যে আর আমায় টেনো না তোমরা, যা ভাল বোঝ তাই করগে।

আমি ছিলাম তখন বিলেতে।

দত্ত আর চৌধুরী বাবার এই উদাসীন ভাব ও একান্ত নিরপেক্ষতার ও সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ভিতরে ভিতরে একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র করলেন।

হঠাৎ একদিন শোনা গেল, ব্যবসার অবস্থা নাকি খুব খারাপ। বাবা শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। অডিটার এল, কমিটি বসল, শেষ পর্যন্ত সত্যিই দেখা গেল ব্যবসাতে প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপর ডিফিসিট পড়েছে। যে ব্যবসার মূলধন মাত্র সাড়ে তিন লক্ষ টাকা, সে ব্যবসায় এত বড় ডিফিসিট দিয়ে আর চলা একেবারেই অসম্ভব। অতএব ব্যবসা লালবাতি জ্বালতে বাধ্য হল।

ভিতরে ভিতরে গভীর ষড়যন্ত্র করে দত্ত ও চৌধুরী নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিয়ে বাবাকে একেবারে পথে বসাল।

সরল-প্রাণ বাবা আমার। তাদের বন্ধু বলে আপনার জন বলে বিশ্বাস করেছিলেন। তাই তারা তাঁকে বন্ধুত্বের ও বিশ্বাসের চরম পুরস্কার দিয়ে গেল। এ আঘাত ও অপমান বাবা সহ্য করতে পারলেন না—অসুখে পড়লেন এবং আমি ফিরে আসবার আগেই চিরনিদ্রায় অভিভূত হলেন। যাবার সময় তিনি আমার নামে একটা চিঠি রেখে যান।

'সুরো বাবা আমার,

এ জীবনের শেষক্ষণে তোমায় দেখে যেতে পারলাম না, এ যে আমার কত বড় দুঃখ তা একমাত্র ভগবানই জানেন। মনে মনে তোমার জন্য আমার শেষ আশীর্বাদ ভগবানের শ্রীচরণে দিয়ে গেলাম। যাবার আগে তোমায় দেবার মত আর আমার বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই, তোমার মার নামে জমানো হাজার পাঁচেক টাকা আর আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সঞ্চয় করা দুটি কথা রেখে যাচ্ছি।

প্রথম কথা—এ দুনিয়ায় সরল বিশ্বাসের কোন দাম নেই।

দ্বিতীয় কথা—যে বিশ্বাসহন্তা, তার একমাত্র ব্যবস্থা কঠোর মৃত্যুদণ্ড।...

যারা তোমার বাবাকে এমনি করে পথে বসিয়ে গেল, তাদের তুমি ক্ষমা করো না।

চোখের জলের মধ্যে দিয়ে বাবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যেমন করেই হোক, যারা বাবাকে আমার এমনি করে লাঞ্ছিত করেছে

তাদের আমি উপযুক্ত দণ্ড দেব।

ভাল করে খোঁজ নিয়ে শুনলাম, দত্ত আর চৌধুরী এখন দুজনেই শহরের মধ্যে বিশেষ গণ্যমান্য লোক। একজন কাঠের ব্যবসা ফেঁদে লক্ষপতি, অন্যজন তামাকের ব্যবসায়ে প্রায় তাই।

এই পর্যন্ত পড়ে কিরীটী থামল। তারপর আবার পাতা ওল্টাতে লাগল।

তারপর শুনুন। বলে কিরীটী আবার পড়তে শুরু করেঃ দত্তর চরম শাস্তি মিলেছে, প্রাণে মারিনি। সমস্ত ব্যবসা তছনছ করে দিয়েছি। আজ লক্ষপতি তামাকের ব্যবসায়ী বিপিন দত্ত পথের ভিক্ষারী। পয়সার শোকে আজ সে পাগল, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়।

এক নম্বর হল। এবার চৌধুরী তোমার পালা।

চৌধুরীর ভাগ্নে সনৎকে লোক দিয়ে দলে ভিড়িয়েছি। ভাগ্নে বুড়োর খুব আদরের। উঃ, বুড়ো একেবারে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। দিনের পর দিন সনৎ অধঃপাতের পথে নেমে চলেছে। অর্থাৎ সে জানে না, এর মধ্যে আছে এক হতভাগ্যের প্রতিহিংসার চক্রান্ত। কিন্তু দিনকে-দিন এ কি হচ্ছে আমার? দুশ্চিন্তা সর্বদা যেন আমায় ভূতের মত পিছু পিছু তাড়া করে চলেছে। এ কি হল?...

ডায়েরীর আর এক জায়গায় লেখা আছে—

আরও কিছুদিন যাক। সনৎকে একেবারে পথের ধুলোয় টেনে এনে বসাই, তারপর বুড়ো চৌধুরীকে ধরব। ওকে শেষ করতে তো আমার এক মাসও লাগবে না। কিন্তু আর একজন কে? কি তার নাম, কে আমাকে বলে দেবে?

কিন্তু আমার এ কি হল? এ কি যন্ত্রণা? রাত্রি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার শয়তানটা যেন আমায় শত বাহু মেলে শয়তানির পথে টেনে নিয়ে চলে, কোনমতেই যেন আমি তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি না।

আর এক জায়গায় লেখা—

ডাঃ চৌধুরী হঠাৎ মরে আমায় বড় ফাঁকিটাই দিয়ে গেল। আমার স্বপ্ন ধুলোয় মিশে গেল। কি করি? এখন কি করি?...কিন্তু এ কি! দুষ্কর্ম কি আমার জীবনের সাথী হয়ে দাঁড়াল নাকি? আমি কি পাগল হয়ে যাব?

ডায়েরীর আর এক পাতায় লেখা—

হ্যাঁ, সেই ঠিক হবে; যেমন করে হোক বুড়ো চৌধুরীর সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করে দিতে হবে। ওর ভাগ্নেদের পথে বসাতে হবে।

মিলেছে, সুযোগ মিলেছে। সনৎ লোক পাঠিয়েছিল আমার কাছে, উইলের অন্যতম উত্তরাধিকারীকে যদি কোনমতে প্রতিরোধ করতে পারি, তবে সে আমায় দশ হাজার টাকা দেবে।...

আরও এক পাতায় লেখা—

অমর বসু সব ভেস্তে দিল! শেষ পর্যন্ত কূলে এসে তরী ডোবাল, কিন্তু আমার যে সব গোলমাল হয়ে যায়! ভেবেছিলাম সনৎকে মুঠোর মধ্যে এনে ধীরে ধীরে তাকে পথের ভিখারী করে পিঁপড়ের মত পিষে মেরে ফেলে দেব একদিন। তা তো হল না। সব ভেস্তে গেল! এখন উপায়? মিলেছে—উপায় মিলেছে। আজ রাত্রেই সনৎকে শেষ করব।

উঃ, কী সর্বনাশ! সংবাদ পেলাম অমর বসুই নাকি বাবার ব্যবসায় ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল, চৌধুরীর সহকারী হিসাবে। দাঁড়াও

বসু, এবারে তোমার পালা।

তারপর অনেক পাতার পরে লেখা আছে—

দলের লোকেরা আমায় জানবার জন্য কী ব্যাকুল—কী ইচ্ছুক! অমর বসুর মৃত্যুর ঘটনা খুব চাঞ্চল্য জাগিয়েছে যাহোক!

কলকাতায় যেতে হবে।

সনৎ আর সুব্রত ওদের মধ্যে যে কোন একজনকেও যদি কোনমতে এখানে এনে ফেলতে পারি তবেই কিস্তিমাত। একজন ধরা পড়লেই ওরা সব কজনই ছুটে আসবে। ধরে সব কটাকে রেঙ্গুনেই আনতে হবে—আমার মুঠোর মধ্যে।

আর এক জায়গায় লেখা—

নাঃ, কিরীটী বড় বাড়িয়ে তুলেছে! কিন্তু ভদ্রলোকের দেখছি বুদ্ধি আছে। হ্যাঁ, বলতেই হবে বুদ্ধি আছে। ঠিক আঁচ করেছে তো!

বুদ্ধির লড়াই আমার বড় ভাল লাগে। দেখি না এক চাল খেলে!

আবার এক জায়গায় লেখা—

দেখছি ধনাগারের চার্টটা চুরি গেছে।...তা যাক, তাতে আমার কিছু এসে যায় না। ও তো আমি জানিই। ওটা আবার কিরীটীটাই হাত করেছে। ওটা চুরি করে আনতে হবে। রেঙ্গুনে গিয়ে চুরি করলেই হবে। ব্যস্ততার কিছু নেই।

ডায়েরীর শেষ পাতায় লেখা আছে—

টাকাকড়ি সঞ্চয় করে আমার আর কি হবে?...আমি আমার ধনাগারের সমস্ত অর্থ তাকে দিয়ে যাব—মরবার আগে যে আমার কাছে সবচাইতে বিশ্বাসী বলে মনে হবে। ও তো পাপের অর্থ, পাপের নেশায় অর্জন করা অর্থ। আমার চাই না।

ডায়েরীর সব শেষ পাতায় লেখা—

মৃত্যুগুহায় সনৎ ও অমরকে আটকে রেখেছি। কাল যাব মৃত্যুগুহায় রাত্রি বারোটায়। তপ্ত শলা দিয়ে অমরের চোখ কানা করব। আর সনৎকে চিরজীবনের জন্য আমার ধনাগারে বন্দী করে রেখে আসব। অর্থ-পিশাচ! দেখি আমার আজীবনের সঞ্চিত অর্থে ওর সাধ মেটে কিনা! যে সামান্য অর্থের জন্য ভাইকে মেরে ফেলতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত নয়, তার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া দরকার। তাছাড়া আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তারও শাস্তি হোক। থাকুক ও ওই রুদ্ধ ধনাগারে—যুগ যুগ ধরে অর্থের প্রাচুর্যের মধ্যে বন্দী হয়ে যখের মত।

এই পর্যন্ত পড়ে কিরীটী ডায়েরী বন্ধ করল এবং সকলের মুখের দিকে চেয়ে বলল, আজ সেই ভীষণ রাত্রি অর্থাৎ এগারোই, এবং আজ বারোটায় হবে সেই ভীষণ পাপানুষ্ঠান।

সকলে এতক্ষণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে কিরীটীর পড়া শুনছিল, এবার বলে উঠল, উঃ, কী ভয়ঙ্কর!

অন্ধকারে মোটর লঞ্চ ঝরঝর শব্দে জল কেটে চলেছে তখন।

কিরীটী ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, তখন রাত্রি সাড়ে দশটা।...এখনও দেড় ঘণ্টা বাকি।

শয়তানের কারখানা

মিয়াংয়ে এসে যখন লঞ্চ পৌঁছাল রাত্রি তখন প্রায় এগারোটা। কৃষ্ণাপঞ্চমীর চাঁদ আকাশের কোণে উঁকি দিচ্ছে।

ইরাবতীর উচ্ছ্বসিত জলধারা অক্লান্ত কল্লোলে বয়ে যাচ্ছে।

স্বল্প চন্দ্রালোক নদীর বুকে ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় যেন কি এক মায়া-স্বপ্নের সৃষ্টি করেছে। অদূরে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় ইরাবতীর স্রোত-বিধৌত বিশাল গৌতম পর্বত প্যাগোডা মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রকিরণ-স্নাত হয়ে।

সকলে লঞ্চ হতে নামল একে একে তীরে।

কিরীটী পকেট থেকে একটা ছোট কাগজ বের করল। তাতে আলো ফেলতে দেখা গেল তার ওপর সাঙ্কেতিক ভাবে কি কতকগুলো লেখা আছে।

কিরীটী সেই কাগজ দেখতে দেখতে বললে, ঐ দেখা যাচ্ছে গৌতম পর্বত। বোধ হয় প্যাগোডার দক্ষিণ কোণ দিয়ে এগিয়ে যেতে একটা চন্দনগাছ পাওয়া যাবে। চলুন, আর দেরি নয়, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলুন।

সকলে দ্রুতপদে এগিয়ে চলল।

কারও মুখে একটি কথা নেই ; উৎকণ্ঠিত আগ্রহে রুদ্ধনিঃশ্বাসে এক রহস্যময় বিভীষিকার দ্বারোদ্‌ঘাটন করতে সব এগিয়ে চলেছে যেন নিঃশব্দে।

এই সেই প্যাগোডা...চল দক্ষিণ কোণ ধরে। চলতে চলতে একসময় থেমে কিরীটী বললে।

সকলে আবার কিছুদূর এগিয়ে চলল। কিন্তু কোথায় ভাঙা বুদ্ধদেবের মূর্তি!

সুব্রত ও রাজু বললে, মিঃ রায়, আমরা বোধ হয় ভুলপথে এসেছি।

কিরীটী জোরগলায় বললে, না, ঠিকই চলেছি। ঐ দেখুন ভাঙা বুদ্ধ-দেবের মূর্তি দেখা যাচ্ছে সামনেই আমাদের।

সত্যই অদূরে ভাঙা একটা বুদ্ধদেবের মূর্তি দেখা গেল, একখণ্ড বড় পাথরের ওপর বসানো।

বুদ্ধমূর্তির ডানদিকে এগোতেই দেখা গেল সেই চন্দনগাছও।

কিরীটী উল্লসিত কণ্ঠে বললে, সব ঠিক ঠিক মিলছে।

তারপর কাগজটা মেলে ধরে বলতে লাগল, এই লেখাগুলোর তলায় যেসব চিহ্ন আছে সেগুলো বাদ দিতে হবে, কেননা বলেছে—চিহ্ন যত বাদ গেছে। তাহলে দাঁড়াচ্ছে—দশ পা পরে দুই DK...অর্থাৎ দুই দিকে তিন শূন্য বা ৩০ হাত রাস্তা আছে। হ্যাঁ। এই তো দুদিকে দুটো রাস্তা গেছে দেখছি, একটা ডাইনে, একটা বাঁয়ে। এখন...এই দু রাস্তার BAMT অর্থাৎ বাঁয়ের রাস্তাটি ধরে, হাতী 0000 যাও। হাতী মানে গজ। চার শূন্য হল চল্লিশ, সব মিলে হল চল্লিশ গজ অর্থাৎ বাঁয়ের রাস্তাটি ধরে চল্লিশ গজ যেতে হবে। চল এগিয়ে। মন্ত্রমুগ্ধের মতই অন্য সকলে কিরীটীর পিছু পিছু এগিয়ে চলে। ত্রিশ হাত যাওয়ার পর দেখা গেল সত্যিই দুই দিকে দুটো রাস্তা চলে গেছে। বাঁয়ের

রাস্তাটি ধরে চল্লিশ গজ এগোবার পর দেখা গেল একটা প্রকাণ্ড পাথরের ওপর এক ছোট লোহার ড্রাগন বসানো। তার মুখে একটা লোহার বালা পরানো। কিরীটী আবার কাগজ দেখে পড়তে লাগল—

ড্রাগন দেখ বসে আছে
ধনাগারের চাবি কাছে।
মুখে তার লোহার বালা
দুলছে তাতে চিকন শলা।

হ্যাঁ, এই তো ড্রাগনের মুখে লোহার বালা। দেখ দেখ, একটা লোহার শলাও আছে!

আনন্দে উত্তেজনায় কিরীটীর সর্বশরীর থরথর করে কাঁপছে তখন। সে পুনরায় চাপা স্বরে বলতে লাগল—

দুইয়ের পিঠে শূন্য নাও
ত্রিশ দিয়ে গুণ দাও,

অর্থাৎ তাহলে হল ২০×৩০=৬০০

শূন্য যদি যায় বাদ
সেই কবারে পূরবে সাধ।

উত্তেজনায় ও অধীর আবেগে কিরীটীর সমগ্র দেহখানি কেঁপে কেঁপে ওঠে; বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে।

ছবার ড্রাগনের মুখে দোলানো লোহার বালাটা ঘোরাতেই ড্রাগনটি যে পাথরের ওপর বসানো ছিল, সেই পাথরখানি ড্রাগন সমেত সর সর করে বাঁয়ে সরে গিয়ে দু হাত পরিমাণ একটা গর্ত প্রকাশ পেল।

পেয়েছি, পেয়েছি! ইউরেকা, ইউরেকা! কিরীটী চাপা কণ্ঠে বলে উঠল, সত্যি এ কি ভোজবাজি—না স্বপ্ন!

সকলেই যেন বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছে।

সেই গর্তমুখে আলো ফেলতে দেখা গেল, ধাপে ধাপে সুন্দর সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে। প্রথমে কিরীটী, তারপর মিঃ সেন, সুব্রত ও রাজু পর পর সিঁড়ির পথে পা বাড়াল। পুলিস দুজন বাইরে দাঁড়িয়ে রইল কিরীটীর নির্দেশের অপেক্ষায়।

গোটা পনেরো সিঁড়ি ডিঙিয়ে যাবার পরই সমতল ভূমি পায়ে ঠেকল। অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা সরু পথ। সেই অপরিসর পথে অতি কষ্টে দুজন লোক পাশাপাশি যেতে পারে।

কিরীটীকে মাথা নীচু করেই এগোতে হল। কিছুদূর এগোতেই অদূরে একটা আলোর ক্ষীণ রশ্মি অন্ধকারে মিটমিট করছে দেখা গেল।

এমন সময় মাটির নীচে অন্ধকার গুহার ভিতর থেকে একটা বুক-ভাঙা করুণ আর্তনাদ জেগে উঠল। সকলেই থমকে দাঁড়াল।

মনে হল এ বুঝি কোন অশরীরীর করুণ হাহাকার যুগ যুগ ধরে এই মাটির নীচে কেঁদে কেঁদে ফিরছে আজও!

অল্পক্ষণ বাদে আবার তারা এগিয়ে চলল। সকলে এসে একটা বিস্তৃত উঠোনের মত জায়গায় দাঁড়ায়। মাথার ওপরে ছাদের খিলান খুব বেশী উঁচু নয়।

সহসা অন্ধকারের মধ্যে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ শুনে সকলে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখল,

একটা ছোট্ট গোলাকার ছিদ্রপথ দিয়ে সরু একটা আলোর রশ্মি অন্ধকারে ছিটকে এসে পড়েছে।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে সেই ছিদ্রপথে চোখ রেখে চমকে ওঠে, এ কি স্বপ্ন না সত্যি! এ যে সেই গল্পের আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপকেও হার মানিয়ে দেয়! সহসা সহস্র আরব্য রজনীর বিস্ময়কর একখানা পাতা যেন এই পাতালপুরীর আঁধারকক্ষে সত্য হয়ে এসে ধরা দিয়েছে।

আলোতে দেখা গেল ছোট একখানি ঘর। সেই ঘরের ছাদের ওপর হতে শিকলের মাথায় একটা কাঁচের প্রদীপদান ঝুলছে। সেই প্রদীপের স্বল্পালোকে দেখা যায় ঘরের চারপাশে ছোট ছোট বেতের ঝাঁপিতে ভর্তি অসংখ্য চকচকে গিনি। কে একজন আগাগোড়া কালো পোশাক-পরা লোক নীচু হয়ে এক-একটা ঝাঁপির কাছে আসছে, আর দু হাত দিয়ে সেই ঝাঁপি হতে মুঠো করে গিনি তুলে নিয়ে পরক্ষণেই মুঠো আলগা করে ধরছে—অমনি সুমধুর ঝন্ঝন্ শব্দ করে সেই সব গিনি কক্ষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ছে।

কিরীটী ছিদ্রপথ দিয়ে সকলকেই তা দেখাল। তারা সবিস্ময়ে দেখল—এ যে সত্যই অতুল ঐশ্বর্য!

কিছুক্ষণ বাদে লোকটা পাশের একটা দরজা দিয়ে ঐ ঘর থেকে চলে গেল। অল্পক্ষণ পরেই আবার জেগে উঠল সেই বুক-ভাঙা চিৎকার।

কোথা হতে চিৎকার আসছে তা জানবার জন্য সকলে ফিরে দাঁড়াল।

চিৎকারের শব্দটা ডানদিক হতে আসছে বলে মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ, তাই।

সহসা সেই বেদনার্ত চিৎকারকে ডুবিয়ে দিয়ে বাজের মতই একটা তীক্ষ্ণ হাসির খলখল শব্দ যেন সেই গুহাগিরিতলে শব্দায়মান হয়ে উঠল—হাঃ হাঃ হাঃ!

দয়া কর! দয়া কর! কার করুণ আবেদন শোনা যায়।

দয়া! হাঃ হাঃ, মনে পড়ে অমর বসু, দিব্যেন্দু সান্যালের সেদিনকার সে হতমানের কথা? মানুষের বুকে ছুরি মেরে তাকে তোমরা শয়তান সাজিয়েছ! দয়া, মায়া, ভালবাসা কিছু সেখানে নেই, সেখানে পড়ে আছে শুধু জিঘাংসা আর প্রতিশোধ।...এবারে সনৎবাবু? এবার তোমাকে কে রক্ষা করবে বন্ধু? কালো ভ্রমরের প্রতিহিংসা—সে বড় ভীষণ জিনিস! চৌধুরীর ভাগ্যে তোমরা। চৌধুরী ফাঁকি দিলেও তোমরা যাবে কোথায়? লক্ষপতি নিরীহ সরল-বিশ্বাসী বাবাকে আমার একদিন তোমার মামাই রাজসিংহাসন থেকে পথের ধুলোয় নামিয়ে এনেছিল, এমনি ছিল তার অর্থপিপাসা! তুমিও অর্থপিশাচ! এমন কি একদিন তুমি তোমার ভাইয়ের বুকেও ছুরি বসাতে পশ্চাৎপদ হওনি। তারপর সকলে মিলে আমাকে সেদিন যে অপমান করেছ, সে অপমানের জ্বালায় এখনও আমার সর্বাঙ্গ জলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আমি সেই দুঃসহ পরাজয়ের গ্লানি কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

আমি আমার এই সুদীর্ঘ এগারো বছরের পাপ-দস্যুজীবনে পাপানুষ্ঠানের দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছি। ভেবেছিলাম আমার দলে সবচাইতে বিশ্বাসী দেখব যাকে তাকেই সব দিয়ে যাব, কিন্তু দেখলাম সত্যিকারের বিশ্বাসী মেলা এ দুনিয়ায় একান্তই দুরূহ ব্যাপার। আমার কাজ শেষ হয়েছে। স্বর্গত পিতার আমার প্রতিশোধ নেওয়া হয়তো হয়েছে।...এখন আমার এই পাপ-ঐশ্বর্যের মধ্যে তোমাকে বন্দী করে রেখে যাব। তুমি তোমার বাকী জীবনের

দিনগুলোর প্রতি মুহূর্তটিতে অর্থগৃধ্নুতার তীব্র অনুশোচনায় তিলে তিলে মৃত্যুর কবলে এগিয়ে যাবে। মৃত্যুর সেই করাল ভয়াবহ বিভীষিকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তুমি দেখবে বন্ধু, যে অর্থের জন্য একদিন তুমি তোমার ভাইয়ের বুকে ছুরি বসাতে চেয়েছিলে, সে অর্থ তোমার কেউ নয়! এই পর্যন্ত বলেই লোকটা থামল।

তারপর আবার সে বলতে শুরু করলে, এই দেখছ তপ্ত শলা! এটা দিয়ে তোমার চক্ষু দুটি চিরজীবনের মত নষ্ট করে দিয়ে যাব। অন্ধ হয়ে তুমি তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর অমর বসু এই গিরিগুহায়।

দয়া কর। দয়া কর। তোমার পায়ে পড়ি।

দয়া! চুপ শয়তান!

অন্য কোন কথা শোনা গেল না। কেবল একটা হৃদয়দ্রাবী করুণ গোঙানি আঁধার-মধ্যে করুণ বিভীষিকায় জেগে উঠল যেন। এমন সময় কিরীটী সবলে সামনের দরজাটির ওপরে একটা লাথি মারল এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজু আর সুব্রতও তার ইঙ্গিতে সজোরে ধাক্কা দিতে লাগল। তিনজনের মিলিত শক্তি প্রতিরোধ করবার মত ক্ষমতা সামান্য কাঠের দরজাটির ছিল না—দরজা ভেঙে গেল। হুড়মুড় করে সকলে ঘরের মধ্যে গিয়ে ছিটকে পড়ল।

শয়তান! কিরীটী গর্জন করে উঠল।

ছোট্ট ঘরখানির একপাশে হাতে-পায়ে শিকল দিয়ে বাঁধা অমর বসু। তাঁর চোখ দিয়ে দর-দর ধারে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তখন। বেচারী যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে একটা শিকলে বাঁধা সনৎ।

আর একজন মাত্র লোক ঘরে ছিল, একটু আগেকার সেই বক্তা। সে তখন ওদের দিকে ফিরে তাকিয়েছে। উঃ, কী কুৎসিত তার মুখ! এ বুঝি কোন মাটির নীচেকার কবরখানা থেকে এইমাত্র উঠে এসেছে। যুগযুগান্তরের বিভীষিকা যেন মূর্তিমান হয়ে সচল হয়েছে।

এখানেও এসেছ? তবে মর! বলে মুহূর্তে সেই ভীষণদর্শন লোকটা কোমর থেকে ছোরা বের করে কিরীটীর দিকে ছুঁড়ে মারল।

কিরীটী চকিতে সরে গেল, ছোরাটা এসে সলিল সেনের পাঁজরায় বিঁধে গেল।

শয়তান! সুব্রত গর্জে উঠল।

হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে কালো ভ্রমর। জামার পকেট থেকে ছোট একটা অ্যাম্পুলের মত জিনিস বের করে সেটা পট করে শরীরের চামড়ার মধ্যে বিঁধিয়ে দিল।

সুব্রত লাফিয়ে গিয়ে কালো ভ্রমরের একখানি হাত ততক্ষণে চেপে ধরেছে।

মূর্খ! পিপীলিকার ওড়বার সাধ! বলে অক্লেশে এক হেঁচকা টান দিয়ে সুব্রতর দৃঢ়মুষ্টির কবল থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, কাজ আমার শেষ! তারপর হঠাৎ যেন তীব্র যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করে উঠল, উঃ, জ্বলে গেল! তীব্র বিষ! বিষধর কালনাগিনীর উগ্র বিষ!...হ্যাঁ, প্রায়শ্চিত্ত—সারাজীবন যে সহস্র পাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত আমি নিজহাতে স্বেচ্ছায় করে গেলাম। তা নাহলে আমার অনুতপ্ত বায়ুভূত আত্মা এই মাটির পৃথিবীর শত সহস্র পাপানুষ্ঠানের স্মৃতির দংশনে হাহাকার করে ফিরত।

কালো ভ্রমর আর কিছু বলতে পারল না—টলতে টলতে বসে পড়ল।

কণ্ঠস্বর তার ক্ষীণ হয়ে আসছে।

কম্পিত হস্তে সে নিজের মুখের মুখোসটা টেনে খোলবার চেষ্টা করতে লাগল।

কিরীটী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ক্ষিপ্রহস্তে কালো ভ্রমরের গায়ের জামাগুলো খুলে দেবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু সফল হল না, পাতলা রবারের মত জামাটা যেন গায়ে এঁটে বসে আছে এবং তার ভিতর থেকেও দেহসৌষ্ঠব যেন ফুটে বের হচ্ছে লোকটার। সত্যি, কি অদ্ভুত তার দেহের প্রতিটি মাংসপেশী! নিয়মিত ব্যায়ামে সুগোল ও সুষ্ঠু। কিন্তু কি আশ্চর্য, ভীষণ-দর্শন কুৎসিত অন্তরের সঙ্গে দেহের তো কোন সাদৃশ্যই নেই! সকলে বিস্মিত হয়ে তার দেহসৌষ্ঠব দেখতে লাগল।

অতি কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে কালো ভ্রমর বলতে লাগল, এই বন্ধ ঘরের বন্ধ হাওয়া ছেড়ে আমি বাইরে যাব।

তখন সকলে ধরাধরি করে তাকে বাইরে নিয়ে এল।

অমর বসু, সনৎ ও আহত সলিল সেনকেও একে একে বাইরের মুক্ত আকাশের তলায় নিয়ে আসা হল।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। প্রভাতী পাখীর কল-কাকলীতে স্থানটি মুখরিত হয়ে উঠেছে। সকলে এসে কালো ভ্রমরের চারিপাশে ঘিরে দাঁড়াল।

অমরবাবুর জ্ঞান তখনও ফেরেনি।

আঃ, আলো-বাতাস! কিন্তু আমার মৃত্যুর পর আমার এ দেহটা নিয়ে আর টানাটানি করো না। ঐ ইরাবতীর শান্ত শীতল জলে ভাসিয়ে দিয়ে যেও। বলতে বলতে কালো ভ্রমর শ্লথ কম্পিত হস্তে নিজ মুখের মুখোশটা টেনে নিল।

তার মুখ দেখে সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতবাক্ হয়ে পড়ল। তারা সকলে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে না তো!

সলিল সেন যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, ডাক্তার সান্যাল? এ কি!

হ্যাঁ, আমিই ডাক্তার সান্যাল! কালো ভ্রমর কোনমতে অস্পষ্ট ভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা কটা বললে।

তখন প্রভাতের রাঙা সূর্য মেঘের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়ে উঠছে।

॥ ২২ ॥

বেদনার অশ্রু

ধীরে ধীরে হতভাগ্যের প্রাণবায়ু বোধ করি বাতাসে মিলিয়ে গেল।

সকলের চোখের কোলেই অশ্রু। এত বড় শয়তান, তবু সকলের বুকেই যেন আজ দোলা দিয়ে গেছে।

অত বড় একটা পাপীর এমনি করুণ পরিসমাপ্তি! তীব্র বিষের ক্রিয়ায় সমস্ত দেহ একেবারে নীল হয়ে গেছে। কিরীটী অশ্রুসজল চোখে ডাক্তারের বা কালো ভ্রমরের মাথায় হাত রেখে বললে, ভগবান তোমার আত্মার মঙ্গল করবেন।

কথাগুলো বলতে বলতে কিরীটী যেই কালো ভ্রমরের মাথায় হাত বোলাতে যাবে, অমনি তার কাঁচাপাকা চুলের পরচুলাটাও কিরীটীর আঙুলের সঙ্গে

খসে এল।

একমাথা ভর্তি সুন্দর ঢেউ-খেলানো কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুল। এতক্ষণে যেন মাথার চুল থেকে দেহের প্রতি অণু-পরমাণু পর্যন্ত অপরূপ সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে উঠল। এত সুশ্রী যে কেউ হতে পারে এ যেন ধারণারও অতীত। এমন সুন্দর দেহের অন্তরালে জঘন্য এক শয়তান লুকিয়ে ছিল! আজ শয়তান দেহ ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দেহ আবার আপন সৌন্দর্য ফিরে পেল।

*　　　*　　　*

কিরীটী বলতে লাগল, ডাক্তার প্রথম পরশু রাত্রে আমাদের গৃহে গিয়েছিল এই নকল সাঙ্কেতিক লেখাটার আসল কাগজটা চুরি করতে। কিন্তু সে জানত না যে তার মতলব আমি জাহাজেই ধরে ফেলি। বলে সে একে একে জাহাজের দু-রাত্রির সমস্ত ঘটনা খুলে বললে।

তারপর একটু থেমে কিরীটী আবার বলতে লাগল, কিন্তু তখনও আমার সন্দেহটা ভাল করে দানা বেঁধে ওঠেনি। সেদিন রাত্রে যখন কাগজটা চুরি করে গাড়িতে করে পালায়, তখন তার গাড়ির পিছনে চেপে তার বাড়ি পর্যন্ত যাই। শুধু তাই নয়—কাঁকর দিয়ে তার গাড়ির গায়ে 'K' অক্ষরও লিখে রেখে আসি। কাল দুপুরে ডাক্তারের ওখানে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে ওর শোবার ঘরে পিতলের মূর্তিটার পাশে ওর ডায়েরীটা পেয়ে তখনই সকলের চোখের আড়ালে সেটা লুকিয়ে ফেলি। তারপর মিঃ সেনকে নীচে বিদায় দিতে এসে তাঁর গাড়ির গায়ে 'K' অক্ষরটা দেখে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলাম। যা হোক তখনই বেরিয়ে গিয়ে ডাক্তারের বাড়ির পিছনে গেলাম। চিনতে পারলাম, সেখানেই গতরাত্রে গাড়ির পিছনে করে এসেছিলাম। তখন আর কোন সন্দেহ রইল না। হ্যাঁ, ডাক্তার সান্যালই যে 'কালো ভ্রমর' তাতে আর কোন সন্দেহই আমার রইল না। তারপর ডায়েরীটা খুলে পড়তে পড়তে একেবারে সকল সন্দেহের অবসান হল। কিন্তু একটা কথা তখনও বুঝতে পারিনি। মিঃ সেনের গাড়িতে 'K' লেখা হল কেমন করে? সেটাও পরে একটু ভাবতেই পরিষ্কার হয়ে গেল, ভাবলাম হয়তো সে-রাত্রে মিঃ সেনের গাড়িটাই ডাক্তার নিয়ে এসেছিল।

এমন সময় মিঃ সলিল সেন বললেন, হ্যাঁ, ডাক্তার তাঁর গাড়িটা কারখানায় দেওয়া হয়েছে বলে বিকেলের জন্য আমার টু-সীটারটা চেয়ে নিয়েছিলেন।

কিরীটী অমনি সহাস্যে বলে উঠল, তবে তো সব কিছুই ঠিক ঠিক মিলে গেছে। আর একটা কথা, সনৎবাবুকে যে রেঙ্গুনে আনবে এ কথায় স্থিরনিশ্চিত কেমন করে হয়েছিলাম, আপনারা এখন হয়তো বুঝতে পেরে থাকবেন। কালো ভ্রমরের আগাগোড়াই ইচ্ছা ছিল সে সকলকে নিজের এলাকার মধ্যে টেনে নিয়ে আসে। সে ভেবেছিল দলের একজনকে যদি টেনে নিয়ে আসা যায়, তবে সকলেই তার উদ্ধারের জন্য বর্মা পর্যন্ত ছুটে আসবে। তার অনুমানের বিষয় সে ডায়েরীতেও লিখে রেখেছে। বলা বাহুল্য, তার অনুমান ভুল হয়নি। এবং এও জানতাম, ঐ সাঙ্কেতিক লেখাটা উদ্ধার করতে কালো ভ্রমর আমার গৃহে আসবেই এবং এসেছিলও।

তবে তার ব্যথার দিকটা, অর্থাৎ কি কারণে অমরবাবু ও সনৎবাবুর ওপর তার এতটা প্রতিহিংসার ভাব জেগে উঠেছে, সেটা আমরা তাঁর ডায়েরী পড়বার আগে পর্যন্ত টের পাইনি। এবং ঐখানেই ছিল আমার যত সন্দেহ।

এই পর্যন্ত বলে কিরীটী তার কথা শেষ করল।

সব কথা শুনে তারা সবাই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে গেল।

*　　　　*　　　　*

প্রভাতী সূর্যের সোনালী আলোয় ইরাবতী হেসে যেন গড়িয়ে পড়ছে।

সুব্রত, রাজু, আর কিরীটী ডাক্তারের মৃতদেহ ধীরে ধীরে ইরাবতীর বুকে ভাসিয়ে দিল। ঢেউয়ের তালে তালে দেহটা ভেসে চলল।

সকলের চোখই অশ্রুভারে ঝলমল করে উঠল।

ইরাবতীর শান্তশীতল জলের তলে কালো ভ্রমর ঘুমিয়ে রইল। স্রোত-বিধৌত গৌতম পর্বতোপরি প্যাগোডা ও পর্বতগাত্রে খোদিত অসংখ্য বুদ্ধদেবের মূর্তি সূর্যের আলোয় অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

কালো ভ্রমরের কি সত্যিই মৃত্যু হল?

এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে?

কে ও? কে?

রহস্যভেদী

কিরীটী তখন পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। পয়সার প্রাচুর্য থাকলেও বিলাসিতাকে কোন দিনই সে প্রশ্রয় দেয়নি। শিয়ালদহের এই অন্ধকার গলিতে অখ্যাতনামা এক ছাত্রাবাস 'বাণীভবন'—মাসিক সাত টাকা খাওয়া-থাকা দিয়ে তারই তেতলার এক অন্ধকার খুপরির মধ্যে থাকত।

কলেজের বন্ধুর মধ্যে একজনই ছিল তার বিশেষ অন্তরঙ্গ—সলিল সরকার। সলিল সরকারের বাবা মধুসূদন সরকার ছিলেন কলকাতার একজন বিখ্যাত ধনী। পাট ও ধানচালের কারবারে লক্ষ লক্ষ টাকা খাটত। সলিল তাঁর একমাত্র পুত্র। অত বড় অর্থশালী পিতার পুত্র হয়েও সলিলের মনে এতটুকুও অহঙ্কার ছিল না। বাড়িতে চার-পাঁচখানা গাড়ি থাকা সত্ত্বেও সে ট্রামে-বাসে ছাড়া কোনদিনও কলেজে আসেনি।

সেদিন রবিবার, কিরীটী সারাদিন কোথাও বের হয়নি।

শীতকাল। এর মধ্যেই কুয়াশার তমিস্রা কলিকাতা মহানগরীর বুকে ঘন হয়ে এসেছে। ঘরের মধ্যেও অন্ধকার চাপ বেঁধে উঠেছে একটু একটু করে। সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল।

আগন্তুক দরজার কাছে আসতেই কিরীটী আহ্বান জানাল, এস সলিল, কি খবর ?

আলো জ্বালাসনি এখনও ?

না, কুঁড়েমিতে ধরেছে, বোস্। তারপর, আজ তো আসবার কথা ছিল না সলিল !

মনটা ভাল নেই—তাই ভাবলাম তোর কাছে একটু ঘুরে যাই।

কি হয়েছে রে ?

আশ্চর্য ঘটনা ! বাবার ঘরের সিন্দুকের মধ্যে একটা দলিল ছিল। কয়েক-দিন ধরে হাইকোর্টে একটা মামলা চলছে। দলিলটা সেই মামলা সংক্রান্ত। পরশুও বাবা সন্ধ্যার দিকে দলিলটা সিন্দুকেই দেখেছেন। আজ সকালবেলা সিন্দুক খুলে দলিলটা উকিলকে দিতে গিয়ে বাবা দেখেন, দলিলটা নেই ! সিন্দুকের টাকাকড়ি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু সবই ঠিক আছে, কেবল দলিলটা নেই সিন্দুকে।

সিন্দুকের চাবি কার কাছে থাকে ?

বাবার কোমরেই সর্বদা থাকে। চাবির বিষয়ে বাবা বিশেষ সাবধান চিরদিনই।

ভৃত্য এসে ঘরে হ্যারিকেন বাতিটা জ্বালিয়ে দিল।

দু কাপ চা দিয়ে যেও নন্দু। কিরীটী বললে। নন্দু চলে গেল।

হঠাৎ একসময় কিরীটী প্রশ্ন করে সলিলকে, তোর বাবার ঠিক মনে আছে, গত পরশু সন্ধ্যায় দলিলটা সিন্দুকেই তিনি দেখেছিলেন ?

হ্যাঁ, তাই তো বাবা বললেন।

এ ব্যাপারে কাউকে তিনি সন্দেহ করেন বলে জানিস কিছু ?

বাড়ির লোকজনের মধ্যে বাবা, আমার এক কাকা, আমার তিনটি বোন, মা, পিসিমা, ম্যানেজার বনবিহারীবাবু, আর চাকরবাকর।

চাকরবাকরগুলো নিশ্চয় সবাই বিশ্বাসী?

হ্যাঁ। সকলেই অনেকদিন ধরে আমাদের কাজ করছে।

মামলাটা কার সঙ্গে হচ্ছে?

মামলাটার একটু ইতিহাস আছে কিরীটী।—মৃদু স্বরে সলিল বলে।

ইতিহাস! সবিস্ময়ে কিরীটী বন্ধুর মুখের দিকে তাকায়।

এমন সময় নন্দু দু হাতে দু কাপ ধূমায়িত চা নিয়ে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

কিরীটী বলল, নন্দু, ঠাকুরকে বলে দিস সলিলবাবু আজ এখানেই খাবেন।

যে আজ্ঞে—নন্দু মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে চায়ের কাপ দুটো রেখে চলে গেল।

সলিল বলতে লাগল, সে আজ প্রায় ২৪/২৫ বছর আগেকার কথা। আমি তখন বোধ হয় সবে হয়েছি। চব্বিশ-পরগণার সোনারপুরে একটা প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে যায়। বাগানবাড়িটা ছিল রাজা ত্রিদিবেশ্বর রায়ের। এককালে রাজা ত্রিদিবেশ্বর রায়ের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। রাজা ত্রিদিবেশ্বর ছিলেন যেমন শিক্ষিত উদারচেতা, তেমনি প্রচণ্ড খেয়ালী। ব্যবসার দিকে তাঁর একটা প্রবল ঝোঁক ছিল। ত্রিদিবেশ্বরের পিতামহ যজ্ঞেশ্বর রায় তাঁর নিজের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে ব্যবসা করে মস্ত জমিদারি গড়ে তোলেন এবং গর্ভনমেন্টের কাছ থেকে রাজা খেতাব পান। যজ্ঞেশ্বরের ছেলে রাজ্যেশ্বর পিতার উপার্জিত জমিদারি বাড়াতে না পারলেও টিকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু তার ছেলে ত্রিদিবেশ্বর পিতার মত চুপটি করে পূর্বপুরুষের উপার্জিত অর্থ কেবলমাত্র আঁকড়ে না থেকে সেটা আরো বাড়িয়ে কি করে দ্বিগুণ তিনগুণ করা যায় সেই চেষ্টায় উঠে-পড়ে লাগলেন। কিন্তু চঞ্চলা লক্ষ্মীর সিংহাসন উঠল টলে। নানা দিক দিয়ে ঘরের অর্থ জলের মত বেরিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু মদের নেশার মতই ত্রিদিবেশ্বরকে তখন ব্যবসার নেশায় পেয়ে বসেছে। সংসারে তাঁর আপনার বলতে এক স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ছিল না, কারণ তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের অবিশ্যি সংখ্যা কম ছিল না। স্ত্রীর নিষেধ, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সতর্কবাণী কিছুই তাঁকে টলাতে পারল না। চোদ্দ-পনের বছরের মধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী নিঃশেষে কোথায় মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল। অবশেষে দেনার দায়ে একদিন তাঁর শেষ বসতবাটি সোনারপুরের বাগানবাড়িটাও বিক্রি করতে হল। বাবা সাত হাজার টাকায় সেই বাগানবাড়িটা কিনেছিলেন। বাগানবাড়িটা বাবা কতকটা ঝোঁকের মাথায়ই কিনেছিলেন এবং তার কোন সংস্কারও করেননি। হঠাৎ বছরখানেক আগে অনিল চৌধুরী নামে একজন ভদ্রলোক বাবার কাছে এসে অনুরোধ জানান, বাগানবাড়িটা তিনি কিনতে চান। বাবাও রাজী হয়ে যান। অনিল চৌধুরী বলেছিলেন, বাগানবাড়িটা কিনে সেখানে তিনি একটা স্কুল স্থাপন করবেন। উদ্দেশ্য খুবই ভালো। লেখাপড়া হবে, সব ঠিকঠাক, এমন সময় হঠাৎ বাবা একটা বেনামী চিঠি পেলেন, চিঠিতে লেখা ছিলঃ

> প্রিয় মধুসূদনবাবু, লোকপরম্পরায় শুনলাম, রাজা ত্রিদিবেশ্বরের বাড়িটা নাকি আপনি বিক্রী করছেন। আপনি জানেন না কিন্তু আমি জানি, ঐ বাড়ির কোন এক স্থানে ত্রিদিবেশ্বরের পিতামহ যজ্ঞেশ্বর রায়ের গোটা

দশ-বারো দামী হীরা পোঁতা আছে। সে হীরার দাম সাত-আট লক্ষ টাকা তো হবেই, আরো বেশী হতে পারে। যার কাছে আপনি রাজা ত্রিদিবেশ্বরের বাড়ীটা বিক্রী করছেন সে সেকথা কোন সূত্রে জানতে পেরেছে বলেই বাড়িটা কেনবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে, তা না হলে এতদিনকার ভাঙা বাড়ি, তাও কলকাতার বাইরে কেউ কিনতে চায়? আপনিই ভেবে দেখুন। রাজা ত্রিদিবেশ্বর বা তাঁর পিতা রাজ্যেশ্বরও সেকথা জানতেন না। হীরার কথা একমাত্র রাজা যজ্ঞেশ্বর ও তাঁর নায়েব কৈলাস চৌধুরীই জানতেন। কিন্তু হীরাগুলো যে ঠিক কোথায় পোঁতা আছে, সেকথা একমাত্র যজ্ঞেশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় প্রাণী কেউ জানতেন না। রাজা যজ্ঞেশ্বর হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে মারা যান। কাজেই মৃত্যুর সময় তাঁর লুকানো হীরাগুলোর কথা কাউকে বলে যেতে পারেননি। আপনাকে সব কথাই খুলে বললাম। ইতি— আপনার জনৈক 'শুভাকাঙ্ক্ষী'।

চিঠিখানা পড়ে, কি জানি কেন বাবার মন বদলে গেল। বাবা বাড়িটা বিক্রী করবেন না বলে সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ফেললেন। পরের দিন লেখাপড়া হবে, অনিলবাবু এলেন। বাবা তাঁকে স্পষ্টই বললেন, বাড়ি তিনি বিক্রী করবেন না। অনিলবাবু তো শুনে অবাক। শেষে অনিলবাবু বিশ হাজার পর্যন্ত বাড়িটার দাম দিতে চাইলেন। কিন্তু বাবা তখন একপ্রকার স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছেন যে বাড়িটা বিক্রী করবেন না। তা ছাড়া অনিলবাবুর জেদ দেখে বাবার মনের সন্দেহটা যেন আরো বদ্ধমূল হয়েছে। অবশেষে এক প্রকার বাধ্য হয়েই অনিলবাবু ফিরে গেলেন। এর পরে মাসখানেক কেটে গেল।

আচ্ছা, তোমার বাবা তারপর খোঁজ করেছিলেন কি সত্যি ঐ বাড়ির কোথাও কোন হীরা লুকানো আছে কিনা—was there any truth in it? কিরীটী প্রশ্ন করে।

না। মনের মধ্যে বাবার কোন সন্দেহ থাকলেও বাইরে তার কোন কিছুই প্রকাশ করেননি। অর্থাৎ সত্যি সত্যি হীরাগুলো সে-বাড়ির কোনখানে লুকানো আছে কিনা সে সম্পর্কে কোন সন্ধানই বাবা করেননি। যাহোক এমন সময় এক অভাবিত ঘটনা ঘটল। বাবার কাছে এক উকিলের চিঠি এল ; তার মর্ম এই যে রাজা ত্রিদিবেশ্বরের সোনারপুরের যে বাড়ি বাবা কিনেছেন সে ক্রয় আইনত অসিদ্ধ। কেননা প্রথমত সে বাড়িটা আগেই রাজা ত্রিদিবেশ্বর ভুবন চৌধুরীর কাছে দেনার দায়ে বন্ধক রেখেছিলেন। বন্ধকী জিনিস কখনো আইনত বিক্রী করা যায় না। তা ছাড়া বাবাকে দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, বাড়িটা সত্যিই তিনি রাজা ত্রিদিবেশ্বরের কাছ থেকে কিনেছিলেন। উকিলের চিঠি পেয়ে বাবা হাসলেন, কোন জবাবই দিলেন না। কেননা বাবার সিন্দুকে যে দলিল আছে, সেটাই তার প্রমাণ। অবশেষে কোর্টে মামলা উঠল।...গতকাল ছিল দলিল কোর্টে পেশ করবার দিন। এমন সময় অকস্মাৎ দলিলটা গেল চুরি।

কিরীটী বললে, এ যে একটা রহস্য উপন্যাস সলিল!

হ্যাঁ, রহস্য উপন্যাসই বটে।

পুলিসে সংবাদ দেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ, বাবা পুলিসে সংবাদ দিয়েছেন। আজ বিকালের দিকে তাদের আসবার কথা ; কিন্তু পুলিসের লোক আসবার আগেই বাড়ি থেকে চলে এসেছি

আমি।

আমি কি ভাবছি জানিস সলিল? ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়। একটু চেষ্টা করলেই ব্যাপারটার সুরাহা করা যেতে পারে।

সলিল উৎসাহে একবারে উঠে বসে, পারবি দলিলটা খুঁজে বের করে দিতে কিরীটী?

কিরীটী সলিলের কথার কোন জবাবই দিল না, একটু হাসলে শুধু।

নন্দু এসে জানাল রাত্রির আহার্য প্রস্তুত।

কিরীটী নন্দুকে দুজনের খাবার ওপরে দিয়ে যেতে বলল।

* * *

যখনকার কথা বলছি, ঢাকুরিয়া অঞ্চলে তখনো আধুনিকতার হাওয়া লাগেনি, লেক তো দূরের কথা। সেখানে তখন ছিল ঘন বনজঙ্গল ও ধানক্ষেত। রেল লাইনের ধার দিয়ে দু-একটা পাকা বাড়ি দেখা যেত মাত্র।

ঢাকুরিয়া স্টেশনের কাছেই মধুসূধন সরকারের প্রকান্ড চারমহলা বাড়ি। বাড়ির সামনের দিকে একটি চমৎকার ফুলের বাগান। নানা জাতীয় ফুলগাছ সংগ্রহ করে বাগানটিকে তিনি সাজিয়েছেন। বাগানটি তাঁর অতি প্রিয়। কাজকর্মের অবকাশে সকাল-সন্ধ্যায় যে সময়টুকু তিনি অবসর পান, ওই বাগানেই ঘুরে ঘুরে বেড়ান।

বাগানটা যেন তাঁর কাছে একটা নেশার বস্তুর মতই হয়ে উঠেছিল। চিরদিনই তিনি অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করেন, বাগানের মধ্যে খালি গায়ে চটিপায়ে পায়চারি করেন সূর্য ভাল করে না ওঠা পর্যন্ত। সেদিন সকালের দিকে শীতটা যেন বেশ একটু চেপেই পড়েছে। ভোরবেলা একটা হালকা কমলালেবু রংয়ের দামী শাল গায়ে জড়িয়ে মধুসূধন বাগানের মধ্যে একাকী পায়চারি করছেন, এমন সময় সলিলের সঙ্গে কিরীটী এসে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করল।

কিরীটী এর আগেও দশ-বারোবার সলিলদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে এবং মধুসূদনবাবুর সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয়ও আছে। কিরীটী মধুসূদনবাবুকে কাকাবাবু বলে ডাকে।

ওদের দেখে মধুসূদনবাবু বললেন, এই যে! তোমরা এত সকালে কোথা থেকে?

কিরীটী জবাব দিল, সলিল কাল আমার ওখানে ছিল কাকাবাবু, সলিলকে আসতে দিইনি, আজ সকালে একসঙ্গে আসব বলে। আপনার শরীর ভাল তো কাকাবাবু?

হ্যাঁ বাবা, বুড়ো হাড় কোনমতে জোড়াতালি দিয়ে যে কটা দিন চালানো যায়। তারপর তোমার শরীর ভাল তো?

হ্যাঁ কাকাবাবু।

তোমাদের পরীক্ষাও তো এসে গেল, না?

হ্যাঁ, আর মাস তিনেক বাকী আছে।

বাবা, কিরীটী বলছিল তোমার হারানো দলিলটা ও খুঁজে বের করে দেবে। বললে সলিল।

মধুসূদন পুত্রের কথায় চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিরীটীর দিকে তাকালেন।

কিরীটী ধীরভাবে বললে, খুঁজে বের করে দেবো এমন কথা আমি বলিনি, তবে চেষ্টা করব, অবিশ্যি কাকাবাবু আপনার যদি তাতে কোন আপত্তি না থাকে।

কিরীটীর কথা শুনে মধুসূদন খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইলেন, তারপর মৃদুস্বরে বললেন, বেশ তো, চেষ্টা করে দেখ।

কিন্তু চেষ্টা করতে হলে যে আপনার সাহায্যই সর্বপ্রথম আমার প্রয়োজন কাকাবাবু!

সাহায্য?

হ্যাঁ।

কি ভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি বল?

আমি যে দলিলটা খোঁজবার ভার নিয়েছি, সে কথা আপনি ও সলিল ছাড়া ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারবে না। আর আমি যা বলব আপনাকে তা করতে হবে।

মধুসূদন আবার খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলেন, মনে মনে বেশ কৌতূহলীই হয়ে উঠেছিলেন তিনি কিরীটীর কথাবার্তায়। মৃদুস্বরে বললেন, বেশ, তাই হবে।

বাইরে ততক্ষণে রোদ উঠে গেছে।

কিরীটী বললে, চলুন কাকাবাবু ঘরে চলুন, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

সকলে বাড়ির দিকে অগ্রসর হল।

আগেই বলেছি, বাড়িটা চারমহলা, দোতলা। প্রথম মহলে মধুসূদনের ব্যবসা সংক্রান্ত দশ-বারোজন কর্মচারী ও ম্যানেজার বনবিহারীবাবু থাকেন। দ্বিতীয় মহল ব্যবসায়ের জিনিসপত্রের গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তৃতীয় মহলে দাস-দাসীরা থাকে ও বাইরের লোকেরা আহারাদি করে। চতুর্থ মহলই প্রকৃতপক্ষে অন্দরমহল।

অন্দরমহলে ওপরের দক্ষিণের দুটো ঘরে মধুসূদনবাবু থাকেন—একটা তাঁর বসবার ঘর, অন্যটা শয়নকক্ষ। অন্য দুটির একটিতে থাকে সলিল, আর একটি পুজোর ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নীচের একটি ঘরে খাওয়াদাওয়া হয়, একটিতে পিসীমা সলিলের তিনটি বোনকে নিয়ে থাকেন, একটিতে থাকেন সলিলের কাকা বিপিনবাবু, অন্যটিতে অতিথি-অভ্যাগত এলে থাকে।

কিরীটী বললে, যে ঘরে সিন্দুকটা ছিল সেই ঘরটা সর্বপ্রথমে দেখতে চাই।

মধুসূদন বললেন, তুমি সলিলের সঙ্গে গিয়ে ঘরটা দেখ, ততক্ষণে আমি ম্যানেজারের সঙ্গে কয়েকটা কথা সেরে আসি। এই বলে তিনি চলে গেলেন।

সলিলের সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী মধুসূদনের শয়নকক্ষে এসে প্রবেশ করল। ঘর খালি, মা অনেকক্ষণ উঠে গেছেন, এতক্ষণে হয়তো পুজোর ঘরে ব্যস্ত।

বেশ বড় আকারের ঘরখানি, দক্ষিণ-পূব খোলা। কিরীটী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ব্যালকনির ঠিক পাশ দিয়েই একটা নারিকেল গাছ উঠে গেছে। ব্যালকনির থেকে হাত বাড়িয়ে অনায়াসেই নারিকেল গাছটা ধরা যায়। তবে তাতে বিপদের সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তা নয়। হাত ফসকে

যাওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে। ঘরটা একেবারে বারান্দার শেষপ্রান্তে। তা ছাড়া ঐ ঘরের সংলগ্নই ছাদে যাওয়ার দরজা। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের তেমন বাহুল্য নেই। দুটি সিংগল বেড পাশাপাশি, নিভাঁজ শয্যা বিছানো। মধুসূদন যে খাটে শয়ন করেন তার এক পাশে একটি শ্বেতপাথরের গোল টেবিলের ওপরে রক্ষিত ফোন। এক পাশে একটা আয়না বসানো কাপড়ের আলমারি এবং আলমারির ঠিক পাশেই মানুষ-প্রমাণ উঁচু মজবুত লোহার সিন্দুক। সিন্দুকের গায়ে বেশ বড় একখানি জার্মান তালা ঝুলছে। সিন্দুকের ঠিক পাশেই একটি টুলের ওপরে জলের কুঁজো; তার মাথায় বসানো একটি কারুকার্যখচিত শ্বেত-পাথরের গ্লাস।

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো মুখোমুখি পূব-পশ্চিমে দুখানি বড় অয়েল-পেনটিং—মধুসূদনের মা ও বাবার। ফটোটি ঠিক সিন্দুকের ওপরেই টাঙানো।

ছেলেবেলায় কিরীটীর ছবি আঁকার দিকে খুব ঝোঁক ছিল। সে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ছবি দুটিকে খুঁটিয়ে শিল্পীর মন নিয়ে দেখতে লাগল। ফটো দুটির গায়ে ঝুল পড়েছে সামান্য। বেশ কিছুদিন যে ঝাড়াপোঁছা হয়নি তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

সলিল প্রশ্ন করলে, অমন করে কি দেখছিস কিরীটী?

বিলিতী ফ্রেম বলেই মনে হয়। তোর ঠাকুর্দার ফটোটা ঠিক দেওয়ালের সঙ্গে সেট করা হয়নি—একটু যেন বাঁয়ে হেলে আছে। কিরীটী জবাব দেয়।

এমন সময় মধুসূদন এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

কি দেখছ? প্রশ্ন করলেন মধুসূদনবাবু।

আপনার বাবার অয়েলপেনটিংটা দেখছিলাম। বেশ সুন্দর। শিল্পীর হাত চমৎকার, যেন একটা প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় তুলির প্রতিটি টানে।

হ্যাঁ, একজন ইটালীয়ান শিল্পীর আঁকা। তোমাদের চা-পর্ব এখনও হয়নি নিশ্চয়ই। চল আমার বসবার ঘরে; ওখানে বসে চা-পান করতে করতে তোমার যা আলোচ্য আছে তা আলোচনা করা যাবে।

চলুন।

সকলে এসে পাশের ঘরে প্রবেশ করলেন।

সুদৃশ্য ট্রেতে করে ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল। একটি ছোট গোল টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম নামিয়ে দিয়ে সে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

সলিল উঠে চা ঢালতে লাগল।

কিরীটী একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ; সে ভাবছিল অয়েলপেনটিংটার কথা। কোথায় কোন্ মাটির তলায় একটা সন্দেহের বীজ যেন অংকুরোদ্গমের সম্ভাবনায় ওপরের দিকে ঠেলে উঠতে চাইছে।

*　　*　　*

চা-পানের সংগে সংগে নানা আলাপ আলোচনা চলছিল।

হঠাৎ একসময় মধুসূদন বললেন, তুমি বোধ হয় জান না কিরীটী, ঐ দলিলটার একটা পূর্ব ইতিহাস আছে।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, সলিলের মুখে গতকাল অনেকটা শুনেছি কাকাবাবু এবং সে ইতিহাস শোনবার পর থেকেই আমার মনে একটা অদম্য স্পৃহা জেগেছে দলিলটা খুঁজে বের করবার। আচ্ছা দলিলটা চুরি যাওয়ার আগের দিন থেকে এবং আপনি যখন জানতে পারলেন দলিলটা সিন্দুকে নেই,

ঐ সময়কার সমস্ত ঘটনা যতটা আপনি জানেন, একটু বাদ না দিয়ে আমাকে সব বলতে পারেন কাকাবাবু?

মধুসূদন কী যেন একটু ভাবলেন, তারপর মৃদুস্বরে বললেন, দলিলটার পূর্ব ইতিহাস যখন তুমি সলিলের মুখে শুনেছই, তখন সেটার আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। দলিলটা যে সিন্দুক থেকে কি করে চুরি যেতে পারে, এখনো তার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই ভেবে স্থির করতে পাচ্ছি না। তবে স্থূল চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, দলিলটা চুরি গেছে এবং এখন সেইটাই সবচাইতে বড় কথা। বাড়িতে লোকজনের মধ্যে আমি, বিপিন, দিদি, সলিলের মা আর সলিলের তিন বোন। প্রতিদিন আমি বিকেল পাঁচটার মধ্যেই দোকান থেকে ফিরি। কিন্তু পরশু ফিরতে আমার রাত্রি প্রায় নটা হয়ে যায়। সকালবেলা দোকানে যাওয়ার আগে সেদিন সিন্দুক খুলে যখন কয়েকটা আবশ্যকীয় কাগজপত্র রাখছি, দলিলটা তখনো সিন্দুকেই ছিল মনে আছে।

আপনার দেখতে ভুল হয়নি তো কাকাবাবু?

দেখবার ভুল আমার কোন দিনই হয় না বাবা, তা হলে এত বড় ব্যবসাটা চালানো আজ কষ্টকর হত। যাহোক শোন। দলিলটা তখনও সিন্দুকেই ছিল। সেই রাত্রে একটা ব্যাপার ঘটেছিল ; প্রথমে ভেবেছিলাম তার হয়তো কোন গুরুত্ব নেই, কিন্তু পরে অনেক ভেবে মনে হচ্ছে সে ব্যাপারটার সংগে কোথাও দলিল চুরি যাওয়ার একটা সূত্র জট পাকিয়ে থাকলেও থাকতে পারে। রাত্রি তখন বোধ করি একটা হবে। রাত্রে আমার তেমন সুনিদ্রা হয় না কিছুদিন থেকে। সামান্য শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু সেদিন বড় ক্লান্ত ছিলাম বলে ঘুমটা যেন বেশ গাঢ়ই হয়ে এসেছিল। হঠাৎ একটা খস্‌খস্‌ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে ভাবলাম ও কিছু নয়। কিন্তু তবুও কান খাড়া করেই রইলাম। আবার খস্‌খস্‌ শব্দ কানে এল, শব্দটা যেন পাশের ঘর থেকেই আসছে মনে হল। ভাবলাম হয়তো বেড়াল হবে। হঠাৎ একটা ক্যাঁচ করে শব্দও হল। এবার আর দেরি না করে উঠে পড়লাম। ঘরের বাতি নিভানো। ডায়নামো রাত্রি এগারটার পর বন্ধ হয়ে যায়। ঘরে মোমবাতি থাকে, প্রয়োজন হলে তাই জ্বালানো হয়। শয্যা থেকে উঠে শিয়রের কাছে রক্ষিত মোমবাতিটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে পাশের ঘরের দিকে চললাম। পাশের ঘরটা খালি। কিন্তু বারান্দার দিকের দরজাটা হা-হা করছে খোলা ও দরজাটা চিরদিন আমি নিজ হাতেই বন্ধ করে শুই, সেদিনও তাই করেছিলাম। কেমন খটকা লাগল। তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে বাইরে বারান্দায় এলাম। আকাশে সামান্য একটুখানি চাঁদ ; তারই অস্পষ্ট আলোয় মনে হল, যেন কে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে নীচে। মোমবাতিটা চট্‌ করে নিভিয়ে দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম ; কিন্তু আর কিছুই চোখে পড়ল না। তবু নীচে পর্যন্ত গেলাম। বাইরে যাবার দরজা বন্ধ। মানে রাত্রে ওটা তালা দেওয়া থাকে কিনা বরাবর। তোমার কাকীমাই প্রত্যহ রাত্রে শুতে যাবার আগে তালা দিয়ে যান, আবার সকালে উঠে তালা খুলে দেন। নীচের তিনটে ঘরও বন্ধ, ঠেলে দেখলাম। হয়তো ব্যাপারটা আগাগোড়া আমার চোখের ভুল হতে পারে। ঘুমের চোখে উঠে গেছি। কিন্তু মনের খুঁতখুঁতুনিটা কিছুতেই যেন গেল না। নীচেটা সর্বত্র তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করেও কিছু পেলাম না। সকালে উঠে দারোয়ান চন্দন সিংকে ও গুরবলিকে প্রশ্ন করলাম, কিন্তু তারাও কিছু বলতে পারলে

না। শেষে নটার সময় সিন্দুক খুলে দলিলটা নিতে গিয়ে দেখি সিন্দুকে দলিল নেই। যথারীতি খোঁজাখুঁজি করে বাধ্য হয়ে শেষটায় পুলিসে সংবাদ দিলাম। গতকাল রাত্রে, তখন বোধ করি সাড়ে বারোটা হবে, আমার শোবার ঘরের সংলগ্ন ব্যালকনিতে চুপচাপ চেয়ারটায় অন্ধকারে বসে আছি, হঠাৎ শুনতে পেলাম ব্যালকনির নীচে থেকে যেন একটা তীক্ষ্ম শিসের শব্দ। চমকে উঠে দাঁড়ালাম এবং অন্ধকারে ঝুঁকে নীচে বাগানের দিকে তাকালাম। অন্ধকারে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। আর দেরি না করে তখুনি চিৎকার করে গুরবলিকে ডাকলাম। সঙ্গে সঙ্গেই নীচের বাগানে কে যেন দ্রুতপদে ছুটে পালিয়ে গেল, তার স্পষ্ট শব্দ পেলাম। তোমার কাকীমার কাছ থেকে তখুনি চাবি নিয়ে নীচের দরজা খুলে বাইরে গেলাম। তারপর দারোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে বাগানটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছু দেখতে পেলাম না। কিন্তু টর্চের আলোয় বুঝতে পারলাম, ব্যালকনির নীচে কেউ কিছুক্ষণ আগে দাঁড়িয়ে ছিল। কেননা ঐ জায়গায় কতকগুলো নতুন ফুলের চারা লাগানো হয়েছে, মালী সেখানে বিকেলের দিকে জল দিয়েছিল। নরম মাটির ওপরে অনেকগুলো জুতোর ছাপ পড়েছে।...

কিরীটী এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে মধুসূদনের কথা শুনছিল, একটি কথাও বলেনি। হঠাৎ সে ধীর সংযত ভাবে বললে, দলিলটা বোধ হয় আপনার পাওয়া যাবে কাকাবাবু। আচ্ছা পুলিসের কছে কি এসব কথা আপনি বলেছেন কাকাবাবু?

না। হয়তো তারা হাসবে এই ভয়ে বলিনি।

বেশ করেছেন, এখনও বলবেন না। তবে একটা কাজ করতে হবে আপনাকে।

কী?

দিনরাত্রি গোপনে বাড়ির আশপাশে পাহারা রাখতে হবে এখন থেকে।

সে আর এমন কঠিন কি? আমার বাড়িতে তিনজন দারোয়ান আছে এবং দোকানে দুজন আছে। দোকান থেকে একজনকে নিয়ে আসব; চারজন অনায়াসেই পাহারা দিতে পারবে।

আপনি এখুনি সেই ব্যবস্থা করুন। আপনাকে আর আপাততঃ আমার প্রয়োজন হবে না।

এরপর মধুসূদনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

মধুসূদন চলে গেলে কিরীটী ওঁর কাছে শোনা কথাগুলো আগাগোড়া আর একবার মনে মনে বিশ্লেষণ করে দেখল। চাবির রহস্যটা কিছুতেই সে যেন উদ্ধার করতে পারছে না। চাবিটা চুরি গিয়েছিল এ বিষয়ে কোন ভুলই নেই। কিন্তু কেমন করে চুরি গেল সেটাই রহস্য। কে চুরি করতে পারে? কার দ্বারা চুরি হওয়া সম্ভব? সহসা তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একটা পথ সে অস্পষ্ট যেন দেখতে পাচ্ছে। তাই যদি হয়, তবে চাবি চুরিরও একটা মীমাংসা পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে মধুসূদনের কাহিনীরও একটা মীমাংসা আপাততঃ খাড়া করা সম্ভবপর। কিন্তু তাও কি সম্ভব? সম্ভবই বা নয় কেন? এ দুনিয়ায় মানুষ স্বার্থের জন্য করতে না পারে এমন কিছু আছে কি? কিন্তু স্বার্থটা কোথায় এবং কার?

কি ভাবছিস কিরীটী? সলিল প্রশ্ন করে।

আজকের রাতটা জাগতে হবে সলিল, পারবি তো?

নিশ্চয়ই পারব।

তবে শোন্ কি করতে হবে আমাদের। ঐ আলমারিটার পিছনে তোকে আজ রাত্রি দশটার পর থেকে অতি গোপনে থাকতে হবে। আর আমি থাকব তোদের ছাদের ওপরে চিলেকোঠার মধ্যে। সন্ধ্যার পরই আমি সে ঘরে যাব। যতক্ষণ না আমার বাঁশীর আওয়াজ পাবি বের হবি না।

বেশ। কিন্তু চিলেকোঠাটা তো ভীষণ নোংরা হয়ে আছে।

ক্ষতি নেই তাতে এতটুকু।

রাত্রি বারোটা। শীতের রাত্রি যেন ঘুম-ভারাক্রান্ত। কোথাও এতটুকু হাওয়া নেই। চারিদিক নীরব নিথর। কিরীটী নিঃশব্দে কাঠের প্যাকিং কেসের ওপরে বসে আছে।

রাত্রি দেড়টা।

ছাদের ওপর কার নিঃশব্দ চাপা পায়ে চলাচলের আভাস। কিরীটী উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে...হ্যাঁ, এগিয়ে আসছে এই ঘরের দিকেই। খুট করে একটা শব্দ হল শিকল খোলার। কিরীটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

মাথায় স্বল্প ঘোমটা, সারাদেহ বস্ত্রাবৃত কে যেন ঘরে এসে প্রবেশ করল। ফস্ করে দেশলাই জ্বালাবার শব্দ হল। আগন্তুক একটা মোমবাতি জ্বালালে। মোমবাতির আলোয় ঘরটা যেন সহসা জেগে উঠল।

মোমবাতিটা হাতে করে আগন্তুক এগিয়ে বাগানের দিকে জানালার ওপরে মোমবাতিটা বসালে। তারপর নিঃশব্দে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

এক মিনিট দু মিনিট কেটে গেল। কিরীটীও তেমনি চুপচাপ, আগন্তুকও নিঃশব্দ। এমনি করে আধ ঘণ্টা কেটে গেল। সহসা এমন সময় আগন্তুক সেই ধূলিমলিন মেঝের ওপর লুটিয়ে কাঁদতে শুরু করলে।

কিরীটী এবারে এগিয়ে এল।

ভূলুণ্ঠিতা নারীর সর্বাঙ্গ কান্নার বেগে ফুলে ফুলে উঠছে। এলোচুল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

ধীরে ধীরে কিরীটী ডাকলে, পিসিমা?

কে? ত্রস্তে পিসিমা উঠে মোমবাতিটা হাতে নিয়ে পেছনদিকে তাকালেন, তাঁর অবস্থা দেখে মনে হয় যেন আচমকা পথের মাঝে ভূত দেখেছেন! কপাল বেয়ে তখনও অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

পিসিমা উঠে বসুন। ভয় নেই আপনার, আমি কিরীটী।

পিসিমা যেন বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেছেন। কিরীটী এই সময় —এত রাত্রে—এইখানে? সমস্ত কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

* * *

কিরীটী ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিতে যেতেই আর্তস্বরে পিসিমা বলে উঠলেন, না না—নিভিও না।

কিন্তু তবু কিরীটী আলোটা নিভিয়ে দিল, না পিসিমা, আলোটা না নিভিয়ে দিলে সে ধরা পড়বে। তাতে আপনার লজ্জা আরো বেশী হবে।

নিঃশব্দে সে পালিয়ে যাক। ধরা পড়লে যে কলঙ্ক হবে, তা থেকে তাকে বাঁচানো মুশকিল হবে। ভয় নেই পিসিমা আপনার কোন। কত বড় দুঃখে যে আপনি এ কাজে হাত দিয়েছেন, আপনি না বললেও তা আমি বুঝতে পারছি। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। কিরীটীর কথার কখনো খেলাপ হয় না।

সহসা পিসিমা কিরীটীর দু হাত চেপে ধরে চাপা কান্নায় ভেঙে পড়লেন, শম্ভুকে বাঁচাও কিরীটী। সে আমার ছেলে। আজ তোমাকে আমি সব খুলে বলব। দীর্ঘদিন এই দুঃসহ ব্যথা ও লজ্জা আমি বুকে চেপে বেড়াচ্ছি। লোকে জানে শম্ভু মারা গেছে, কিন্তু আসলে তা নয়। শম্ভুর যখন তেরো বছর বয়স তখন তার বাবা মারা যান। লেখাপড়া শিখিয়ে তাকে মানুষ করতে আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু অসৎ সঙ্গে মিশে সে গোল্লায় গেল। চোদ্দ বছর বয়সের সময় সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। দু বছর কত খুঁজলাম, কিন্তু তার কোন সন্ধানই পেলাম না। শেষে দাদার এখানে চলে এলাম। দীর্ঘ এগার বছর পরে দিনদশেক আগে কালীঘাটের মন্দিরে সন্ধ্যার সময় তার সঙ্গে দেখা হল। তাকে দেখেই আমি চিনেছিলাম। সে আমাকে কালীমন্দিরে দেখা করবার জন্য আগে একটা চিঠি দিয়েছিল। সঙ্গদোষে আজ সে অধঃপতনের শেষ সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে। রোগজীর্ণ কঙ্কালসার দেহ। বোধ হয় আজ আর তার কোন নেশাই বাদ নেই।
আর তার নেশাই বাদ নেই।

কাঁধের ওপরে তার একরাশ ধার। যার কাছ থেকে সে টাকা ধার নিয়েছে, সে শাসিয়েছে আগামী দশদিনের মধ্যে টাকা না শোধ করতে পারলে তাকে তারা জেলে দেবে। তাই সে আমার শরণাপন্ন হয়েছে। কিন্তু আমি বিধবা, মান খুইয়ে ভাইয়ের সংসারে এসে পড়ে আছি, কোথায় আমি টাকা পাব? একটা কাজ করতে পারলে একজন তাকে এক হাজার টাকা দেবে বলেছে। সে কাজ হচ্ছে দাদার সিন্দুক থেকে সোনারপুরের বাড়ির দলিলটা এনে দেওয়া। শুনে ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠল। কিন্তু সে কাঁদতে লাগল, টাকা না পেলে তাকে জেলে যেতে হবে। আর কোন উপায়ই নেই। হায় রে মায়ের প্রাণ!...তিন রাত বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করছি ; শেষে সন্তানের দাবিই জয়ী হল। কি করে যে দলিলটা চুরি করেছিলাম, সে লজ্জার কথা আর বলতে চাই না বাবা তোমার কাছে। কথা ছিল পরের দিন রাত্রে সে বাগানে এসে দাঁড়াবে এবং শিস দেবে, আমি দলিলটা জানালা দিয়ে নীচে ফেলে দেব। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল। তাই আজ এসেছিলাম এ ঘরে—আলোর নিশানা তাকে জানাতে। ...আমার মানসম্ভ্রম আজ সবই তোমার হাতে বাবা। পিসিমা কাঁদতে লাগলেন।

কাঁদবেন না পিসিমা, চুপ করুন। আমি জানি দলিলটা কোথায়। এ কাহিনী আমি ছাড়া আর কেউই জানতে পারবে না। আপনি নীচে যান। যা করবার আমি করব।

পিসিমা নিঃশব্দে নীচে চলে গেলেন। কিরীটীও নীচে গেল। সলিল তখনো আলমারির পিছনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে।

সলিল বেরিয়ে আয়! ডাকলে কিরীটী।

সলিল আলমারির পিছন থেকে বের হয়ে এল, কি ব্যাপার?

দলিল পাওয়া গেছে।

সত্যি ?

হ্যাঁ—বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে কিরীটী মধুসূদনের বাবার ফটোর পিছন থেকে খামসমেত দলিলটা বের করে দিল।...পাশের ঘরে মধুসূদনবাবু তখনো জেগেই বসে ছিলেন, কিরীটীর সঙ্গে সলিল গিয়ে মধুসূদনের হাতে দলিলটা দিল।

মধুসূদন বিস্ময়ে একেবারে থ হয়ে গেছেন যেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে পেলে ?

ঐটি আমাকে মাপ করতে হবে কাকাবাবু। আমি বলতে পারব না কেমন করে কোথায় পেলাম এবং কে চুরি করেছিল!

বেশ। কিন্তু অপরাধীর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন, এ কথা তো মানো তুমি ?

কাকাবাবু, পৃথিবীতে সব অপরাধেরই কি শাস্তি হয়? আপনার দলিলের প্রয়োজন, দলিল পেয়েছেন। আর একটা অনুরোধ আপনার কাছে—এ বিষয় নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করতে পারবেন না আপনি।

বেশ তাই হবে।

এর পরদিন কিরীটী এক হাজার টাকা এনে পিসিমার হাতে দিল।

এ টাকা কিসের কিরীটী? পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন।

শম্ভুকে দেবেন পিসিমা, আর তাকে বলবেন এবার সৎপথে চলতে। ওপথে কেবল দুঃখই বাড়ে, সুখ নেই। এটা আমার প্রণামী পিসিমাকে।

একটা কথা কাল থেকে কেবলই আমার মনে হচ্ছে বাবা, কী করে তুমি জানতে পেরেছিলে ?

কিরীটী তখন মধুসূদনের কথাগুলো আগাগোড়া বলে গেল। প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম, কোন বাইরের লোক দলিল চুরি করতে পারে না। নিশ্চয়ই কোন ঘরের লোক এ কাজ করেছে। কিন্তু কে? বাড়ির লোকজনের মধ্যে আপনি, সলিলের কাকা এ ছাড়া আর কাউকেই সন্দেহ করা যায় না—এবং বুঝেছিলাম দলিল এখনও বাড়ির বাইরে যায়নি এবং শীঘ্রই সেটা বাইরে যাবে। দ্বিতীয় রাত্রে চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সংগ্রহকারী বিফল হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। আবার সে আসবেই, তাই সব আঁটঘাট বেঁধে আমি কাজে নেমেছিলাম। তবে আপনাকে আমি একেবারেই সন্দেহ করিনি—করেছিলাম সলিলের কাকাকে। আপনাকে চিলেকোঠায় দেখে সত্যিই চমকে গিয়েছিলাম। কাকাবাবুর বাবার ফটোটা একটু কাত হয়ে ছিল, কিন্তু মনে একটা খটকা লাগলেও সেটা খুঁজে দেখিনি। পরে আপনার কথা শুনে বুঝেছিলাম, তাড়াতাড়িতে আপনি ফটোর পিছনে দলিলটা রেখে পালিয়ে এসেছিলেন।

সত্যিই তাই, দাদার পায়ের শব্দ পেয়ে আমি ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ঘরের লোকই যে নিয়েছে তা তুমি বুঝলে কি করে ?

কাকাবাবুর একটি মাত্র কথায়। পায়ের শব্দ শুনে তিনি যখন পাশের ঘরে আসেন, তখন দরজাটা খোলা ছিল পাশের ঘরের এবং তিনি দেখেছিলেন কাউকে পালিয়ে যেতে, তারপর নীচে গিয়ে দেখলেন, বাইরে যাওয়ার দরজাটা তালা দেওয়া। তাতেই বুঝেছিলাম বাইরের কেউ নয়, ভিতরেরই কেউ। ...আচ্ছা পিসিমা, আজ তবে আসি।

কিরীটী পিসিমাকে প্রণাম করে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

சகி

ঠিক সমুদ্রের উপকূল ঘেঁষে 'সাগর-সৈকত' হোটেলটি। বলতে গেলে ছোট-খাটো শহরটি যেন গড়ে উঠেছে সাগরেরই কূল ঘেঁষে। শহরটিতে নানা শ্রেণীর স্বাস্থ্যান্বেষীদের ভিড় ও আনাগোনা যেন লেগেই আছে। এবং একমাত্র বর্ষাকাল ব্যতীত বৎসরের বাকি সময়টা নানা জাতীয় নানা শ্রেণীর যাত্রীদের আনাগোনা চলে। মাঝে মাঝে হোটেলে স্থান পাওয়াই দুষ্কর হয়ে ওঠে। 'সাগর-সৈকত' হোটেলটির মালিক একজন সিন্ধী। সময়টা মাঘের শেষ এবং শীত এখনো যেন বেশ আঁকড়েই বসে আছে এখানে। কিরীটীর ধারণা, শীতকালে কোনো সমুদ্র-সৈকতই নাকি রৌদ্রসেবনের প্রকৃষ্ট স্থান এবং এমন কোন স্থানে আসতে হলে নাকি মনের মত একজন সংগী বা সাথী অপরিহার্য, অতএব আমাকেও সে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে সংগে করে, আমার কোন যুক্তিতেই সে কান দিতে চায়নি।

আমি অনেক করে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, রৌদ্রসেবনের আমার আদৌ প্রয়োজন নেই, যেহেতু আমার জন্মগত দৈহিক কৃষ্ণবর্ণের উপরে আর এক পোঁচ কৃষ্ণ রঙ সূর্যদেবতার নিকট হতে আমি গ্রহণে একান্তই অনিচ্ছুক, কিন্তু আমার যুক্তি সে মেনে নিতে রাজী হয়নি, বলেছে, গায়ের রঙটাই বড় কথা নয় সুব্রত। আমাদের মাথার মধ্যে যে স্নায়ুকোষের গ্রে সেলগুলো আছে, সূর্য-রশ্মির মধ্যস্থিত বেগুনী-পারের আলোর প্রভাবে সেগুলো আরো সজীব ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। তা ছাড়া সমুদ্রের মত মনের খোরাকও কেউ দিতে পারে না। তুই দেখবি, কী আশ্চর্যরকম সক্রিয় করে তোলে রৌদ্রসেবন তোর মনকে ও চিন্তাশক্তিকে!

কিন্তু রৌদ্রসেবন তো এখানে বসেও চলতে পারে?

উঁহু। এখানে হলে চলবে না। রৌদ্রসেবনেরও অনুপান আছে—সমুদ্র-সৈকত। কিরীটী মাথা নেড়ে জবাব দেয়।

কিরীটীর যুক্তিকে হয়তো তর্কের ঝঞ্ঝা তুলে কিছুক্ষণ ক্ষতবিক্ষত করতে পারতাম কিন্তু তাতেও তাকে নিরস্ত্র করা যেত না; কারণ রৌদ্রসেবন ও সমুচ-সৈকত একটা অছিলা মাত্র। মোট কথা মনে মনে কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গা সে স্থির করেছে এবং কিছুদিনের জন্য সে সেখানে গিয়ে নিরবচ্ছিন্ন খানিকটা নিষ্ক্রিয় আরাম উপভোগ করতে চায় এবং সাথী হতে হবে আমায়। তাই বৃথা আর যুক্তিতর্কের জাল না বুনে একান্তভাবেই ওর হাতে আত্মসমর্পণ করে দিনপাঁচেক হল আমরা এই জায়গাটিতে এসে 'সাগর-সৈকত' হোটেলে অধিষ্ঠিত হয়েছি এবং হোটেলের সামনে খোলা জায়গাটিতে বসে রীতিমত রৌদ্রসেবনও চলেছে আমাদের।

'সাগর-সৈকত' হোটেলটি থেকে সমুদ্র হাত-কুড়ি-পঁচিশের বেশী দূরে হবে না। হোটেলের বারান্দা হতে সমুদ্র একেবারে স্পষ্ট দেখা যায়—ঐ দিগন্তে আকাশ ও সমুদ্র যেন প্রীতির আনন্দে কোলাকুলি করছে। একটানা সমুদ্রের নোনা বাতাসে ভেসে আসছে যেন অবিশ্রাম নিষ্ঠুর চাপা হাসির একটা উল্লাস।

সফেন তরঙ্গগুলি যেন আদি-অন্তহীন সমুদ্রের ঝকঝকে করাল দন্তপাতি। পৃথিবীর তিন ভাগ জল, একভাগ স্থল। বলতে গেলে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মাটি, যেটুকু সমুদ্রের বলয়গ্রাসের বেষ্টনীতে বন্দী হয়ে আছে সেটুকুও যেন গ্রাস করবার জন্য দুরন্ত নিষ্ঠুর ঐ জলধির চেষ্টার অন্ত নেই। ব্যাকুল নির্মম লক্ষ লক্ষ বাহু প্রসারিত করে মুহুর্মুহুঃ সে মাটির বুকে দুরন্ত উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ক্ষুরধার তৃষিত লোল জিহ্বা দিয়ে লেহন করে নিষ্ঠুর কলহাসিতে যেন পরক্ষণেই আবার ভেঙে শতধায় গুঁড়িয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

বেলা প্রায় সাড়ে আটটা হবে। সূর্যের তাপ এখনো প্রখর হয়নি। হোটেলের সামনেই বালুবেলার উপরে নিত্যকারের মত আমি ও কিরীটী দুটো ক্যাম্বিসের ফোলডিং চেয়ার পেতে কিরীটীরই নির্দেশমত শোলার হ্যাট চাপিয়ে গেঞ্জি গায়ে পায়জামা পরিধান করে যথানিয়মে রৌদ্রসেবন করছি। রৌদ্রসেবনের ফলাফল যাই হোক, শীতের সকালে সমুদ্রোপকূলে বসে রৌদ্রের তাপটুকু বেশ উপভোগই করছিলাম।

অল্প দূরেই সমুদ্র-সৈকত এবং শীতকাল হলেও নানাজাতীয় যুবা-বৃদ্ধ-পুরুষ-রমণী ও কিশোর-কিশোরী স্নানার্থী ও দর্শকদের ভিড়ে সমুদ্র-সৈকতটি আলোড়িত হচ্ছে এবং মধ্যে মধ্যে তাদের উল্লাসের সুস্পষ্ট গুঞ্জনও কানে আসছে সাগর-বাতাসে ভেসে।

হোটেলের সামনে যে জায়গাটিতে আমরা বসে আছি তাকে ছোটখাটো একটা উদ্যান বলা চলে। নানাজাতীয় পাতাবাহারের গাছ ও মরসুমী ফুলের বিচিত্র রঙিন সমারোহ স্থানটিকে সত্যিই মনোরম করে রেখেছে। হোটেল থেকে যে পায়ে-চলা-পথটা বরাবর সাগর-সৈকতে গিয়ে মিশেছে, তার দু' পাশে ঝাউয়ের বীথি। সাগর-বাতাসে ঝাউ গাছের পাতায় একটা করুণ কান্না যেন নিরন্তর দীর্ঘশ্বাসের মত ছড়িয়ে যাচ্ছে।

অল্পক্ষণ আগে কিরীটী তার মাথা থেকে শোলার টুপিটা খুলে একটা মোটা লাঠির মাথায় বসিয়ে পাশেই বালুর মধ্যে লাঠিটা পুঁতে দিয়ে আড় হয়ে আরাম-কেদারটার ওপরে বাম হাঁটুর উপরে ডান পা-টা তুলে দিয়ে মৃদু মৃদু নাচাচ্ছিল সামনের সাগর-সৈকতের দিকে তাকিয়ে। হাতের মুঠোয় ধরা একটা ইংরাজী উপন্যাস। হঠাৎ আমাকে সম্বোধন করে বললে, সু, ঐ সাদা ফ্লানেলের লংস ও গায়ে কালো গ্রেট কোট একটা চাপিয়ে যুবকটি এই দিকেই আসছে, স্রেফ ওর চলা দেখে এই মুহূর্তে ওর মনের চিন্তাধারার একটা study করে বলতে পারিস কিছু?

হাতের মধ্যে ধরা বাংলা বইটা বুজিয়ে কিরীটীর কথায় সামনের দিকে তাকালাম, শ্লথ মন্থর পায়ে যুবকটি এইদিকেই আসছে। একেবারে পথের ধারের ঝাউবীথি ঘেঁষে আসছে যুবক। মুখের রঙ শ্যামবর্ণই। মাথার এক-রাশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বাতাসে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে উড়ছে। চুলের সঙ্গে তেলের বা চিরুনির যে সংস্পর্শ বড় একটা নেই বোঝা যায় বিস্রস্ত রুক্ষ চুলগুলো দেখে। যুবকের দুটি হাতই পরিহিত গ্রেট কোটের দু পাশের পকেটে প্রবিষ্ট। মুখটা নিচু করে হাঁটার দরুন ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় কোন কারণে যুবক যেন একটু চিন্তিতই।

ভদ্রলোকটি বোধ হয় কিছু ভাবছেন!

ভাবছেন? কী ভাবছেন? কিরীটী প্রশ্ন করে, হিত না অহিত?

চলতে চলতে ঐ সময় যুবকটি একবার সামনের দিকে দৃষ্টি তুলে তাকাল।

তা কী করে বলি, থট্‌রীডিং তো জানা নেই!

থট্‌ রীড করতে তো বলিনি তোকে, বলেছি ভদ্রলোকের গেইট্‌ অর্থাৎ চলাটা দেখে বলতে,—অর্থাৎ পা থেকে মাথা।

কিরীটীর মুখের কথাটা শেষ হল না, হঠাৎ কেমন একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে এল। সেই সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় উপবিষ্ট কিরীটীর পাশেই লাঠির মাথায় বসানো তার শোলার টুপিটা ছিটকে গিয়ে মাটিতে পড়ল ও অস্ফুট একটা কাতর শব্দও কানে এল।

ঘটনার আকস্মিকতায় দুজনেই চমকে উঠেছিলাম। জায়গাটায় হাওয়া ছিল কিন্তু হাওয়ার বেগ এত ছিল না যাতে করে সহসা অমন করে লাঠির মাথায় বসানো কিরীটীর টুপিটা উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়তে পারে।

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি, মাত্র হাত ৮।১০ ব্যবধানে একটু পূর্বে যে যুবকটিকে কেন্দ্র করে আমাদের কথাবার্তা চলছিল, সে বাঁ হাতে তার নিজের ডান কাঁধটা চেপে মাটির উপরেই বসে পড়েছে। আমি তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেলাম যুবকটির দিকে। তার সামনে গিয়ে পৌঁছবার আগেই যুবক উঠে দাঁড়িয়েছে, চোখে-মুখে তার সুস্পষ্ট একটা যন্ত্রণার চিহ্ন। যুবকের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, পড়ে গিয়ে হঠাৎ কাঁধে লাগল বুঝি? পড়ে গেলেন কি করে?

আমার প্রশ্নে যুবকটি মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। মৃদুকণ্ঠে বললে, ঠিক বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ কাঁধে যেন একটা ধাক্কা লাগতে পড়ে গেলাম আচমকা। না, তেমন কিছু লাগেনি।

হঠাৎ ধাক্কা লাগল মানে? বিস্মিত আমি প্রশ্ন করলাম।

কিরীটী ইতিমধ্যে তার টুপিটা মাটি হতে কুড়িয়ে আমাদের কাছে এসে কখন দাঁড়িয়েছে টের পাইনি। সহসা অতি নিকটে তার কণ্ঠস্বর শুনে যুগপৎ আমরা দুজনেই ফিরে তাকালাম।

মনে হচ্ছে একটা বুলেট সুব্রত!

বুলেট! সবিস্ময়ে কথাটা উচ্চারণ করে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে ঘুরে তাকালাম।

কিরীটী কিন্তু তখনও গভীর মনোযোগ সহকারে তার হস্তধৃত টুপিটা ঘুরিয়ে দেখছে এবং দেখতে দেখতেই মৃদু কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই—it was a bullet and that blessed bullet pierced through and through my poor hat!

এবং কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় হস্তধৃত টুপিটা আমার চোখের সামনে তুলে ধরে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি আমার কথাটা? Well see—এই দেখ্‌!

তাকিয়ে দেখলাম কিরীটীর কথা মিথ্যা নয়, সত্যি। টুপিটার দুই দিকে দুটি গোলাকার ছিদ্র।

কিন্তু সর্বাগ্রে আপনাকে একবার দেখা দরকার। বলতে বলতে কিরীটী

আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান যুবকটির দিকে অগ্রসর হয়। বুঝতে অবশ্য পারছি আঘাতটা নিশ্চয়ই তেমন মারাত্মক হয়নি, তা হলেও আপনার কাঁধের ক্ষতস্থানটা একটিবার পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। জামাটা খুলুন তো!

না না—বিশেষ কিছু হয়নি, যুবকটি কাঁধের উপর থেকে ততক্ষণে হাতটা সরিয়ে নিয়েছেন। স্মিতভাবে বললেন, ব্যস্ত হবেন না।

আপনি বলছেন কি—মানে—

আমার নাম শতদল বোস। না, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। মৃদু হাস্যতরল কণ্ঠে জবাবটা দিলেন মিঃ বোস। এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় গায়ের গরম ওভার-কোটটা খুলে ফেলে দিলেন। কোটের নিচে সাদা টুইলের শার্ট ছিল। দেখা গেল মিঃ বোসের কথাই সত্য। গুলিটা তাঁর কাঁধ ছুঁয়ে গেলেও কোটের নীচে শার্ট পর্যন্তও পৌঁছয়নি। বোধ হয় সামান্য কাঁধের উপর দিয়ে ছুঁয়ে গেছে, যার ধাক্কাতেই বেমক্কা তিনি টলে পড়ে গেছেন।

যাক্ গে—না লেগে থাকলেই ভাল! But it was a bullet—এযাত্রা খুব বেঁচে গেছেন যা হোক। কিরীটী স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলে।

মিঃ বোস আবার কথা বলেন, কিন্তু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না তো! আপনি বলছেন একটা বুলেট, কিন্তু কই, কোন ফায়ারিং-এর শব্দও শুনলাম না! তা ছাড়া এখানে আমাকে গুলিই বা করবে কে? এবং কেন?

কে আর করবে! করেছেন অবশ্য তিনিই যিনি হয়তো এ পৃথিবীতে আপনার বেঁচে থাকাটা বাঞ্ছনীয় মনে করছেন না! তা ছাড়া ফায়ারিং-এর শব্দ বলছেন? সমুদ্রের হাওয়া ও সী-বীচের স্নানার্থীদের একটানা হৈ-হল্লার মধ্যে ফায়ারিং-এর শব্দটা না শুনতে পাওয়াটাও বিশেষ কিছু আশ্চর্য নয়। তা ছাড়া পিস্তলে সাইলেন্সারও তো লাগানো থাকতে পারে। তাতেও আপনি ফায়ারিং-এর শব্দ শুনতে পাবেন না। কিন্তু কেউ না কেউ যে একটা গুলি ছুঁড়েছে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। বলতে বলতে হঠাৎ কথাটার মোড় ঘুরিয়ে কিরীটী অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়, আপনিও আমাদের মতো স্বাস্থ্যান্বেষী নাকি মিঃ বোস? না এইখানেই থাকেন?

আজ্ঞে দুটোর একটাও নয়। মাসখানেক হল বিশেষ একটা কাজে এখানে এসে আছি। ঐ দেখছেন যে দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের ওপর বাড়িটা—ঐ বাড়িতেই আমি থাকি।

শতদলবাবুর কথা অনুসরণ করে দক্ষিণদিকে আমরা তাকালাম। সমুদ্রের কোল ঘেঁষে একটা ছোট পাহাড়, তারই উপরে যেন ঐতিহাসিক দুর্গের মতো বাড়িটা দূর থেকে মনে হয়। দুর্গের মতো পাহাড়ের উপরের ঐ বাড়িটার প্রতি এখানে এসে পৌঁছবার পরদিনই প্রত্যুষে কিরীটী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দূর হতে মনে হয় একখানা ছবি। পাহাড়টা লোকালয় হতে আধ মাইলটাক দূর তো হবেই।

কিরীটী শতদলবাবুর কথায় দূর পাহাড়ের মাথায় দুর্গের মতো বাড়িটার দিকে তখনও তাকিয়ে ছিল অন্যমনে। একসময় ঐ দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে শতদলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, অদ্ভুত জায়গায় বাড়িটা তৈরী করা হয়েছে! বাড়িটা যিনি তৈরী করেছিলেন তাঁর সম্পর্কে দুটো কথা কেউ না

বললেও, স্বতঃই মনে হয়—

কী বলুন তো? সকৌতুকে শতদল প্রশ্ন করে।

প্রথমতঃ, যিনিই বাড়িটা তৈরী করে থাকুন, বিশেষ খেয়ালী-প্রকৃতির ছিলেন তিনি। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর অর্থের অভাব ছিল না—

আশ্চর্য! সত্যি তাই। বাড়িটা আমার দাদামশাইয়ের। এককালে পূর্ব-বঙ্গে ওঁদের সুবিস্তীর্ণ জমিদারী ছিল। যার আয় ছিল শুনেছি প্রায় বাৎসরিক লক্ষাধিক টাকা। আর দাদামশাই লোকটিও ছিলেন নিজে একজন নামকরা চিত্র ও মৃৎশিল্পী। শিল্পী রণধীর চৌধুরীর নাম শুনেছেন নিশ্চয়!

নিশ্চয়ই। শুনেছি বৈকি। অত বড় শিল্পপ্রতিভা নিয়ে আমাদের দেশে খুব কম লোকই জন্মেছেন। আপনি তাঁরই দৌহিত্র?

হ্যাঁ। তাঁর একমাত্র মেয়ের একমাত্র পুত্র। তাঁর বিরাট সম্পত্তির শেষ ও একমাত্র অবশিষ্ট তাঁর ঐ 'নিরালা' নামক পাহাড়ের ওপরে বাড়িখানার ওয়ারিশন। মৃদু হাস্যতরল কণ্ঠে শতদল বললে।

একজন শিল্পীর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মূল্যের দিকে যাচাই করতে গেলে হয়তো আপনাকে হতাশই হতে হবে। কিন্তু সাগরের উপকূলে ঐ পাহাড়ের উপর নগরের কোলাহল হতে দূরে অমন একখানা বাড়ির মধ্যে যে মহামূল্যবান সৌন্দর্য-সৃষ্টির ইঙ্গিত ওর প্রতিটি গাঁথুনির মধ্যে ওতোপ্রোত হয়ে জড়িত আছে, তার মূল্য নিছক স্রেফ কাঞ্চনমূল্যে তো ধার্য করা যায় না শতদলবাবু। বিশেষ মূল্যেই যে ওর বিশেষত্ব।

শতদলবাবু কিরীটীকে বাধা দিয়ে কী বলতে উদ্যত হতে কিরীটী বলে ওঠে, না না শতদলবাবু, এ সংসারে সব কিছুকেই নিছক টাকার নিক্তিতে ওজন করবেন না। এ শিল্পীর প্রতিভা—

আপনিও হয়তো আমার দাদুর মতই শিল্প-পাগল, তাই ওই নির্জন সমুদ্রের উপকূলে জনমানবের বসতি ছাড়িয়ে পাহাড়ের উপর বাড়িখানা দূর থেকে দেখেই অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্যের আভাস পাচ্ছেন। এবং বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করলে হয়তো আরও কিছু দেখতে পাবেন। কারণ বাড়ি-ভর্তি সব নর-নারীর স্ট্যাচু এবং অয়েল ও ওয়াটারকলার পেণ্টিং, এ ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু আমি অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক লোক, অতি সাধারণ ছাপোষা মধ্যবিত্ত মানুষ, আমার কাছে ওর কী-ই বা মূল্য বলুন! শতদল হাসতে হাসতে বলে।

মানুষের মন এমনিই বিচিত্র বটে মিঃ বোস, কিন্তু মন আপনার যতই বস্তু-তান্ত্রিক হোক, আপাততঃ ক্ষমা করবেন, একটা কথা আপনাকে আমি কিন্তু না বলে পারছি না—আপনার প্রাণটি নেবার জন্য কেউ-না-কেউ অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন।

এবারেই হাসালেন মশাই। আমার মত একজন অতি সাধারণ লোকের প্রাণের এমন কি মূল্য আছে বলুন তো যে সেটি নেবার জন্য কেউ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠবে! না আছে আমার অগাধ সম্পত্তি, না আছে এ দুনিয়ায় আমার কোন শত্রু।

হতে পারে, তবে আমার কথায় যদি বিশ্বাস করেন তাহলে জানবেন—it was a pure and simple attempt on your life!

সত্যি নাকি? আমার কৌতূহলটা মাপ করবেন, আপনার নামটি জানতে পারি কি?

কিরীটী রায়। মৃদুকণ্ঠে কিরীটী জবাব দেয়।

নমস্কার। আপনিই কি বিখ্যাত সেই রহস্যভেদী কিরীটী রায়?

বিখ্যাত কিনা জানি না, তবে আমিই কিরীটী রায়। মৃদু হেসে কিরীটী জবাব দেয়।

আর উনি?

সুব্রত।

কী সৌভাগ্য, আপনার মত লোকের এখানে পদার্পণ হয়েছে অথচ জানতেও পারিনি! তা আসুন না আজ আমার বাড়িতে। রাত্রির আহারপর্বটা গরীবের ঘরেই সারবেন—

বিলক্ষণ, সে একদিন হবে'খন। তবে আজ নয়, কাল সকালের দিকে যাব, আপনার ঐ বাড়িটা দেখতে। কিরীটী জবাব দেয়।

আসবেন, নিশ্চয় আসবেন কিন্তু। শতদলবাবু অনুরোধ জানান দন্দদ দিয়ে।

যাব। কিন্তু আমার কথাটা মনে থাকে যেন।

কি বলুন তো? শতদল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল আবার।

একটু সাবধানে থাকবেন। আপনার আততায়ীটীর নিশানা একবার ব্যর্থ হলেও, বার বার ব্যর্থ নাও হতে পারে।

সত্যিই কি আপনার তাই সন্দেহ নাকি কিরীটীবাবু, আমার জীবনের উপরেই কেউ attempt নিয়েছিল!

কোন ভুল নেই তাতে। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, একটু ভেবে বলুন তো—আজকের এই দুর্ঘটনার আগে আপনার অন্য কোন accident দু-দশদিনের মধ্যে হয়েছে কিনা?

Accident!

হ্যাঁ, মানে কোনপ্রকার দুর্ঘটনা?

কই, এমন বিশেষ কোন ঘটনা তো আমার মনে পড়ছে না যাকে প্রাণহানিকর দুর্ঘটনার পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে!

ভেবে দেখুন—

না মশাই। তবে—, কিন্তু তাকে দুর্ঘটনাই বা বলি কি করে এবং সেগুলো যে আমার জীবনের ওপরেই attempt নেওয়া হয়েছে তাই বা—

কী ঘটেছিল বলুন তো?

এমন বিশেষ কিছুই নয়। এই তো পরশু রাত্রে যে ঘরে শুই—আমার ঠিক শিয়রের ধারে মাথার উপরে দেওয়ালের গায়ে মস্ত বড় একটা অয়েলপেণ্টিং টাঙানো ছিল, হঠাৎ মাঝরাত্রে সেটা ছিঁড়ে আমার মাথার কাছেই পড়ে—অবশ্য অল্পের জন্যই আঘাত পাইনি—

হুঁ। আর কোন ঘটনা ঘটেছে?

গতকাল সন্ধ্যার সময় পাহাড়ের গায়ের ঢালু পথ বেয়ে নিচে নেমে আসছি, হঠাৎ একটা বড় পাথরের চাঁই গড়াতে গড়াতে আর একটু হলে হয়তো আমার ঘাড়েই পড়ত এবং ঐ পাথরটা এসে গায়ে পড়লে একেবারে যে পিষে ফেলত তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে দুটো ব্যাপারই তো pure and simple accident! আমার জীবনের ওপরে attempt বলি কী করে! আপনি না

বললে হয়তো মনেও পড়ত না, ভুলেই গিয়েছিলাম—

ভুলে যে যাননি তার প্রমাণ আপনার ঘটনা দুটির narration এবং আগের দুটি যেমন আপনার জীবনের উপরে attempt হয়েছিল, আজও ঠিক তেমনি চেষ্টা হয়েছিল। তিন-তিনবার নিষ্ফল হয়েছে যখন, চতুর্থবারের প্রচেষ্টা হয়তো খুব শীঘ্রই হবে। সাবধান হবেন।

কিরীটীর চরিত্রের সঙ্গে আমি যতখানি পরিচিত অনেকেই তা নয় এবং বিশেষ করে সে যখন কোন সাবধান বাণী উচ্চারণ করে, তার গুরুত্ব যে কতখানি সেও আমার চাইতে বেশী কেউ জানে না। কিন্তু শতদলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, তিনি যেন কিরীটীর কথায় কোন গুরুত্বই আরোপ করতে পারছেন না। সামান্য দু-চারটে কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে বুঝেছিলাম, শতদলবাবু মানুষটি বেশ দিলখোলা ও সরল প্রকৃতির। সংসারের কূটনীতি যেন তাঁকে কোনরূপে স্পর্শই করতে পারে না।

শতদল হাসতে হাসতেই এবার প্রত্যুত্তর দিলেন, আপনি যখন অত করে বলছেন মিঃ রায়, চেষ্টা করব সাবধান হতে।

হ্যাঁ, করবেন। এবং শুধু বাইরেই নয়, বাড়ির মধ্যেও সাবধানে থাকবেন।

বাড়ির মধ্যেও সাবধানে থাকব? কী বলতে চাইছেন আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না!

এই ধরুন, যে ঘরে আপনি রাত্রে শয়ন করেন সে ঘরটা ভাল করে দেখে-শুনে শোবেন।

কেন বলুন তো, রাত্রেও কেউ আমার শয়নঘরে চড়াও হয়ে আমার প্রাণ-হানি করবার চেষ্টা করবে নাকি?

ঘরের বাইরে ও ভিতরে যখন চেষ্টা হয়েছে, সেটা কিছু অসম্ভব নয়।

সহসা এমন সময় কুড়ি-বাইশ বৎসরের অপরূপ সুন্দরী একটি তরুণী হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা একেবারে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে শতদলবাবুকেই সম্বোধন করে বললে, বাবাঃ, এতক্ষণে তোমার আসবার সময় হল? দোতলার বারান্দা থেকে তোমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসছি। স্টেশনে আসনি কেন?

তরুণীর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে আমরা তিনজনেই আগন্তুক তরুণীর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

এই তো সবে সকালেই আজ তোমার চিঠি পেয়েছি রাণু—তুমি কবে এসে পৌঁচেছ?

কাল সকালের গাড়িতে—, রাণু জবাব দেয়, কিন্তু সত্যি তুমি আজই আমার চিঠি পেয়েছ?

হ্যাঁ। কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকায় শতদল রাণুর মুখের দিকে।

বিশ্বাস করি না। অভিমান-স্ফুরিত কণ্ঠে রাণু জবাব দেয়।

সে হবেখন। এসো আগে এঁদের সঙ্গে তোমার আলাপটা করিয়ে দিই রাণু। আশ্চর্য ভাবেই এঁদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল এইমাত্র। এঁকে চেনো? বিখ্যাত রহস্যভেদী কিরীটী রায় আর ইনি সুব্রত রায়—

শতদলের কথায় রাণু আমাদের দিকে তাকাল। কিন্তু আমাদের পরিচয় পেয়ে যে সে বিশেষ কিছু আনন্দিত হয়েছে তেমন কোন কিছু তার মুখের চেহারায় বোঝা গেল না।

তথাপি সে হাত তুলে বোধ হয় একান্ত সৌজন্যের খাতিরেই আমাদের নমস্কার জানাল।

সহসা এমন সময়ে কিরীটী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, চল্‌, সুব্রত, সমুদ্রের ধারে একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

বলে কাউকে কোনরূপ আর কোন কথার অবকাশ মাত্রও না দিয়ে সমুদ্র-সৈকতের দিকে এগিয়ে চলল। অগত্যা কতকটা যেন বাধ্য হয়েই তাকে আমি অনুসরণ করলাম।

কিরীটীর হঠাৎ এভাবে চলে আসাটা কেমন যেন আকস্মিক ও বিসদৃশ বলেই আমার কাছে মনে হল।

কিন্তু কিরীটী বেশী দূর অগ্রসর না হয়েই সামনেই জলের একেবারে কোল ঘেঁষে বালুর উপরেই একটা জায়গায় হঠাৎ বসে পড়ল। আমিও পাশে বসলাম।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। কারো মুখে কোন কথা নেই। বুঝলাম, কোন একটা বিশেষ চিন্তা আপাততঃ কিরীটীর মাথার মধ্যে ফেনিয়ে চলেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভাবছিস কিরীটী?

কিরীটী আনমনে সমুদ্রের দিকেই তাকিয়ে ছিল। সেই দিকেই তাকিয়ে সে বলল, পর পর দুটি আবির্ভাব। বুলেট ও নারী—সুন্দরী তরুণী!

কিরীটীর কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল যাতে তার মুখের দিকে না তাকিয়ে আমি পারলাম না।

॥ ২ ॥

কিরীটী কিছুক্ষণ আবার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।

হঠাৎ আবার কতকটা যেন খাপছাড়া ভাবেই কিরীটী বলে উঠল, এমন সুন্দর পৃথিবী অথচ মানুষগুলোর কি বিচিত্র স্বভাব! শান্তির মধ্যে নিশ্চয়-তার মধ্যে যেন ওরা কিছুতেই দিন কাটাতে চায় না!

মৃদু হেসে বললাম, কেন, তোর আবার শান্তির অভাব ঘটল কিসে?

এখনো বলছিল অভাব হল কিসে? এর পরও শান্তিতে থাকতে পারব বলে মনে করিস? দুর্ঘটনাটা ঘটবার সংগে সংগে স্থির করেছিলাম ওদিকে চোখ দেব না কিন্তু শতদল আর রাণু,—নাঃ, কিছুতেই যোগে মিলছে না। কিন্তু তারও আগে সর্বাগ্রে আমাকে একটিবার ঐ নির্জন সাগরকূলে পাহাড়ের উপরে 'নিরালা' নামক বাড়িখানি দেখতে হচ্ছে—

তোর কি তাহলে ধারণা যে, ঐ বাড়িটার সংগেই কোন রহস্য জড়িয়ে আছে কিরীটী?

নিশ্চয়ই, নচেৎ এমন অকস্মাৎ বুলেটের আবির্ভাব ঘটবে কেন?

কিন্তু একটা কথা তোকে না বলে পারছি না। বুলেটটা যেন বুঝলাম, কিন্তু রিভলবারের—

কথাটা আমায় কিরীটী শেষ করতে না দিয়েই বলে ওঠে, আওয়াজটা শুনতে পাসনি, এই তো? কিন্তু বললাম তো—

কিন্তু—

রিভলবারের সঙ্গে সাইলেন্সার ফিট করা ছিল।

কিন্তু গুলিটা এল কোন্ দিক থেকে?

পূর্ব দিক অর্থাৎ সাগরের দিক থেকেই এসেছে বলে আমার মনে হয়।

ঐসময় সেই দিকে অত লোকজন ছিল!

সেটা তো আরো চমৎকার কেমোফ্লাজ—শতদলবাবুর দিক থেকে সামান্য একটুক্ষণের জন্য আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম সুব্রত, তোর সঙ্গে কথা বলতে বলতে এবং ঠিক সেই মুহূর্তটিতে ব্যাপারটা ঘটে গেল, নচেৎ আমার দৃষ্টিকে সে এড়াতে পারত না।

সহসা একটা আনন্দ-মিশ্রিত হাসির শব্দে চমকে ফিরে তাকালাম। মাত্র হাত-আট-দশ দূরে সমুদ্রের ধার দিয়ে শতদল ও রাণু পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। এবং রাণু ও শতদল দুজনেই খুব হাসছে।

চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু ওদের দুজনকে কিরীটী! চেয়ে দেখ, **a nice pair!**

আমি ওদের সম্পর্কে বিশেষ করে বলা সত্ত্বেও কিরীটী ফিরে তাকাল না, কেবল মৃদুকণ্ঠে বললে, নির্জন সাগরকূলে পাহাড়ে উপরে এক দুর্গ গড়ে তুলেছিল এক আপনভোলা শিল্পী। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সেই দুর্গের মধ্যে শিল্পী বসে বসে কখনো আঁকত ছবি, কখনো গড়ত মূর্তি, কিন্তু তার চাইতে বড় কথা—আমাদের দেশে যে একটা প্রবাদ আছে, মরা হাতির দামও লাখ টাকা—যদি সেই দিক দিয়ে ভাবা যায়, তাহলে কী দাঁড়ায় বল্?

কিন্তু উত্তরাধিকারী শতদলবাবুই তো একটু আগে বলে গেলেন, অবশিষ্ট এখন মাত্র ঐ গৃহখানিই। সম্পত্তির আর কিছু অবশিষ্ট নেই—

তারই দাম লাখ টাকা। চল্, ওঠা যাক। হোটেলে গিয়ে আপাততঃ তো এক কাপ গরম চা সেবন করা যাক। বলতে বলতে কিরীটী উঠে দাঁড়াল এবং হোটেলের দিকে চলতে শুরু করল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম।

সমস্তটা দ্বিপ্রহর কিরীটী হোটেলের সামনের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারের উপরে হেলান দিয়ে একটা মোটামত বাংলা উপন্যাস নিয়েই কাটিয়ে দিল।

সকালের ব্যাপারে তাকে বিশেষভাবে যে একটু উত্তেজিত বলে মনে হয়েছিল, সে উত্তেজনার যেন এখন অবশিষ্টমাত্রও নেই। তার হাবভাব দেখে মনে হয় ব্যাপারটা যেন সে ইতিমধ্যেই একেবারে ভুলেই গিয়েছে। মনের মধ্যে তার কোন চিহ্নমাত্রও নেই।

বাইরে শীতের রৌদ্র ইতিমধ্যেই ঝিমিয়ে এসেছে। নিভন্ত দিনের আলোয় সমুদ্রও যেন রূপ বদলিয়েছে। বিষণ্ণ ক্লান্তিতে সমুদ্রের নীল রঙ কালো রূপ ক্রমে ক্রমে নিচ্ছে যেন। এ বেলা আর স্নানার্থীদের কোন ভিড় নেই। তবু বায়ুসেবনকারীদের চলাচল শুরু হয়েছে।

হোটেলের ভৃত্য শিবদাস চায়ের ট্রেতে করে চা ও কিছু কেক বিস্কুট রুটি জ্যাম সামনের টেবিলের ওপরে এনে নামিয়ে রাখল।

কিরীটী একমনে পড়ছে দেখে আমিই উঠে চায়ের কাপে চা ঢেলে কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে বললাম, চা!

কিরীটী হাতের বইটা মুড়ে কোলের উপর নামিয়ে রেখে চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিল। উষ্ণ চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললে, তোর সঙ্গে

টর্চ আছে না সুব্রত?

আছে।

কেডস্ জুতো আছে?

না, তবে আমার ক্রেপ-সোলের জুতো—

ওতেই হবে।

কোথাও বের হবি নাকি?

হ্যাঁ, 'নিরালা' দর্শনে যাব।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে দুজনে 'নিরালার' দিকে অগ্রসর হলাম।

সূর্যাস্তের পূর্বে ওখানে আমাদের পেঁছতে হবে। কিরীটী বলল।

তা আর পারা যাবে না কেন?

ক্রমে লোকালয় ছেড়ে সমুদ্রের কোল ঘেঁষে অপ্রশস্ত একটা পায়ে-চলা পথ ধরে আমরা দুজনে এগিয়ে চললাম। সমুদ্র যেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। টের পাচ্ছি সমুদ্রের পাড় যেন ক্রমে সমুদ্র থেকে উঁচু হয়ে চলেছে। সমুদ্রের গর্জমান ঢেউগুলো পাড়ের গায়ে এসে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। এ জায়গাটায় সমুদ্রের পাড়টা বড় বড় পাথর দিয়ে বাঁধানো। মধ্যে মধ্যে বড় বড় এক-একটা ঢেউ বাঁধানো পাড়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলকণার ফুলঝুরি ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বিকেল থেকেই হাওয়াটাও যেন বেড়েছে।

ক্রমে খাড়াই পথ ধরে আমরা উপরের দিকে উঠছি। চমৎকার বাঁধানো পথ। সূর্য ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে অনেকটা নেমে এসেছে পশ্চিম দিগ্বলয়ে।

তিন-চারশো ফুটের বেশী পাহাড়টা উঁচু হবে না।

ক্রমে যত উপরের দিকে উঠছি, ডান দিকে সমুদ্র আরো স্পষ্ট ও অবারিত হয়ে ওঠে। ভারি চমৎকার দৃশ্যটি।

এমন জায়গায় শিল্পী না হলে কেউ এত খরচ করে বাড়ি করে!

কিরীটীর কথায় সায় না দিয়ে আমি পারলাম না, যা বলেছিস। লোকটা সত্যিই শিল্প-পাগল ছিল।

আরো কিছুদূর উপরের দিকে উঠতেই একটা লোহার গেট দেখতে পেলাম। এবং গেটের সামনে দাঁড়াতেই বাড়িটার সামনের দিকটা সুস্পষ্ট হয়ে চোখের উপর ভেসে উঠল।

মুঘল যুগের স্থাপত্যশিল্পের পরিপূর্ণ একটি নিদর্শন যেন বাড়িখানি। দ্বিতল বাড়িটা, চারদিকে চারটি গোলাকার গম্বুজ। গম্বুজের গায়ে বোধ হয় নানা রঙের পেটেন্ট স্টোন বসানো, অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মি সেই পাথরগুলোর ওপরে প্রতিফলিত হয়ে যেন মরকতমণির মতো জ্বলছে।

বাড়িটার সামনেই একটা নানাজাতীয় ফল-ফুলের বাগান। গেট বন্ধ ছিল, এক পাশের থামে শ্বেত-পাথরের প্লেটে সোনালী অক্ষরে বাংলায় লেখাঃ নিরালা।

গেট ঠেলে দুজনে ভিতরের কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করলাম। হাত-চারেক চওড়া লাল সুরকি ঢালা পথ বরাবর বাড়ির সদর দরজার সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে দুজনে সামনের দিকে এগিয়ে চললাম।

দোতলার ও একতলার সব জানালাগুলোই দেখছি ভিতর থেকে বন্ধ।

মাঝামাঝি রাস্তা এগিয়েছি, হঠাৎ একটা কর্কশ কণ্ঠস্বরে চমকে পাশের দিকে তাকালাম। একঝাড় গোলাপগাছের সামনে হাতে একটা খুরপি নিয়ে একজন প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে।

কাকে চান?

দেখলাম লোকটা বেশ রীতিমত ঢ্যাঙা। এবং একটু কুঁজো হয়েই যেন দাঁড়িয়ে আছে। পরিধানে একটা ধুতি ও গায়ে একটা গরম গেঞ্জি। গেঞ্জির হাতা দুটো গোটানো এবং দুই হাতেই কাদামাটি লেগে আছে। বুঝলাম প্রৌঢ় বাগানের গোলাপ গাছগুলোর সংস্কার করছিল।

প্রৌঢ়ের মাথার চুলগুলো সবই প্রায় পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। কপালের উপর বলিরেখাগুলো বয়সের ইঙ্গিত দিলেও দেহের মধ্যে যেন একটা বলিষ্ঠ কর্মপটুতা দেহের সমগ্র পেশীতে পেশীতে সুস্পষ্ট ও সজাগ হয়ে আছে। দেখলেই বোঝা যায়, এককালে ভদ্রলোক শরীরে যথেষ্ট শক্তি তো ধরতেনই, এখনও অবশিষ্ট যা আছে তাও নেহাত কম নয়।

দেহের ও মুখের রঙ অনেকটা তামাটে। রৌদ্র-জলে পোড়-খাওয়া দেহ। হাতের আঙুলগুলো কী মোটা মোটা ও লম্বা!

ভদ্রলোকের প্রশ্নে এবার কিরীটী জবাব দিল, শতদলবাবু আছেন?

শতদল! সে তো এমন সময় কখনো বাড়িতে থাকে না। গোটাচারেকের সময় বের হয়ে যায়।

ফেরেন কখন?

তা রাত্রে ক্লাব থেকে ফিরতে রাত এগারোটা সাড়ে-এগারোটা হয়।

এখানকার ক্লাব বলতে 'সাগর-সৈকত' হোটেলেরই নিচের একটা ঘরে নাচ-গান তাস দাবাখেলা ও ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা আছে, সেটাই এখানকার ক্লাব। এখানকার স্থানীয় ভদ্রলোকেরা সেইখানেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় এসে মিলিত হন। এবং রাত দশটা পর্যন্ত আনন্দ চলে সেখানে।

আমি যতদূর জানতাম, শতদলবাবু এখানে একাই থাকেন! কিরীটী প্রৌঢ়কে আবার প্রশ্ন করে।

শতদল তো মাত্র মাসখানেক হল এসেছে। আমি আমার স্ত্রী ও আমার মেয়েকে নিয়ে এক বছরের উপরে এখানে আছি। তা ছাড়া চাকর অবিনাশ, মালী রঘুনাথ আছে।

ওঃ, তা আপনি শতদলবাবুর—

রণধীর আমার সম্পর্কে শ্যালক হত।

ওঃ, রণধীরবাবুর আপনি তাহলে ভগ্নীপতি হন?

হ্যাঁ।

চমৎকার জায়গায় বাড়িটি কিন্তু—, কতকটা যেন তোষামোদের কণ্ঠেই কথাটা উচ্চারণ করে কিরীটী।

আর মশাই চমৎকার জায়গা! নেহাত আটকা পড়ে গিয়েছি, নইলে এমন জায়গায় মানুষ থাকে? আধ মাইলের মধ্যে জন-মনিষ্যি পর্যন্ত একটা নেই। রাতবিরেতে ডাকাত পড়লে চেঁচিয়েও কারো সাড়া পাবার উপায় নেই।

কিরীটী হাসতে হাসতে জবাব দেয়, বাইরে থেকে যেভাবে বাড়িটা তৈরী দেখছি তাতে ডাকাত পড়লেও বিশেষ তেমন কিছু একটা সুবিধা করতে পারবে বলে তো মনে হয় না—

এমন সময় সুমিষ্ট মেয়েলী গলায় আহ্বান শোনা গেল, বাবা গো বাবা! এত করে তোমাকে ডাকছি, তা কি শুনতে পাও না? ওদিকে চা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল!

চেয়ে দেখি একটি উনিশ-কুড়ি বৎসরের শ্যামবর্ণ একহারা চেহারার মেয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

মেয়েটির পরিধানে চমৎকার একটি নীলাম্বরী শাড়ি, কলকাতার কলেজের মেয়েদের মত স্টাইল করে পরা, গায়ে সাদা ব্লাউজ।

মেয়েটি ততক্ষণে একেবারে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কখন আবার তুই ডাকলি আমায় সীতা! মেয়েটির বাপ জবাব দেন।

রোগা একহারা চেহারা হলে কী হয় এবং গায়ের রঙ শ্যাম হলেও অপরূপ একটা লাবণ্য যেন মেয়েটির সর্বদেহে। সর্বাপেক্ষা মেয়েটির মুখখানির যেন তুলনা হয় না—চোখে-মুখে একটা তীক্ষ্ম বুদ্ধির ছাপ রয়েছে।

মেয়েটির দেহের সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ তার পর্যাপ্ত কুঞ্চিত কেশ। বর্মীদের ধরনে মাথার উপরে প্যাগোডার আকারে বাঁধা। হাতে একগাছি করে কাচের চুড়ি।

এইটিই আমার মেয়ে সীতা। হ্যাঁ, ভাল কথা—আপনাদের নাম তো জানা হল না! আমার নাম হরবিলাস ঘোষ। হরবিলাস নিজের পরিচয় দিলেন।

পরিচয়টা দিলাম এবারে আমিই, আমার নাম সুব্রত রায়, আর ইনি হচ্ছেন কিরীটী রায়।

আবার একদফা নমস্কার প্রতি-নমস্কারের আদান-প্রদান হল।

আসুন না কিরীটীবাবু, শতদলের কাছে এসেছেন, সে যখন বাড়িতে নেই আমার আতিথেয়তাটুকু না হয় গ্রহণ করুন, এক কাপ করে চা—আপত্তি আছে নাকি কিছু? কথাগুলো বলে হরবিলাস একবার কিরীটী ও একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি একটু ইতস্তত করছিলাম, কিন্তু কিরীটী দ্বিধামাত্র না করে বললে, সানন্দে। বিশেষ করে চা যখন। কিন্তু সীতা দেবী, আপনার আপত্তি নেই তো? কথাটা শেষ করল কিরীটী সীতার মুখের দিকেই তাকিয়ে।

আপত্তি! বা রে, আপত্তি হবে কেন? আসুন না—

হ্যাঁ, চলুন। এই পাণ্ডব-বর্জিত বাড়িতে লোকের মুখ দেখবারও তো উপায় নেই। তাছাড়া আমার স্ত্রীও আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে সুখী হবেন। রোগী মানুষ, কোথাও তো বের হতে পারেন না।

রোগী! কিরীটী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, আজ দু বছর ধরে নিম্ন-অঙ্গের পক্ষাঘাতে ভুগছেন। তাঁর জন্যেই তো এখানে আসা আমার শ্যালকের অনুরোধে।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার প্রকৃতির বুকে ঘন হয়ে এসেছে। দূরে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় মনে হয়, সমুদ্রের জলে কে যেন একরাশ কালো কালি ঢেলে দিয়েছে, কেবল মধ্যে মধ্যে ঢেউয়ের চূড়ায় শুভ্র ফেনাগুলো কোন ক্ষুধিত করাল দানবের হিংস্র দন্তপাতির মত ঝিকিয়ে উঠছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন একটানা ছেদহীন।

প্রকাণ্ড দরজা পার হয়ে আমরা সকলে বাড়ির মধ্যে এসে প্রবেশ করলাম।

সামনেই একটা বারান্দা এবং বারান্দা অতিক্রম করে একটা সুসজ্জিত হলঘর, সেটা পার হয়ে মাঝারি গোছের একটা আলোকিত কক্ষমধ্যে এসে আমরা প্রবেশ করলাম।

ঘরে সিলিং থেকে একটা বাতি ঝুলছে। সেই আলোয় প্রথমেই নজরে পড়ে ঘরের ঠিক মধ্যিখানে একটা টেবিলের পাশে একটা ইনভ্যালিড চেয়ারের উপর বসে একজন স্থূলাঙ্গী মধ্যবয়সী মহিলা উল ও কাঁটার সাহায্যে কী যেন একটা বুনে চলেছেন অত্যন্ত ক্ষিপ্র হস্তে।

ভদ্রমহিলা আমাদের পদশব্দে মুখ তুলে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, কিন্তু হাত দুটি যেন মেশিনের মতই অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে বয়নকার্য চালিয়ে যেতে লাগল।

সিলিং থেকে ঝুলন্ত আলোর স্বল্প রশ্মি যা সেই উপবিষ্ট ভদ্রমহিলার মুখের উপরে এসে পড়েছিল তাতেই তাঁর মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। পাথরের মত ভাবলেশহীন এমন মুখ ইতিপূর্বে খুব কমই যেন চোখে পড়েছে। আর তাঁর দুটি চক্ষুর স্থির দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল যেন আমাদের অন্তস্তল পর্যন্ত ভেদ করে চলে যাচ্ছে। আমাদের চোখে-মুখে এসে যেন বিঁধছে। মুখের একটি রেখারও এতটুকু পরিবর্তন দেখা গেল না।

আড়চোখে একবার কিরীটীর দিকে না তাকিয়ে পারলাম না, কিন্তু কিরীটীর চোখে-মুখে কোন কিছুরই সন্ধান পেলাম না।

হিরণ দেখ, এঁরা আজ আমাদের গৃহে সান্ধ্য-অতিথি। সুব্রতবাবু, কিরীটীবাবু—এই আমার স্ত্রী হিরণ্ময়ী—হরবিলাস শেষের কথাগুলো আমাদের উভয়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে শেষ করলেন।

আসুন। বসুন। কী সৌভাগ্য আমাদের! হিরণ্ময়ী আমাদের নিষ্প্রাণ কণ্ঠে যেন আহ্বান জানালেন। আমরা উভয়ে পাশাপাশি দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম।

আশ্চর্য একটা জিনিস লক্ষ্য করছিলাম, ঘরের সব কটি জানলাই বন্ধ। একটা চাপা গুমোট ভাব যেন সমস্ত ঘরটার মধ্যে থমথম করছে। বুকটা কেমন চেপে ধরছে।

সামনে টেবিলটার ওপরে সূক্ষ্ম সূচের এম্‌ব্রয়ডারি করা একটি টেবিল-ক্লথ বিছানো, তার উপরে সজ্জিত চায়ের সাজসরঞ্জাম। ঘরের মধ্যে আসবাব-পত্র সামান্য যা আছে তাও একন্ত পরিপাটিভাবে যেখানকার যেটি ঠিক হওয়া উচিত রুচিসম্মতভাবে সাজানো। তথাপি মনে হচ্ছিল, সব কিছুর মধ্যে একটা সযত্ন সুচারু পরিচ্ছন্নতা থাকলেও কিসের যেন একটা অভাব আছে। সবই আছে অথচ কী যেন নেই! কোথায় যেন ছন্দপতন হয়েছে!

সত্যিই সৌভাগ্য আমাদের কিরীটীবাবু, আপনাকে আজ আমার ঘরে অতিথি পেয়ে। হিরণ্ময়ী দেবী কিরীটীকে লক্ষ্য করেই কথাটা উচ্চারণ করলেন, আপনাকে ইতিপূর্বে আমার দেখবার সৌভাগ্য না হলেও আপনার নাম আমি শুনেছি।

কিরীটীর ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু একটা হাসির আভাস যেন বঙ্কিম রেখায় জেগে উঠেই মিলিয়ে যায়।

তা ছাড়া—, হিরণ্ময়ী দেবী আবার বলতে শুরু করেন, আজ দেড় বৎসরের মধ্যে এমন জায়গায় পড়ে আছি যে কারও সঙ্গে বড় একটা দেখাই হয় না, তাই

কেউ এলে মনে হয় যেন বদ্ধ এই ঘরটার মধ্যে একটা খোলা হাওয়ার ঝলক বয়ে গেল। উঃ, এই ঘরটি এবং পাশের ছোট একটা ঘর—এরই এই সংকীর্ণতার মধ্যে এই দীর্ঘ দেড় বছরের রাত্রি দিন দুপুরগুলো কীভাবে যে কাটাচ্ছি তা আমি জানি। একটা ক্লান্ত অবসন্নতা যেন হিরণ্ময়ীর কণ্ঠস্বরে মূর্ত হয়ে ওঠে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন তাঁর বুকখানা কাঁপিয়ে বের হয়ে আসে।

হরবিলাস কন্যাকে তাড়া দিলেন, কই রে সীতা, এঁদের চা দে!

সীতা ইতিমধ্যে চায়ের কাপগুলো সাজিয়ে দুধ দিয়ে চা ঢালতে শুরু করেছিল। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনাদের কে কয় চামচ করে চিনি নেন চায়ে?

আমি বললাম, আমাকে ছোট চামচের এক চামচ দেবেন, আর ওকে দেড় চামচ দেবেন।

সীতা আমাদের দিকে চা ও প্লেটে কিছু কেক এগিয়ে দিল।

চা-টা নিতে নিতে বললাম, ও প্লেটটা সরিয়ে রাখুন সীতা দেবী—বিকেলে হোটেল থেকে বের হবার পূর্বেই একপেট খেয়ে এসেছি।

তা হোক, তা হোক, একটু খেয়ে দেখুন—বাজারের জিনিস নয়, আমার স্ত্রীরই নিজের হাতের তৈরী। হরবিলাস বলে উঠলেন।

কিন্তু পেটে যে একেবারে জায়গা নেই হরবিলাসবাবু! কিরীটী হাসতে হাসতে বলে।

আরে মশাই, এক পীস কেক আর খেতে পারবেন না? বললে হয়তো বলবেন লোকটা তার নিজের স্ত্রীর প্রশংসা করছে, কিন্তু তা নয়, ঊনত্রিশ বছর ঘর করছি তো, অমন রান্না মশাই কোথাও খেলাম না! আসবেন একদিন, এখানে দুপুরে আহার করবেন।

না না, উনি রোগী মানুষ—কিরীটী প্রতিবাদ জানায়।

তাতেও কি উনি নিশ্চিন্ত থাকেন! ঐ invalid চেয়ারে বসে বসেই রোজ দুবেলা রান্নার যাবতীয় সব করেন।

সত্যি আশ্চর্য তো! আমি বলি, কষ্ট হয় না আপনার?

বরং এমনি করে সারাটা দিন চেয়ারের উপর নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকাটাই আমার দুঃসহ লাগে। তাই যত পারি নিজেকে engaged রেখে দেহের এই অভিশাপটা ভুলে থাকবার চেষ্টা করি। তাছাড়া দেখুন, এমন জায়গায় পড়ে আছি, একটা লোকজনের মুখ পর্যন্ত দেখবার উপায় নেই। তাই তো ওকে বলি, যে ভাই এত আদর করে এখানে নিয়ে এল আমায়, সেই যখন চলে গেল—আর কেন, চল অন্য কোথাও চলে যাই। দেহটা অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছে বলে বেশী দিন এক জায়গায় থাকতেও ভাল লাগে না।

ঘরের মধ্যে অত্যন্ত গরম বোধ হচ্ছিল। শীতকাল হলেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। কিরীটীরও বোধ হয় গরম লাগছিল ঘরের মধ্যে। সে-ই বলে উঠল, ঘরটার মধ্যে বেশ গরম মনে হচ্ছে যেন—

ওঃ, সত্যিই তো, আমারই ভুল হয়ে গিয়েছে। সীতা, দাও তো মা দক্ষিণের জানালাটা খুলে। এ বাড়িতে এত বেশী হাওয়া যে বিরক্ত ধরে যায়, তাই বেশীর ভাগ সময় জানালাগুলো এঁটে রাখি—

না না, থাক না, তেমন কিছু বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না। কিরীটী প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করে। সীতা কিন্তু ততক্ষণে মায়ের আদেশে এগিয়ে

গিয়ে ঘরের একটা জানালা খুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের সমুদ্রবক্ষ থেকে একঝলক ঠান্ডা হাওয়া ঘরের মধ্যে হু-হু করে বয়ে এল সমুদ্রের নোনা স্বাদ নিয়ে। সেই সঙ্গে এল অদূরাগত সমুদ্রের শব্দকল্লোল। বাইরের দুরন্ত খ্যাপা সমুদ্রের স্পর্শ যেন সমস্ত ঘরটার মধ্যেকার পীড়িত বন্ধ আবহাওয়াটাকে মুহূর্তে এসে একটা মুক্তির স্নিগ্ধ পরশ দিয়ে গেল।

দেখলাম জানালাটা খুলে সীতা আর ফিরে এল না, খোলা জানালার গরাদ ধরেই দাঁড়িয়ে রইল ঘরের দিকে পিছন ফিরে। বাইরের রহস্যময় সমুদ্রের মত সীতার দেহটাও যেন একটা রহস্যে পরিণত হয়েছে।

এখানে বুঝি বেড়াতে এসেছেন মিঃ রায়? হিরণ্ময়ী আবার প্রশ্ন করলেন কিরীটীকেই লক্ষ্য করে।

হ্যাঁ। সী-সাইডটা এখানকার ভারী চমৎকার!

শতদলের সঙ্গে আপনার আগেই বুঝি আলাপ ছিল?

না। আজই সকালে সবে আলাপ হয়েছে।

ওঃ, সবে আজই আলাপ হয়েছে?

হ্যাঁ।

আপনারা আসবেন সে কি জানত না? আবার প্রশ্ন করলেন হিরণ্ময়ী দেবী!

না। ভেবেছিলাম একটা surprise visit দেব।

সহসা এমন সময় বাইরের অন্ধকার ভেদ করে সমুদ্রের একটানা গর্জনকে ছাপিয়ে ক্রুদ্ধ একটা জন্তুর চিৎকার কানে ভেসে এল। বাইরের অন্ধকার যেন সহসা একটা আর্তনাদ করে উঠলো। চমকে হিরণ্ময়ী দেবীর মুখের দিকে তাকাতেই দ্বিতীয়বার আবার সেই ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল, এবারে বুঝলাম কোনো বড় জাতীয় বিলেতী কুকুরের ডাক সেটা।

হঠাৎ সীতা ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুতপদে কক্ষ হতে বের হয়ে গেল।

কুকুরটার গম্ভীর ডাকটা বাইরের অন্ধকারকে যেন ফালি ফালি করে দিচ্ছে।

॥ ৩ ॥

হিরণ্ময়ী দেবীই প্রথমে কথা বললেন, সীতার কুকুর টাইগারটা অমন করে চেঁচাচ্ছে কেন?

কিরীটী ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। হরবিলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, আজ এবার তাহলে আমরা উঠি মিঃ ঘোষ!

উঠবেন? এখুনি উঠবেন? হিরণ্ময়ী দেবী প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ, রাত হয়ে গেল। আবার কাল-পরশু আসব। শতদলবাবুকে তাহলে বলবেন আমরা এসেছিলাম।

বলব, দেখা হলে বলব। হরবিলাস জবাব দিলেন।

কেন, আপনাদের সঙ্গে কি দেখা-সাক্ষাৎ হয় না? এক বাড়িতেই তো—

এক বাড়ি হলে কি হয়? বাইরের মহলের সঙ্গে ভিতরের মহলের কোন যোগাযোগ নেই, সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা থাকি বাইরের মহলে, তাই বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। জবাব দিলেন হিরণ্ময়ী দেবী।

হরবিলাসই আমাদের দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। এবং কিরীটীই তাঁকে অনুরোধ জানাল আর বেশী দূর না আসবার জন্যে।

আপনাকে আর গেট পর্যন্ত কষ্ট করে আসতে হবে না, মিঃ ঘোষ। এবারে আমরা নিজেরাই যেতে পারব।

না না, তাতে কি, চলুন না গেট পর্যন্ত।

না, আপনি যান।

হরবিলাস ফিরে গেলেন। পাশাপাশি আমরা দুজনে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললাম।

গেটের কাছাকাছি প্রায় এসেছি, হঠাৎ একটা চাপা ক্রুদ্ধ গর্-র্ শব্দ শুনে দুজনেই থমকে দাঁড়াই।

শব্দটা লক্ষ্য করে সামনের অন্ধকারে গেটের ঠিক পাশেই চামেলী-ঝাড়টার দিকে তাকিয়ে চোখের দৃষ্টি আমার পাথরের মতই স্থির হয়ে গেল। অন্ধকারে দুটো আগুনের ভাঁটা যেন ক্রুদ্ধ জিঘাংসায় ধক্‌ধক্ জ্বলছে। অশরীরী কোন প্রেত যেন হিংস্রলোলুপ হয়ে আমাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে।

গোঁ-গর্-র্ একটা চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন।

আঃ Tiger, stop! Stop! চাপা মেয়েলী কণ্ঠের একটা নির্দেশ শোনা গেল।

সীতার গলা।

অন্ধকারে চামেলী-ঝোপটার নিচ থেকে ছায়ার মত নিঃশব্দে সামনের দিকে এগিয়ে এল সীতা এবং তার পাশে এগিয়ে এল প্রকাণ্ড একটা কালো আলসেসিয়ান কুকুর তো নয়—যেন একটা বাঘ!

কিন্তু আশ্চর্য, কুকুরটা তার মনিবের নির্দেশে তখন একেবারে চুপ করে গিয়েছে—শান্ত, স্থির!

চলে যাচ্ছেন বুঝি? সীতা আবার প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ। আপনার ঐ টাইগারের ডাকই বুঝি একটু আগে শোনা গিয়েছিল! প্রশ্ন করল কিরীটী।

হ্যাঁ। অচেনা কারো সাড়া পেলে টাইগারটা যেন একেবারে ক্ষেপে ওঠে। বোধ হয় কোনমতে আপনাদের সাড়া পেয়েছিল। হাসতে হাসতে জবাব দেয়।

কিন্তু একটু দেরিতে পেয়েছিল বোধ হয় মিস ঘোষ! প্রত্যুত্তরে হাসতে হাসতে কিরীটী জবাব দেয়।

কিরীটীর ইঙ্গিতটা সীতা বুঝতে পারল কিনা বোঝা গেল না, কারণ জবাবে সে বললে, আর কখনো আপনাদের দেখলে ও গোলমাল করবে না। টাইগার, চিনে রাখ, এঁরা আমাদের বন্ধু। ভাল লোক।

কুকুরটি আপনার কী খায় মিস ঘোষ? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

মাংস আর রুটি। জবাব দেয় সীতা।

আচ্ছা চলি, মিস ঘোষ, নমস্কার। কিরীটী হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে এগিয়ে গেল।

চলুন, নিচ পর্যন্ত আপনাদের এগিয়ে দিয়ে আসি কিরীটীবাবু। এ পাহাড়টার উপর বেজায় সাপের উৎপাত।

তাই নাকি? কিরীটী চলতে চলতেই বলে।

হ্যাঁ। সব একেবারে ভয়ঙ্কর বিষধর গোখরো।

সাপকে বুঝি আপনার ভয় করে না? কিরীটী প্রশ্ন করে।

না, সঙ্গে টাইগার থাকলে এ জগতে কিছুকেই আমি ভয় করি না।

না মিস ঘোষ, তার আর প্রয়োজন হবে না। আপনি ফিরে যান। আয় সুব্রত। কিরীটী বেশ দ্রুতপদেই গেট অতিক্রম করে পাহাড়ের গা দিয়ে ঢালু পথ বেয়ে এগিয়ে চলল। আমি কতকটা একপ্রকার বাধ্য হয়েই অতঃপর কিরীটীকে অনুসরণ করি।

এগিয়ে চলেছি অন্ধকার পথ ধরে আবার হোটেলের দিকে।

শীতের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি হলেও কালো আকাশটা তারায় তারায় যেন ঝক্-ঝক্ করছে। বাঁয়ে কালো কালির মত গর্জন-উদ্বেলিত সমুদ্র।

মাঝামাঝি পথ আসতেই দূরে হোটেলের আলোগুলো অন্ধকার আকাশপটে ক্রমে ফুটে উঠতে লাগল। কিরীটী নিঃশব্দে পথ অতিক্রম করছিল, এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। কিন্তু কিরীটীর নিস্তব্ধতা আমাকে যেন কেমন পীড়ন করছিল। আমিই কথা বললাম, হিরণ্ময়ী দেবীকে কেমন লাগল, কিরীটী?

কেন, ভদ্রমহিলা বেশ ভালই তো!

হরবিলাসের উপরে একটা অসাধারণ হোল্ড রয়েছে বলে যেন মনে হল!

স্বাভাবিক। ধনীর কন্যা বিবাহ করলে স্বামীকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্ত্রীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় ও মধ্যে মধ্যে স্ত্রীর আজ্ঞাবহও হতে হয়। বিশেষ করে আবার এক্ষেত্রে শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর মত প্রখর বুদ্ধিমতী নারীর কাছে হরবিলাসের একটা inferiority complx থাকাটাই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু তা তুই ভাবছিস না, অন্য কিছু ভাবছিস! আমি আবার কিরীটীর চিন্তান্বিত মনটাকে একটা খোঁচা দিয়ে আমার প্রতি সজাগ করে তোলবার চেষ্টা করি।

এবং কিরীটীর পরবর্তী জবাব শুনে বুঝলাম প্রচেষ্টা আমার একেবারে নিষ্ফল হয় নি। কিরীটী মৃদু হাস্যসহকারে জবাব দিল, শতদলবাবু যে আজ সকালবেলাতে বললেন এই বাড়ির একমাত্র উত্তরাধিকারী এখন তিনিই, তা তো কই মনে হচ্ছে না! তিনি নাতি এবং হিরণ্ময়ী দেবী বোন। সেদিক দিয়ে শ্রীমতী সীতাও তো মালিকের নাতনী। আরো আছে কিনা তাই বা কে জানে!

এতক্ষণে বুঝতে পারি কিরীটীর বর্তমান চিন্তাধারাটা ঠিক কোন্ পথ ধরে চলেছে। সকালবেলাকার আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে শতদলের রহস্যটাই তার সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এবং এও বুঝতে পারলাম, শতদল-রহস্য মীমাংসিত না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে কিরীটী নড়বে না। সঙ্গে সঙ্গে আমারও নড়া চলবে না। অতএব অনির্দিষ্ট কালের জন্য এখন এখানেই অবস্থানও হবে অবধারিত।

বস্তুতঃ শতদলের রহস্যটা যে আমার মনকেও বেশ কিছুটা চঞ্চল করে তোলেনি তা নয়। কিন্তু কোন কিছুরই যেন হদিস পাচ্ছিলাম না। সকাল হতে কতকগুলো ছিন্ন ছিন্ন ঘটনা ও কয়েকটি বিভিন্ন চরিত্রের নর-নারী—যার সংস্পর্শে আমরা এসেছি, কোন কিছুর মধ্যেই যেন একটা পূর্ণ যোগপুত্র খুঁজে

পাচ্ছিলাম না। সহসা একটা প্রশ্ন আমার মনের অন্ধকারে বিদ্যুৎ-চমকের মতই যেন ঝিলিক হেনে গেল, কিন্তু কিরীটীকে সে প্রশ্নটা করবার পূর্বেই সে আমাকে বললে, রাত আটটা বাজে প্রায়, একটু পা চালিয়ে চল সুব্রত, হোটেলের ক্লাব-ঘরে বহু জনসমাগম হয়, দেখা যাক আজ তাদের মধ্যে কারো সঙ্গে একটু-আধটু আলাপ-পরিচয় করা যায় কিনা। এতদিন এখানে এসেছি, হোটেলে আছি, অথচ কারো সঙ্গে আলাপ হল না! এ অন্যায়। চল্।

হোটেলে এসে যখন পৌঁছলাম রাত তখন প্রায় সাড়ে আটটা।

কিরীটী ও আমি সোজা একেবারে হোটেলের নিচের তলায় যে হলঘরটি স্থানীয় ক্লাব-ঘর বলে এখানে পরিচিত, সেই ঘরে এসে প্রবেশ করলাম।

প্রশস্ত হলঘরটি তখন হোটেলের ও স্থানীয় অধিবাসী নরনারীতে গমগম করছে। বলতে গেলে হোটেলে আসবার পর এই সর্বপ্রথম ঐ ঘরে আমাদের পদার্পণ।

হলঘরের একধারে কাউণ্টার। সেখানে উর্দি-পরা হোটেলের ওয়েটার নানা-জাতীয় কড়া ও নরম পানীয়ের বোতলগুলো সাজিয়ে তৃষিতজনদের পানীয় পরিবেশন করছে। মধ্যে মধ্যে ছোট-বড় সব চৌকো ও গোলাকর টেবিল ও চেয়ার পাতা। সেই চেয়ারগুলো অধিকার করে নানাবয়সী নরনারীর ভিড় জমেছে। উচ্চ ও চাপা হাসির গুঞ্জন ও তর্কাতর্কির শব্দে সমগ্র হলঘরটি মুখরিত। চারদিকেই সর্বত্র একটা আনন্দঘন উচ্ছ্বাসের সাড়া। কেউ গল্প করছে, কেউ তাস খেলছে, কেউ দাবা, কেউ টেবিল-টেনিস, আবার কেউ কেউ বা পানীয়ের গ্লাসে নিয়ে বসে আছে ও মধ্যে মধ্যে এক-আধ সিপ ড্রিংক করে স্বপ্নালু দৃষ্টিতে আশেপাশে চেয়ে দেখছে।

ঘরের এক কোণে একটা গোলাকার খালি টেবিলের পাশে খানতিনেক খালি চেয়ার পড়েছিল। কিরীটী আমাকে আকর্ষণ করে সেই দিকে নিয়ে গেল। এবং নিজে একটা চেয়ারে বসে আমাকে বললে, বোস্।

পকেট থেকে চামড়ার সিগারের কেসটা বের করে একটা সিগার কেস থেকে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করতে করতে বললে, যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ—কী খাবি বল?

চেয়ে দেখি ইতিমধ্যে আমাদের চেয়ারে বসতে দেখে একসময় একজন উর্দি-পরিহিত ওয়েটার আমাদের সামনে জার্মান-সিলভারের একটা ট্রে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

একঠো ছোটা বিয়ার অ্যাণ্ড জিন—তুই কী খাবি বল্ সুব্রত?

আমি—মানে ওসব আমার চলবে না ভাই।

এক যাত্রায় পৃথক্ ফল নেই, you must keep company! আর দেখো, এ সাবকে নিয়ে একঠো ছোটো জিন অ্যাণ্ড লাইম লাও!

ওয়েটার সেলাম জানিয়ে কাউণ্টারের দিকে চলে গেল।

কিন্তু ভাই, ওসব খেয়ে যদি মাতাল হই? ভয়ে ভয়ে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম।

একটা ছোট জিন অ্যাণ্ড লাইম খেয়েই মাতাল হবি? Rubbish!

অভ্যাস নেই যে ভাই।

আমার যেন কতকালের অভ্যাস আছে! থাম্।

একটু পরে ওয়েটার ট্রেতে করে দুটো পেগ গ্লাস এনে টেবিলের উপরে

নামিয়ে রাখল, আউর কুছ সাব?

হ্যাঁ, দোনোমে থোড়া করকে পানি মিলা দো।

ওয়েটার একটু একটু করে দুটো পেগ গ্লাসে জল ঢেলে দিয়ে চলে গেল।

সন্তর্পণের সঙ্গে একটু একটু করে সিপ করছি আর অনুভব করবার চেষ্টা করছি নেশা ধরল কিনা। হঠাৎ এমন সময় খোলা দরজার দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলাম, শ্রীমতী রাণু ও শতদল হাসতে হাসতে প্রবেশ করল ঘরের মধ্যে।

এবং তারা আমাদের দুটো টেবিলের পরের টেবিলে এসে বসল। ওরা আমাদের দুজনকে লক্ষ্য করেনি।

বোয়—বোয়? শতদলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

বয় এসে ওদের সামনে দাঁড়াল।

একঠো হুইস্কি সোডা, আউর একঠো অরেঞ্জ স্কোয়াস—, শতদল অর্ডার দিল।

কিরীটীর দিকে তাকালাম। সে দেখি অন্যদিকে তাকিয়ে একমনে সিগার টেনে যাচ্ছে, শতদল বা রাণুর দিকে তার দৃষ্টি নেই।

কিন্তু তোমার মা, simply I can't stand her রাণু! তিনি যে আমাকে খুব বেশী পছন্দ করেন তা বলে মনে হয় না—, শতদল রাণুকে বলছে কানে এল।

ওটা তোমার ভুল ধারণা দল—

না, ভুল ধারণা নয়। কুমারেশের প্রতিই তাঁর একটু—, কথাটা শতদল শেষ করে না।

Don't be silly, দল! রাণু জবাব দেয়।

একটু বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। কাউণ্টারের পাশে কনসার্ট বাজানো শুরু হয়েছিল। বেহালা, পিয়ানো ও ফ্লুট—মাত্র তিনটি যন্ত্রের সহযোগে চমৎকার ঐকতান বাদ্য। সুরটা একটা পরিচিত বাংলা গানের। কনসার্ট-বিরতি কয়েক মিনিটের জন্য হতেই আবার শতদলের কণ্ঠ শোনা গেল, কুমারেশের আজ পর্যন্ত কোনো সংবাদই আর পাওয়া যায়নি?

না। রাণু জবাব দেয়।

কিন্তু এবারও কুমারেশের অলিম্পিকে যোগ দেবার কথা। সারা ভারতবর্ষ থেকে তো ওই একা সাঁতারে সিলেকটেড হয়েছে।

এতক্ষণে বুঝতে পারি কুমারেশ মানে বিখ্যাত সাঁতারু কুমারেশ সরকারের কথা হচ্ছে। নামটা তাই প্রথম থেকেই কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল।

এখানে আসবার দিন পনেরো আগে সংবাদপত্রে একটা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, বিখ্যাত সাঁতারু কুমারেশ সরকার তার কলকাতার বাসভবন থেকে হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে। সংসারে তার আপনার বলতে একমাত্র বৃদ্ধ বাপ অধ্যাপক ডঃ শ্যামাচরণ সরকার। বছর পাঁচেক হল ডঃ সরকার চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। কুমারেশ সরকার শুধু একজন বিখ্যাত সাঁতারুই নয়, কণ্ঠসংগীতেও আধুনিক গায়কদের মধ্যে সে অন্যতম। গায়কদের মধ্যেও কুমারেশ রেডিও গ্রামোফোন জগতে একচ্ছত্র সম্রাট। সেইজন্যই কুমারেশ

সরকারের নিরুদ্দেশের সংবাদ যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং এ-ও জানি, এখন পর্যন্ত সেই নিরুদ্দিষ্ট কুমারেশের কোন সংবাদই পাওয়া যায়নি। ব্যাপারটা সত্যিই যেমন রহস্যপূর্ণ তেমনি চাঞ্চল্যকর।

আবার রাণুর গলা শোনা গেল, সত্যিই শতদল, তুমি জান না কুমারেশ কোথায় গিয়েছে?

সকালবেলাতেই তো বলেছি জানি না।

কিন্তু আমি কি ভেবেছিলাম, জান?

কি?

তুমিই তার সবচাইতে প্রিয় বন্ধু, অন্ততঃ তুমি বোধ হয় জান সে কোথায়!

শুধু তোমার কেন, সকলেরই তাই ধারণা। অথচ এরা কেউ বিশ্বাস করে না যে, তার সংবাদ জানা সত্ত্বেও গোপন করে রাখার কী আমার স্বার্থ থাকতে পারে! জগতে কুমারেশের চাইতে প্রিয় বন্ধু আর আমার নেই। সেই স্কুলের জীবন থেকে আমাদের বন্ধুত্ব, তার প্রতিটি কাজে চিরদিন আমিই সর্বাগ্রে তাকে উৎসাহ দিয়েছি, তার জীবনের প্রতিটি success-এ আমিই তাকে এগিয়ে দিয়েছি। সে শুধু আমার বন্ধুই নয়, সহোদরের চাইতেও অধিক।

জানি। মৃদুকণ্ঠে রাণু কেবল জবাব দেয়।

আবার বাজনা শুরু হয়, এবারে কিন্তু আর ঐকতান নয়, কেবল বেহালা-বাদক বেহালা বাজাতে শুরু করে। চমৎকার বাজনার হাত লোকটির। আমার মনটা বাজনার প্রতি আবার আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

হঠাৎ কিরীটী চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। চেয়ে দেখি, রাণু আর শতদলও চেয়ার ছেড়ে উঠে খোলা দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিরীটী দূর থেকে ওদেরই অনুসরণ করে, আমিও কিরীটীর পিছনে চললাম।

মাথাটা একটু হালকা-হালকা বোধ হয়। বুঝলাম জিন ও লাইমের কার্য শুরু হয়েছে আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলোতে।

শতদলবাবু? কিরীটীর ডাকে চমকে শতদল ফিরে তাকাল, কে? ও মিঃ রায়, our detective! Hallow! মনে আছে স্যার, আপনার সেই সাবধান বাণী। আর বলতে হবে না।

ব্যাপার কি শতদল? বিস্মিতা রাণু প্রশ্ন করে শতদলের মুখের দিকে তাকিয়ে।

মিঃ রায়ের ধারণা, আমার জীবনের উপরে কেউ না কেউ attempt নিচ্ছে, উনি আমাকে তাই আজ সকালে সাবধান করে দিয়েছেন—, মৃদু হাস্যসহকারে বলে শতদল।

তোমার life-এর ওপরে attempt! বিস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আবার তাকাল রাণু শতদলের মুখের দিকে।

কিন্তু আমি অন্য কথা বলবার জন্য আপনাকে ডেকেছিলাম শতদলবাবু—, কিরীটী বললে।

কী বলুন তো?

আপনার বাড়িতে আজ সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম। হরবিলাসবাবু, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল।

Really! তিনটে পাগল—তিন শ্রেণীর। কেমন লাগল পাগলগুলোকে?

হাসতে হাসতে শতদল বলে।

কিন্তু আপনার 'নিরালা' দেখা হল না, তাই ভাবছি কাল সকালের দিকে যাব।

নিশ্চয় নিশ্চয়। আসবেন। তুমিও এস না রাণু। রাণুর দিকে ফিরে তাকিয়ে শতদল বলে।

কোথায়, তোমার ওখানে?

হ্যাঁ। সকালে চা-পর্বটা আমার ওখানেই না হয় হবে সকলের, কী বলেন মিঃ রায়!

বেশ তো। তাহলে রাণু দেবী যাবেন নাকি!

কখন যাবেন? রাণু প্রশ্ন করে।

একটু সকাল-সকালই না হয় বের হওয়া যাবে। কিরীটী জবাব দেয়।

হঠাৎ একটা ভারিক্কী মেয়েলী কণ্ঠে সামনের দিকে তাকালাম।

এই যে রাণু, কোথায় ছিলি এতক্ষণ? সেই কখন বের হয়েছিস—

একটি বিধবার বেশ পরিহিতা মধ্যবয়সী মহিলা। পরিধানে বিধবার বেশ থাকলেও ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যের চিহ্ন যেন তাঁর চোখ-মুখ হাব-ভাব, এমন কি দাঁড়াবার ভঙ্গীটুকু থেকে পর্যন্ত ফুটে বের হচ্ছে। পরিপাটি চুল আঁচড়ানো। হাতে একগাছি করে সোনার চুড়ি। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা।

কোথায় ছিলি এতক্ষণ? আবার মহিলা প্রশ্ন করলেন।

এই—মানে, বলতে বলতে এদিক-ওদিক তাকায় রাণু।

চেয়ে দেখি, আমাদের ধারে-কাছে কোথাও শতদলের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। কখন একসময় ইতিমধ্যেই নিঃশব্দে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে সে গা-ঢাকা দিয়েছে।

॥ ৪ ॥

এঁরা কে রাণু? ভদ্রমহিলা রাণুর দিকে তাকিয়ে আমাদের ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করলেন।

রাণু যেন শতদলের আকস্মিক অন্তর্ধানে কতকটা আরাম অনুভব করে এবং একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার মা। ইনি মিঃ কিরীটী রায়, ইনি মিঃ সুব্রত রায়। মিঃ কিরীটী রায়ের নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনে থাকবে মামি—বিখ্যাত রহস্যভেদী।

নমস্কার, মিঃ রায়—আমার স্বামীর নাম নিশ্চয়ই আপনি শুনে থাকবেন—স্যার আর. এন. মিত্র—

কোন স্যার আর. এন.? বিখ্যাত মার্চেন্ট, গত বৎসর সুইজারল্যাণ্ডে যিনি অপারেশন হতে গিয়ে মারা যান?

হ্যাঁ। পৃথিবীবিখ্যাত সার্জেনদের দিয়ে অপারেশন করানো হল এখান থেকে ফ্লাই করে গিয়ে...কিন্তু oh dear! He could not be saved—লেডি মিত্র হাতের দামী সুগন্ধযুক্ত রেশমী রুমালটা চোখের উপরে একবার বুলিয়ে নিলেন এবং মনে হল গলার স্বরটা যেন একটু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, সংবাদপত্রে ঘটনাটা পড়েছিলাম। কিরীটী মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়।

শ্রীমতী রাণু তাহলে ক্রোড়পতি স্যার আর. এন.-এর সমস্ত সম্পত্তির

একমাত্র উত্তরাধিকারিণী এবং শ্রীমান শতদল তাহলে বেশ উঁচু ডালের দিকে হস্ত প্রসারিত করছে!

আসুন না, আমাদের ঘরে চলুন না। আপনারাও তো এই হোটেলে এসেই উঠেছেন? লেডি মিত্র তাঁর ঘরে আমন্ত্রণ জানালেন।

হ্যাঁ। আজ থাক মিসেস মিত্র, রাত হয়েছে। কিরীটী মৃদু প্রতিবাদ জানায়।

রাত আর এমন বেশী কি হয়েছে? লেডি মিত্র তাঁর সুডোল মণিবন্ধ চোখের সামনে তুলে ধরে দামী রিস্টওয়াচটার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই তো সবে রাত পৌনে দশটা। আসুন আসুন, তিন-চার দিন হল এই হোটেলটায় এসে উঠেছি, তা একটা লোক পেলাম না যার সংগে দু-দন্ড আলাপ করা যেতে পারে। ও হোটেলটায় জায়গা পেলাম না, তাই কতকটা বাধ্য হয়েই এসে এই হোটেলটায় উঠতে হল। এত ভাল ভাল সী-সাইড থাকতে কেন যে রাণুর এই হতচ্ছাড়া ন্যাস্টি জায়গাটাতে আসবার জন্যেই এত জেদ চাপল! আসুন মিঃ রায়, মিঃ সুব্রত, আপনিও আসুন।

তরল পানীয়ের প্রভাবে পেটের মধ্যে তখন আমার ক্ষুধার প্রচণ্ড আলোড়ন চলেছে। বাধা দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কিরীটীকে মিসেস মিত্রকে অনুসরণ করতে দেখে একপ্রকার বাধ্য হয়েই আমাকেও ওঁদের পশ্চাতে অনুসরণ করতে হল।

হোটেলের দোতলায় কোণের একট বড় ঘর নিয়ে মাতা ও পুত্রী আছেন। এবং সংগে এসেছে ওঁদের একজন বয়, একজন আয়া ও একজন দাই। এও দেখলাম ঘরে প্রবেশ করে যে, হোটেলের আসবাবপত্রের উপরেই ওঁরা একবারে নির্ভর করেননি, কিছু কিছু শয্যাদ্রব্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিসপত্র যা হয়তা তাঁরা সংগে করেই নিয়ে এসেছিলেন, তারই সাহায্যে নিজেদের বাসের কক্ষটি যথাসাধ্য রুচিসম্মতভাবে সাজিয়েগুছিয়ে নিয়েছেন। ধনের প্রাচুর্য ও আভিজাত্যের চিহ্ন সর্বত্রই ঘরের মধ্যে পরিস্ফুট।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে লেডি মিত্র বললেন, আসুন। May I offer you a drink Mr. Roy? লেডি মিত্র কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

No, thanks! Just now we had one!

What about you Mr. Subrata Roy? এবারে আমার প্রতি প্রশ্ন বর্ষিত হল।

No, thanks!

বেশ, ড্রিংক না চান, চা-কোকো-কফি অর ওভালটিন?

বুঝলাম লেডি মিত্র নাছোড়াবান্দা। অতিথিদের অন্ততঃ কিছু না পান করিয়ে সুস্থির হতে পারছেন না।

বেশ, তাহলে চা আনতে বলুন। কিরীটী জবাব দেয়।

বয়, চা লাও। বয়কে চায়ের আদেশ দিয়ে সোফাটার উপরে নিজে একটু ভাল করে গুছিয়ে বসে লেডি মিত্র আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, বসে বসে আলাপ করবার সময় কোন একটা 'ড্রিংক' সংগে না থাকলে আমি চিরদিনই যেন কেমন bored feel করি। আমার বহুদিনকার habit। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, রাণু, দাঁড়িয়ে আছ কেন, বোসো!

রাণু এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়েই ছিল, মায়ের আদেশ পেয়ে আমাদেরই পাশের খালি চেয়ারটার ওপরে উপবেশন করল।

আমার only child এই, মিঃ রায়। লরেটো থেকে এবার সিনিয়ার কেমব্রীজ

পাস করেছে। Oh dear, রণেনের ইচ্ছে ছিল রাণু বিলেত যায়, ওকে তার ব্যারিস্টারি পড়াবার কী ইচ্ছেই ছিল! But where is he now? সব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দেখুন না—how cruel! আবার কণ্ঠস্বর তাঁর অশ্রুতে গদগদ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কিরীটী কথার মোড়টা পালটে দিল।

সে বললে, আপনারা তাহলে কিছুদিন এখানেই থাকবেন, লেডি মিত্র?

হ্যাঁ, যতদিন না ওর আবার ইচ্ছে হয় ফিরে যাবার! বড্ড জেদী আর এক-গুঁয়ে মেয়ে আমার।

কিরীটী হাসতে হাসতে বলে, কিন্তু সামান্য ওঁর সঙ্গে আমার যা আলাপ হয়েছে, তাতে মনে হয় she is really charming!

আপনিই বলুন তো মিঃ রায়, জায়গাটি really চমৎকার নয়? মামির ধারণা, এমন বিশ্রী জায়গা নাকি আর ভূ-ভারতে নেই! রাণুই এবারে জবাব দেয়।

বয় সুদৃশ্য চায়ের ট্রের ওপরে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসে সামনের টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখল।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কিরীটী বললে, আপনি বোধ হয় হোটেলের বাইরে যাননি লেডি মিত্র, গেলে দেখতেন বাইরের দৃশ্য এখানকার সত্যিই চমৎকার!

আমার আবার পায়ে হেঁটে বেড়াতে এমন বিশ্রী লাগে! লেডি মিত্র জবাব দিলেন।

তা অবশ্য ঠিক, পায় হেঁটে বেড়ানোও আপনার অভ্যাস নেই, ভালো তো লাগবেই না আপনার। কিরীটী লেডি মিত্রের কথায় সায় দিয়েই কতকটা যেন বলে ওঠে।

এমন চমৎকার সী-সাইডে কেউ আবার গাড়িতে চেপে বেড়ায় নাকি, মামির যেমন উদ্ভট সব—, রাণু প্রতিবাদ জানায়।

শুনছেন মিঃ রায় আমার মেয়েটির কথা?

তা তো সত্যি, অভ্যাস না থাকলে—, কিরীটী আবার বলে।

অভ্যাস! অভ্যাস আবার কী? দুদিন হেঁটে বেড়ালেই অভ্যাস হয়ে যায়। মেয়ে বলে উঠে।

না মিস মিত্র, তারও একটা বয়স আছে। কিরীটী মৃদু হাস্যসহকারে বলে।

সে রাত্রে আমাদের আহার শেষ করতে করতে প্রায় রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেল।

দুজনে এসে হোটেলের বারান্দায় দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে পাশাপাশি বসলাম। হোটেলটি ইতিমধ্যেই যেন নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। ঘরে ঘরে যে যার শয্যা নিয়েছে রাত্রের মত। বোধ হয় কেবল আমরা দুজনেই জেগে এখনও।

বালুবেলার উপর অদূরে গর্জমান সমুদ্রের ঢেউগুলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে কলচ্ছ্বাসে। ভাঙা ঢেউইয়ের চূর্ণগুলোতে মধ্যে মধ্যে ফসফরাসের সোনালী চুমকি ঝিলমিল করে ওঠে। দিবারাত্র একটানা ঢেউ ভেঙে-গড়েই চলেছে যেন সমুদ্রের খেলা। ওর চোখে কি ঘুম নেই!

আমিই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলাম, ব্যাপার কী বল্ তো কিরীটী, লেডি মিত্রকে হঠাৎ অত তোষামোদ করতে শুরু করলি কেন?

ভদ্রমহিলাকে যখন একটু তোষামোদপ্রিয়ই দেখলাম, আগে থাকতেই

খানিকটা তোষামোদ করে ভবিষ্যতের জন্য হাতের মধ্যে রেখে দিলাম, প্রয়োজন হলে কাজে লাগানো যাবে।

তোর মতলবটা কি সত্যি করে বলবি? সত্যিই কি তুই সকালবেলাকার কী একটা accident হয়ে গিয়েছে, সেটার ভূতকে এখনো কাঁধে করে বেড়াচ্ছিস?

হ্যাঁ রে, কতকটা সেই সিন্দবাদ নাবিকের অবস্থা। কিন্তু আমার কথা যদি বিশ্বাস করিস তাহলে বলতে পারি, সকালবেলাকার ব্যাপারটা যোগসূত্রহীন সামান্য একটা এলোমেলো দুর্ঘটনাই নয়। পর পর কতকগুলো দুর্ঘটনা, যেগুলো একসূত্রে গাঁথলে শেষ পর্যন্ত হয়তো গিয়ে দাঁড়াবে একটা মার্ডার বা নিষ্ঠুর হত্যায়!

You mean—

হ্যাঁ I mean শীঘ্রই যদি আমার পূর্ব দূরদৃষ্টির ক্ষমতা না নিঃশেষ হয়ে গিয়ে থাকে, আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, I can hear the footsteps! হ্যাঁ সুব্রত, আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি নিষ্ঠুর মৃত্যু নিঃশব্দে ফেলে এগিয়ে আসছে অবশ্যম্ভাবী অবধারিত। কিরীটীর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার সুস্পষ্ট আভাস। কিরীটী তখনও তার বক্তব্য শেষ করেনি, কিন্তু আমার চোখে যখন ব্যাপারটা পড়েছে, আমি চেষ্টা করব to my last to stop it! প্রতিরোধ করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

তোর কি স্থির বিশ্বাস তাহলে something is going to happen? কোনো একটা কিছু শীঘ্রই ঘটবে?

হ্যাঁ, যদি আমার ক্যালকুলেশন ভুল না হয়, চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই আবার একটা চেষ্টা হবে। বার বার চারবার।

কিরীটীর অনুমান যে কতখানি নির্ভুল, পরের দিন সকালেই সেটা জানা গেল।

খুব ভোরে উঠেই আমি, কিরীটী ও রাণু 'নিরালা'র উদ্দেশে রওনা হয়েছিলাম।

ভোরের আলো তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সমুদ্রের বুকে একটা আলো-ছায়ার পর্দা যেন থির্ থির্ করে কাঁপছে। শীতের সকাল হলেও কোথাও কুয়াশার লেশমাত্র ছিল না। আকাশের প্রান্তে শুকতারাটা নিভে যায়নি তখনও।

'নিরালা'র লৌহফটকের সামনে এসে আমরা যখন পৌঁছলাম, পূর্ব দিগন্ত যেখানে জলকে আলিঙ্গনের মধ্যে টেনে নিয়েছে, সেখানটা সূর্য-সারথির রথ-চক্রের ঘর্ষণে ঘর্ষণে ও সপ্ত অশ্বের খুরের আঘাতে যেন রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে।

গতকাল সন্ধ্যার মত লৌহফটক খোলাই ছিল, ফটক ঠেলে তিনজনে আমরা কম্পাউন্ডের ভিতরে প্রবেশ করলাম।

একটু অগ্রসর হতেই হরবিলাসের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। কালো রঙের একটা ওভারকোট গায়ে, হাত দুটো পকেটের মধ্যে প্রবিষ্ট করে হাঁটতে হাঁটতে হরবিলাস গেটের দিকেই এগিয়ে আসছিলেন।

এই যে মিঃ ঘোষ, সুপ্রভাত! কিরীটীই প্রথমে সুপ্রভাত জানাল।

হরবিলাসও আমাদের শুভ প্রভাত জানালেন প্রত্যুত্তরে, সুপ্রভাত। খুব সকালেই এসেছেন দেখছি! যান, শতদল বোধ হয় বসেই আছে। সারাটা রাত

বেচারা শোবার ঘরে খিল তুলে বসে আছে, পাশে একটা লোডেড রিভলভার নিয়ে।

ব্যাপার কী? কোন দুর্ঘটনা? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কিরীটী প্রশ্ন করে।

কী জানি মশাই, রাত দুটো-আড়াইটের সময় হঠাৎ পর পর দুটো বন্দুকের গুলির শব্দে চমকে উঠে—

বন্দুকের গুলির শব্দ! প্রশ্নটা এবারে করলাম আমি।

হ্যাঁ। চট করে রাত্রে ঘুম আসে না, তাই অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে বই পড়ি। কালও রাত্রে বসে বসে নিজের ঘরে একটা বই পড়ছিলাম, হঠাৎ বন্দুকের গুলির আওয়াজ, তারই কিছুক্ষণ পরে শতদল ও অবিনাশের চেঁচামেচি শুনে অন্দরের দিকে ছুটে যাই। শতদলের ঘরে গিয়ে দেখি, বেচারী অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছে। ঘুম আসছিল না বলে জেগে টেবিলের আলোয় বসে কী একটা বই পড়ছিল, এমন সময় হঠাৎ বন্দুকের গুলির আওয়াজ ও সংগে সংগে টেবিলল্যাম্পের চিম্‌নিটা ভেঙে চুরমার হয়ে ঘর অন্ধার হয়ে যায়। ও কিছু বোঝবার আগেই অন্ধকারেই আবার একটা গুলি এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। কী ভয়ানক ব্যাপার বলুন তো মিঃ রায়! ও বলে, কেউ ওকে হত্যা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু হঠাৎ কে আবার শতদলকে হত্যা করবার চেষ্টা করবে বলুন তো? আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। ও নিজেও এমন ঘাবড়ে গিয়েছে যে, বাকি রাতটুকু বোধ হয় শোয়ওনি। চলুন, আপনি এসেছেন ভালই হল, ওকে একটু সাহস দিয়ে যান—

হরবিলাস গতরাত্রের ব্যাপারটায় যে বেশ একটু উত্তেজিতই হয়ে উঠেছেন, ওঁর কথাবার্তাতেই সেটা বোঝা গেল এবং ব্যাপারটার মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনার খোরাক থাকা সত্ত্বেও কিরীটীকে কিন্তু একান্ত নির্বিকার বলেই মনে হতে লাগল। অস্বাভাবিক বা অত্যাশ্চর্য কিছুই তেমন ঘটেনি, শান্ত ও নির্বিকার কণ্ঠেই সে এবারে হরবিলাসবাবুকে প্রশ্ন করল, তা এত সকালে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?

সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়, আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। গত-রাত্রে আপনারা চলে যাবার পর আমার স্ত্রীর মুখে আপনাদের অনেক কীর্তি-কাহিনীই শুনেছি, তাতে করে আমার মনে হল এ ব্যাপারে আপনিই যোগ্য ব্যক্তি বেচারীকে একটা পরামর্শ দেবার—

কেন, শতদলবাবু কি বলেননি আজ সকালে আমাদের তিনি চায়ের নেমন্তন্ন করেছেন, আমরা আসব? কিরীটী দ্বিতীয় প্রশ্ন করল।

কই, না তো! সবিস্ময়ে জবাব দিলেন হরবিলাস।

ও, আচ্ছা চলুন দেখি—

হরবিলাসবাবুকে অনুসরণ করে আমরা তিনজন অগ্রসর হলাম। সংবাদটা শোনা অবধিই লক্ষ্য করছিলাম, রাণুর মুখের পরিবর্তন। রাণু যেন সত্যিই বিস্মিত ও হতচকিত হয়ে গিয়েছে। রাণু আমার ও কিরীটীর মধ্যবর্তিনী হয়ে পথ চলছিল, সহসা একসময় চাপা কণ্ঠে কিরীটীকে সে প্রশ্ন করল, আপনি শতদলকে সাবধান করে দিয়েছেন, কালই সকালে আমাকে বলছিল! আপনার নাকি ধারণা, ওকে মারবার জন্য কেউ attempt নিচ্ছে! শতদল তো বিশ্বাস করেইনি, সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়, আমিও করিনি। কিন্তু এ-সব কী শুনছি—how horrible!

বিশ্বাস করেননি ভুলই করেছেন, এবারে বোধ হয় বিশ্বাস করবেন! কিরীটী মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়।

অন্দর ও বহির্মহলের মধ্যে যোগাযোগের দ্বারটা, সেটা অন্দর থেকে বন্ধই ছিল। বাইরের দরজায় একটা দড়ি ঝুলছিল, হরবিলাসবাবু সেটা ধরে বার-দুই টান দিতেই অন্দর থেকে একটা অস্পষ্ট ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই দরজাটা খুলে গেল। দরজাটা খুলতেই চোখে পড়ল খোলা দ্বারপথে দাঁড়িয়ে একজন বৃদ্ধগোছের লোক। লোকটার বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে তো নিশ্চয়ই। রোগা ও বেঁটেমত চেহারা। দেহের সমস্ত মাংসপেশীগুলো যেন একেবারে শণের দড়ির মত পাকিয়ে গিয়েছে। মাথার চুলগুলো কাঁচায়-পাকায় মেশানো। লোকটার পরিধানে একটা ধোপদুরস্ত ধুতি ও হাতকাটা গরম বেনিয়ান। বেনিয়ানের উপরে একটা চাদর জড়ানো।

অবিনাশ, শতদল কোথায়? প্রশ্ন করলেন হরবিলাসই।

বাবু তাঁর ঘরেই আছেন। এখনো দরজা খোলেননি। বাবুর কাছেই যাচ্ছিলাম, আপনাদের ঘণ্টা শুনে—

এঁদের বাবুর ঘরে নিয়ে যাও।

আসুন—আজ্ঞে—, অবিনাশ আমাদের আহ্বান জানাল।

একটা দীর্ঘ টানা বারান্দা পার হয়ে আমরা অবিনাশকে অনুসরণ করে প্রশস্ত শ্বেতপাথরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে গিয়ে উঠলাম সকলে। উপরের তলাতেও ঠিক নিচের মতোই অনুরূপ একটি টানা বারান্দা। বারান্দার দু-পাশের দেওয়ালে সব বড় বড় ফ্রেমে বাঁধানো নানাপ্রকারের চিত্র টাঙানো। মধ্যে মধ্যে স্ট্যান্ডের উপরেও রক্ষিত জয়পুরী টবে পামট্রি। বাড়িটা যে কোন এক শিল্পীর, বুঝতে সেটা আদৌ কষ্ট হয় না। বারান্দার শেষপ্রান্তে যে বন্ধ ঘরটার সামনে এসে আমরা দাঁড়ালাম, তারই ঠিক দরজার দুপাশে দুটো বৃহদাকারের স্ট্যাচু। একটি স্ট্যাচু হচ্ছে অপূর্ব একটি অর্ধউলঙ্গ নারীর এবং দ্বিতীয় স্ট্যাচুটি হচ্ছে একটি পুরুষের।

এই ঘরে আছেন বাবু। অবিনাশ বললে আঙুল তুলে ঘরটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে।

কিরীটী দরজার গায়ে নক করল টুকটুক করে এগিয়ে গিয়ে, মিঃ বোস! শতদলবাবু!

ভিতর হতে আহ্বান এল, কে?

আমি কিরীটী, শতদলবাবু, দরজা খুলুন—

একটু পরেই দরজা খুলে গেল। সামনেই দাঁড়িয়ে শতদল। চমকে উঠলাম শতদলের মুখের দিকে তাকিয়ে। মাত্র এক রাত্রের মধ্যে এ কী চেহারা হয়েছে তার? সমস্ত মুখে শুধু যে রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তি তাই নয়, একটা নিরতিশয় ভয় ও উৎকণ্ঠা যেন মুখের রেখায়-রেখায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই যে মিঃ রায়, again there was an attempt last night! আবার কাল রাত্রে কেউ, somebody, আমাকে গুলি করে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল। এখন স্পষ্টই বুঝতে পারছি মিঃ রায়, you were right! আপনার কথাই ঠিক —সত্যিই someone is after me! কেউ আমার পিছনে লেগেছে। কিন্তু কে এবং কেন? উত্তেজনায় শতদলের কণ্ঠস্বর যেন একেবারে ভেঙে পড়ে।

Don't be nervous! চলুন শতদলবাবু, ঘরের মধ্যে চলুন। হরবিলাস-বাবুর মুখেই এইমাত্র গতরাত্রের সমস্ত ব্যাপার শুনেছি—, কিরীটী যেন একপ্রকার শতদলকে ঠেলেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

আমরাও পিছনে পিছনে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

দেখবেন, সাবধান, কাচের টুকরো এখনো ঘরময় ছড়িয়ে আছে! সাবধান করে দিলেন আমাদের শতদলবাবু।

॥ ৫ ॥

শতদলবাবুর কথায় তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই ঘরময় ছোট-বড় কাচের টুকরো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। কিরীটী সাবধানে পা ফেলে এগুতে এগুতে বললে, ইস, কাচের টুকরোগুলো এখনো এইভাবে ঘরময় ছড়িয়ে রেখে দিয়েছেন! কাউকে বলুন ঘরটা তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে দিতে!

হ্যাঁ, এক্ষুনি পরিষ্কার করাচ্ছি। বলে শতদল ভৃত্য অবিনাশকে ডেকে ঘরটা পরিষ্কার করে দিতে আদেশ দিল।

ঘরটা বেশ বড় আকারের হবে। ঘরের মেঝেটা লাল সিমেণ্টের তৈরী এবং পুরাতন হলেও এখনো ঝকঝক করে এমন চমৎকার পালিশ। একধারে মস্ত বড় একটা পালঙ্ক এবং তারই একপাশে একটা লোহার সিন্দুক, কাঠের একটা চৌকির ওপরে বসানো। ঘরের অন্য কোণে একটা জানলার একেবারে বরাবর একটা লিখবার টেবিল; ঐ টেবিলটি এখন বিশেষ ব্যবহৃত হয় বলে মনে হয় না, কারণ টেবিলের উপরে নানা কাগজপত্র ও বই এলোমেলো ভাবে ছড়ানো রয়েছে। সেই টেবিলটা থেকে হাতচারেক দূরে অনেকটা ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় ছোট একটি রাইটিং টেবিল, তারই উপরে টেবিল ল্যাম্প বোধ হয় বসানো ছিল এবং জানালাপথে নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে ল্যাম্পটি মেঝেতে ছিটকে পড়ে চিমনিটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে।

অবিনাশই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে একটা ঝাড়নের সাহায্যে কাচের টুকরো-গুলো তুলে, তখনও মেঝের উপরে উলটে-পড়ে-থাকা ল্যাম্পটা তুলে রাখতে যাচ্ছে, কিরীটী এগিয়ে গিয়ে অবিনাশের হাত থেকে একদিকে খানিকটা টোল-খেয়ে-যাওয়া ল্যাম্পটা হাতে নিলে চেয়ে, দেখি অবিনাশ, ল্যাম্পটা?

অবিনাশ ল্যাম্পটা কিরীটীর হাতে এগিয়ে দিয়ে ঘর হতে চলে গেল। বারকয়েক ল্যাম্পটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে কিরীটী এগিয়ে গিয়ে ল্যাম্পটা সামনের টেবিলের উপর বসিয়ে রাখল। এবং হঠাৎ শতদলের একেবারে মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, গুলিটা কোন্ দিক দিয়ে এসে ঢুকেছিল শতদল-বাবু?

সামনের ঐ বাগানের দিককার জানালাটাই রাত্রে খোলা ছিল। ঐ জানালা-পথেই গুলিটা এসেছিল।

শতদলবাবু হাত তুলে ঘরের অনেকটা মধ্যস্থলে রক্ষিত রাইটিং-টেবিলটার ঠিক মুখোমুখি যে জানালাটা তখনও বন্ধ ছিল, সেইটার দিকে হাত তুলে দেখাল।

কিরীটী আর দ্বিতীয় প্রশ্ন উচ্চারণ না করে নিজেই এগিয়ে গিয়ে ছিট-

কিনটা তুলে হাত দিয়ে ঠেলে জানালার বন্ধ কবাট খুলে দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে কী যেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগল।

কৌতূহলভরে আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

এ বাড়ির পশ্চাতের অংশ সেটা। দেখলেই বুঝতে কষ্ট হয় না, দীর্ঘদিন জমিটা অসংস্কৃত অবস্থায় পতিত হয়ে আছে। বড় বড় ঘাস ও আগাছায় জায়গাটা জঙ্গলে পরিণত হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। মধ্যে মধ্যে শেয়া-কুলের ঝোপ ও ঝাউগাছ। শেষপ্রান্তে জমির সীমানা দেড়-মানুষ-সমান উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের ওদিক দিয়ে জমি ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে, সমুদ্র বেশ কিছুটা দূরে সেখান থেকে। ঐসব ঝোপ ও আগাছার মধ্যে আত্ম-গোপন করে থেকে আততায়ীর পক্ষে এই ঘরের মধ্যে অবস্থিত কাউকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়াটা এমন কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়, কারণ নিচের ঐ জমিতে দাঁড়িয়ে ঘরের এই জানালাটা খোলা থাকলে ঘরের ভিতরের অনেকটা অংশই চোখে পড়া সম্ভব মনে হল।

আততায়ী ঐখান থেকেই বোধ হয় শতদলবাবুকে রাত্রে আলোর সামনে বসে থাকতে দেখে গুলি ছুঁড়েছিল। কথাটা কিরীটীকে সম্বোধন করেই নিম্নস্বরে বললাম আমি।

কিরীটী বোধ হয় নিজের আত্মচিন্তায় অন্যমনস্ক ছিল, আমার প্রশ্নে চমকে ফিরে তাকাল, কী বলছিলি সুব্রত?

বলছিলাম, ঐখান থেকে অনায়াসেই গুলি ছোঁড়া যেতে পারে—

তা পারে। মৃদুকণ্ঠে কিরীটী জবাব দিল। কিরীটীর কণ্ঠস্বরে যেন কোন আগ্রহের সুরই নেই।

রাণু এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করা অবধি, এবারে সে শতদলকে বলছে শুনতে পেলাম, তুমি কিন্তু সত্যিসত্যিই কাল খুব বেঁচে গেছ শতদল!

হ্যাঁ, তাই তো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি রাণু, এখনো যেন এর মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝে উঠতে পারছি না! আমাকে কারো হত্যা করে কী লাভ থাকতে পারে? তা ছাড়া তুমি তো জান, এ জগতে কারো সঙ্গেই আমার কোন শত্রুতা নেই।

কিন্তু ব্যাপারটা যে রকম দাঁড়াচ্ছে—

রাণুর কথায় প্রতিবাদ জানিয়ে শতদল বলে, সে যাই হোক, ব্যাপারটা ক্রমে এমন দাঁড়াচ্ছে যে, এর একটা হেস্তনেস্ত না করে চুপ করে বসে থাকাটাও হয়তো আর উচিত হবে না। আপনি কি বলেন মিঃ রায়?

হ্যাঁ, তা বইকি। We must see to its end! কিরীটী ফিরে দাঁড়িয়ে জবাব দিল।

তাহলে এখন আমার কী করা উচিত? আপনার পরামর্শ কী?

সেইটাই এতক্ষণ আমি ভাবছিলাম, শতদলবাবু। দুটো কাজ সর্বাগ্রে আপনাকে করতে হবে। কিরীটী শতদলের দিকে তাকিয়ে বলে।

কী, বলুন?

প্রথমত সমস্ত ব্যাপারটা এখানকার স্থানীয় থানা-ইনচার্জকে জানাতে হবে। কারণ তাঁদের বাদ দিয়ে আমরা এসব ব্যাপারে এক পাও এগুতে পারব না, তাছাড়া সেটা একেবারেই আইনসংগতও হবে না।

হ্যাঁ, গতরাত থেকে আমিও ঐ কথাটাই ভাবছিলাম। মৃদুভাবে শতদল বলে।

শুধু ভাবা নয় মিঃ বোস, আপনার উচিত ছিল ইতিমধ্যে থানা-ইনচার্জকে সমস্ত ব্যাপার বলে তাঁর পরামর্শ নেওয়া। যাক আর দেরি করবেন না, এখুনি কোন একজনকে থানায় পাঠিয়ে দিন এবং লিখে পাঠান তিনি যেন এখুনি একবার অনুগ্রহ করে এখানে আসেন, লিখবেন বিশেষ জরুরী।

এখুনি দেব ?

হ্যাঁ, আর এক মুহূর্তও দেরি করা উচিত হবে না।

কিরীটীর নির্দেশমত তখুনি শতদল একটা কাগজে স্থানীয় থানা অফিসারকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা লিখে এবং কিরীটীর নামটাম ঐ সঙ্গে যোগ করে মালী রঘুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল।

থানা অফিসার আসুন, ততক্ষণ আমরা চা-পান-পর্বটা শেষ করে নিই, কি বলেন শতদলবাবু!

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমি এখুনি আসছি—, শতদল বোধ হয় সকলের চায়ের ব্যবস্থা করতেই ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

রাণু দেবী সমুদ্রের দিককার খোলা জানালাটার ধারে গিয়ে চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

আমি কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ওঁরা দুজনেই যে নার্ভাস হয়ে গিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে!

কিরীটী পকেট থেকে সিগার-কেসটা বের করে একটা সিগার কেস থেকে টেনে নিয়ে সেটাতে অগ্নিসংযোগের চেষ্টায় ছিল, আমার কথার কোন জবাব দিল না। বুঝতে পারলাম তার নিঃশব্দতার কারণ। কোনো একটা বিষয়ে যখনই সে গভীরভাবে চিন্তা করে, সেই চিন্তার মধ্যেই সে বরাবর এমনভাবে অন্যমনা হয়ে যায় যে বাইরের পারিপার্শ্বিকের থেকে সে যেন অনেক দূরে চলে যায়।

আমি আর একবার কতকটা অনন্যোপায় হয়েই ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। ঘরটার দু-দিকে তিনটে তিনটে করে ছটা জানালা। দক্ষিণের দিকে সমুদ্র, উত্তরের দিকে একটু পূর্বে দেখা সেই খোলা জমিটা— প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বাড়িটার পশ্চাতের অংশ। ঘরের দেওয়ালে বড় বড় সব অয়েল-পেনটিং এবং সবগুলোই নারী ও পুরুষের প্রতিকৃতি। বোধ হয় শিল্পী রণধীর চৌধুরীর পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতি। প্রত্যেকটি প্রতিকৃতি যেন একেবারে সজীব, প্রাণবন্ত। কী অদ্ভুত শিল্পচাতুর্য!

শতদল এসে প্রবেশ করল অবিনাশকে সঙ্গে নিয়ে, অবিনাশের হাতে চায়ের ট্রে।

চা পরিবেশন করল রাণু দেবী কিরীটীরই অনুরোধে। চা-পান করতে করতেই একসময় কিরীটী তার অর্ধসমাপ্ত কথার জের টেনেই যেন বলতে লাগল, যে কথাটা আপনাকে বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলাম, আমার কিন্তু মনে হয়, এর পর আর আপনার এইভাবে একা একা এ বাড়িতে থাকা উচিত হবে না। এবং যুক্তিসঙ্গতও হবে না মিঃ বোস—

রাণু যেন কিরীটীর কথাটা কতকটা লুফে নিল। সে বলে ওঠে, আমিও সেই কথাটাই বলব বলব ভাবছিলাম তোমাকে শতদল। কিরীটীবাবু ঠিকই বলেছেন। এ বাড়িতে আর তোমার এভাবে risk নিয়ে একা একা থাকা উচিত

নয়।

তোমার যেমন কথা রাণু! একা একা আবার আমি এ বাড়িতে আছি কোথায়? ভিতরের মহলে অবিনাশ আছে, দিন দুই হল অবিনাশের এক ভাইপো এসেছে, রমেশ। তাকেও এ বাড়ির কাজে আমি নিযুক্ত করেছি, তাছাড়া দাদুর একমাত্র বোন হিরণ্ময়ী দিদি ও হরবিলাস দাদু এবং তাঁদের মেয়ে সীতা আছে। এতগুলো লোক বাড়িতে আছে! প্রতিবাদ জানায় শতদল।

তা হোক শতদলবাবু, হরবিলাসবাবু ও তাঁর স্ত্রী-কন্যা তাঁরা সকলেই থাকেন বাইরের মহলে। ভিতরে এত বড় মহলটায় বলতে গেলে আপনি তো একাই থাকেন। অবিনাশের বয়স হয়েছে, সেও হয়তো থাকে ভিতরের দিকে, কিন্তু এ অবস্থায় রাত্রে যদি আচমকা একটা বিপদ-আপদ ঘটে তো সময়মত কারো সাহায্যও তো আপনি পাবেন না! তা ছাড়া আমি এমন একজন লোককে সর্বদা আপনার কাছে কাছে রাখতে চাই, যিনি সর্বতোভাবে আপনাকে সাহায্য তো করতেই পারবেন এবং সর্বদা আপনার প্রতি দৃষ্টিও রাখতে পারবেন। কিরীটী জবাব দেয়।

কিন্তু এমন কোন একজন সহচর আমি এখন পাই বা কোথায় মিঃ রায়? শতদল যেন একটু চিন্তিতই হয়ে ওঠে।

এমন কোন আত্মীয় কেউ কি আপনার নেই, যিনি অন্ততঃ কিছুদিন এসে আপনার কাছে থাকতে পারেন?

কিছুদিন মানে! সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় শতদল কিরীটীর মুখের দিকে।

এই ধরুন, দিন ১৫।২০! দেখুন না ভেবে কেউ আছেন কিনা? কিরীটী আবার শতদলের মুখের দিকে তাকায় কথাটা বলে।

না, এমন কাউকেই মনে পড়ছে না। তবে আমার দাদুর বোন ঐ হিরণ্ময়ী দেবী, ওঁদেরই না হয় আমি অনুরোধ জানাতে পারি ভিতরের মহলে এসে থাকতে—শতদল বলে।

আমার মনে হয়, সেইটাই সব চাইতে ভাল ব্যবস্থা হবে। আমিই কথাটা বলি।

হরবিলাসবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে অনুরোধ জানাতে তাঁরা শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হলেন অন্দরমহলে এসে থাকতে এবং মনে হল হরবিলাস যেন প্রস্তাবটা আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। কিন্তু কেন যেন আমার মনে হল কিরীটীর এ প্রস্তাবে হরবিলাসবাবু সম্মত হওয়ায় শতদল খুব বেশী সন্তুষ্ট হতে পারেনি। হরবিলাসবাবুকে প্রস্তাবটা জানাবার জন্য আমরাই সকলে নিচে বাইরের মহলে গিয়েছিলাম। হরবিলাস-পরিবারের স্থান পরিবর্তনের ব্যবস্থাটা যাতে ঐদিনই সম্ভব হয়, কিরীটী শতদলকে সেই অনুরোধ জানাল।

শতদল বললে, রঘু ফিরে আসুক, সে এলেই অবিনাশ ও রঘু সব ব্যবস্থা করে দেবে'খন।

ঠিক এই সময় রঘু এসে ঘরে প্রবেশ করল এবং বললে, দারোগাবাবু এসেছেন নিজেই। বাইরে অপেক্ষা করছেন।

চলুন শতদলবাবু, উপরে আপনার ঘরে যাওয়া যাক। রঘু, দারোগা-

বাবুকে উপরের ঘরে নিয়ে এস। রঘুর দিকে তাকিয়ে কিরীটী নির্দেশ দিল।

শতদলবাবুকে নিয়ে আমরা অন্দরমহলে তাঁর ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম, রঘু বাইরে চলে গেল দারোগাবাবুকে ডাকতে।

স্থানীয় থানা-ইনচার্জ রসময় ঘোষাল, বয়স তেত্রিশের বেশী হবে না।

ভদ্রলোকের বোধ হয় নিয়মিত ব্যায়াম করা অভ্যাস, বেশ বলিষ্ঠ পেশী-বহুল চেহারা। লোকটি কথাবার্তায় অত্যন্ত অমায়িক। আমি কিরীটীর পরিচয় দিতে তিনি সোল্লাসে এগিয়ে এসে কিরীটীর সঙ্গে করমর্দন করলেন, কী সৌভাগ্য, আপনিই মিঃ কিরীটী রায়?

ভদ্রলোকের অমায়িক ব্যবহারে আমিও যেন মনে মনে অনেক স্বস্তি পাই। অন্ততঃ এর পর প্রতি পদে যার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে, তাঁর মধ্যে কোন পুলিসী অহমিকা বা গাম্ভীর্য নেই। সত্যিই ভদ্রলোক।

কিরীটীই শতদলবাবুর সঙ্গে ঘোষাল সাহেবের পরিচয়টা ঘটিয়ে দিল, ইনিই শতদলবাবু, এই বাড়ির মালিক ; ইনিই আপনাকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন মিঃ ঘোষাল।

বলতে লজ্জা নেই মিঃ রায়, আমি কিন্তু ওঁর চিঠিতে আপনি এখানে উপস্থিত জেনেই, থানার সমস্ত কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি এখানে ছুটে এসেছি। কী আশ্চর্য দেখুন, আপনি এখানে এসেছেন জানতেও পারিনি!

মিঃ ঘোষালের কথা শুনে শতদল একবার ঘোষালের দিকে তাকালেন।

কিরীটীর দিকে চেয়ে দেখি, কিরীটী কিন্তু মৃদু মৃদু হাসছে। ব্যাপারটার মধ্যে যে হাসির কি কারণ থাকতে পারে সেদিন ঐ মুহূর্তে বুঝিনি, পরে যখন রহস্যটা উপলব্ধি করেছিলাম—থাক্ সে কথা, বহুবার বহুক্ষেত্রে দেখেছি, কিরীটীর অত্যাশ্চর্য অনুসন্ধানী দৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে সর্বদা এমন ভাবে সজাগ থাকে যে, ভাবতেও বিস্ময়ে যেন অভিভূত হয়ে যেতে হয়। শুধুমাত্র তাই নয়, বহুক্ষেত্রে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ ঘটনা, অনেক সময় যার কোন তাৎপর্যই হয়তো আমরা খুঁজে পাই না,—কিরীটী প্রবলভাবে সেইটার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এবং বারংবার সেইটা নিয়েই নাড়াচাড়া করতে থাকে নিজের মনের গভীর তলদেশে। কিরীটীকে ঐ সম্পর্কে পরে প্রশ্নও করেছি। জবাবে সে বলেছে, প্রত্যেক মানুষেরই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ আছে সুব্রত এবং তার বিচার-পদ্ধতিটাও মানুষ-বিশেষে বিভিন্ন। সামান্য একটা তুচ্ছ ঘটনা, যা হয়তো অনেকেরই চিন্তায় রেখাপাতও করে না, অনেক সময় সেই তুচ্ছর মধ্যেই আমি রহস্যেরই ইঙ্গিত পাই।

কিরীটীর কথায় আবার আমার সম্বিৎ ফিরে এল, তাহলে আপনাকে আগাগোড়া ব্যাপারটা খুলেই বলি, মিঃ ঘোষাল। যদিও ব্যাপারটার মধ্যে কাল পর্যন্তও শতদলবাবু কোন গুরুত্বই আরোপ করেন নি এবং গতরাত্রি থেকে কতকটা বাধ্য হয়েই মত পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছেন, সেটা হচ্ছে ভদ্রলোক বর্তমানে সত্যিই বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। আরো সোজা করে বললে বলা উচিত, শতদলবাবুর প্রাণ কয়েক দিন থেকে বিপন্ন হয়ে উঠেছে।

বিপন্ন হয়ে উঠেছে, কী রকম? প্রশ্ন করে ঘোষাল মশাই কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

Somebody is after his life!

বলেন কী? সত্যি?

হ্যাঁ, চার-চারটে attempt, অর্থাৎ অত্যন্ত সাধুপ্রচেষ্টা ওঁর জীবনের ওপরে হয়ে গিয়েছে!

চার-চার-বার attempt হয়েছে?

হ্যাঁ। প্রথমবার, ঐ যে দেখছেন খাটের পাশে মাটিতে নামানো বড় অয়েল পেনটিংটা, ঐটাই বোধ হয় ওঁর অজ্ঞাতে কোন এক সময় এমন কায়দা করে ফিট করে রাখা হয়েছিল, যাতে করে রাত্রে ঘুমের ঘোরে কোন এক সময় সহসা ছবিটা মাথার উপরে ছিঁড়ে পড়ে ওঁর মাথাটা থেঁতলে দিয়ে ওঁর মৃত্যু ঘটায়। যদিও ব্যাপারটা গতকালই মাত্র ওঁর মুখে শোনা, আজ ঘরে ঢুকে একসময় ইতিপূর্বে ঐ ছবিটার প্রতি নজর দিয়েই আমি দেখেছি এবং আপনিও ইচ্ছা করলে এগিয়ে গিয়ে দেখে আসতে পারেন, ছবিটা টাঙানো ছিল একটা মোটা তার দিয়ে এবং সে তারটাকে এমন ভাবে সামান্য একটু অংশ বাকি রেখে কাটা হয়েছে যে ছবির ভারে বাকি তারের অংশটুকু ছিঁড়ে পড়া একসময় এমন কিছুই বিচিত্র নয়।

কিরীটীর কথা শুনে আমরা সকলেই খাটের পাশে নামিয়ে রাখা ছবিটির দিকে তাকালাম এবং বুঝলাম কিরীটীর কথাটা মিথ্যা নয়। গতকাল সকালে হোটেলের সামনে সী-বীচে শতদলবাবু ছবি সম্পর্কে কিরীটীকে কী বলেছিলেন ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ আবার হঠাৎ কিরীটীর কথায় মনে পড়ে গেল।

এগিয়ে গেলাম সকলে কিরীটীর সঙ্গে-সঙ্গেই ছবিটার দিকে।

যে তারের সাহায্যে ছবিটা দেওয়ালে পেরেকের সঙ্গে পাকাপোক্তভাবে টাঙানো ছিল, দেখলাম পরীক্ষা করে, সত্যি সত্যিই সে তারটা কোন কিছুর সাহায্যে এমন ভাবে কাটা যে বাকি যে অংশটুকু কাটা ছিল না সেটা ছবির ভারেই ছিঁড়ে গিয়েছে। কিরীটী কথাটা ভোলেনি এবং আজ ঘরে প্রবেশ করে অন্যান্য কথাবার্তার মধ্যেও ছবিটাকে লক্ষ্য করেছে এবং বেশ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতেই সবটুকু লক্ষ্য করেছে ইতিমধ্যেই। কিরীটী আবার বলতে লাগল, তারপর দ্বিতীয়বার attempt হয় এই বাড়ির বাইরে। এখানে আসবার সময়ই লক্ষ্য করে থাকবেন হয়তো মিঃ ঘোষাল, বাড়ির গেট থেকে যে রাস্তাটা বরাবর সামনের দিকে চলে গিয়েছে, বাড়িটা পাহাড়ের উপর অবস্থিত বলে রাস্তাটা ক্রমে ঢালু হয়ে নিচে গিয়েছে, সেই ঢালু রাস্তা দিয়ে একসময় শতদলবাবু যখন অন্যমনস্ক হয়ে নিচে নেমে যাচ্ছেন, পিছন থেকে কেউ একটা বড় পাথরের চাঁই গড়িয়ে দিয়ে ওঁকে পিষে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল।

ঘোষাল শতদলের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

হ্যাঁ। মৃদু কণ্ঠে শতদল বললে, প্রথমটায় আমি বিশ্বাস করিনি ব্যাপারটা, ভেবেছিলাম হয়তো সাধারণ ভাবেই হঠাৎ পাথরের চাঁইটা নিচের দিকে গড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, কিরীটীবাবুর কথাই ঠিক, that was also an attempt on my life!

তারপর তৃতীয় প্রচেষ্টা গতকাল সকালে সমুদ্রসৈকত হোটেলের সামনে সী বীচে—কিরীটী আবার বলে।

বলেন কি মিঃ রায়?

হ্যাঁ, and that was a bullet! কিন্তু আততায়ী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ফলে

উনি তো বে'চে যানই, আমার পৈতৃক প্রাণটাও—মানে প্রাণ ঠিক নয়, মাথাটাও বে'চে যায়।

সত্যি? বিস্ময়ে যেন একেবারে হাঁ হয়ে গিয়েছেন ঘোষাল কিরীটীর কথায়।

হ্যাঁ, আমার মাথার টুপিটা ফুটো করে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে বুলেটটা বের হয়ে যায়। এবং সেই ব্যাপারের পরই আকস্মিকভাবে ওঁর সংগে আমাদের চেনা-পরিচয়। আমি আর সুব্রত তখন ঠিক ঐ সময় সী-বীচে বসে রৌদ্র-সেবন করছিলাম।

কই, এ কথা তো তুমি কাল আমাকে বলোনি শতদল! এতক্ষণে প্রশ্ন করল রাণু শতদলকে।

কী বলব তোমাকে, গতকাল ব্যাপারটা আমি কি বিশ্বাস করেছিলাম! শতদল বিষণ্ণ ভাবে জবাব দেয়।

কিন্তু দিনের আলোয় অমন জায়গায় কাউকে গুলি করে হত্যা করবার প্রচেষ্টা, এ যে তাজ্জব ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে মিঃ রায়! আপনি না হয়ে অন্য কারো মুখে ব্যাপারটা শুনলে তো আমি বিশ্বাসই করতাম না, হেসেই উড়িয়ে দিতাম। ঘোষাল বললেন।

ব্যাপারটা অবশ্য কতকটা সেই রকমই বটে, মিঃ ঘোষাল। তবে অনেক সময় দেখা গিয়েছে, সত্যিকারের তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ক্রিমিন্যাল দু-একটা ঐ প্রকারের দুঃসাহসের কাজ করে থাকে। যাই হোক, এর পর আমি কতকটা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই শতদলবাবুকে fourth attempt সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিই!

দিয়েছিলেন ওঁকে সতর্ক করে?

হ্যাঁ। And the fourth attempt was rather too early! ভাবতেই পারিনি, এত দ্রুত আবার আততায়ী ওঁর জীবনের উপরে attempt নেবে! এবারেও গুলি এবং এই ঘরের মধ্যে!

এই ঘরের মধ্যে?

হ্যাঁ। পিছনের বাগান থেকে কেউ ওঁকে গতরাত্রে টেবিলের সামনে আলোয় বসে লেখাপড়া করতে দেখে নিশ্চিন্ত মনে বন্দুক চালায়। এবং সৌভাগ্য-বশতঃ এবারের নিক্ষিপ্ত মৃত্যুবাণটিও লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম হয়নি আততায়ীর। আলোর চিমনিটার উপর দিয়ে গিয়েছে। এরপর আপনাকে সংবাদ না দিয়ে থাকাটা এবং সব কিছু আপনার গোচরীভূত না করাটা বিবেচনার কাজ হবে না বুঝেই আপনাকে সংবাদ পাঠানো হয়েছে। Now you are in the spot, এবারে আপনি এর একটা বিহিত করুন, কারণ আইন আপনাদেরই হাতে। আমরা সম্পূর্ণ তৃতীয় ব্যক্তি, বুদ্ধি বা মৌখিক সাহস দিতে পারি ওঁকে, কিন্তু সত্যিকারের সাহস বলতে যা বোঝায় একমাত্র তা উনি আপনাদের কাছেই আশা করতে পারেন ও পেতে পারেন। কিরীটী চুপ করল।

ঘোষালের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সমস্ত ঘটনা শোনবার পর তাঁর অবস্থা কতকটা ন যযৌ ন তস্থৌ।

ভদ্রলোক বিমূঢ় ও বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। অসহায়ের মতই ঘোষাল কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

কিন্তু এ ব্যাপারে আমি যে ঠিক কি ভাবে ওঁকে সাহায্য করতে পারি,

সেটা তো বুঝে উঠতে পারছি না মিঃ রায়! অবশ্য যদি উনি ভালো বোঝেন তো জন-দুই পাহারাওয়ালা এ বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য মোতায়েন করতে পারি!

কিন্তু তাতে করে বিশেষ কোন ফল হবে বলে কি আপনার মনে হয়, মিঃ ঘোষাল? কিরীটী ঘোষালের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

তবে কি ভাবে আমি সাহায্য করতে পারি বলুন! I would be always at your service! ঘোষাল বললেন।

তার চাইতে যদি কোন plain dress-এর গোয়েন্দাকে সর্বদা শতদল-বাবুকে পাহারা দেবার জন্য নিযুক্ত করা যায়,—কথাটা আমি বললাম।

না, না মিঃ ঘোষাল, ও-সব কিছুর প্রয়োজন নেই। তার চাইতে যা বলছিলেন, রাত্রে জন-দুই যদি পাহারাওয়ালা আমার এ বাড়িটা পাহারা দেবার জন্য পাঠাতে পারেন, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। শতদলবাবু আমার কথার প্রতিবাদ জানান।

কিরীটী নিঃশব্দে চোখ বুজে আপন মনে চেয়ারটার উপর বসে পা নাচাচ্ছিল, শতদলবাবুর প্রতিবাদে একটিবার মাত্র বোজা চোখ দুটি খুলে শতদলের মুখের দিকে তাকিয়েই আবার পূর্ববৎ পা নাচাতে লাগল।

শতদলবাবুর প্রস্তাবে কতকটা যেন নিশ্চিন্ত হয়েছেন বলে ঘোষালকে মনে হল। তিনি কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তাহলে সেই ব্যবস্থাই করি, মিঃ রায়?

কিরীটী সহসা উঠে দাঁড়ায়, হ্যাঁ, আপাততঃ তাই করুন। আচ্ছা শতদল-বাবু, আমরাও তাহলে উঠি। আপনি তাহলে হরবিলাসবাবুদের অন্দরমহলে আনার ব্যবস্থা করুন আজই।

হ্যাঁ, তাই করব। তবে আপনার সাহায্যও কিন্তু আমি চাই, মিঃ রায়!

কিরীটী হাসল, তা অবশ্যই পাবেন বইকি। তা ছাড়া ব্যাপারটায় আমি নিজেও কম interested নই। চল সুব্রত,—কিরীটী দরজার দিকে অগ্রসর হয়। ঘোষালও আমাদের অনুসরণ করলেন।

সিঁড়ির শেষ ধাপে অবিনাশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

কিরীটী হঠাৎ থেমে দাঁড়াল, অবিনাশ?

আজ্ঞে বাবু!

অনেকদিন এ বাড়িতে আছ, না?

হ্যাঁ, বাবু মশাইয়ের কাছেই আমি তো পনের বছর চাকরি করেছি—

হঠাৎ কিরীটী শতদলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা শতদলবাবু কতদিন আগে আপনার ঘরের সেই ছবিটা ছিঁড়ে পড়েছিল বলুন তো?

তা দিনচারেক আগে হবে। শতদলবাবু জবাব দেন।

ব্যাপারটা তুমি জান অবিনাশ? কিরীটী ঘুরে দাঁড়িয়ে এবারে অবিনাশকে প্রশ্ন করে, শতদলবাবুর ঘরের ছবি ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছিল!

হ্যাঁ বাবু, দেখেছি। তাজ্জব ব্যাপার! অমন মোটা তারটা যে কী করে ছিঁড়ল—

ছেঁড়েনি তো--কেউ কেটে রেখেছিল তারটাকে! কিরীটী জবাব দেয়।

বলেন কি বাবু! বিস্মিত অনিবাশ কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ। তুমি আর রঘু ছাড়া তো বাড়ির মধ্যে কেউ ঢোকে না? কিরীটী

আবার প্রশ্ন করে।

আজ্ঞে না। তবে দিনকতক হল আমার ভাইপো এসেছে, বাবু তাকে চাকরিতে বহাল করেছেন দয়া করে।

ও! বাবুর রান্নাবান্না করে কে?

হিন্দুস্থানী ঠাকুর আছে একটা, বাবুর সঙ্গেই তো এসেছে। অবিনাশ জবাব দেয়।

কই, আপনি তো সেকথা বলেননি শতদলবাবু? কিরীটী প্রশ্ন করে শতদলের মুখের দিকে তাকায়।

মনে ছিল না। হ্যাঁ, ভুখনা আছে, আমার সঙ্গেই এসেছে, লোকটা বোবা আর কালা।

বোবা আর কালা! এমন রত্নটি কোথায় পেলে শতদল? প্রশ্নকারী রাণু দেবী।

লোকটা অনেকদিন থেকেই আমার কাছে আছে। জাতে ছত্রী। রান্না করে চমৎকার। শতদল জবাব দেয়।

কই ডাকুন তো, দেখি লোকটাকে! আমিই বলি।

অবিনাশ, ভুখনাকে ডেকে নিয়ে এস তো! শতদল অবিনাশের দিকে তাকিয়ে আদেশ করে।

অবিনাশ ভুখনাকে ডাকতে চলে গেল।

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম সকলে।

॥ ৬ ॥

ভুখনাকে ডেকে নিয়ে এল অবিনাশ।

দ্রষ্টব্য বটে ভুখনা। যেমনি লম্বা তেমনি ঢ্যাঙা। দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় ফুট ছয় ইঞ্চির কাছাকাছি হবে। দেহের অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যের জন্যই বোধ হয় লোকটা একটু কোলকুঁজো হয়ে হাঁটে। বড় বড় ভাসা ভাসা দুটো চোখের তারায় কেমন একপ্রকার বোবা নির্বোধ দৃষ্টি। ছড়ানো চৌকো চোয়াল। মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, অন্ধকারে আচমকা লোকটাকে দেখলে আঁতকে ওঠাও কিছু অসম্ভব নয়।

লোকটা তো বলছিলেন বোবা আর কালা, তা ওকে দিয়ে কাজ চালান কেমন করে শতদলবাবু? প্রশ্ন করল কিরীটী।

অনেকদিন আমার কাছে থেকে থেকে এখন আমার মুখ নাড়া দেখলেই ও বুঝতে পারে কী আমি বলতে চাই। তাই কাজকর্মের কোন অসুবিধা হয় না। তা ছাড়া একমাত্র রান্না করানো ছাড়া ওকে দিয়ে তো আর অন্য কোন কাজই করানো হয় না। শতদল জবাব দেয়।

এখানে আসবার পূর্বে তো আপনি কলকাতাতেই ছিলেন—তাই না শতদল-বাবু?

হ্যাঁ, কলকাতার একটা বেসরকারী কলেজের আমি ইংরেজীর অধ্যাপক।

কিরীটী আবার অবিনাশের দিকে ফিরে তাকিয়ে তাকেই প্রশ্ন করল, ভুখনা একেবারেই শুনতে পায় না অবিনাশ, না?

তাই তো মনে হয় বাবু, একেবারে বেহদ্দ কালা!

এমন সময় সহসা গতরাত্রের সীতার সেই ভয়ংকর আলসেসিয়ান কুকুরটার ডাক শুনতে পেলাম।

ঘেউ ঘেউ করে টাইগার ডাকছে।

আমরা সকলেই কুকুরের ডাকে চমকে বোধ হয় ক্ষণেকের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ কিরীটীর দিকে তাকিয়ে দেখি, নিষ্পলক দৃষ্টিতে সে ভুখনার দিকেই তাকিয়ে আছে।

ভুখনার চোখে কিন্তু সেই বোবা নির্বোধ দৃষ্টি। নিষ্প্রাণ, স্থির।

চলুন মিঃ ঘোষাল! কিরীটীই আবার সর্বাগ্রে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

আমরাও সকলে তাকে অনুসরণ করলাম।

শতদল গেট পর্যন্ত আমাদের পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিয়ে ফিরে গিয়েছে।

নিঃশব্দে সর্বাগ্রে কিরীটী ও মিঃ ঘোষাল পাশাপাশি এবং আমি ও রাণু দেবী পাশাপাশি পাহাড়ের ঢালু পথটা দিয়ে এগিয়ে চলেছি হোটেলের দিকেই।

সকালের শীতের রৌদ্রে নীল সমুদ্র যেন চূর্ণ ঢেউয়ের মাথায় মাথায় গুচ্ছ গুচ্ছ জুঁই ফুল ছড়িয়ে আপন মনে খেলে চলেছে। আমার মনের মধ্যে তখন 'নিরালা' ও তার অধিবাসীদের কথাই ঘোরাফেরা করছে।

শতদলবাবুর জীবন বিপন্ন সন্দেহ নেই, কিন্তু কেন? কোন গোপন রহস্য কি ঐ 'নিরালা'র মধ্যে লুকিয়ে আছে? কিংবা কোন গুপ্তধন? শতদলই শিল্পী রণধীর চৌধুরীর যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হল কি করে? আইনের দিক থেকে সীতা বা তার মা হিরণ্ময়ী দেবীর কি কোন স্বত্বই নেই মৃত শিল্পীর সম্পত্তিতে? এবং শতদল, সীতা ও হিরণ্ময়ী দেবী ব্যতীত আর কোন উত্তরাধিকারীই কি নেই? আর শতদলবাবুই বা বলেন কি করে তিনিই তাঁর মৃত দাদুর যাবতীয় সম্পত্তির একমেবাদ্বিতীয়ম্ উত্তরাধিকারী? কোন উইল বা ঐ জাতীয় কোন লেখাপড়া আছে কি? মৃত শিল্পী রণধীর চৌধুরীর কি কোন আইন-উপদেষ্টা সলিসিটার বা অ্যাটর্নী ছিল না? না আছে? বৎসরাধিককাল হরবিলাস, তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী ও তাঁদের কন্যা সীতা ঐ 'নিরালা'তে আছেন এবং রণধীর চৌধুরীর জীবিতকালে তাঁরই আমন্ত্রণে রুগ্ন হিরণ্ময়ী ওখানে আসেন—তাঁরা বাইরের মহলে থাকেন কেন? ব্যবস্থাটা কি রণধীর চৌধুরীরই? তাই যদি হয়, তাহলে নিজের রুগ্না ভগিনীর প্রতি এ ব্যবহার কেন? কোন কারণবশতঃই কি তিনি—রণধীর চৌধুরী তাঁর রুগ্ন বোনকে বাইরের মহলেই এনে স্থান দিয়েছিলেন? ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে, তথাপি হিরণ্ময়ী দেবীরা এখনো এখান হতে অন্যত্র যাননি কেন? হরবিলাসদের কী ভাবেই বা সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়? পূর্বেই বা কী করতেন, এখনই বা কী করেন! পেনশন পান, না কোন জমিদারী বা সঞ্চিত অর্থ আছে! তাই যদি থাকে, তাহলে এভাবে হতাদরে বহির্মহলে পড়ে থাকবারই বা কী কারণ থাকতে পারে! বাড়ির প্রত্যেকটি প্রাণীই যেন আমার মনের মধ্যে আনাগোনা করে ফিরতে থাকে। একান্তভাবে পত্নীর শরণাপন্ন ও মুখাপেক্ষী হরবিলাস, তাঁর স্ত্রী—পক্ষাঘাতগ্রস্ত চলচ্ছক্তিহীন প্রৌঢ়া স্ত্রী হিরণ্ময়ী; তাঁর চক্ষুর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। তাঁদের একমাত্র তরুণী কন্যা সীতা যেন একটি নির্বাক দ্রষ্টা। সদা-সঙ্গী তার ভীষণাকৃতি আলসেসিয়ান কুকুর—টাইগার। বৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্য অবিনাশ। পুরাতন মালী রঘু। শতদলের বোবা ও কালা ছত্রী অনুচর ভুখনা। সহজ সরল অধ্যাপক মানুষ শতদল, ক্রোড়পতির

একমাত্র কন্যা অনন্যাসুন্দরী তরুণী রাণু দেবীর অনুরক্ত।

নিঃশব্দেই আমরা সকলে দীর্ঘ পথটা অতিক্রম করে হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ঘোষাল কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তাহলে এবারে আমাকে বিদায় দিন মিঃ রায়!

তা কি হয়, এক কাপ চা অন্তত না খেয়ে—আসুন? রাণু দেবী, আপনি? কিরীটী রাণুর মুখের দিকে তাকাল।

আমাকে ক্ষমা করতে হবে মিঃ রায়—কয়েকটা জরুরী চিঠি সকালেই আমাকে শেষ করতে হবে। তা ছাড়া অনেকক্ষণ বের হয়েছি, মা হয়তো ব্যস্ত হয়ে আছেন।

রাণু বিদায় নিয়ে উপরে চলে গেল।

আমরা তিনজনে হোটেলের বারান্দায় এসে বসলাম তিনটে চেয়ার টেনে নিয়ে। আমার মাথার মধ্যে তখনও পূর্বের চিন্তাগুলোই নিঃশব্দে পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছে। সম্মুখের রৌদ্রালোকিত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে রইলাম আমি।

কিরীটী ও ঘোষাল নিম্নস্বরে কী সব আলাপ করতে লাগল।

মধ্যে মধ্যে কেবল তাদের দু-একটা কথার অস্পষ্ট টুকরো শ্রুতিপথে আমার ভেসে আসছিল। বুঝলাম সম্পূর্ণ অন্য সাধারণ কথাবার্তা। 'নিরালা' সম্পর্কে বা শতদল-ঘটিত কোন আলোচনাই নয়।

দিন দুই এর পর যেন কতকটা নির্বিবাদেই কেটে গেল। দুটো দিন কিরীটীও বিশেষ হোটেল থেকে কোথাও একটা বের হয়নি। বেশীর ভাগ সময়ই বারান্দায় ডেকচেয়ারে শুয়ে নিঃশব্দে একটার পর একটা সিগার ধ্বংস করেছে। মনে হয়েছে, সে যেন চারিদিক হতে হঠাৎ নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বিশেষ কোন একটা চিন্তায় সমাধিস্থ হয়ে পড়েছে। তৃতীয় দিন হঠাৎ বিকালের দিকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চল সুব্রত, সমুদ্রের ধার দিয়ে একটু ঘুরে আসা যাক।

দুজনে নিঃশব্দে সমুদ্রের বালুবেলার উপর দিয়ে পাহাড়টার দিকে হেঁটে চলেছি, হঠাৎ দূরে মনে হল যেন কে একটি তরুণী আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। অস্তমুখী ম্লান সূর্যালোকে দূর হতে সীতাকে দেখে আমার চিনতে কষ্ট হলেও কিরীটীর কিন্তু চিনতে কষ্ট হয়নি।

সে বলে ওঠে, আশ্চর্য! সীতা দেবী একাকী আসছেন? সঙ্গে তাঁর সেই চিরানুগত সাথী দুরন্ত ব্যাঘ্র-সদৃশ ভয়ঙ্কর আলসেসিয়ান কুকুর টাইগারকে কই দেখছি না যে!

সত্যি সীতাই আসছে।

কাছাকাছি আসতে কিরীটীই প্রথমে হাত তুলে সম্ভাষণ নমস্কার জানাল, শুভ সন্ধ্যা। এই যে সীতা দেবী, একা যে, আপনার অনুগত সাথীটি কই? তাকে দেখছি না যে?

নমস্কার। সীতাও হাত তুলে প্রতিনমস্কার জানিয়ে বললে, আমার অনুগত সাথী?

হ্যাঁ, আপনার সেই টাইগার?

সহসা লক্ষ্য করলাম কিরীটীর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই সীতার চোখের তারা দুটি যেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল, কাল রাত্রে হঠাৎ গুলি লেগে বেচারার একটা

পা জখম হয়েছে, মিঃ রায়। কাতর কণ্ঠেই সীতা বললে।

বলেন কী, টাইগার গুলিতে জখম হয়েছে! হাসতে হাসতে কিরীটী শেষের কথা কয়টি উচ্চারণ করে, তারপর সহসা সীতার মুখের দিকে তাকিয়েই বলে, কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো? এ যে বাঘের ঘরে ঘোঘের ব্যাপার!

সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার, মিঃ রায়! আমি আপনার সঙ্গেই হোটেলে দেখা করতে যাচ্ছিলাম—

আমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন?

হ্যাঁ। আপনি তো জানেন, সেদিনই আমাদের অন্দরমহলে থাকবার জন্য শতদল-ভাগ্নে অনুরোধ জানান। আপনারা চলে আসবার পর কতকটা যেন নিজে উৎসাহ দেখিয়েই একপ্রকার আমাদের অন্দরমহলের দক্ষিণ দিককার যে দুটো ঘর খালি পড়ে ছিল, তাতে নিয়ে গিয়ে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। একটা দিন ও একটা রাত ভালোই লাগছিল। কিন্তু—, কথাগুলো বলে সীতা যেন একটু দম নেয়।

কিরীটী ও আমি দুজনই উদ্‌গ্রীব হয়ে সীতার কথা শুনছি।

সীতা আবার বলতে শুরু করে, কাল রাত তখন বোধ হয় গোটা দুই হবে। অন্যান্য দিনের মতই টাইগার আমার ঘরের বাইরে শুয়ে ছিল। হঠাৎ তার ক্রুদ্ধ একটা চাপা গোঁ-গোঁ শব্দে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে হল কোন কারণে টাইগার যেন হঠাৎ ভীষণ খাপ্পা হয়ে উঠেছে। তারপরই পর পর দুটো গুলির শব্দ!

গুলির শব্দ?

হ্যাঁ। প্রথমটায় তো সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়, ভয়ে আতঙ্কে আমি একেবারে কাঠ হয়েই গিয়েছিলাম ঘটনার আকস্মিকতায়। কিন্তু চিরদিনই ভয় বস্তুটা আমার একটু কম। নিজেকে সামলে নিতে তাই আমার খুব বেশী সময় লাগেনি। তাড়াতাড়ি বিছানা হতে উঠে দরজাটা খুলে একেবারে বাইরে চলে এলাম। মাঝরাতে কাল বোধ হয় চাঁদ উঠেছিল। ম্লান চাঁদের আলো বারান্দটার উপরে এসে পড়েছে। দেখলাম টাইগার তখনও আমার ঘরের দরজার অল্প দূরে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে গোঁ গোঁ করে গজরাচ্ছে যন্ত্রণায়। ইতিমধ্যে পাশের ঘরে মা-বাবার এবং উপরের তলায় শতদল-ভাগ্নেরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তারাও যে যার ঘর থেকে টাইগারের গর্জন শুনে বের হয়ে এসেছে। শতদল-ভাগ্নের ডাকাডাকিতে অবিনাশও ঘুম ভেঙে উঠে এল। আমি টাইগারকে ডাকতেই সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, তার ডান পা-টা বেশ গুরুতর ভাবেই জখম হয়েছে। রক্ত ঝরছে তখনও। বারান্দাতেও রক্ত। আর—আর বারান্দায় দেখলাম, অনেকগুলো কেডস্‌ জুতোর সোলের ছাপ। ছাপগুলো জুতোর সোলে বোধ হয় ভিজে কাদা লেগেছিল তারই। এবং জুতোর ছাপ লক্ষ্য করে দেখলাম, বরাবর বারান্দার দক্ষিণ প্রান্তের শেষ পর্যন্ত যেখানে প্রাচীর শুরু হয়েছে এবং প্রাচীরের গায়ে যে দরজাটা সেই পর্যন্ত চলে গেছে। দরজাটা কিন্তু বন্ধ। দরজাটা বাইরের থেকে শিকল তুলে বন্ধ করে দিয়েছে। এদিককার খিল খোলা। দরজাটা ভিতর থেকেই খিল এঁটে বন্ধ করা ছিল।

সীতা চুপ করল।

কিরীটী আগাগোড়া সীতার বর্ণিত কাহিনী গভীর মনোযোগ সহকারে

শুনছিল। এতক্ষণে কথা বলল, আচ্ছা সীতা দেবী, ইতিপূর্বে আর কখনো ঐ বাড়িতে থাকাকালীন সময়ের মধ্যে আপনার টাইগারের উপর কোন প্রকার attempt হয়েছিল কি?

এখন মনে হচ্ছে, দিন দশেক আগে একবার বোধ হয় টাইগারের উপর কোন attempt হয়েছিল।

কী রকম?

সে-রাত্রেও ঠিক অমনি কালকের রাতের মতই টাইগারের চাপা গর্জন শুনে ঘর থেকে আমি বের হয়ে আসি কিন্তু কিছুই দেখতে পাই না—

কোন firing-এর শব্দ শুনেছিলেন সে-রাত্রে?

না।

হুঁ। কিরীটী মুহূর্তকাল কি যেন ভাবে, পরে প্রশ্ন করে, শতদলবাবু কোথায়? এখন বাড়িতে আছেন নাকি?

তিনি ঘণ্টাখানেক আগেই বের হয়ে এসেছেন; জানি না ঠিক কোথায় গিয়েছেন!

আচ্ছা সীতা দেবী, জুতোর সেই ছাপগুলো বারান্দায় এখনো আছে কি? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

বোধ হয় আছে। কারণ সকালেই তো থানা-অফিসার মিঃ ঘোষালকে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল।

মিঃ ঘোষাল গিয়েছিলেন ওখানে?

হ্যাঁ। তিনি দুপুরেই এসেছিলেন। বললেন, আপনার সঙ্গে তিনি দেখা করবেন। বুঝতে পারছি তিনি দেখা করেন নি।

সন্ধ্যার ধূসর অস্পষ্টতা ক্রমে যেন চারিদিকে চাপ বেঁধে উঠছে। একটু একটু করে চারিদিককার পটচ্ছায়া লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যাকাশে দেখা দিতে শুরু করেছে একটি-দুটি করে তারা। অল্পদূরে ডানদিকে সমুদ্র সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে একটানা গর্জনে জানাচ্ছে তার অস্তিত্ব।

ক্ষণকালের জন্য কিরীটী বোধ হয় কী চিন্তা করে সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে সীতা দেবীর দিকে তাকিয়ে বলে, সীতা দেবী, আপনার বাবা মিস্টার ঘোষ এখন বাড়িতেই তো আছেন, না?

হ্যাঁ। বাড়ি থেকে বড় একটা তিনি তো কোথাও বের হন না। মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় সীতা।

চলুন। একবার না হয় আপনাদের ওখান থেকেই ঘুরে আসা যাক। শতদলবাবু এর মধ্যে ফিরে এলে তাঁর সঙ্গেও হয়তো দেখা হয়ে যেতে পারে, কী বলেন?

চলুন। হতেও পারে। কতকটা সোৎসাহেই সীতা যেন কিরীটীর প্রস্তাবটা অনুমোদন করে।

কিরীটী ও সীতা পাশাপাশি এগিয়ে চলে, আমি ওদের অনুসরণ করতে লাগলাম।

মাথার উপরে শীতের কুয়াশাহীন প্রথম রাতের কালো আকাশে তারাগুলো বেশ উজ্জ্বল মনে হয় এখন। সমুদ্রের ভাঙা ঢেউয়ের শীর্ষে শীর্ষে ফসফরাসের সোনালী ঝিলিক চিক-চিক করে ওঠে। কালো জলে আলোর চুমকি ওগুলো যেন।

সহসা কিরীটীই আবার পাশাপাশি চলতে চলতে সীতাকে প্রশ্ন করে, আপনি আমার ওখানে যাচ্ছিলেন কেন মিস ঘোষ?

ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ করব—

পরামর্শ! কিসের বলুন তো?

এখানে, মানে ঐ বাড়িতে থাকাটা আর ভালো হবে কি না তাই ভাবছি—

কেন?

ভাবছিলাম মা'র বর্তমান অবস্থা ভেবেই। এমনিতে মা'র নার্ভ খুব স্ট্রং, কিন্তু গতরাত্রের ব্যাপার দেখেশুনে মা যেন বেশ একটু নার্ভাসই হয়ে পড়েছেন বলে মনে হয়। জানেন তো, একে প্যারালেটিক রোগী—ডাক্তারের অ্যাডভাইস আছে যেন ওঁর পক্ষে কোন সময়েই কোনপ্রকার মানসিক উত্তেজনার কারণ না ঘটে। মাকে সর্বদাই তাই আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি যাতে ওঁর মানসিক শান্তি অটুট থাকে। কিন্তু গত কয়েক দিন ধরে ঐ বাড়িতে যা সব ঘটেছে—সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তির পক্ষেই উত্তেজনার কারণ হচ্ছে, তা মা তো রোগী—

কথাটা অবশ্য ভাববার, মিস ঘোষ! কিন্তু আপনার বাবা কী বলেন? কিরীটী প্রশ্ন করে।

বাবা! এসব ব্যাপারে অত্যন্ত indifferent। জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে আসছি তো, কোন ব্যাপারেই তিনি বড় একটা থাকতে চান না। নির্লিপ্ত। অসুস্থ হলেও মা-ই সব কিছু দেখাশোনা করেন। তাঁর পরামর্শমতই সব চলে। কিন্তু এক্ষেত্রে যে মাকে নিয়েই কথাটা।

সীতার কথার এবারে আর কিরীটী কোন জবাব দেয় না। নিঃশব্দে কেবল পথ অতিক্রম করতে থাকে।

সীতাই আবার কথা শুরু করে, মা'র আপনার উপরে একটা অসাধারণ শ্রদ্ধা আছে মিঃ রায়। আমার তো মনে হয়, এ অবস্থায় আমাদের আর ও বাড়িতে বেশী দিন থাকা উচিত হবে না। যে যাই বলুক, definitely some foul play is going over there! তা ছাড়া স্বাস্থ্যের জন্যই মা'র ঐ বাড়িতে থাকা—স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও মা'র বর্তমানে বিশেষ যে কোন progress হচ্ছে বলেও আমার মনে হয় না—

কিন্তু কোন প্রকার foul play-ই যে বর্তমানে ঐ বাড়িতে চলেছে তাই বা আপনার ধারণা হল কেন মিস ঘোষ?

নইলে গত কয়েক দিন ধরে যে সব ব্যাপার ঘটছে, এ-সবের আর কি explanation হতে পারে, আপনিই বলুন! একটা হানাবাড়ি—

ভূত-প্রেতে আপনার বিশ্বাস আছে নাকি সীতা দেবী?

না, না—ঠিক সেভাবে কথাটা আমি অবশ্যই বলিনি, মিঃ রায়। বলছিলাম, যা ও বাড়িতে ঘটছে, যুক্তি-তর্ক দিয়েও যে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছি না।

আমার কি মনে হয় জানেন সীতা দেবী?

কী?

এখুনি ও-বাড়ি ছেড়ে হয়তো আপনার মা অন্যত্র কোথাও যেতে রাজী হবেন না।

বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল সীতা, এ কথা বলছেন কেন?

সীতার প্রশ্নের জবাবটা কিরীটী বোধ হয় একটু ঘুরিয়েই দিল, আপনার মামা স্বর্গীয় রণধীর চৌধুরীর সম্পত্তিতে আপনাদের কি কোন অংশই নেই, মিস ঘোষ?

তা তো জানি না!

রণধীর চৌধুরী গত হয়েছেন কতদিন?

মাস দুই হল।

তাঁর কোন উইল বা ঐজাতীয় কোন নির্দেশনামা নেই?

বলতে পারি না।

আপনার মা'র মুখেও কিছু শোনেননি?

কিরীটীর শেষ প্রশ্নে সীতা কেমন যেন একটু ইতস্তত করতে থাকে। কিরীটীর তীক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসাতে সেটুকু এড়ায় না। কিরীটী সঙ্গে সঙ্গেই আবার প্রশ্ন করে, সাধারণ ভাবে বিচার করে দেখতে গেলে আপনার মা'রও তাঁর ভাইয়ের সম্পত্তিতে কিছু দাবী থাকাটা তো বিচিত্র নয়। তবে অবশ্য যদি তিনি তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি উইল করে তাঁর একমাত্র মেয়ের ছেলে-নাতিকেই দিয়ে গিয়ে থাকেন তো আলাদা কথা। আপনার মা'র সঙ্গে শতদলবাবুকেও ও-সম্পর্কে কোন দিন বলতে শোনেননি?

শতদল-ভাগ্নে এখানে আসবার কয়েক দিন পরে মা'র সঙ্গে তাঁর ঐ ধরনের কি সব কথাবার্তা হচ্ছিল, আমি বিশেষ কান দিইনি। মৃদুকণ্ঠে সীতা জবাব দেয়।

ইতিমধ্যে আমরা প্রায় 'নিরালা'র গেটের কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। অন্ধকারে কালো আকাশপটের নীচে 'নিরালা' যেন কেমন একটা ভয়াবহ ছায়ার মতই মনে হয়। যেন কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিরাটকায় রক্তলোলুপ জানোয়ার ঘাপটি মেরে বসে আছে। নিজের অজ্ঞাতেই গা-টা অকারণেই কেমন যেন ছমছম করে ওঠে।

গেটটা খোলাই ছিল। সর্বাগ্রে সীতা, পশ্চাতে কিরীটী, তারও পশ্চাতে আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম।

অস্পষ্ট তারকার আলোয় চারিদিককার গাছপালা কেমন ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট। হঠাৎ তিনজনেই আমরা থমকে দাঁড়ালাম।

দোতলার একটা জানালা খুলে গেল আর সেই জানালাপথে একটা শক্তিশালী টর্চের অনুসন্ধানী আলো নীচের অন্ধকারে এসে ঊর্ধ্বদিকে উৎক্ষিপ্ত হল। শূন্য আকাশপথে অন্ধকারে আলোর রেখাটা কয়েক মুহূর্তে ঘুরে-ফিরে দপ করে একসময় নিবে গেল। আলোটা দেখা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় কিরীটী দ্রুত বলিষ্ঠ হাতে আকর্ষণ করে আমাকে ও সীতাকে নিয়ে একটা মোটা ঝাউগাছের আড়ালেই আত্মগোপন করেছিল। আলোটা নিভে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা তিনজনেই গাছের আড়ালেই দাঁড়িয়েছিলাম আত্মগোপন করে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে। কিরীটীর দুহাত দিয়ে তখনও আমাদের দুজনের হাত ধরা। তিনজনেই নির্নিমেষে আমরা উপরের খোলা জানালাটার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি একটা মানুষের ছায়া।

ছায়াটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চিত্রার্পিতের মত।

সহসা চাপা গলায় কিরীটী প্রশ্ন করে, কোন্ ঘরের জানালা ওটা বলতে

পারেন মিস ঘোষ?

মনে হচ্ছে শতদল-ভাগ্নের ঘরের জানালা! চাপা উত্তেজিত কণ্ঠেই জবাব দেয় সীতা।

আমারও তাই ধারণা। কতকটা যেন স্বগতোক্তিই করে কিরীটী।

একটু পরেই জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল।

আরো কিছুক্ষণ পরে আমরা গাছের আড়াল হতে বের হয়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজাটা ভিতর হতে বন্ধই ছিল। কিরীটী দরজা খোলার সংকেত-ঘণ্টার দড়ির প্রান্তটা ধরে টেনে দরজাটা খোলবার জন্য দড়ির সঙ্গে সংযুক্ত ভিতরের ঘণ্টাটা বাজাতে যাবে, হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। খোলা দরজার সামনে হ্যারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে অবিনাশ।

অবিনাশই কথা বললে, বুড়োবাবু তো ঠিকই বলেছেন, আপনারা এসেছেন, দরজাটা খুলে দিতে!

বুড়োবাবু? তিনি জানলেন কী করে যে আমরা এসেছি? প্রশ্ন করল কিরীটীই।

তা তো জানি না। তিনি দরজাটা এসে খুলে দিতে বললেন, তাই তো খুলতে এলাম। মৃদু হাসির সঙ্গে কথাটা বললে অবিনাশ।

॥ ৭ ॥

শতদলবাবু বাড়িতে ফিরে এসেছেন, অবিনাশ? দ্বিতীয় প্রশ্ন করল কিরীটী অবিনাশের দিকে তাকিয়ে।

আজ্ঞে, কই না! দাদাবাবু তো এখনও ফেরেননি বাবু। মৃদুকণ্ঠে অবিনাশ জবাব দিল।

কখন ফিরবেন কিছু বলে গিয়েছেন? কিরীটী অবিনাশকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করে।

আজ্ঞে না। তা তো কিছুই বলে যাননি।

কোথায় গিয়েছেন তুমি জান?

না।

অতঃপর কিরীটী আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, চল সু, ভিতরে গিয়ে বসা যাক। এখুনি হয়তো শতদলবাবু এসে পড়বেন—চলুন সীতা দেবী।

সকলে আমরা অন্দরের দিকে অগ্রসর হলাম। অন্ধকার বারান্দাটা। আগে আগে হ্যারিকেন বাতিটা হাতে ঝুলিয়ে চলেছে অবিনাশ, পশ্চাতে আমরা তিনজন। বেশী দূর অগ্রসর হইনি, একটা খস-খস শব্দ শুনে সামনে দিকে তাকাতেই অস্বচ্ছ আলোকিত বারান্দাপথে নজর পড়ল ইনভ্যালিড চেয়ারটার উপরে উপবিষ্ট পক্ষাঘাতে চলচ্ছক্তিহীন হিরণ্ময়ী দেবী দুই হাতে মন্থর গতিতে উপবিষ্ট চেয়ারটার দুই পাশের চাকা দুটো দুপাশের হ্যাণ্ডেলের সাহায্যে ঘোরাতে ঘোরাতে ঐদিকেই এগিয়ে আসছেন।

সকলের আগে ছিল হ্যারিকেন হাতে অবিনাশ, তাকেই প্রশ্ন করলেন উদ্বেগাকুল কণ্ঠে হিরণ্ময়ী দেবী, অবিনাশ, সীতা এল?

অবিনাশ জবাব দেবার আগেই সীতা জবাব দেয়, এই যে মা, এসেছি আমি

—বলতে বলতে সামনের দিকে সে এগিয়ে যায়।

অন্ধকারে পশ্চাতে বোধ হয় আমাকে ও কিরীটীকে দেখতে পাননি প্রথমটায় হিরণ্ময়ী দেবী। তাঁর রুক্ষ বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এত রাত করে কোথায় ছিলে শুনি? কিন্তু পরক্ষণেই কিরীটীকে সীতার পশ্চাতে দণ্ডায়মান দেখে হিরণ্ময়ী দেবীর কণ্ঠের ক্ষণপূর্বের সমস্ত বিরক্তি যেন নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেল এবং এবারে আর কন্যাকে নয়, কিরীটীকেই সম্বোধন করে প্রশান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, এ কি। কিরীটীবাবু নাকি? আসুন, আসুন। কোথায় দেখা হল আপনার সঙ্গে ওর?

তুমি ওঁদের ভিতরে নিয়ে এস মা। আমি চায়ের জল চাপাচ্ছি। কথাগুলো বলে সীতা সহসা অন্ধকারে বেশ যেন দ্রুত পদবিক্ষেপেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

তীক্ষ্ণ একটা দৃষ্টি কন্যার গমনপথের দিকে মুহূর্তের জন্য নিক্ষেপ করে হিরণ্ময়ী দেবী আমাদের দিকে আবার ফিরে তাকালেন। ইনভ্যালিড চেয়ারটার হ্যাণ্ডেলের উপরে রক্ষিত দুই হাতের মুষ্টি দুটো মনে হল যেন মুহূর্তের জন্য কঠিন হয়ে আবার শ্লথ হয়ে গেল। এবং এবারে শান্তকণ্ঠে কিরীটীকেই লক্ষ্য করে বললেন, চলুন মিঃ রায়। শতদলের কাছেই বোধ হয় এসেছেন! সে বোধ হয় তো বাড়িতে নেই—, ক্ষণপূর্বেই বিরক্তির লেশমাত্রও কণ্ঠস্বরে নেই।

সকলে আবার ভিতরের দিকে অগ্রসর হলাম। অবিনাশ আগে আগে আলো দেখিয়ে চলল। সকলের আগে হিরণ্ময়ী দেবীর চলমান ইনভ্যালিড চেয়ারটার পাশাপাশি হেঁটে চলেছে কিরীটী। পশ্চাতে আমি।

আপনাদের এদিকেই আসছিলাম। পথেই আপনার মেয়ের সঙ্গে দেখা হতে তাঁরই মুখে শুনলাম শতদলবাবু বাড়িতে নেই। কিরীটী এতক্ষণে কথা বললে।

গতরাত্রের ব্যাপার বোধ হয় তাহলে সীতার মুখেই সব শুনেছেন মিঃ রায়?

হ্যাঁ, শুনলাম। মৃদুস্বরে জবাব দেয় কিরীটী।

এর পর আর এ-বাড়িতে বাস করা খুব বিবেচনার কাজ হবে না—আপনি কি বলেন কিরীটীবাবু?

খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই?

কি বলছেন আপনি মিঃ রায়! এই সেদিন রাত্রে শতদলের ঘরে কে বন্দুক ছুঁড়ল এবং শতদলের মুখেই কালকের রাত্রের ঘটনার পর আজ সকালে শুনলাম ইতিপূর্বেও নাকি তার উপরে আক্রমণ হয়েছিল—

সে তো তাঁর জীবনের ওপরে attempt হয়েছিল! জবাব দিলাম আমি।

কিন্তু কাল রাত্রের ঘটনাটা? সীতার কুকুরটাকে গুলি করেছে! এক বাড়িতে যখন আছি, ওর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘাড়েও বা বিপদ আসতে কতক্ষণ? আমিও ওঁকে আজ স্পষ্টই বলে দিয়েছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ-বাড়ি ছেড়ে আমরা চলে যাব। সুখের চাইতে স্বোয়াস্তি ভালো—কি বলেন মিঃ রায়!

তা তো বটেই। কিরীটী জবাব দেয় মৃদুকণ্ঠে।

আমরা সকলে এসে হরবিলাসবাবুর ঘরেই ঢুকলাম। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই নজরে পড়ল হিরণ্ময়ী দেবীর পূর্বেকার ঘরের মত এ ঘরখানির মধ্যেও রুচিসম্মত পরিচ্ছন্নতা। দুদিনের মধ্যেই ঘরখানি তিনি সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিয়েছেন, তবে এ ঘরেও লক্ষ্য করলাম জানালাগুলো প্রায় সবই ভিতর হতে বন্ধ। একটা বদ্ধ বায়ু যেন থমথম করছে।

বসুন, মিঃ রায়। বসুন সুব্রতবাবু।

হিরণ্ময়ী দেবীর আহ্বানে আমরা দুজনে দুখানা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে উপবেশন করলুম।

ঘরের সিলিং থেকে একটা প্রকাণ্ড গোলাকৃতি সাদা ডুমের মধ্যে চারটে মোমবাতি জ্বলছে। এবং তাতেই ঘরটা বেশ পরিষ্কার ভাবেই যেন আলোকিত হয়ে উঠেছে।

ঘরে প্রবেশ করতেই দেওয়ালে টাঙানো কয়েকখানা চিত্র দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। তার মধ্যে গোটা দুই ল্যান্ডস্কেপ এবং বাকি দুটো অল্পবয়সী দুই নারীর অয়েল-পেণ্টিং।

দুটি নারী-প্রতিকৃতি একটু নজর দিয়ে দেখলেই মনে হবে দুটি যেন যমজ বোন। মুখের চেহারাও হুবহু বলতে গেলে প্রায় একই, এমন কি তাকাবার ভঙ্গিটা পর্যন্ত যেন এক। কিরীটীকে কথাটা বলব ভেবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি একদৃষ্টে ঐ ছবি দুখানার দিকেই তাকিয়ে আছে। ছবি দুটো তাহলে কিরীটীর তীক্ষ্ন দৃষ্টি এড়ায়নি!

ট্রেতে করে টি-পট ও অন্যান্য চায়ের সরঞ্জাম হাতে এমন সময় সীতা এসে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল।

ঘরের মধ্যস্থিত টেবিলের ওপরে চায়ের সরঞ্জাম রেখে সীতা কাপে কাপে চা ঢালতে লাগল।

সহসা কিরীটী হিরণ্ময়ী দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, ঐ দেওয়ালের অয়েলপেনণ্টিং দুটো কার মিসেস ঘোষ?

কিরীটীর প্রশ্নে যেন চমকে তাকালেন হিরণ্ময়ী দেবী দেওয়ালের গায়ে টাঙানো ছবি দুটোর দিকে।

দেখলে মনে হয় যেন একই জনের দুটি প্রতিকৃতি! কিরীটী আবার মন্তব্য করে।

জানি না ও কার ছবি। মৃদুকণ্ঠে হিরণ্ময়ী দেবী জবাব দিলেন।

শতদলবাবুর মা তো আপনার ভাইঝি, তাই না?

কিরীটীর এবারকার প্রশ্নে কিরীটীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত না করেই ইতিমধ্যে অর্ধসমাপ্ত যে উলের বুননটা কোলের মধ্যে ছিল সেটা তুলে নিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্তে বুনতে বুনতে মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন হিরণ্ময়ী দেবী, হ্যাঁ।

তাঁকে, মানে শতদলবাবুর মাকে আপনি দেখেননি?

খুব ছোট—যখন তার তিন বছর বয়স হবে সেই সময় তাকে দেখি, তার পর আর দেখিনি। তার বিবাহের সময়ও আসতে পারিনি—পরে আর দেখা-সাক্ষাৎই হয়নি। শতদলের যখন বছর তিনেক বয়স তখুনি তো সে মারা যায়। কথাগুলো যেন একটানা সুরে কতকটা বলে গেলেন হিরণ্ময়ী দেবী।

আপনার ভায়েরও ঐ একটিমাত্র মেয়েই ছিলেন, তাই না?

না, দাদার দুই মেয়ে ছিল। বনলতা আর সোমলতা। সোমলতা বনলতার ৪।৫ বছরের ছোট, তাকে আমি কোনদিনও দেখিনি—

তিনি, মানে বনলতা দেবী—চৌধুরী মশায়ের ছোট মেয়ে বেঁচে আছেন কি?

না। সহসা হিরণ্ময়ী দেবীর কণ্ঠস্বরটা যেন রুক্ষ শোনাল।

হিরণ্ময়ী দেবীর আকস্মিক কর্কশ কণ্ঠে আমি চমকে ওঁর দিকে না তাকিয়ে পারলাম না।

পূর্বের মতই হিরণ্ময়ী দেবীর দৃষ্টি তাঁর হাতের বুননের উপরে নিবদ্ধ এবং তিনি ক্ষিপ্রহস্তে বুনন-কার্যে রত।

কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম কিন্তু কিছু বোঝা গেল না। সে-মুখে রাগ দ্বেষ বা বিরক্তি কোন কিছুর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। শান্ত ও নির্বিকার। চায়ের কাপটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, নিঃশেষিত চায়ের কাপটা সামনের টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখতেই সীতা এগিয়ে এসে কিরীটীকে প্রশ্ন করল, আর চা দেব মিঃ রায়?

চা? না থাক, ধন্যবাদ।

বাইরের দালানে জুতোর মসমস শব্দ শোনা গেল।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই বোধ হয় ঘরের বাইরে সেই জুতোর শব্দ শুনতে পেয়েছিল। সীতা নিম্নকণ্ঠে বললে, শতদল-ভাগ্নে এল বোধ হয়—

সীতা কথাগুলো বলবার আগেই কিরীটী চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার দিকে অগ্রসর হয়েছিল এবং খোলা দরজাপথে অদৃশ্য হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এই যে শতদলবাবু, কোথায় গিয়েছিলেন?

কে! কিরীটীবাবু নাকি? আপনি এখানে, আর আমি যে আপনার খোঁজেই হোটেলে গিয়েছিলাম!

কথা বলতে বলতে দুজনে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করে।

সীতা, চা সব শেষ, না এক কাপ মিলতে পারে? ঘরে প্রবেশ করেই শতদল সীতাকে লক্ষ্য করে কথাটা বলে।

না না, আছে বৈকি, দিচ্ছি, বসো। সীতা জবাব দেয়।

হঠাৎ ঐসময় আমার দৃষ্টিটা হিরণ্ময়ী দেবীর উপরে গিয়ে পড়তেই দেখি ইতিমধ্যে তাঁর ক্ষিপ্র বুননরত হস্ত দুটি কখন থেমে গিয়েছে এবং তিনি বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে একবার শতদল ও একবার সীতার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, কিন্তু সীতা বা শতদল কারো সেদিকে দৃষ্টি নেই।

সীতা একটা কাপে ততক্ষণে চা ঢালতে শুরু করেছে।

কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম। পুরাতন একটা সংবাদপত্র টেবিলের উপর পড়েছিল, ইতিমধ্যে কখন একসময় টেবিলের উপর থেকে সংবাদপত্রটা টেনে নিয়ে সে গভীর মনোযোগ সরকারে কী যেন পড়ছে। ঘরের মধ্যে যে আমরা আরও চারটি প্রাণী উপস্থিত আছি, ঐ মুহূর্তে সে সম্পর্কে যেন সম্পূর্ণ অচেতন।

চিনি ও দুধ মিশিয়ে চায়ের কাপটা সীতা শতদলের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললে, এই যে—

সবেমাত্র শতদল সীতার প্রসারিত কর হতে চায়ের কাপটি হাতে তুলে নিয়েছে, আচমকা কিরীটী কণ্ঠস্বরে আমি যেন চমকে উঠলাম, আপনি একটু বেশী চিনি খান চায়ে, না মিঃ বোস?

চায়ের কাপটা আর ওষ্ঠের নিকটে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হল না, শতদল বিস্মিত প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে এবং বললে, চিনি বেশী খাই চায়ে!

হ্যাঁ, দেখলাম যে সীতা দেবী তিন চামচ চিনি দিলেন চায়ে।

হাতে-ধরা সংবাদপত্রটা ভাঁজ করতে করতে হাস্যোদ্দীপ্ত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয় কিরীটী, নিশ্চয় সীতা দেবীর ওটা deliberate mistake নয়, কী বলেন সীতা

দেবী?

শতদলের মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। কেমন একটা অসহায় অপ্রস্তুত ভাব শতদলের চোখে-মুখে। কিন্তু সীতার মুখে ঠিক যেন একটা বিপরীত ভাবের সুস্পষ্ট আভাস। সমস্ত মুখখানা যে তার লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠেছে, ঐ মুহূর্তটিতে ঘরের স্বল্পালোকেও সেটা দৃষ্টিতে এড়ায় না।

অবশ্য চিনি কেউ কেউ চায়ে একটু বেশীই খান এবং আস্বাদনের ব্যাপারটাও যখন বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন, এ বিষয় নিয়ে কোন কথাই চলে না, কি বলেন সীতা দেবী? কথাটা বলে নিজে সঙ্গে সঙ্গে হেসে ঘরের ঐ মুহূর্তের আবহাওয়া-টাকে যেন কিরীটী লঘু করে দেবার চেষ্টা করল।

হিরণ্ময়ী দেবীর দিকে তাকিয়ে দেখি, অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে তাঁর বুনন-কার্য চলেছে।

শতদল নিজেকে ততক্ষণে সামলে নিয়েছে এবং ব্যাপারটাও যেন আগা-গোড়াই একটা কৌতুক ছাড়া কিছু নয়, এইভাবে চায়ের কাপে একটা দীর্ঘ আরামসূচক চুমুক দিয়ে বললে, সত্যিই কি সীতা তুমি আমার চায়ে তিন চামচ চিনি দিয়েছ নাকি?

কেন? এখনো বুঝতে পারেননি নাকি সেটা? হাসতে হাসতে কিরীটী বলে।

হ্যাঁ, সত্যি বড্ড বেশী মিষ্টি হয়ে গেছে চা-টা সীতা, আর একটু লিকার এর মধ্যে ঢেলে দাও—

বলতে বলতে শতদল চায়ের কাপটা সীতার দিকে এগিয়ে দিল।

সীতাও টি-পট্ থেকে আরও খানিকটা লিকার ঢেলে মিল্ক-পট্ থেকে একটু দুধ ঢেলে চা-টা চামচ দিয়ে নেড়ে দিল।

শুনলাম কাল রাত্রে নাকি আবার এ-বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে, শতদলবাবু! কিরীটী আচম্‌কা প্রশ্নটা করে যেন প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল।

হ্যাঁ, সেই জন্যই তো আপনার ওখানে গিয়েছিলাম। এও শুনেছেন বোধ হয়, এবারে সীতার কুকুরটার উপর দিয়েই ফাঁড়াটা আমার গেছে।

শুনলাম। মৃদুকণ্ঠে কিরীটী জবাব দিল, সীতা দেবীর মুখে অবিশ্যি ব্যাপারটা শুনেছি, তাহলেও আপনার মুখ থেকে ব্যাপারটা আর একবার শুনতে চাই, শতদলবাবু।

এবারেও ঘটনাটা অবিশ্যি extremely mysterious—রাত তখন প্রায় গোটা বারো কি সাড়ে বারো হবে, সে রাত্রের ঐ ব্যাপারের পর থেকে সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়, আমি যেন একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছি, রাত্রে ঠিক যেন আর sound sleep হয় না, বিছানায় শুয়েছিলাম বটে তবে ঠিক ঘুমোইনি, একটা তন্দ্রামত ভাব—হঠাৎ সীতার কুকুরের ঘন ঘন ডাকে চমকে উঠে পড়লাম। জামাটা গায়ে চাপিয়ে জুতোটা পায়ে গলিয়ে দরজা খুলে সিঁড়িতে পেঁছবার আগেই দুড়ুম দুড়ুম দুটো গুলির আওয়াজ পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম আর ঠিক সেই সঙ্গে সঙ্গেই যেন বিশ্রী করুণভাবে আর্তনাদ করে উঠলো সীতার কুকুরটা।

আপনি নিচে নেমে এলেন, না? প্রশ্নটা এবার শতদলকে করলাম।

হ্যাঁ, দু-চার মিনিটের জন্য বোধ হয় কেমন একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, তার পরই তাড়াতাড়ি নিচে নেমে আসি। জবাব দেয় শতদল।

আপনি তখন কোথায় ছিলেন? আচম্‌কা কিরীটী প্রশ্ন করে সীতার

মুখের দিকে তাকিয়ে।

আমি? আমিও তখন টাইগারের চেঁচানি শুনে ঘরের বাইরে বের হয়ে এসেছি। জবাব দিল সীতা।

আর আপনি মিসেস ঘোষ?

আমি? হিরণ্ময়ী দেবী হাতের বুনন থামিয়ে তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, আপনি!

আমি আর আমার স্বামী দুজনেই প্রায় একসঙ্গে বের হয়ে আসি ঘর থেকে। কতকটা যেন ইতস্তত করেই কথাটা বললেন হিরণ্ময়ী দেবী।

হুঁ। হরবিলাসবাবুকে দেখছি না, তিনি কোথায়?

আমাকে খুঁজছিলেন বুঝি, মিঃ রায়? কথাটা কেমন একটা ব্যঙ্গের সুরে উচ্চারণ করতে করতে ঠিক কিরীটীর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই কতটা যেন মাটি ফুঁড়ে বের হয়ে আসবার মতই ঐ মুহূর্তে হরবিলাস ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর আকস্মিক আবির্ভাব ও প্রশ্নের জবাবে মনে হল, কিরীটীর মুহূর্ত-আগেকার প্রশ্নটির জন্যই বুঝি এতক্ষণ হরবিলাস ঠিক ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

গায়ে কালো রঙের সেই গরম গলাবন্ধ ঝুল-কোট, গলায় ও মাথায় একটা উলেন কম্ফর্টার জড়ানো, মুখ-ভর্তি কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি—মনে হয় পাঁচ-ছ'দিন বুঝি ক্ষৌরকর্ম করেননি। হাতে একটা মোটা লাঠি।

ঘরের মধ্যে আমরা সকলেই নির্বাক। কেবল কিরীটী যেন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে হরবিলাসের দিকে তাকিয়ে। আচম্‌কা যেন ঘরের সমস্ত আবহাওয়াটা থম্‌থমে হয়ে উঠেছে।

অতঃপর ঘরের মধ্যে উপস্থিত নির্বাক সকলের মুখের দিকে নিঃশব্দে বারেকের জন্য নিজের দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে শতদলের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু যেন কর্কশ কণ্ঠেই তাকে সম্বোধন করে হঠাৎ হরবিলাস বলে উঠলেন, তোমার ঐ অবিনাশকে সাবধান করে দিও, শতদলবাবু!

কেন, অবিনাশ আবার তোমার কী করল শুনি? প্রশ্নটা করলে হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর স্বামীকে। এবং চেয়ে দেখি পূর্ববৎ তিনি আবার তাঁর বুননকার্যে মনোনিবেশ করেছেন।

ক্ষিপ্রগতিতে হাত দুটো বুনন করে চলেছে।

কি করল মানে? হরবিলাসের কণ্ঠস্বরে বেশ একটা সুস্পষ্ট বিরক্তি, his every movements is suspicious! তোমার দাদার এ বাড়ি তো নয়, যেন একটা কবরখানা, আর ঐ বেটা কখন আচম্‌কা কোন্ পথে যে এসে সামনে হঠাৎ হাজির হয়! রোজ সন্ধ্যার পরে একা একা এ বাড়ির পিছনে ঐ ভাঙা গোল-ঘরটায় অন্ধকারে ও কি করে বল তো? দেখ শতদলবাবু, I am definite he is after something! নিশ্চয় ওর—

হরবিলাসের মুখের কথাটা শেষ হল না, হঠাৎ একটা ভারী কোন বস্তু পতনের দুম করে একটা শব্দ ও সেই সঙ্গে রাত্রির স্তব্ধতাকে দীর্ণবিদীর্ণ করে একটা কাচ ভাঙার ঝন-ঝন শব্দ যেন খানখান হয়ে চারিদিকে সচকিত করে তুলল।

অতর্কিত সেই কোন একটা ভারী বস্তু পতনের ও ঠিক সেই সঙ্গে সঙ্গে কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দটা ঘরের মধ্যে আমাদের সকলকেই সচকিত করে দিয়ে গেল। কথা বললে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রথমে আমাদের মধ্যে কিরীটীই, কাচের কোন জিনিস ভাঙার শব্দ!

তাই তো, শব্দটা উপরের তলা থেকেই এল বলে মনে হল! যাই দেখে আসি কি ভাঙল—, শতদল ঘর হতে বের হয়ে যেতেই কিরীটীও তাকে অনুসরণ করে আর আমি করি কিরীটীকে। দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির দেওয়ালের গায়ে যে ওয়াল-ল্যাম্পটা টিমটিম করে জ্বলছে, তাতে করে সিঁড়িপথের অন্ধকার দূরীভূত হওয়া তো দূরের কথা, দু'পাশের দেওয়ালের চাপে পড়ে আরো যেন ঘন হওয়ায় এবং তার মধ্যে আলোর স্বল্পতায় যেন একটা কেমন ছমছমে ভাবের সৃষ্টি করেছে।

সর্বাগ্রে শতদলবাবু, তার পশ্চাতে কিরীটী ও সবার শেষে আমি সিঁড়ি-পথ অতিক্রম করে উপরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই একটা সাদা কাপড়ে ঢাকা ছায়ামূর্তি যেন সোঁ করে আমাদের চোখের সামনে দিয়েই বারান্দার শেষপ্রান্তের দরজাপথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যাপারটা এত চকিতে, যেন মনে হল, একটা স্বপ্নের মতই ছায়ামূর্তিটি অন্ধকারে বারান্দার ওদিকে মিলিয়ে গেল।

কিরীটী কিন্তু মুহূর্তের জন্যও সময় নষ্ট করেনি, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যেন একপ্রকার দৌড়েই বারান্দার শেষপ্রান্তে যেদিকে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়েছে ক্ষণ-পূর্বে সেই ছায়ামূর্তি, সেই দিকে এগিয়ে গেল।

আমিও কতকটা যেন যন্ত্রচালিতের মতোই কিরীটীকে অনুসরণ করলাম।

দরজাটা পার হলেই একটা অপরিসর ছাদের মতো, তিনদিকে তার এক বুক-সমান প্রায় প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। কিরীটী দেখি সেই প্রাচীরের উপর দিয়ে ঝুঁকে অন্ধকারে নিচে তাকিয়ে আছে। আমি ওর পাশে এসে দাঁড়ালাম।

নিচে অন্ধকারে বাগানের মধ্যে গাছপালাগুলো নিঃশব্দে ছায়ার মত গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। দোতলার ছাদ থেকে নিচের বাগানে চট করে কারো পক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভবপর না হলেও, প্রাণের দায়ে যে কেউ ঝাঁপিয়ে পড়বে না এমন কোন কথা নেই। এবং বেকায়দায় নিচে পড়লে গুরুতর জখম বা আহত হওয়াও এমন কিছু আশ্চর্য নয়।

ছায়ামূর্তিটা এই ছাদের দিকেই যখন এসেছে এবং স্পষ্ট আমরা যখন সকলেই চোখে দেখেছি এবং এই ছাদ থেকে অন্য কোথাও যাওয়া যখন সম্ভব-পর নয়, তখন একমাত্র নিচের ঐ বাগানে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মগোপন করা ছাড়া ছায়ামূর্তিটা আর অন্য কোথায় যেতে পারে?

সু, তোর সঙ্গে টর্চ আছে? কিরীটী হঠাৎ প্রশ্ন করে।

না তো! জবাব দিই।

হঠাৎ এমন সময় আমাদের ঠিক পশ্চাতেই শতদলবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আমার ঘরে টর্চ আছে মিঃ রায়, এনে দেব?

না, প্রয়োজন নেই। চলুন দেখা যাক কিসের শব্দ হয়েছিল! বলতে বলতে কিরীটীই আবার বারান্দার দিকে পা বাড়াল।

সকলে ভিতরে এসে প্রথমে বারান্দা অতিক্রম করে। শতদলবাবুর শয়ন-ঘরের ঠিক পাশের ঘরটির দরজা হাঁ করে খোলা দেখে প্রথমে শতদলবাবুই থেমে বললে, এ কি! ঘরের দরজাটা খোলা কেন?

দরজাটা বন্ধ ছিল সেদিনও দেখেছি, যতদূর আমার মনে পড়ছে তালা-বন্ধই ছিল, না শতদলবাবু? কথাটা বললে কিরীটী।

হ্যাঁ। দাদুর স্টুডিও-ঘর। এটা সর্বদা বন্ধই থাকে, আমি এখানে আসা পর্যন্ত,—মৃদুকণ্ঠে শতদল জবাব দেয়, আশ্চর্য! এ দরজায় একটা হবস্-এর ভারী তালা লাগানো ছিল—তালাটাই বা কোথায় গেল? পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে অল্প একটু এগিয়ে শতদল উচ্চকণ্ঠে ডাকল, অবিনাশ? অবিনাশ?

অমনি অবিনাশকে একটা আলো নিয়ে আসতে বলুন তো! কিরীটী কথাটা বললে।

কিন্তু অবিনাশের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

শতদল সিঁড়ির দু-চারটে ধাপ এগিয়ে গিয়ে আবার উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিল, অবিনাশ? ভুখনা?

এবারেও অবিনাশের বা ভুখনার কারোরই কোন সাড়া পাওয়া গেল না নিচের তলা হতে।

উপরে একটা বাতি নিয়ে আয় ভুখনা! তথাপি শতদল চেঁচিয়ে বললে।

কিছুক্ষণ পরেই সিঁড়িতে ক্ষীণ পদশব্দ পাওয়া গেল এবং দেখা গেল শতদলবাবুর সেই বিচিত্র চেহারার রাঁধুনী বামুন একটা হ্যারিকেন হাতে উপরে উঠে আসছে।

হ্যারিকেন বাতিটা হাতে নিতে নিতে শতদল ভুখনার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, অবিনাশ কোথায়?

নিঃশব্দে ভুখনা মাথাটা একবার দোলাল মাত্র, সে জানে না।

যা, দেখ অবিনাশ কোথায় আছে, তাকে একবার ডেকে দে।

ভুখনা চলে গেল।

সর্বাগ্রে হ্যারিকেন হাতে শতদল এবং পশ্চাতে আমি ও কিরীটী ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম।

হ্যারিকেনের বাতিটার অনুজ্জ্বল আলোয় অকস্মাৎ যেন ঘরের মধ্যে চারিদিক হতে অনেকগুলো চোখের দৃষ্টি একসঙ্গে আমাদের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একসঙ্গে অনেকগুলো চোখের দৃষ্টি আমাদের চারিদিকে হঠাৎ সজীব হয়ে জিজ্ঞাসায় প্রখর হয়ে উঠেছে, কে তোমরা? কি চাও?

ঘরের দেওয়ালে বিরাট সব প্রমাণ-সাইজের কলার ও অয়েলপেণ্টিং, নানা আকারের পাথর, প্লাস্টার ও ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি। মনে হয় একটু আগেও বুঝি ওদের প্রাণ ছিল, হঠাৎ কেউ মন্ত্রোচ্চারণে ওদের বোবা করে দিয়ে গিয়েছে। অনুজ্জ্বল আলোর অপর্যাপ্ত আভা চারিদিককার ছবি ও মূর্তিগুলোর উপরে প্রতিফলিত হয়ে যেন সৃষ্টি করেছে কি এক ঘনীভূত রহস্যের!

কিরীটী শতদলবাবুর হাত হতে হ্যারিকেনটা নিয়ে উঁচু করে চারিদিকে

ঘুরিয়ে একবার দেখতেই, সকলেরই আমাদের যুগপৎ দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ঘরের পূব কোণে মেঝেতে একটা ভারী কারুকার্য-খচিত চওড়া বোঞ্জের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি মেঝেতে পড়ে আছে এবং তার চারপাশে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য কাঁচের টুকরো। বোঝা গেল ক্ষণপূর্বে আমরা ঐ ভারী ছবিটারই পড়ে গিয়ে ভাঙ্গার শব্দে নীচে থেকে সচকিত হয়ে উঠেছিলাম। কিরীটী নিঃশব্দে বাতিটা হাতে নিয়ে সর্বাগ্রে সেই দিকে গেল।

ছবিটা উবুড় হয়ে পড়ে আছে।

একটা মোটা তার দিয়ে দেওয়ালের গায়ে বড় একটা পেরেকের সাহায্যে ছবিটা দেওয়ালে টাঙানো ছিল। দেখা গেল ছবির সঙ্গে তারটাও অক্ষতই আছে, দেওয়ালের গায়ে পেরেকটাও ঠিক আছে। তবে ছবিটা এইভাবে মাটিতে খসে পড়ল কী করে?

কিরীটী হ্যারিকেনটা মেঝেতে একপাশে নামিয়ে রেখে নীচু হয়ে মাটি হতে ছবিটা তুলে সোজা করে দাঁড় করাল।

চোগা-চাপকান পরিহিত মাথায় পাগড়ি-আঁটা বিরাট এক পুরুষের প্রতিকৃতি অয়েলকলারে অঙ্কিত। প্রশস্ত ললাট, উন্নত খড়্গের মত নাসিকা, দীর্ঘ আয়ত চক্ষু এবং সেই চক্ষুর দৃষ্টি যেন মনে হয় সজীব এবং অন্তর্ভেদী।

ছবিখানা দু'হাতের সাহায্যে একবার মাটি থেকে উঁচু করে কিরীটী বোধ হয় ছবিটার ওজনটা পরীক্ষা করে আবার নামিয়ে রাখল, বেশ ভারী ছবিখানা! ওজনে অন্ততঃ পনের-ষোল সের হবে!

মৃদু আত্মগত ভাবেই যেন কথাগুলো কতকটা উচ্চারণ করল কিরীটী। তার পরই শতদলের দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, চেনেন শতদলবাবু, এ ছবিটা কার?

না। এখানে আসবার পর একদিন মাত্র এ ঘরে ঢুকেছিলাম। এর আগে দু-একবার যা এখানে এসেছি, এই স্টুডিও-ঘরে কখনো প্রবেশ করিনি। দাদু কখনো কাউকে এ ঘরে ঢুকতে দিতেন না।

কেন? প্রশ্নটা করলাম এবারে আমিই।

তিনি ঠিক কারো এই স্টুডিও-ঘরে প্রবেশ করাটা পছন্দ করতেন না। বরাবরই লক্ষ্য করেছি, এই স্টুডিও-ঘরে প্রবেশ সম্পর্কে তাঁর যেন একটা sentiment ছিল। দিবারাত্র এই ঘরের মধ্যেই প্রায় রং-তুলি, ইজেল অথবা ছেনী-বাটালী নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকতেন। দীর্ঘকাল ধরে একবেলাই আহার করতেন শুনেছি রাত্রে। এও শুনেছি অনেক রাত্রে নাকি তিনি খাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে যেতেন, এই ঘরের মধ্যে তাঁর রাত কেটে যেত—

শিল্পীর সাধনা-ক্ষেত্রই বটে। শিল্পী রণধীর চৌধুরী যেন এখনো এই মূর্তি ও ছবিগুলোর মধ্যেই বেঁচে আছেন। নিভৃত এই কক্ষখানির মধ্যে তিনি আপনাকে যে একান্তভাবে সমর্পণ করেছিলেন এবং যে সমর্পণের ভিতর দিয়ে এই বিস্ময় তিল তিল করে গড়ে উঠেছে তারই সাক্ষ্য যেন কক্ষের চতুর্দিকে।

এই ঘরের চাবিটা?

সেটা তো আমি যে ঘরে থাকি সেই ঘরের আলমারির ড্রয়ারের মধ্যে থাকত একটা রিংয়ে অন্যান্য চাবির সঙ্গে।

দেখুন তো সে রিংয়ে চাবিটা আছে কিনা? কিরীটী শতদলকে অনুরোধ

জানায়।

দেখছি—, শতদলবাবু ঘর হতে বের হয়ে যাবার আগেই আবার কিরীটী বললে, শতদলবাবু, just a minute, ঐ সঙ্গে kindly একটা টর্চও নিয়ে আসবেন।

শতদল ঘর হতে অতঃপর নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে এখন আমরা দুজনই—কিরীটী ও আমি। হ্যারিকেন-বাতির স্বল্প আলোয় কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম।

মুখের রেখায় রেখায় কোন কিছু একটা চিন্তার সুস্পষ্ট আভাস। তার ইতিপূর্বের ধীর মৃদু সংযত কণ্ঠস্বর ও নিষ্ক্রিয়তা থেকেই বুঝেছিলাম, ঐ মুহূর্তে গভীর ভাবেই কোন একটা চিন্তা কিরীটীর মাথার মধ্যে পাক খেয়ে চলেছে। এবং ঐ সময়ে সে নিজ হতে স্বেচ্ছায় মুখ না খুললে কারো সাধ্য নেই তাকে কথা বলায়। বুঝতে পারছিলাম ছবিটা অমনি আকস্মিক ভাবে মাটিতে পড়ে গিয়ে ভাঙার ব্যাপারটা সে খুব সহজভাবে নেয়নি। শতদলের ক্ষণপূর্বের জবানিতে জানা গিয়েছে ঘরটা বন্ধ ছিল এবং এ ঘরের চাবিটাও তারই ঘরে ছিল। অথচ দেখা যাচ্ছে ঘরের দরজায় কোন তালা নেই—দরজা খোলা এবং ঘরের মধ্যে ঐ ছবিটা ভগ্ন কাচের টুকরোর মধ্যে পড়ে আছে। আরো ভাঙার শব্দটা কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা নিচের তলা থেকেই শুনেছি। ছবিটা আপনা হতেই পড়ে গিয়ে যে ভাঙেনি তারও প্রমাণ পাচ্ছি।

সব কিছু পরিস্থিতি বিবেচনা করলে এ কথাটা স্বতঃই মনে হচ্ছে, কেউ নিশ্চয়ই এ ঘরে এসেছিল। এবং ছবিটা পাড়তে গিয়ে বা নামাতে গিয়ে দেওয়াল থেকে আচম্‌কা অসাবধানতাবশতঃ তার হাত থেকে হয়তো মাটিতে পড়ে গিয়ে কাচটা ভেঙেছে। খুব সম্ভব সেই কারণেই হয়তো তাকে আচম্‌কা ঘটনাবিপর্যয়ে স্থানত্যাগ করতে হয়েছে।

এক্ষেত্রে তাহলে বক্তব্য হচ্ছে, কেউ না কেউ কিছুক্ষণ আগে এ ছবিটার জন্য এ-ঘরে এসেছিল। যেই অসুক! কিন্তু কেন?

এ ছবিটার প্রয়োজন নিশ্চয় ছিল তার। কিন্তু কেন? কী প্রয়োজন ছিল তার?

ওজনে অত ভারী এবং আকারে অত বড় ছবিটা চট করে কোথায়ও নিয়ে যাওয়া বা লুকোনোও তো সহজ নয়। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, তার ছবিটা সরাবার বা কোথাও নিয়ে যাওয়ার ঠিক প্রয়োজন ছিল না, কেবল হয়তো ছবিটা দেওয়াল হতে নামিয়ে দেখতেই চেয়েছিল সে। কিন্তু ছবিটা দেখবারই যদি প্রয়োজন ছিল তার, দেওয়ালে টাঙানো অবস্থাতেও তো দেখতে পারত? দেওয়াল হতে নামাবার কী প্রয়োজন ছিল?

বাইরে এমন সময় জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। বুঝলাম শতদলবাবু চাবির রিং ও টর্চ নিয়ে এই ঘরেই আসছে।

অনুমান মিথ্যা নয়। শতদলবাবুই ঘরে এসে প্রবেশ করলেন এবং নিঃশব্দে চাবির রিংটা ও পাঁচ-সেলের একটা হান্টিং টর্চ কিরীটীর দিকে এগিয়ে দিলেন।

ডান হাতে চাবির রিংটা ধরে বাম হাতে টর্চটা নিল কিরীটী।

এই রিংয়ের মধ্যেই এই ঘরের তালার চাবিটা ছিল? কিরীটী শতদলকে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ।

দেখুন তো সে চাবিটা আছে কি না? সু, বাতিটা একটু তুলে ধর।

কিরীটীর নির্দেশমতো বাতিটা আমি তুলে ধরলাম।

চাবির গোছাটা কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখে শতদল মৃদুকণ্ঠে বললে, এই তো, চাবিটা রিংয়ের মধ্যেই আছে দেখছি!

একটা বড় আকারের চাবি গোছার ভিতর থেকে আলাদা করে কিরীটীর সামনে ধরল শতদল।

চাবির রিংটা আপনার ঘরে যে আলমারির ড্রয়ারে ছিল বলছিলেন, সেটা কি চাবি দেওয়াই থাকত শতদলবাবু?

হ্যাঁ। চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলেই তো রিংটা নিয়ে এলাম।

ড্রয়ারের চাবিটা কোথায় ছিল?

আমার পকেটেই ছিল। সর্বদা পকেটেই রাখি।

আপনার ঘরটা কি সাধারণতঃ যখন আপনি থাকেন না, তালা দেওয়া থাকে?

না।

কিরীটী অতঃপর টর্চের আলো ফেলে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে কী যেন দেখল এবং ফিরে এসে বললে, তালাটা নেই দেখছি। ভাল কথা, আজ কখন আপনি বাইরে বের হয়েছিলেন? কতক্ষণই বা বাইরে ছিলেন শতদলবাবু?

প্রায় গোটা-চারেকের সময় বাইরে গিয়েছি—

যাওয়ার সময়ও এই ঘরের দরজার সামনে দিয়েই আপনি গিয়েছিলেন, তখন লক্ষ্য করেছিলেন কি, এই ঘরের দরজার তালাটা ছিল কিনা?

না, লক্ষ্য করিনি।

কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?

থানায় গিয়েছিলাম দারোগাবাবুকে গতরাত্রের ব্যাপারটা জানাতে।

দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা হল?

হয়েছে।

হোটেলে কখন গিয়েছিলেন?

থানায় ঘণ্টাখানেক ছিলাম, বোধ করি সাড়ে ছটা নাগাদ হোটেলে পৌঁছাই। সেখানে আপনাদের না পেয়ে বরাবর এখানে ফিরে আসি।

হুঁ। আচ্ছা একটা কথা বলতে পারেন শতদলবাবু, হিরণ্ময়ী দেবীরা এখন নিচের মহলে যে ঘরটায় আছেন সেই ঘরের দেওয়ালে পাশাপাশি যে দুটি মহিলার ছবি টাঙানো আছে তাঁরা কারা?

আমি লক্ষ্য করে দেখিনি তো! বিস্মিত দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে শতদল জবাব দেয়।

দেখেননি? কাল একবার দিনের বেলা ছবি দুটো ভাল করে দেখে আমাকে বলবেন তো, চিনতে পারেন কিনা ছবি দুটো কার? কতকটা যেন নির্দেশের সুরেই কথাগুলো বললে কিরীটী।

কিরীটী প্রস্তাবে শতদল যেন একটু ইতস্ততঃ করে বলে, উনি মানে আপনার ঐ হিরণ্ময়ী দেবী, আমাকে ঠিক যেন পছন্দ করেন বলে আমার মনে হয় না মিঃ রায়। কাজেই তাঁর ঘরে যাওয়া—

অবিশ্যি যদি কিছু মনে না করেন—আপনার ওরকম মনে হওয়ার কোন কারণ আছে কি?

থাকলেও অন্ততঃ আমি জানি না মিঃ রায়, কারণ এবারে এখানে আসবার পূর্ব পর্যন্ত ওঁদের সঙ্গে আমার কোন চেনা-পরিচয়ই ছিল না।

হরবিলাসবাবু, হিরণ্ময়ী দেবী ও ওঁদের মেয়ে ঐ সীতা—এঁদের কারও সঙ্গেই পূর্বে আপনার আদৌ কোন পরিচয় ছিল না আপনি চলতে চান শতদলবাবু?

প্রশ্নটার মধ্যে যেন কোন গুরুত্ব নেই, কথার পিঠে কথাপ্রসঙ্গে এসে গিয়েছে এমনি ভাবেই অত্যন্ত শান্ত ও নির্লিপ্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলতে বলতে ইতিমধ্যে হাতের টর্চটা জেলে তার আলোয় কিরীটী ঘরের চতুর্দিকে দেওয়ালে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। শতদল মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে মৃদু সংযত কণ্ঠে জবাব দিল, না।

আচমকা কিরীটী ঘুরে দাঁড়াল শতদলের মুখোমুখি হয়ে এবং তার স্বাভাবিক অনুসন্ধানী চাপা অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করল, ছিল না?

না।

মুহূর্তের জন্য কিরীটীর কণ্ঠে যে অনুসন্ধিৎসা জেগে উঠেছিল তার পরবর্তী প্রশ্নে যেন তার আর লেশমাত্রও অবশিষ্ট রইল না, আপনার সঙ্গে ওঁদের পূর্ব-পরিচয় যদি কিছু না-ই থেকে থাকে, তাহলে হঠাৎই বা হিরণ্ময়ী দেবী আপনাকে অপছন্দ করতে যাবেন কেন?

তাহলে কথাটা আপনাকে খুলেই বলি মিঃ রায়, যদিচ কারণটা আমার কাছে একান্তই হাস্যাস্পদ বলে মনে হয়। হিরণ্ময়ী দেবী দাদুর মৃত্যুর পর আমার এভাবে এখানে আসাটাই যেন পছন্দ করেননি। আমি না এলে দাদুর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী তো তিনিই হতেন, যদিচ দাদুর সম্পত্তির মধ্যে তো এই বাড়িখানা ও একগাদা ছবি ও মূর্তি। আমার কাছে তো এর কোন মূল্যই নেই আর দাবিও করব না। একা মানুষ, বিয়ে-থাও করিনি, যা মাইনে পাই প্রফেসারি করে তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এ কথা এখানে আসবার পরই ওদের আমি বলেছিলাম, কিন্তু—

কিন্তু কী?

কিন্তু উনি জবাব দিলেন, যতটুকু তাঁর প্রাপ্য তার এক কড়াক্রান্তিও উনি বেশী চান না এই সম্পত্তির!

হুঁ। মনে কিছু করবেন না শতদলবাবু, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল এবং না বলেও পারছি না—

নিশ্চয়ই, বলুন না?

প্রথমে যেদিন সৈকতে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়, মনে আছে নিশ্চয়ই আপনার, আপনি কথায় কথায় বলেছিলেন, যতদূর আমার মনে পড়ে যে শিল্পী রণধীর চৌধুরীর বিরাট সম্পত্তির শেষ ও একমাত্র অবশিষ্ট তাঁর এই 'নিরালা'র ওয়ারিশ আপনি। তাই নয় কি?

কিরীটীর অমন সোজা ও স্পষ্ট অভিযোগে শতদল প্রথমটায় কেমন যেন একটু বিহ্বল হয়েই পড়ে, কিন্তু মুহূর্তে সে বিহ্বলতাটুকু কাটিয়ে হাস্যতরল কণ্ঠে বলে ওঠে, হ্যাঁ বলেছিলামই তো এবং এখনও তাই বলব, কিন্তু ওঁরা সে কথা মানতে চান না।

মানতে চান না কেন? রণধীরবাবুর কোন উইল নেই?

উইল—সেটাকে উইলই বলা চলে, মানে দাদুর লেখা একখানি চিঠি আমার কাছে আছে যেটা অনায়াসে আইনের চোখে উইলের সমপর্যায়ে পড়ে।

ওঃ, তবে সেটা ঠিক উইল নয়?

না। ঠিক উইলের খসড়ায় ফেলে রেজেস্ট্রী করবার বা কোন আইনজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করবারও হয়তো তিনি সময় পাননি, কারণ সেটাকে চিঠিই বলুন বা উইলই বলুন, তাঁর মৃত্যুর মাত্র দিনসাতেক আগে লেখা—

সেই উইলে কী আছে?

চলুন না আমার ঘরে—ঐ ঘরের দেওয়াল-সিন্দুকেই উইলটা আছে—

যাব'খন, তবু বলুন না আপনি কী লেখা আছে সেই চিঠিতে?

বিশেষ কিছুই না, লেখা আছে এই 'নিরালা' ও এ-বাড়ির যাবতীয় সব কিছু আমাকে তিনি দিয়ে যাচ্ছেন তাঁর মৃত্যুর পরে।

বাইরের দালানে এমন সময় অস্পষ্ট পদশব্দ পাওয়া গেল। এবং ঘরের মধ্যস্থিত একমাত্র হ্যারিকেন বাতিটা, হঠাৎ মনে হল, কেমন যেন তার আলোর শিখাটা নিস্তেজ হয়ে আসছে।

আলোটার দিকে দৃষ্টি আমারই প্রথম পড়ল, আলোটায় তেল নেই বলে যেন মনে হচ্ছে শতদলবাবু!

আমার কথায় আকৃষ্ট হয়ে কিরীটী ও শতদল দুজনেই আলোটার দিকে তাকাল।

আলোটা নিস্তেজ হয়ে এসেছে।

পদশব্দটা ঠিক দরজার গোড়ায় এসে থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ-বারের মত বার-দুই দপ দপ করে আলোর শিখাটা কেঁপে নিবে গেল হঠাৎ।

অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই যেন আলোর শিখাটা নিবে গেল।

অন্ধকার। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার মুহূর্তে যেন আমাদের সমস্ত দৃষ্টিকে গ্রাস করল।

অন্ধকারে কিরীটীর গলা শোনা গেল, কে? কে ওখানে?

কথার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটীর হস্তধৃত পাঁচ-সেলের হান্টিং টর্চের সুতীব্র অনুসন্ধানী আলোর রশ্মিটা উন্মুক্ত দ্বারপথে গিয়ে পড়ল।

কে?

চিনতে কষ্ট হল না টর্চের আলোয়। দরজার ঠিক ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে এ-বাড়ির পুরাতন ভৃত্য অবিনাশ।

আজ্ঞে আমি অবিনাশ! অবিনাশ জবাব দিল, আমায় ডাকছিলেন দাদাবাবু?

হ্যাঁ। কোথায় থাক তোমরা? আলোগুলোতে তেল থাকে কি না থাকে সেদিকেও তোমাদের এতটুকুও নজর নেই, কী কর যে সব সারাদিন বসে বাড়িতে? ঝাঁজালো বিরক্তি-পূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন শতদলবাবু।

কেন? আজ দুপুরেও সব বাতিতে তেল ভরে দিয়েছি!

তেল ভরেছ তো বাতি নিবে যায় কি করে? যাও, আর একটা বাতি নিয়ে এস শিগগির করে।

যাই। অবিনাশ নিঃশব্দে চলে গেল।

কিরীটী হস্তধৃত টর্চের আলো ফেলে ঘরের মেঝেটা আবার দেখতে লাগল। যে জায়গায় দেওয়াল থেকে ছবিটা মেঝেতে পড়েছিল তার চারিদিকে কাচের টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে ইতস্তত।

দেওয়ালের গায়ে যেখানে ছবিটা টাঙানো ছিল কিরীটী সেখানে আলো ফেলল, তারপর আবার ঘরের চারিদিকে অনুসন্ধানী আলো ফেলে মৃদুকণ্ঠে বললে, কতকটা যেন আত্মগত ভাবেই, আশ্চর্য! টুলটা দেখছি না—গেল কোথায়?

কী বললেন মিঃ রায়? প্রশ্নটা করলেন শতদলবাবুই।

একটা টুল—

টুল! বিস্মিত কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন শতদল।

হ্যাঁ, টুল বা ঐ জাতীয় একটা কিছু—, হ্যাঁ ভাল কথা, আপনার কাছে মজবুত তালা আছে শতদলবাবু?

তালা! তা আছে বোধ হয়—

নিয়ে আসুন। ঘরটা তালা দিয়ে রাখতে হবে।

শতদলবাবু ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

কিরীটী হাতের আলোটা ততক্ষণে ভূপতিত ছবিটার উপরে ফেলেছে এবং আমাকে এবারে লক্ষ্য করে বললে, ছবির ফ্রেমটা কিসের তৈরী বলে মনে হয় সু?

ছবি—মানে ঐ ছবির ফ্রেমটা?

হ্যাঁ। চেয়ে দেখ ছবির ফ্রেমটা একটু যেন peculiar! ব্রোঞ্জ-জাতীয় কোন মেটালের তৈরী। এবং যেমন মজবুত তেমনি ভারি। ওয়াটার-কলার একটা ছবি ও তার কাচের ওজন এত বেশী হতে পারে না। ছবিটার যা-কিছু ওজন ওই ফ্রেমটার জন্যই। কথাগুলো বলে সহসা যেন অতঃপর কতকটা স্বগতোক্তির মতই আস্তে আস্তে বললে, কিন্তু কেন?

কী বললি! প্রশ্নটা করলাম আমিই কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

ভাবছি ছবির ফ্রেমটার কথাই। বিনা প্রয়োজনে এ জগতে কিছুই তৈরী হয় না সু! ছবির ফ্রেমটাও নিশ্চয়ই ঐভাবে তৈরী করবার আর্টিস্টের কোন একটা উদ্দেশ্য ছিল!

হয়তো ছবিটাকে মজবুত ও টেকসই করবার জন্যই।

There you are! You are cent per cent right, সু।

বাইরে এমন সময় পদশব্দ শোনা গেল।

অবিনাশ একটা আলো হাতে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

হঠাৎ কিরীটী অবিনাশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, পায়ে তোমার বুঝি চোট লেগেছে অবিনাশ?

কিরীটীর আচমকা প্রশ্নে অবিনাশ যেন একটু চমকে থতমত খেয়ে বলে, আজ্ঞে?

কেমন একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছ দেখছি কিনা। পায়ে চোট লেগেছে নাকি? বেশ মোলায়েম কণ্ঠে কিরীটী আবার শুধোয়।

আজ্ঞে ঠিক খুঁড়িয়ে নয়, তবে জন্ম হতেই বাঁ পা-টা একটু খাটো কিনা, তাই একটু টেনে চলতে হয় চিরদিনই।

শতদলবাবু এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। হাতে তাঁর একটা ভারী পিতলের বড় তালা ও একটা চাবি।

এই নিন তালা কিরীটীবাবু! তালা ও চাবিটা এগিয়ে দিল শতদল কিরীটীর দিকে।

হ্যাঁ, দিন। কিরীটী তালা ও চাবি শতদলবাবুর হাত থেকে নিল, চাবি কি এই একটাই, না duplicate key আছে?

আছে।

সেটা কোথায়?

ও-ঘরে চাবির রিঙে আছে। এনে দেব কি?

না, থাক। চলুন বাইরে যাওয়া যাক।

সকলে আমরা বাইরে এলাম। কিরীটী নিজ হাতে দরজায় তালাচাবি দিয়ে চাবিটা নিজের জামার পকেটে রেখে দিল, এটা আমার কাছেই রইল শতদলবাবু। ডুপ্লিকেট চাবিটাও আমাকে দেবেন।

বেশ তো।

তারপর হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়েছে এইভাবে আলো হাতে দণ্ডায়মান অবিনাশের দিকে ফিরে তাকিয়ে কিরীটী তাকেই প্রশ্নটা করলে, ভাল কথা অবিনাশ, আজ এই কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যার দিকে তুমি যখন আমাদের সদর দরজা খুলে দিতে গিয়েছিলে, বলেছিলে না, বড়বাবু মানে হরবিলাসবাবু তোমাকে আমাদের আসবার কথাটা জানতে পেরেই সদর দরজাটা খুলতে পাঠিয়েছিলেন?

আজ্ঞে! মৃদুকণ্ঠে অবিনাশ জবাব দিল।

আমরা যখন এ-বাড়ির সদরে এসে বাইরে থেকে ঘণ্টার দড়ি নাড়া দিই, তুমি আর তোমার বড়বাবু কোথায় ছিলে?

আমি রান্নাঘরের দিকে ছিলাম—

আর বড়বাবু?

বড়বাবু রান্নাঘরের সামনে অন্ধকার বারান্দায় পায়চারি করছিলেন।

হুঁ। ভুখনা কোথায় ছিল?

সে তো রান্নাঘরেই ছিল। পূর্ববৎ মৃদুকণ্ঠে অবিনাশ জবাব দেয়, রান্না করছিল বোধ হয়।

হুঁ। আচ্ছা তুমি যেতে পার। আলোটা এইখানেই রেখে যাও।

অবিনাশ কিরীটীর নির্দেশমত হাতের হ্যারিকেনটা বারান্দায় নামিয়ে রেখে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

একদৃষ্টে কিরীটী অবিনাশের গমনপথের দিকে তাকিয়ে ছিল।

এবারে আমিও স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম, সত্যিই অবিনাশ যেন তার বাঁ পা-টা একটু টেনেটেনেই চলছে। যতক্ষণ অবিনাশকে দেখা গেল, কিরীটী একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। ক্রমে অবিনাশ সিঁড়ি-পথে নেমে নিচের দিকে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর কিরীটী শতদলের দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, একটা ব্যাপার কখনো লক্ষ্য করেছেন শতদলবাবু—আপনাদের ঐ পুরনো চাকর অবিনাশের চলাটা একটু defective! মানে চলবার সময় বাঁ পা-টা একটু টেনে টেনে চলে?

কই, না? কখনো লক্ষ্য করিনি তো? শতদল জবাব দেয়।

লক্ষ্য করেননি? আশ্চর্য!

না, সত্যি লক্ষ্য করিনি। তবে সাধারণতঃ ও একটু আস্তেই যেন চলাফেরা করে বলে মনে হয়। শতদল বললে।

চলুন আপনার ঘরে যাওয়া যাক। কিরীটী যেন তার নিজের দিক হতেই উত্থিত ক্ষণপূর্বের প্রশ্নটা অতঃপর এড়িয়ে গিয়ে শতদলবাবুর শয়নকক্ষের দিকে সর্বাগ্রে পা বাড়াল।

সকলে এসে আমরা কিরীটীর পিছু পিছু শতদলবাবুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। এক কোণে একটা উঁচু টুলের ওপরে সাদা ডোম-ঢাকা আলো জ্বলছে। সমস্ত ঘরটা কিন্তু তবু সমানভাবে আলোকিত হয়নি। ঘরটা আকারে বড় হওয়ার দরুনই বোধ হয় একটিমাত্র আলোয় সমস্ত ঘরটিকে তেমনভাবে আলোকিত করতে পারেনি। ঘরের একটিমাত্র জানালা ছাড়া বাকি সব কয়টি জানালাই বন্ধ। এবং একটিমাত্র ঐ খোলা জানালাপথে হু-হু করে সমুদ্রের হাওয়া ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করছিল।

, কিরীটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সর্বাগ্রে ঐ খোলা জানালাটার দিকে এগিয়ে গেল। আমিও কিরীটীকে অনুসরণ করে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দূরে সম্মুখে দৃষ্টির সামনে যেন একটা দিগন্তপ্রসারী কৃষ্ণ চাদর আর কানে ভেসে আসে একটানা একটা চাপা গর্জন অন্ধকার ভেদ করে। কিরীটীর হাতে তখন শতদলবাবুর দেওয়া পাঁচ সেলের হান্টিং টর্চটা। তারই আলো সম্মুখের দিকে ফেলল কিরীটী।

আলোর রশ্মিটা বহু দূর পর্যন্ত গেল—একেবারে এ-বাড়ির গেট পর্যন্ত।

হাতের আলোটা বার কয়েক কিরীটী নীচে চারিদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল, তারপর আলোটা নিবিয়ে ঘুরে দাঁড়াল এবং শতদলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, আপনি তো বলছিলেন শতদলবাবু, এ ঘরটা আপনার অনুপস্থিতিতে তালা দেওয়াই থাকে, তাই না?

হ্যাঁ।

আজও তালা দেওয়াই তো ছিল?

না, বোধ হয় তালা দেওয়া ছিল না।

ছিল না?

না, এসেও দেখলাম একটু আগে টর্চটা নিতে এসে—ঘরের দরজাটা কেবল ভেজানোই আছে, তালা লাগানো নেই। কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে, বিকালে বেরুবার আগে যেন তালা দিয়েই গিয়েছিলাম। কী জানি, বোধ হয় তালা দিতে ভুলে গিয়েছি!

চাবিটা কোথায় ছিল?

আমার পকেটেই ছিল।

আপনার এ-ঘরের তালার কোন duplicate চাবি তো নেই? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে শতদলকে।

আছে, সেও ঐ চাবির রিঙের মধ্যেই।

দেখুন তো, রিঙের মধ্যে চাবিটা আছে কিনা? হ্যাঁ, ঐ সঙ্গে রিং থেকে স্টুডিয়োর ঘরের তালার duplicate চাবিটাও আমাকে খুলে দিন।

কিরীটীর নির্দেশে শতদলবাবু ঘরের কোণে রক্ষিত একটা কাঠের ভারী

চেস্ট ড্রয়ারের টানা খুলে তার ভিতর হতে অনেকগুলো চাবির গোছাসমেত একটা রিং বের করলেন। চাবির রিং থেকে প্রথমেই শতদল স্টুডিও-ঘরের তালার ডুপলিকেট চাবিটা খুলে কিরীটীকে দিলেন; তারপর এ-ঘরের তালার ডুপলিকেট চাবিটা রিঙের চাবির মধ্যে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু রিঙের সমস্ত চাবিগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজেও প্রয়োজনীয় ডুপলিকেট চাবিটা খুঁজে পাওয়া গেল না।

কী হল, চাবিটা নেই? আমি প্রশ্ন করলাম।

আশ্চর্য, সত্যিই চাবিটা তো নেই দেখছি! বুঝতে পারছি না সুব্রত-বাবু—পরশু তো যতদূর মনে পড়ছে দেখেছিলাম যেন রিঙের মধ্যে সে চাবিটা ছিল!

যাক, ও নিয়ে আর মিথ্যে ব্যস্ত হবেন না শতদলবাবু। আমি পূর্বেই অনুমান করেছিলাম চাবিটা পাওয়া যাবে না। কথাটা বললে কিরীটীই।

অনুমান করেছিলেন। বিস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকান শতদল কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ। কিরীটীর কণ্ঠ হতে ছোট্ট সংক্ষিপ্ত জবাবটি উচ্চারিত হল।

আমি আপনার কথা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না মিঃ রায়!

আপনিই হয়তো দু-চার দিনের মধ্যেই আমার কথার তাৎপর্যটা বুঝতে পারবেন, আমাকে আর কষ্ট করে বলতে হবে না শতদলবাবু। কিন্তু সেকথা থাক, আপনি যে একটু আগে কী একটা চিঠির কথা বলছিলেন, চিঠিটা একটি-বার দেখতে পারি কি?

নিশ্চয়ই। শতদলবাবু এগিয়ে গিয়ে ঘরের একটা দেওয়াল-আলমারি খুলে তার ড্রয়ার থেকে একটা সাদা বড় আকারের রঙ ও তুলির সাহায্যে চিত্র-বিচিত্র খাম বের করে এনে কিরীটীর হাতে দিলেন।

কিরীটী শতদলবাবুর হাত হতে খামটা নিয়ে আলোর সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল। আমিও পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

খামটার উপরে রঙের বাহার যেন চিত্র-বিচিত্র হয়ে উঠেছে। মানুষের মুখ হতে শুরু করে পশু-পাখি, ফল-ফুল, লতা-পাতা কী যে নেই তার ঠিকানা নেই!

অনেকক্ষণ ধরে তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণের সঙ্গে কিরীটী খামের উপরে আঁকা চিত্রগুলি দেখতে লাগল। খামের মুখটা খোলাই ছিল, অতঃপর তার ভিতর হতে একটা ভাঁজ-করা কাগজ টেনে বার করল।

আলোর সামনে ভাঁজ খুলে কাগজটা মেলে ধরল।

একটা চিঠিঃ চিঠির শীর্ষে ব্র্যাকেটের মধ্যে দুই লেখা।

(২)

আমার আত্মীয়দের প্রতি—ইহাই আমার শেষ নির্দেশ	(৩)
সজ্ঞানে লিখিয়া যাইতেছি, রণধীর চৌধুরী আমি	(০)
আমার যাবতীয় সম্পত্তি ও এই 'নিরালা' গৃহখানি আমার	(৩)
দৌহিত্র শ্রীমান শতদল বোসকে আমার মৃত্যুর পর	(৫)

বর্তাইবে। কেবলমাত্র সে যেন স্মরণ রাখে যে আমার স্টুডিওতে (৪)
যে সব আত্মীয়ের ছবিগুলো, যেমন পিতামহ প্রপিতামহের (৬)
সেইগুলো ও অন্যান্য যে সকল পেণ্টিং ও ছবি (৩)
এবং ঐ সংগে ঐ কক্ষ-মধ্যস্থিত সমস্ত মূর্তিগুলোরও স্বত্ব (২)
বাকি সব বর্তাইবে আমার দৌহিত্র শতদলকুমারে (৩)
শুধু ঐ নয়, আমার শিল্পী-জীবনের নিন্দা ও যশের (২)
উত্তরাধিকারীও একমাত্র সে-ই হইবে (৩)

ইতি—

রণধীর চৌধুরীঃ ৩০৩৫৪৬৩২৩২৩ঃ

১৮ই ভাদ্র ১৩৫৩

অবাক বিস্ময়েই চিঠিটা বার-দুই আগাগোড়া পড়বার পরও চিঠিটার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। লেখা ছাড়াও চিঠিটার মধ্যে দুপাশে দুখানি মুখের রেখা-চিত্র বা স্কেচ আঁকা।

কিরীটীর দিকে আড়চোখে তাকালাম। কিরীটীর সমস্ত চেতনা যেন চিঠিটার মধ্যেই তন্ময় হয়ে গিয়েছে। স্থির নিস্পন্দ ভাবে চিঠিটা আলোর সামনে প্রসারিত করে হাতের মধ্যে ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে।

সহসা শতদলবাবুর কণ্ঠস্বরে কিরীটীর তন্ময়তা ভংগ হল।

দেখলেন তো চিঠিটা পড়ে মিঃ রায়? আমি আপনাকে ঠিক বলেছিলাম কিনা যে, আমিই দাদুর যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী এবং তাঁর সম্পত্তি বলতে এই 'নিরালা' গৃহটা আর স্টুডিওর মধ্যে একটু আগে যে ছবি ও মূর্তিগুলো দেখে এলেন ঐগুলোই!

হ্যাঁ, অন্ততঃ চিঠিটায় মোটামুটি ভাবে সেই নির্দেশই রয়েছে দেখলাম। অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে যেন কিরীটী শতদলের কথার জবাব দিল।

ঘরের মধ্যে দেরাজের উপর মাঝারি আকারের একটা টাইমস-পীস ছিল, হঠাৎ সেটা রিং-রিং করে বেজে উঠতেই চমকে টাইম-পীসটার দিকে তাকালাম, রাত্রি প্রায় পোনে নটা।

শতদলও অ্যালার্মের শব্দে চমকে উঠেছিল, এগিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি অ্যালার্মের বোতামটা টিপে অ্যালার্ম বন্ধ করে দিলেন। কিরীটী রণধীর চৌধুরীর লেখা চিঠিটা ভাঁজ করে পুনরায় খামের মধ্যে ভরে রাখতে রাখতে বললে, যদি কিছু মনে না করেন শতদলবাবু, এই চিঠিটাও আজকের রাতের মত নিয়ে যেতে চাই আমি। কাল আবার ফিরিয়ে দেব।

বেশ তো, নিয়ে যান না। শান্তকণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেন শতদল।

ধন্যবাদ। আজকের মত তাহলে আমরা বিদায় নেব শতদলবাবু। কাল সকালে একবার পারেন তো হোটেলে আসবেন। আপনার সংগে কিছু আলোচনা করবার আছে।

যাব।

শতদল আমাদের সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

অন্ধকারে দুজনে পাশাপাশি আমি ও কিরীটী সাগরের ধার দিয়ে হোটেলের দিকে ফিরে চলেছি। অকস্মাৎ যেন কিরীটী অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে গিয়েছে।

কোন একটা চিন্তা যে তার মাথার মধ্যে পাক খেয়ে ফিরছে বুঝতে কষ্ট

হয় না। এবং যে চিন্তাই হোক, বিষয়বস্তুটা যে তাকে বেশ বিচলিত করে তুলেছে বুঝতে পারছিলাম। আমিও অনেক কিছুই ভাবছিলাম।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এই সন্ধ্যায় যে সব ঘটনা পর পর ঘটে গেল, কোনটার সঙ্গে কোনটারই কোন যোগসূত্র একটা খুঁজে না পেলেও একটা ব্যাপার যেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেটা হচ্ছে শতদলের সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা রহস্য যেন ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে। একটা আশু অমঙ্গলের ছায়া যেন ক্রমে ক্রমে চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কোন একটা অভাবনীয় দুর্ঘটনা যেন পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। এবং অবশ্যম্ভাবী সে দুর্ঘটনাকে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা আমাদের কারোরই হবে না।

হোটেলের সামনে সী-বীচে কয়েকদিন আগেকার সকালের একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, এই কয়দিন ধরে যে ব্যাপারটাকে অন্ততঃ আমি আদপেই কোন গুরুত্ব দিইনি, অথচ প্রথম হতেই যেটা কিরীটীকে বিচলিত করেছে সেটাই যেন এখন ক্রমশ স্পষ্ট আকার নিয়ে সত্যিই জটিল হয়ে উঠছে।

কিরীটীই একসময় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কথা বলে উঠল, তোকে একটা কাজ করতে হবে সু!

কী?

লুকিয়ে সীতার ও তার মায়ের গতিবিধির উপর নজর রাখতে হবে।

কেমন করে সেটা সম্ভব হবে? ওরা থাকে বাড়ির মধ্যে—

যতদূর আমার মনে হয়, খুব বেশীদিন নজর রাখতে হবে না। দু-চারদিন 'নিরালা'র আশেপাশে সমুদ্রের ধারে ও 'নিরালা'র পিছনের বাগানে ঘোরাফেরা করতে পারলেই কিছু-না-কিছু তুই জানতে পারবি। তবে হ্যাঁ, তোকে জেলের ছদ্মবেশ ধরতে হবে।

বেশ, কাল সকাল থেকেই তাহলে শুরু করি!

না, আজ রাত থেকেই।

আজ রাত থেকেই?

হ্যাঁ।

হোটেলে পেঁ‍ৗছে দেখি, আমাদের ঘরের সামনে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন থানা-অফিসার রসময় ঘোষাল।

কিরীটীই প্রথম ঘোষালকে সংবর্ধনা জানাল, ঘোষাল সাহেব যে, কতক্ষণ?

তা প্রায় আধ ঘণ্টাটাক তো হবেই। এসে শুনলাম আপনারা বেড়াতে বেরিয়েছেন, এখনো ফেরেননি। এত রাত হল যে?

হ্যাঁ, একটু রাত হয়ে গেল। 'নিরালা'য় গিয়েছিলাম। কিরীটী বসতে বসতে বললে, উঠছেন কেন, বসুন!

আমি কিরীটীর পাশেই উপবেশন করলাম।

এতক্ষণ 'নিরালা'য় ছিলেন? শতদলবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে? পুনরায় বসতে বসতে ঘোষাল বললে।

হয়েছে।

সব শুনেছেন তো?

পরশু রাত্রের ব্যাপারটা তো? কিরীটী শুধোয়।

হ্যাঁ। মশাই, আমিও সত্যিই তাজ্জব বনে গিয়েছি!

ভাল কথা মিঃ ঘোষাল, আপনার যে দুজন plain dress পুলিসের ও-বাড়িটা সর্বদা পাহারা দেবার কথা ছিল, পরশু রাত্রে তারা ছিল না?

ছিল।

তদের রিপোর্ট কি?

সেরাত্রে ঐ সময় অশোক সাহা বলে আমার যে লোকটি পাহারায় ছিল, সেও নাকি গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। ঐসময় সে 'নিরালা'র পিছনের বাগানেই ছিল।

অন্য কিছু সন্দেহজনক তার নজরে পড়েনি?

না।

পরে অশোক কি ঐ রাত্রে শতদলবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিল?

করেছিল।

হুঁ। 'নিরালা'র একতলার বারান্দার শেষপ্রান্তে কতকগুলো কেডস জুতোর সোলের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল, জানেন?

জানি। এবং তার ফটোও তুলে নেওয়া হয়েছে। আজ সকালেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আমি আসতাম, কিন্তু স্থানীয় একটা আসন্ন উৎসবের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায়—

উৎসব! কিসের?

সামনেই ২রা মাঘ ; ঐ রাত্রে প্রতি বৎসর এখানে একটা মেলা বসে সমুদ্রের ধারে। এখানকার লোকেরা বলে মাঘী মেলা। এবং রাত্রে একটা বিরাট বাজির প্রতিযোগিতা হয়।

বাজির প্রতিযোগিতা!

হ্যাঁ, বহু জায়গা হতে এখানে লোকেরা বাজির প্রতিযোগিতায় এসে যোগ দেয়, রাত নটা থেকে প্রায় বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত বাজি পোড়ানো হয়। এই জায়গায় 'নিরালা'র উচ্চতা সব চাইতে বেশী বলে অনেকেই ঐ বাড়িতে গিয়ে ছাদে উঠে বাজি পোড়ানো দেখে। রণধীর চৌধুরীর আমল থেকেই নাকি ঐ নিয়ম চলে আসছে। বছরের মধ্যে ঐ রাতটির জন্য তিনি সকলের জন্য বাড়ির দরজা খুলে দিতেন। এখন তো বাড়ির মালিক শতদলবাবু, তাই তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম আমি জনসাধারণের দিক হতে, তাঁর কোন আপত্তি আছে কিনা জানবার জন্য—

তা কী বললেন শতদলবাবু?

বললেন, নিশ্চয়ই তাঁর কোন আপত্তি নেই। চিরদিন যা চলে এসেছে তাঁর দাদুর আমল থেকে, এখনও সেই নিয়ম চালু থাকবে। সকলেই স্বচ্ছন্দে তাঁর ওখানে গিয়ে বাজি পোড়ানো দেখতে পারেন। সব ব্যবস্থাই তিনি করে রাখবেন। After all he is a nice man! চমৎকার লোক। ঘোষাল বিশেষণ যোগ দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

আর দিন-পাঁচেক বাদেই তাহলে সেই মেলা? প্রশ্নটা করলাম আমি।

হ্যাঁ। কাল-পরশু থেকেই সব দোকান-পসারীরা এসে ভিড় জমাবে দেখবেন। আশেপাশে অনেক জায়গা হতেই সব লোকজন আসে। কিন্তু আসলে আপনার কাছে আমার আসবার উদ্দেশ্য ছিল মিঃ রায়—শতদলবাবুর ব্যাপারটা আমাকে বিশেষ ভাবিত করে তুলেছে। এ বিষয়ে আমি আপনার পরামর্শ ও সাহায্য দুই-ই চাই। শতদলবাবু নিজেও যেন অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

তা তো হবারই কথা। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আমার পক্ষেও কোন মতামত দেওয়া তো সম্ভব নয় মিঃ ঘোষাল! তবে আজ সন্ধ্যা থেকেই একটা কথা আমার মনে হচ্ছে মিঃ ঘোষাল যে, শিল্পী রণধীর চৌধুরীর সম্পত্তি কেবল ঐ 'নিরালা' প্রাসাদখানিই নয়—there is something more! Something more!

কী আপনি বলতে চান মিঃ রায়?

আমি নিজেও এখন অন্ধকারেই মিঃ ঘোষাল। কয়েকটা ছিন্ন সূত্র কেবল হাতে এসেছে, ভাসা-ভাসা অস্পষ্ট। হয়তো দু-একদিনের মধ্যেই এমন কোন ঘটনা ঘটবে যার সাহায্যে আমরা কোন একটা সিদ্ধান্তের পথে এগিয়ে যেতে পারব। Matter will take a shape!

কিরীটীর নির্দেশমত ঐ রাত্রেই সাধারণ একজন জেলের ছদ্মবেশে আমাকে হোটেল থেকে বের হতে হল।

রাত্রি তখন বোধ করি এগারটা হবে।

সাগরের কিনার দিয়ে হনহন করে চলেছি 'নিরালা'র দিকে। চাঁদ উঠতে এখনো ঘণ্টাখানেক দেরি।

সঙ্গে আমার একটা দড়ির মই, একটা টর্চ ও লোডেড পিস্তল।

'নিরালা'র গেটের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালাম। গেট হতে আমার দূরত্ব তখন প্রায় হাত-কুড়ি হবে।

তারার অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম, পাশাপাশি দুটি ছায়া-মূর্তি গেট খুলে বাইরে বের হয়ে এল।

চট করে রাস্তার ধারে পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করলাম।

ছায়া-মূর্তি দুটো এগিয়ে আসছে। কে? কারা ওরা? অন্ধকারেই তাকিয়ে রইলাম।

॥ ১০ ॥

এই দিকে এগিয়ে আসছে ছায়া-মূর্তি দুটো। কাছে—আরো কাছে। ততক্ষণে তাদের অস্পষ্ট কথাবার্তার দু-একটা টুকরো টুকরো শব্দও কানে আসছে।

চমকে উঠলাম এবার, চিনতে পেরেছি ওদের। শতদল ও সীতা। দূরের একটানা সমুদ্রগর্জনকে ছাপিয়েও ওদের মৃদু কথার শব্দতরঙ্গ আমার কানে এসে প্রবেশ করছিল। অন্ধকারে স্পষ্ট না দেখতে পেলেও কণ্ঠস্বরে ওদের চিনেছি। সীতা বলছিল, তুমি জান না শতদল, মায়ের দৃষ্টি কী অসম্ভব প্রখর! আমার মনে হয়, ঘুমের মধ্যেও তাঁর দু'চোখের দৃষ্টি আমার সমস্ত গতিবিধির ওপরে রেখেছেন। তিনি যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন এত রাত্রে তোমার সঙ্গে আমি বাড়ির বাইরে এসেছি—

সেই জন্যই আরও 'নিরালা'র বাইরে এলাম। তোমার মার শকুনির মত দৃষ্টি। সত্যি বলছি, আমার গা শিরশির করে। শতদল জবাব দেয়, তাই তো চিঠি লিখে তোমায় এত রাত্রে এই বাইরে ডেকে এনে তোমার সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা আমাকে করতে হয়েছে!

কিন্তু আমি যে তোমার চিঠি পেয়ে এত রাত্রে বাইরে আসব ভাবলে কী

করে? যদি না আসতাম?

আমি জানতাম তুমি আসবেই, সেই জন্যই চিঠি দিয়েছিলাম। যাক, এই পাথরটার উপরেই এস বসা যাক।

পথের ধারে একটা বড় পাথরের উপর দুজন পাশাপাশি বসল আমার দিকে পিছন ফিরে। এ একপক্ষে ভালই হল। আমি যে পাথরটার আড়ালে আত্মগোপন করে ছিলাম সেই পাথরটা থেকে হাত-তিনেক দূরেই বড় পাথরটার উপরে দুজনে পাশাপাশি বসেছে।

মাথাটা একটু উঁচু করে দেখলাম, পিছন ফিরে সীতা বসে আছে, সাগর-বাতাসে তার শাড়ির আঁচলটা ও খোলা চুলের রাশ উড়ছে। সীতার একেবারে গা ঘেঁষে বসে আছে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে শতদল।

শতদলের কথায় সীতা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর একসময় বলে, সব কিছুর পরেও তুমি কি আশা করেছিলে শতদল যে আমি আসব তোমার চিঠি পেয়ে?

তুমি আমাকে আগাগোড়াই ভুল বুঝেছ সীতা!

সব জায়গায় ভুল করলেও একটা জায়গায় মেয়েমানুষ বড় একটা ভুল করে না। সীতা জবাব দেয়।

মানুষ মাত্রেই ভুল করতে পারে সীতা, তা সে কি মেয়েই হোক বা পুরুষই হোক। একতরফা তুমি বিচার করেছ।

একতরফা বিচার করেছি! সীতার কণ্ঠে যেন বিস্ময়ের সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

নিশ্চয়ই। কেন যে তুমি হঠাৎ আমার ওপরে বিরাগ হয়ে উঠলে সেটা তুমি আমায় জানানো পর্যন্ত কর্তব্যবোধ করলে না!

জলের মতই যেখানে সব কিছু পরিষ্কার, সেখানে গলা উঁচিয়ে জানাতে যাওয়াটা কি বিড়ম্বনা নয়? কিন্তু কাসুন্দি ঘেঁটেই বা কি আর লাভ বল?

তাহলে সত্যি-সত্যিই তুমি আমাদের অতীত সম্পর্কটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ধুয়ে-মুছে ফেলতে চাও সীতা?

সব দিক দিয়ে এক্ষেত্রে সেটাই তো বাঞ্ছনীয় শতদল। সেতারের একবার তার ছিঁড়ে গেলে আর কি ছেঁড়া তার জোড়া লাগালে পূর্বের সেই সুর বের হয়! তবে কেন আর?

কোন কথাই তাহলে তুমি আর আমার শুনতে চাও না?

মনে মনে আমি সীতার কথা শুনে না হেসে পারি না। এমনই মেয়েদের মন বটে! সমস্ত সম্পর্ক শতদলের সঙ্গে ধুয়ে-মুছে গেছে বলেই বুঝি শতদলের একখানা চিঠি পেয়ে এই নিশুতি রাত্রেও বাড়ির বাইরে আসতে দ্বিধাবোধ করেনি?

শোন সীতা, কি কারণে তুমি হঠাৎ আমাকে আর বিশ্বাস করতে পারছ না জানি না। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় তো আজকের নয়—গত তিন বৎসর হতে—এই তিন বৎসরেও কি আমাকে তুমি বুঝতে পারনি?

এতদিন তোমাকে আমি বুঝতে পেরেছি বলেই আমার ধারণা ছিল কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আমার সে জানাটাই ভুল। কিন্তু সে কথা থাক। কি জন্য এত রাত্রে এভাবে চিঠি লিখে তুমি আমাকে এখানে ডেকে এনেছ বল?

আমাকে যখন তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না, তখন সে-কথা তোমার

আর শুনেই বা লাভ কী বল? যাক সে কথা,—শতদলের কণ্ঠে সুস্পষ্ট অভিমানের সুর।

এরপর কিছুক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ হয়ে থাকে। কেউ কোন কথা বলে না। অখণ্ড রাত্রির স্তব্ধতা শুধু অদূরবর্তী গর্জমান সাগরের কলকল্লোলে পীড়িত হতে থাকে।

এদের মান-অভিমানের পালাগান কতক্ষণ চলবে কে জানে! কিরীটীর উপরে সত্যিই রাগ ধরছিল। নিজে দিব্যি হোটেলের বিছানায় আরাম করে নাক ডাকাচ্ছে, আর আমাকে এই শীতের রাতে ঠেলে দিয়েছে! কী কুক্ষণেই যে ওর পাল্লায় পড়ে এই জায়গায় মরতে এসেছিলাম! ভেবেছিলাম কয়েকটা নিশ্চিন্ত দিন আরামে কাটিয়ে দিয়ে যাওয়া যাবে সাগর-সিনারি দেখে, তা না, কী এক ঝামেলায়ই না পড়া গিয়েছে! কোথাকার কে এক পাগলা আর্টিস্ট, পাহাড়ের উপরে এক হানাবাড়ি, যত সব ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা, তার মধ্যে মিথ্যে মিথ্যে এমন করে জড়িয়ে পড়বার কি প্রয়োজন ছিল বাপু?

হঠাৎ আবার সীতার কথায় চমক ভাঙল।

তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ শতদল!

প্রতারণা করেছি? এ-সব তুমি কি বলছ সীতা? শেষ পর্যন্ত তুমি এ কথা বললে যে তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করেছি!

হ্যাঁ, প্রতারণা। নিশ্চয়ই প্রতারণা বৈকি। আজ বুঝতে পারছি, দিনের পর দিন তুমি আমার সঙ্গে প্রেমের খেলাই খেলে এসেছ। মনের মধ্যে একজনের চিন্তা অহোরাত্র করে বাইরে আর একজনের সঙ্গে তুমি খেলা করেছ। কিন্তু কী এর প্রয়োজন ছিল? আমি তো যেচে তোমার কাছে কোনদিন দাঁড়াইনি। তুমি—, শেষের দিকে সীতার কণ্ঠস্বর কান্নায় যেন বুজে আসে। হায় রে! সেই চিরাচরিত ত্রিকোণ রহস্য। শতদল, সীতা ও রাণু। একটি পুরুষ, দুটি নারী। সেই চির-পুরাতন চির-নতুন খেলা। সেই পঞ্চশরের একঘেয়ে রসিকতা।

ছি ছি! এতদিন এ কথা তুমি আমাকে বলনি কেন? রাণু—রাণুকে নিয়ে তুমি সন্দেহ করেছ? রাণু তো কুমারেশের বাগদত্তা। ওরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে। আর কুমারেশের সঙ্গে যে আমার কতখানি বন্ধুত্ব তাও নিশ্চয়ই তোমার অজানা নেই!

কুমারেশ? কোন্ কুমারেশ?

কুমারেশকে চেনো না? কুমারেশ সরকার! অধ্যাপক ডাঃ শ্যামাচরণ সরকারের একমাত্র ছেলে। মস্ত বড় ধনী। কিন্তু তার চাইতেও তার বড় পরিচয় হচ্ছে এশিয়ার মধ্যে সবচাইতে বড় সাঁতারু। এবারে অলিম্পিকে যার সাঁতারে যোগ দেওয়ার কথা।

ওঃ, তোমার সেই গায়ক কুমারেশ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেই কুমারেশ ও রাণু, ওরা পরস্পর পরস্পরকে বহুদিন হতে ভালবাসে। আজ পাঁচ-ছ বছর ওদের আলাপ দুজনের সঙ্গে। ছি ছি! দেখ তো কী একটা মিথ্যা কল্পনায় অনর্থক ব্যস্ত করেছ?

আমি নিজে পুরুষ, শতদলও পুরুষ, তাই শতদলের শেষের কথাগুলো শুনে মনে হচ্ছিল শতদলের পরিস্থিতিতে আমি পড়লে আমিও হয়তো ঐরূপই অভিনয় করতাম। ঐ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছিল, মাত্র কয়েক রাত্রি আগে হোটেলের বারে শতদল ও রাণুর কথোপকথন।

তাহলে মিথ্যে তুমি দেরি করছ কেন? মাকে এবারে সব বললেই তো হয়! সীতা অনুরোধ জানায় শতদলকে।

দাঁড়াও, আর কয়েকটা দিন যেতে দাও। অ্যাটর্নীকে আমি চিঠি দিয়েছি, এই বাড়িটা আমি বিক্রি করতে চাই। পেপারে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছে।

পাহাড়ের উপরে এই পুরনো বাড়ি কে তোমার কিনবে?

কিনবে কী বলছ! জান, ইতিমধ্যেই দুজন খরিদ্দারের কাছ থেকে অফার পাওয়া গিয়েছে!

অফারই যদি পেয়েছ তো বিক্রি করে দিচ্ছ না কেন?

দাঁড়াও—ভাল দাম না পেলে ছাড়ব কেন?

এইরকম একটা বাড়ির জন্য তুমি ভাল দাম পাবে আশা কর?

নিশ্চয়ই। দাদুর হাতে আঁকা ছবিগুলোরই কি কম দাম! দাদুর মতই পাগল শিল্পী আছে যারা ঐ ছবির collections-এর জন্যই বাড়িটা হয়তো একটা fanatic দাম দিয়েও কিনবে।

কিন্তু কয়েক দিন ধরে যেভাবে তোমার উপর দিয়ে বিপদ যাচ্ছে—

সেটাই তো চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে সীতা। ব্যাপারটার মাথা-মুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। প্রথমটায় কিরীটীবাবুর কথা আমি তো হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তার পরের ব্যাপারগুলো সত্যিই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এখন বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি, কেউ আমার জীবন নিতে যেন বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেন? কারও তো আমি কোন ক্ষতি করিনি? আমার তো কোন শত্রু নেই?

বাবা কী বলেন জান?

কী?

এ ঐ মামার প্রেতাত্মা! এ-বাড়ির মায়া আজও তিনি কাটাতে পারেননি তাই—

পাগল! বলতে বলতে শতদল হঠাৎ সীতাকে দু'হাতে আরও কাছে টেনে নেয়।

না না—আমার সত্যি কিন্তু তাই মনে হয়—

দাদু আমাকে কত ভালবাসতেন তা জান! আর কেউ হলে না-হয় বিশ্বাস করা যেত। দাদু আমার কোন ক্ষতি করবেন এ আমি ভাবতেও পারি না। স্বেচ্ছায় তিনি সব আমার নামে লিখে দিয়ে গিয়েছেন—

মা কিন্তু তা বিশ্বাস করেন না।

তা জানি, কিন্তু তাঁর চিঠি আছে—

মা বলেন, ও চিঠির কোন মূল্য নেই—

মূল্য আছে কি না আছে, সেটা কোর্টই স্থির করবে। সেজন্য আমি ভাবি না। তা ছাড়া আমি তো দিদিমাকে বলেছিই, বাড়ি বিক্রি হলে কিছু টাকা তাঁকে দেব—তাঁর কোন প্রাপ্য এ-বাড়ি থেকে নেই তা সত্ত্বেও। কিন্তু তা তিনি চান না। তিনি বলেন এ বাড়িতে তাঁর অর্ধেক অধিকার। তারপর একটু থেমে আবার বলে, বাড়ি বিক্রির টাকা থেকে কিছু যে তাঁকে দেব বলেছি সেও তোমার জন্য সীতা। দাদুর বোন বলে নয়—তোমার মা বলে।

এ তো খুব ভাল প্রস্তাব। মা বুঝি তাতে রাজী নন?

না। এক-একবার কি মনে হয় জান সীতা?

কী ?

দিয়ে দিই বাড়িটা তাঁকে। কী হবে মিথ্যে আপনার জনের সঙ্গে ঐ একটা পুরনো বাড়ি নিয়ে গোলমাল করে? শেষ পর্যন্ত বাড়িটা তো আমাদেরই হবে—

কী রকম ?

আরে তোমাকে বিয়ে করলে তো আর আমি পর থাকব না! আর তুমি ছাড়া ওঁদের বা আর কে আছে সংসারে ? যাক গে চল, অনেক রাত হল—এবারে ওঠা যাক।

চল।

অতঃপর দুজনে উঠে দাঁড়াল। আমারই পাশ দিয়ে তারা দুজনে পাশাপাশি এগিয়ে গেল।

নিঃশব্দে আমি তাদের অনুসরণ করলাম।

একটা নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। শতদল আর সীতার সম্পর্ক। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা নতুন সংশয় মনের মধ্যে এসে উঁকি দিচ্ছে। বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে ওদের আমি পিছনে পিছনে চলেছি। দেখতে পেলাম, দূর হতে অন্ধকারে অস্পষ্ট, ওরা 'নিরালা'র গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। আমি দাঁড়ালাম, ভাবছি এবারে কী করব, সহসা কার মৃদু করস্পর্শ পৃষ্ঠদেশে অনুভব করতেই চকিতে চমকে ফিরে তাকাতেই দেখি, সর্বাঙ্গে একটা কালো বস্ত্র জড়িয়ে ঠিক আমার পশ্চাতেই দাঁড়িয়ে—মুখের ওপরে ঘোমটা তোলা, কেবলমাত্র মুখটা অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—

কে ?

চুপ! আস্তে—আমি।

চাপা সতর্ক কণ্ঠস্বরেও চিনতে কষ্ট হয় না। কিরীটী।

কিরীটী!

। হ্যাঁ চল্, ফেরা যাক।

কিন্তু—

চল্। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে। বলে কিরীটী সত্যি-সত্যিই ঢালু পাহাড়ী পথ ধরে নিঃশব্দে নীচের দিকে নামতে লাগল। অগত্যা আমিও তার পিছু নিলাম।

দুজনে পাশাপাশি আবার হোটেলের দিকে হেঁটে চলেছি।

এদিকে কোথায় এসেছিলি ?

'নিরালা'র স্টুডিও-ঘরে কাজ ছিল। মৃদুকণ্ঠে কিরীটী জবাব দেয়। তারপর একটু থেমে পথ চলতে চলতেই বলে, কী এত মনোযোগ দিয়ে ওদের কথা শুনছিলি ?

শুনছিলাম বলেই জানতে পেরেছি—

কি ? ওদের আগে থাকতেই পরস্পরের সঙ্গে ভাব ছিল ?

আশ্চর্য হই কিরীটীর কথায়। কিন্তু আমার কোনরূপ প্রশ্ন করবার আগেই কিরীটী বলে, সে-রহস্যও সন্ধ্যাবেলাতে জানা হয়ে গিয়েছে। Nothing new!

তুই জানতে পেরেছিলি ?

নিশ্চয়ই। শতদলের চায়ের কাপে সীতার তিন চামচ চিনি দেওয়াটা

অনিচ্ছাকৃত অনামনস্ক হয়ে ভুল নয়। শতদলের চায়ে তিন চামচ চিনি খাওয়ার অভ্যাসটার সঙ্গে সীতা পূর্ব হতেই সুপরিচিত। এবং তা থেকেই আমি বুঝেছিলাম ওদের—শতদল ও সীতার মধ্যে একটা জানাশোনা আছে এবং দুটি তরুণ-তরুণীর জানাশোনা মানেই রঙের ব্যাপার! একান্ত অবলীলাক্রমেই যেন কিরীটী কথাগুলো বলে গেল।

বিস্ময়ে একেবারে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি। কিরীটীর অতীব সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে আমি একান্তভাবেই সুপরিচিত, কিন্তু তবু যেন নতুন করে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কত সামান্য তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে দিয়ে যে কিরীটী তার মীমাংসার সূত্র খুঁজে বের করে, আবার নতুন করে যেন আমার উপলব্ধি হল।

হিরণ্ময়ী দেবী ওদের এই সম্পর্কের কথা জানেন বলে তোর মনে হয় কিরীটী?

না জানলেও তিনি সন্দেহ করেন।

কিন্তু শতদলের রাণুর সঙ্গে সম্পর্কটা?

রাণু ও শতদলের পরস্পর পরস্পরের প্রতি চিন্তাধারাটা আলাদা। বলতে বলতে হঠাৎ যেন কথার মোড়টা ঘুরিয়ে দিয়ে বললে, শতদল আর সীতার মান-ভাঙাভাঙি নিয়ে তুই ব্যস্ত ছিলি, ওদিকে 'নিরালা'য় গেলে অন্য কিছু তুই দেখতে পেতিস—more interesting! আসলে সেইজন্যই তোকে আমি এই রাত্রে ওইদিকে পাঠিয়েছিলাম।

কেন, সেখানে আবার কি হল? শতদলের হত্যাকারীর কোন সন্ধান পেলি নাকি? শেষের কথাটা যেন কতকটা ঠাট্টা করে আমি বলি।

চোখ থাকলে দেখতে পেতিস, শতদলের হত্যাকারী দূরের লোক তো নয়ই, ধোঁয়াটেও নয়। কিন্তু তার চাইতেও যে ব্যাপারটা বর্তমানে আমাকে বিশেষ চিন্তিত করে তুলেছে—

কী?

বুড়ো শিল্পীর চিঠিটা। যেটা শতদলের কাছ হতে আমি আজ সন্ধ্যায় চেয়ে এনেছি। চিঠিটা শুধু যে বুড়োর শেষ উইল তাই নয়, 'নিরালা'-রহস্যের আসল চাবিকাঠিই ওর মধ্যে আছে। ওই চিঠির মধ্যের প্রতিটি অক্ষরের—আঁচড়ের মানে আছে। তাছাড়া শতদল মুখে যাই বলুক, 'নিরালা'র কোন মূল্য নেই—একটা পুরনো বাড়ি ও কতগুলো ছবি, আসলে নিশ্চয়ই তা নয়। অন্যথায় হিরণ্ময়ী ও তার স্বামী হরবিলাস, শতদল ও বাড়ির পুরাতন ভৃত্য অবিনাশ এরা অমনি করে খুঁটি পেতে বসে থাকত না।

তোর তাহলে মনে হয় কোন গুপ্তধন ঐ বাড়ির মধ্যে কোথাও না কোথাও লুকনো আছে?

গুপ্তধন আছে কিনা বলতে পারি না, তবে থাকলেও আশ্চর্য হব না। সেটাই বরং স্বাভাবিক।

শতদলের প্রাণের উপরে এই যে পর পর attemptগুলো হল, তাহলে তারও কারণ তাই?

তাছাড়া আর কি!

শতদলের এখন কিন্তু বিশ্বাস হয়েছে যে সত্যি-সত্যিই তার প্রাণ নেবার চেষ্টায় কেউ না কেউ ঘুরছে।

হলেই ভাল। কতকটা উদাসীন ভাবেই যেন কিরীটী কথাটা বলে।

এতক্ষণে হঠাৎ যেন আমার মনে হয়, আমার সঙ্গে এতক্ষণ নানা ধরনের কথা বললেও তার মনের মধ্যে অন্য কোন চিন্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কী ভাবছিস বল্ তো? প্রশ্ন করি।

ভাবছিলাম একটা মজার কথা—

কী রে?

তোদের হিরণ্ময়ী দেবীও পঙ্গু নন, আর তোদের ভুখনাও কালা নয়।

বলিস কী!

হ্যাঁ। কিন্তু কথা হচ্ছে, কেন একজন পঙ্গুর অভিনয়—আর কেনই বা অন্যজন কালার অভিনয় করে যাচ্ছে? আর—

আর আবার কী?

দুজনের একজনের ইতিমধ্যে মরবার কথা ছিল, কিন্তু এখনো মরছে না কেন?

বোকার মতই কিরীটীর মুখের দিকে তাকাই। ওর কথার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। তবু প্রশ্ন না করে পারি না, দুজন কারা?

কুব্জী মন্থরা বা প্রিয়সখী ললিতা! কিরীটী জবাব দেয়।

॥ ১১ ॥

ইতিমধ্যে আমরা হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। হাতঘড়ির রেডিয়ম-ডায়েলের দিকে তাকিয়ে দেখি রাত প্রায় দেড়টা।

কুব্জী মন্থরা বা প্রিয়সখী ললিতা! কিরীটীর শেষোচ্চারিত কথাটারই জের টেনে কী যেন আমি বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কিরীটী আমাকে বাধা দিয়ে নিরস্ত করলে, বড্ড ঘুম পেয়েছে রে। চোখ আর খুলে রাখতে পারছি না।

কথাটা উচ্চারণ করতে করতেই কিরীটী আমাদের নির্দিষ্ট ঘরের দিকে একেবারে এগিয়ে গেল সোজা। বুঝলাম এখন আর কোনরূপ আলোচনা করতে কিরীটীর ইচ্ছে নেই, তাই তার অকস্মাৎ মৌনভাব।

সত্যি-সত্যিই কিরীটী অতঃপর সোজা পায়ের জুতোটা খুলে শয্যার ওপরে চট্‌পট চাদরটা গলা অবধি টেনে নিয়ে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

অগত্যা নিরুপায় আমাকেও গিয়ে বাকি রাতটুকুর জন্য শয্যা আশ্রয় নিতে হল। কিন্তু আমার চোখে আর তখন ঘুম নেই। বাকি রাতটুকু আমায় জেগেই কাটাতে হবে। শতদলের ব্যাপারটা ক্রমেই যেন বেশী অস্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে। নিজে সেই সন্ধ্যা হতে মনে মনে সব কিছু বিশ্লেষণ করে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছিলাম, 'নিরালা'র মূল্য একমাত্র সেই বাড়িটাই নয়, আর কিছু আছে এবং সেইখানেই এ রহস্যের মূল। শতদল ও সীতার কথাগুলো মনে পড়ছে। শতদল বাড়িটা বিক্রি করতে চায় এবং কয়েকজন খরিদ্দারও ইতিমধ্যে জুটেছে এবং আশাতীত মূল্য দিয়ে তারা বাড়িটা ক্রয় করতে চায়। কিন্তু কেন?

তা ছাড়া আরও একটা কথা। কিছুক্ষণ আগে হোটেলের পথে কিরীটী যা বলছিল, হিরণ্ময়ী দেবী নাকি পঙ্গু নন! কী উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে এভাবে পঙ্গু সাজিয়ে রেখেছেন? আর পঙ্গুই যদি তিনি নন—পঙ্গুর অভিনয়ই

বা করে যাচ্ছেন কেন? আর কতদিন থেকেই বা এ অভিনয় করছেন? আর ভুখনাও নাকি 'কালা' নয়! ভুখনা শতদলের নিজের চাকর। তার কথা নিশ্চয়ই শতদল জানে। শতদল কি জানে হিরণ্ময়ী দেবীর রহস্য? আশ্চর্য! এও তো বোঝা যায় না, একজন এমনি করে সুস্থ হয়েও দিনের পর দিন রাতের পর রাত পঙ্গুর অভিনয় করে যাচ্ছেন। আর ভুখনাই বা কেন কালা সেজে থাকে!

ইতিপূর্বে আরো কত জটিল রহস্যের মীমাংসা করেছি, কিন্তু এতখানি জটিলতার সম্মুখীন ইতিপূর্বে হয়েছি বলে মনে পড়ে না।

*　　　　*　　　　*

কিরীটীর অনুমান যে এত তাড়াতাড়ি সত্যে পরিণত হবে, এমন পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় সত্য রূপ নেবে, সত্যিই সেদিন সন্ধ্যাতে ভাবিনি। এবং সত্য কথা বলতে কি, শতদলের ব্যাপারটাকে প্রথম হতেই আমি খুব বেশী একটা গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু কিরীটী বুঝেছিল, তাই বোধ হয় দু-চারবার অবশ্যম্ভাবী সেই সর্বনাশের ইঙ্গিত দিয়েছিল।

শুধু শতদলের ব্যাপারেই নয়, ইতিপূর্বে আমিও দু'চারবার দেখেছি কিরীটীর অদ্ভুত বিশ্লেষণ-শক্তি—অন্ধকারের মধ্যে যেন ভবিষ্যতের পদসঞ্চার সে শুনতে পায়। পঞ্চ অনুভূতির বাইরে তার যে একটা বিচিত্র ষষ্ঠ অনুভূতি, যার সাহায্যে অনেক সময় অসাধ্য সাধন করেছে সে, ভাবতে গেলে যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কিরীটী বলে ওটা নাকি তার common sense, স্বাভাবিক বুদ্ধির বিচারশক্তি।

কিন্তু যাক, যে কথা বলছিলুম।

দিন দুই পরের কথা। মেলার উৎসবে ছোট শহরটিতে যেন প্রাণ-চাঞ্চল্যের একটা সাড়া পড়ে গিয়েছে।

রাত্রে বিস্তীর্ণ সমুদ্রের বালুবেলার ওপরে বাজির প্রতিযোগিতা হবে। অ্যামেচার ও পেশাদার বাজিকরদের ভিড়ে সৈকতের নির্দিষ্ট স্থানটি গমগম করছে। রাত আটটা হতে বিভিন্ন দলের প্রতিযোগিতা শুরু হবে। 'নিরালা'র উন্মুক্ত গেট খুলে দেওয়া হয়েছে বিকাল হতেই। সর্বসাধারণের কাছে আজ অবারিত 'নিরালা'র লৌহ-ফটক। আমি, কিরীটী ও স্থানীয় থানা-ইনচার্জ গিয়ে দাঁড়িয়েছি। শতদল সকলকে অভ্যর্থনা করতেই ব্যস্ত। হোটেল হতে রাণু দেবীও এসেছে। আসেননি তার মা মিসেস মিত্র। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে নাকি ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। দুবেলাই স্থানীয় ডাক্তার চ্যাটার্জী যাতায়াত করছেন হোটেলে।

আজকের রাতের শীতটা বেশ আরামদায়ক। স্থানীয় দু-চারজন অফিসারের স্ত্রী ও কন্যারা এবং স্থানীয় ভদ্রলোকেরাও অনেকে স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে বাজি প্রতিযোগিতা দেখতে এসেছেন।

পরিষ্কার আকাশ। ঝকঝক করছে তারাগুলো।

হঠাৎ একটা মিষ্টি হাসির তরঙ্গোচ্ছ্বাসে সামনের দিকে চেয়ে দেখি, সীতা রাণুর সামনে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিতভাবে হাসছে।

সীতার এমন হাসিখুশি আনন্দ-রূপ এ কয়দিনের পরিচয়ের মধ্যে এক দিনের জন্যেও দেখিনি।

সীতাকে মানিয়েছেও আজ ভারি চমৎকার। সাদা চওড়া জরির পাড় বসানো কালো জর্জেট শাড়ি, গায়ে সিফনের সাদা ব্লাউজ, মাথার চুল বেণীর আকারে

পৃষ্ঠদেশে লম্বমান।

রাত্রি ঠিক আটটার সময় বাজির প্রতিযোগিতা শুরু হল।

বিচিত্র সুন্দর দৃশ্য। কালো আশমানের বুকে লাল নীল সাদা হরেক রঙের আগুনের ফুলকিগুলো যেন আলোর ফুলঝুরি ছড়িয়ে চলেছে। হাউইগুলো সোনালী সর্পিল রেখায় কালো আকাশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যেন এক-একটা অগ্নি-ইঙ্গিত এঁকে চলে যাচ্ছে। মিলিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে।

সকলেই আমরা যেন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছি। হঠাৎ সেই কল-গুঞ্জনের মধ্যে শতদলের কণ্ঠস্বর কানে এল।

শতদল সীতাকে বলছে, এই ঠান্ডার মধ্যে গরম জামা গায়ে দাওনি কেন সীতা?

ঠান্ডা আবার কোথায়!

হঠাৎ ঠান্ডা লাগতেই বা কতক্ষণ? যাও, নিচে গিয়ে একটা গরম জামা গায়ে দিয়ে এস।

কিছু হবে না।

না। আমার এই শালটাই না হয় গায়ে দাও।

না, না—তোমার ঠান্ডা লাগবে।

না। আমার গায়ে জামা আছে। নাও—

কতকটা জোর করেই যেন শতদল সীতার গায়ে ডীপ লাল রঙের কাশ্মীরী শালটা নিজের গা হতে খুলে জড়িয়ে দিল।

ঠিক ভিড়ের মধ্যে নয়, ছাদের একেবারে কিনার ঘেঁষে একধারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সীতা ও শতদল। আমি ওদের থেকে হাততিনেক মাত্র দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম বলেই ওদের পরস্পরের কথাগুলো প্রায় স্পষ্টই শুনতে পেয়েছি। একটু পরেই দেখলাম শতদল ভিতরের দিকে চলে গেল।

ভিড় বাঁচিয়ে ছাদের অন্য দিকে দাঁড়িয়ে কিরীটী ও থানা-ইনচার্জ রসময় ঘোষাল নিম্নকণ্ঠে পরস্পরের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ করছে।

বাজি পোড়ানোর ব্যাপারে কিরীটীর যে খুব বেশী মনোযোগ আছে বলে মনে হয় না। আজকের উৎসবে যোগ দিলেও সে যেন উৎসবকে বাঁচিয়ে চলেছে।

অতিথি—বিশেষ করে বিশিষ্ট অতিথিদের প্রতি যে শতদলবাবুর লক্ষ্য আছে বুঝলাম যখন কিছুক্ষণ বাদে ভৃত্য অবিনাশ ট্রেতে করে কেক, বিস্কিট ও ধূমায়িত চা পরিবেশন করে গেল আমাদের।

আরো আধ ঘণ্টাটাক পরে।

কালো আকাশ-পটে তখন বিচিত্র বাজির অপূর্ব আলোর খেলা চলেছে।

প্রত্যেকেই আমরা তন্ময় হয়ে একেবারে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। ঐ মুহূর্তে ছাদের উপরে উপস্থিত সকলেরই মনোযোগ ও দৃষ্টি আকাশের দিকে কেন্দ্রীভূত।

হঠাৎ আমরা চমকে উঠলাম একটা মেয়েলী কণ্ঠের আর্ত তীক্ষ্ন চিৎকারে।

ভয়ার্ত আকুল চিৎকার।

কী হল? ব্যাপার কী? সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। সকলের চোখেই একটা প্রশ্ন যেন।

চিৎকারটা এসেছিল কোন্ দিক থেকে তাও ভালো করে প্রথমটায় বোঝা যায়নি। সকলেই আমরা যেন বিস্ময়ে চকিতে হতভম্ব বিমূঢ়।

ঠিক সেই সময় একটি সুবেশা তরুণী একপ্রকার চেঁচাতে চেঁচাতেই ছাদে এসে দাঁড়ালেন, খুন! খুন হয়েছে!

কথা বলতে বলতে তরুণীটি হাঁপাচ্ছিলেন। ভয়ে আতঙ্কে চোখের মণি দুটো যেন তাঁর ঠিকরে বের হয়ে আসছে।

মুহূর্তে চারপাশ হতে সকলে এসে তরুণীটিকে ঘিরে ধরে।

খুন! কোথায় হয়েছে? কে খুন হল? যুগপৎ একসঙ্গে বহু কণ্ঠ হতে প্রশ্ন উত্থিত হল।

হঠাৎ এমন সময় কিরীটীর শান্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, একটু অনুগ্রহ করে আপনারা সরে দাঁড়ান তো। সরুন। পথ ছেড়ে দিন।

তাকিয়ে দেখি, কিরীটী ও তার পাশে থানা-ইনচার্জ রসময় ঘোষাল।

সরুন না! পথ ছাড়ুন না! শতদলের কণ্ঠস্বর।

শতদল মধ্যবর্তী তরুণীর কাছে এগিয়ে যাবার জন্য সকলকে পথ ছেড়ে দেবার মিনতি জানাচ্ছে।

বহু কষ্টে আমরা তরুণীর সম্মুখবর্তী হলাম।

শতদল প্রথমে প্রশ্ন করে, আপনি কে? কে খুন হয়েছে? কোথায়?

তরুণী তখনও হাঁপাচ্ছে। চোখে-মুখে ভয়ার্ত ব্যাকুলতা।

এবারে কিরীটী তরুণীর সামনে এগিয়ে যায়, কোথায় খুন হয়েছে বলুন তো?

নীচের বসবার ঘরে—

কিরীটী বলে, আসুন শতদলবাবু। আপনিও আসুন।

সকলে অতঃপর আমরা দোতলায় নেমে এলাম। অভ্যাগতদের বসবার জন্য দোতলার স্টুডিও-ঘরের পাশের ঘরটা খুলে কতকগুলো চেয়ার ও সোফা ঐদিনের জন্য সাজানো হয়েছিল।

ঐদিনকার উৎসবোপলক্ষে ঝাড়বাতিটাও সন্ধ্যা হতেই জ্বেলে দেওয়া হয়েছিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন সর্বাগ্রে তরুণীটি এবং তাঁর ঠিক পশ্চাতে আমি ও কিরীটী।

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই চমকে উঠেছিলাম। ঘরের ঠিক মাঝখানে মেঝের ওপর কাত হয়ে পড়ে আছে যে মৃতদেহটি তাকে দেখামাত্রই চিনতে আমার কষ্ট হয়নি।

সীতা!

শতদলের সেই রক্তবর্ণ কাশ্মীরী শালটায় তখনও তার দেহ আবৃত।

পশ্চাৎ হতে পৃষ্ঠদেশে গুলি করা হয়েছে। গায়ের শাল ও জামা ভিজিয়ে রক্তধারা ঘরের মেঝেতে—সেদিনই পরিষ্কার করা পরিচ্ছন্ন মসৃণ পাথরের মেঝেতে ছড়িয়ে জমাট বেঁধেছে।

মৃতদেহের চোখ দুটো বিস্ফারিত। যেন ভয় ও জিজ্ঞাসার চিহ্ন। হস্ত দুটি প্রসারিত।

স্তব্ধ বিস্ময় যেন আমার বাক্যরোধ করেছিল। মুখটা একপাশে কাত হয়ে আছে। শতদলও আমাদের পাশেই নিশ্চল পাষাণের মত দাঁড়িয়ে নির্বাক। তার সমগ্র মুখখানা জুড়ে একটা অসহায় আতঙ্ক যেন ফুটে উঠেছে। চোখে

ভীত প্রশ্নভরা দৃষ্টি।

কিরীটীও স্তব্ধ হয়ে মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে। তার পাশে রসময় ঘোষাল। এবং রসময় ও কিরীটীর কাছ হতে বেশ কিছুটা ব্যবধান বাঁচিয়ে ভীত নর-নারীর দল চিত্রার্পিতের মতই নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে। ঘরের মধ্যে পাথরের মতই জমাট একটা স্তব্ধতা যেন থমথম করছে।

বোধ হয় মিনিট চার-পাঁচ ঐভাবেই কেটে গেল।

কিরীটী এগিয়ে গেল সর্বপ্রথম মৃতদেহের খুব কাছে। ঝুঁকে নীচু হয়ে মৃতের অবশ শিথিল হাতটা তুলে আবার যেমনটি ছিল ঠিক সেইভাবে নামিয়ে রাখলে সন্তর্পণে আলগোছে।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পৃষ্ঠদেশে গুলি করা হয়েছে।

সীতা! সীতা খুন হল! অর্ধস্ফুট ভাবে কথাগুলো শতদলের কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হল। এবং সঙ্গে সঙ্গে দু হাতে মুখ ঢাকল শতদল।

বসুন শতদলবাবু বসুন। শতদলবাবুকে ধরে বসিয়ে দিলাম একটা চেয়ারের উপর, নার্ভ হারাবেন না।

আপনিই দেখেছিলেন? আপনার নামটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? কিরীটী সেই তরুণীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে।

উনি মিস গুহ। এখানকার উকিল শরৎবাবুর মেয়ে। জবাব দিলেন পাশ্বেই দণ্ডায়মান প্রৌঢ়বয়স্কা একটি ভদ্রমহিলা।

দেখুন! এবারে কিরীটী সমবেত সমস্ত নরনারীকে সম্বোধন করে বললে, আপনারা সকলে এইভাবে এই ঘরে ভিড় করলে তো চলবে না। অবশ্য আপনাদের সকলের সঙ্গেই আমাদের কথা বলার প্রয়োজন হবে—তবে একে একে, পৃথক পৃথক ভাবে। কী বলেন রসময়বাবু? কিরীটী তার বক্তব্য শেষ করলে শেষ মুহূর্তে থানা-ইনচার্জ রসময়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে।

হ্যাঁ, আপনাদের আমার প্রয়োজন হবে।

থানা-ইনচার্জ রসময় ঘোষালকে সকলে চিনতেন না। কেউ কেউ যাঁরা চিনতেন, তাঁরাই বোধ হয় ইতিমধ্যে পাশাপাশি যাঁরা জানতেন না তাঁদের ফিস-ফিস করে জানিয়ে দিয়েছিলেন রসময় ঘোষালের সত্যিকারের পরিচয়টা। এবং কিরীটীকে রসময়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দেখে তার সত্যিকারের পরিচয়টা না জেনেই বোধ হয় তাকেও ঐ পর্যায়ে ফেলে ওদের দুজনার সম্পর্কেই হঠাৎ যেন সকলে বেশ একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে।

আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারে প্রথমটায় সকলে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যে মুহূর্তে তারা বুঝতে পারলে এর মধ্যে থানা-পুলিশও উপস্থিত, সমস্ত ঘটনার চেহারাটাই যেন বদলে গেল। প্রথমটায় যে গুরুত্ব এতক্ষণ আকস্মিকতার মধ্যে ঠিক প্রকাশ পায়নি, থানা ও পুলিশের পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে সেই গুরুত্ব যেন সহসা সুস্পষ্ট ও কঠিন হয়ে দেখা দিল। আকস্মিক বিমূঢ়তার মধ্যে ফুটে উঠল একটা ভয়-ব্যাকুল চাঞ্চল্য। সকলেই ভিতরে ভিতরে অবিলম্বে স্থানত্যাগের জন্য যেন চঞ্চল ও ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

যুগপৎ নিঃশব্দে উপস্থিত সকলেরই মুখের দিকে তাকিয়ে কিরীটী নিঃসংশয়ে ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারে। মৃদু হেসে যেন সকলকেই সাহস দেয়, আপনাদের ব্যস্ত হবার বা ভয় পাবার কোন কারণ নেই। সামান্য দু-চারটে প্রশ্ন প্রয়োজনমত আপনাদের কাউকে কাউকে উনি রসময়বাবু ও আমি

জিজ্ঞাসা করব মাত্র। তার পরই আপনারা যে যার গৃহে প্রত্যাবর্তন করবেন। কিছুক্ষণের জন্য বাইরের বারান্দায় আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমরা বেশীক্ষণ সময় নেব না। কেবল মিস গুহ, আপনি ঘরে থাকুন।

দেখতে দেখতে ঘর খালি হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে এখন আমি, কিরীটী, থানা-ইনচার্জ রসময় ঘোষাল, শতদলবাবু ও মিস গুহ।

মিস গুহ, মনে হচ্ছে আপনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম আমাদের মধ্যে ঐ মৃতদেহ দেখেছেন?

কিরীটীর প্রশ্নে মিস গুহ কিরীটীর মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে বোবা-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, কোন জবাব দেন না। মৃতদেহ দেখার পর আকস্মিক ভাবে যে চাঞ্চল্য তরুণীর মনের মধ্যে জেগেছিল, তার কিছুমাত্র যেন এখন আর অবশিষ্ট নেই। একেবারে স্তব্ধ। বোবা হয়ে গিয়েছেন যেন তিনি।

আপনি নীচে এসেছিলেন কেন?

জলপিপাসা পেয়েছিল তাই এধারে এসেছিলাম। কিন্তু ঘরে ঢুকেই,—মিস গুহ আবার মৃতদেহের দিকে দৃষ্টিপাত করে চুপ করে গেলেন।

কিরীটী বারেকের জন্য তার মণিবন্ধে বাঁধা হাতঘড়ির দিকে তাকাল। পরে মৃদু কণ্ঠে বললে, তা এখন ঠিক নটা বেজে দশ মিনিট। আপনি তাহলে পৌনে নটা নাগাদ এ ঘরে এসেছিলেন!

তাই হবে।

সে সময় এ ঘরে আর কেউ ছিল না?

না।

নামবার সময় বাইরের বারান্দায় বা সিঁড়িতেও আর কারো সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?

না।

আপনি জল খেতে নামবার আগে আগাগোড়া ছাদেই ছিলেন? একবারের জন্যও নীচে নামেননি?

না।

অতঃপর কিরীটী একে একে সকলকেই ডেকে তাদের গত এক ঘণ্টার গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল।

নবম জনকে প্রশ্ন করা হল। মধ্যবয়েসী একজন ভদ্রমহিলা। তিনি জবাবে বললেন, রাত তখন আটটা আন্দাজ হবে, তিনি এ বাড়িতে আসেন। আসতে তাঁর একটু দেরিই হয়েছিল। এখানকার স্থানীয় স্কুলের তিনি একজন মিসট্রেস। নাম মালিনী সেন। মিস। অবিবাহিতা।

মিস সেন বললেন, সিঁড়ি দিয়ে সবে দোতলার বারান্দায় উঠেছি, হঠাৎ—, এখন মনে পড়ছে, দেখেছিলাম যেন—উনি ও আর একজন পুরুষ এই ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিম্নকণ্ঠে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কিন্তু আমি তখন তাঁদের বিশেষ লক্ষ্য করিনি। সোজা উপরে ছাদে উঠে যাই।

মিস সেনের কথা মুহূর্তের জন্য লক্ষ্য করলাম শতদল যেন তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

সেই পুরুষটি দেখতে কেমন বা তার পরিধানে কী পোশাক ছিল আপনার মনে আছে কি মিস সেন? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

ভাল করে ঠিক তো লক্ষ্য করিনি, তবে মনে আছে ভদ্রলোকের বয়স খুব বেশী হবে না। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। লম্বা ও বেশ গাট্টাগোট্টা চেহারা! পরিধানে বোধ হয় ফুলপ্যাণ্ট ও একটা হাফশার্ট ছিল।

তাঁদের কোন কথাবার্তা আপনার কানে গিয়েছিল?

না। তাঁরা এত আস্তে কথাবার্তা বলছিলেন যে, তাঁদের কোন কথাই আমি শুনতে পাইনি। তাছাড়া ওঁদের দিকে আমি তত নজরও তো দিইনি।

সামান্য ঐ সংবাদটুকু ছাড়া আর বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধানই আর কারো কাছ হতে প্রশ্ন করে পাওয়া গেল না।

হঠাৎ এমন সময় বাইরে হরবিলাসের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, শতদল! শতদল!

প্রায় সংগে সংগেই হরবিলাস এসে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন এবং কক্ষে প্রবেশ করার সংগে সংগেই ভূপাতিত একমাত্র কন্যার মৃতদেহটা জমাট রক্তের মধ্যে দেখে হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে পাষাণের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। কারো মুখে একটি শব্দ পর্যন্ত নেই। নির্বাক কয়েকটি কঠিন মুহূর্ত।

তারপর হঠাৎ সেই স্তব্ধতা ভংগ হল, সীতা! সীতাকে মেরে ফেলেছে! সীতা নেই! সীতা মারা গিয়েছে!

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে মৃত কন্যার শিয়রের সামনে হাঁটু ভেঙে বসে পড়লেন হরবিলাস। নিঃশব্দে একখানি হাত মৃত কন্যার হিমশীতল মাথার ওপরে রেখে বার-দুই কেবল উচ্চারণ করলেন, সীতা! সীতা! সত্যিই তুই মরে গিয়েছিস মা!

সমস্ত কক্ষখানি যেন এক মর্মন্তুদ বেদনায় ঐ কথা কয়টির মধ্যে গুমরে গুমরে হাহাকার করে উঠল।

নিঃশব্দে হাতখানি মৃত কন্যার মাথার ওপরে বুলোচ্ছেন হরবিলাস। আমরা যেন স্তব্ধ বিমূঢ়। হঠাৎ হরবিলাস কিরীটীর মুখের দিকে তাকালে, কী হবে কিরীটীবাবু! হিরণ এখনও কিছু জানে না। অবিনাশ আমাকে খবর দিতেই তাড়াতাড়ি আমি উপরে ছুটে এসেছি। হিরণ রান্নাঘরে—সে এখনও কিছু জানে না। তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে কতকটা যেন আত্মগত ভাবেই বললেন, জানতাম। আমি জানতাম এ লোভের দণ্ড! লোভের দণ্ড! এত বড় মাশুল দেওয়া আমাদের বাকি ছিল বলেই হিরণ এ বাড়ি ছেড়ে যেতে চায়নি। কিছুতেই তাকে মত করাতে পারিনি।

বলতে বলতে আচমকা হরবিলাস উঠে দাঁড়ালেন, না, না—এ আমি সহ্য করতে পারছি না। এ আমি সহ্য করতে পারছি না! সীতা! সীতা!

টলতে টলতে হরবিলাস কক্ষ হতে বের হয়ে গেলেন।

॥ ১২ ॥

একটা বেদনার ঝড় তুলে যেন প্রস্থানরত হরবিলাসের কতকটা আত্মোক্তির মত উচ্চারিত কথাগুলো তাঁর পিছনে পিছনে মিলিয়ে গেল চাপা হাহাকারের মতই।

এবং আমাদের বিমূঢ় ভাবটা কাটবার আগে আচমকা জ্ঞান হারিয়ে শতদলের শিথিল দেহটা চেয়ারের উপরেই ঢলে পড়ল। আমার আগেই কিরীটী ক্ষিপ্র-

গতিতে শতদলের দিকে এগিয়ে এসে উৎকণ্ঠিতভাবে বললো, শতদলবাবু হঠাৎ বোধ হয় জ্ঞান হারিয়েছেন সুব্রত। আয়, ধর্। ওঁকে ঐ সোফাটায় শুইয়ে দিই—

আমি ও কিরীটী দুজনে ধরাধরি করে শতদলের জ্ঞানহীন দেহটা কোনমতে পাশের সোফাটায় শুইয়ে দিলাম। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে তখন শতদলের। চোখ দুটো বোজা। মুখটা ফ্যাকাশে বিবর্ণ। ঘরের কোণে রক্ষিত কুঁজো থেকে একটা গ্লাসে করে জল নিয়ে শতদলের চোখেমুখে জলের ছিটে দিতে লাগলাম।

কয়েক মিনিট শুশ্রূষা করবার পরই শতদল চোখ মেলে তাকাল। লম্বা একটা নিঃশ্বাস টেনে নিল।

শুয়ে থাকুন শতদলবাবু। একটু বিশ্রাম নিন। আমিই বলি বাধা দিয়ে।

ইতিমধ্যে কিরীটী শতদলের শয়নকক্ষ হতে একটা সাদা চাদর এনে মৃতদেহটা ঢেকে দিয়েছিল। চোখের সামনেই রক্তাক্ত বীভৎস মৃতদেহটা যেন ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছিল।

কিছুক্ষণ আগেও যাকে ছাতের ওপরে শতদলের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি, তারই নিষ্প্রাণ রক্তাক্ত দেহটা সামনে ঐ মেঝেতে পড়ে আছে।

সামান্য এই দু-ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কখনই বা সে নিচে নেমে এল, আর কার হাতেই বা এমন নিষ্ঠুরভাবে নিহত হল? ঘূর্ণাবর্তের মতই প্রশ্নগুলো মনের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে।

আর কখনই বা তাকে হত্যা করা হল? নিরীহ ঐ মেয়েটির পৈশাচিক হত্যার মূলে কী মোটিভ (উদ্দেশ্য) আছে? ছাতের উপর থেকে অলক্ষ্যে অলঙ্ঘ্য মৃত্যুই যেন ওকে টেনে নিয়ে এসেছিল নিচে। কিন্তু হত্যা করলে কে? কে? হত্যাকারী কে?

শরীরটার মধ্যে কেমন যেন অস্থির-অস্থির করছে! শতদল ক্ষীণকণ্ঠে বললে।

সুব্রত, শতদলবাবুকে ওঁর ঘরে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও। কিরীটী আমাকে সম্বোধন করে বলে।

না, না, আমি একা থাকতে পারব না। অস্থির উদ্বেগাকুল কণ্ঠে বলে ওঠে শতদল, এখানেই আমি থাকব। শতদলের সমস্ত মুখখানা যেন ভয়ে পাংশুটে হয়ে গিয়েছে, অভাবনীয় আকস্মিক আঘাতটা যেন খুবই লেগেছে।

তাহলে সোফাটার ওপরে ভাল করে শুয়ে পড়ুন। কিরীটী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলে।

একজন ডাক্তারকে ডাকলে হত না? কথাটা আমিই বলি।

সুব্রত মন্দ কথা বলেনি। কোন জানা-শোনা ভাল ডাক্তার আছে আপনার মিঃ ঘোষাল? প্রশ্ন করে কিরীটী।

আছেন। ডাঃ আদিত্য চ্যাটার্জী। সব চাইতে তাঁরই এখানে ভাল প্র্যাকটিস। ছোটখাটো একটা নার্সিং হোম মতও তাঁর আছে।

তাঁকে একটা খবর দেওয়া যায় না?

বিপিন গেটের বাইরে plain dress-এ পাহারায় আছে, তাকেই আমি বলে আসছি। মিঃ ঘোষাল বলেন।

সুব্রত, মিঃ ঘোষালের সঙ্গে যা।

কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম। বুঝলাম একাকী শতদলের সঙ্গে ও

কিছুক্ষণ থাকতে চায়। আমিও আর দ্বিধা না করে ঘোষালের দিকে তাকিয়ে বললাম, চলুন মিঃ ঘোষাল।

সিঁড়ির ঠিক শেষ ধাপের পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল অবিনাশ—এ বাড়ির পুরাতন ভৃত্য।

সিঁড়ির আলোর খানিকটা অবিনাশের মুখের একাংশে তির্যক্‌ভাবে এসে পড়েছে। আমাদের দেখে অবিনাশ তাড়াতাড়ি সরে গেল। মনে হল অবিনাশ আমাদের সান্নিধ্য থেকে যেন পালিয়ে গেল। অভ্যাগতের দল সকলেই চলে গিয়েছেন।

সমস্ত বাড়িটার মধ্যে একটা অদ্ভুত ভৌতিক স্তব্ধতা যেন থমথম করছে।

টানা বারান্দার মাঝামাঝি আসতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। সামনে ঘরের খোলা দরজার সামনেই ইনভ্যালিড চেয়ারটার উপরে নিশ্চল পাথরের মত বসে আছেন হিরণ্ময়ী দেবী। বারান্দায় জ্বলন্ত বাতির আলো ওঁর ওপর এসে পড়েছে। সমস্ত মুখখানা ফ্যাকাশে বিবর্ণ। প্রাণের চিহ্ন পর্যন্ত যেন সে চোখে-মুখে নেই। হাত দুটি শ্লথভাবে কোলের ওপরে ন্যস্ত। তাঁর নিত্যসহচর উলের বল ও বুননটা কোলের ওপরে নেই।

আমাদের দুজনের পদশব্দেও কোনরূপ স্পন্দন জাগল না যেন হিরণ্ময়ী দেবীর মধ্যে। যেমন নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার মত স্তব্ধ-অনড় বসেছিলেন ইন-ভ্যালিড চেয়ারটার ওপর, ঠিক তেমনই বসে রইলেন। চোখের দৃষ্টি সামনের দিকে নিবদ্ধ।

আরো একটু এগিয়ে গেলাম ইনভ্যালিড চেয়ারে উপবিষ্ট হিরণ্ময়ী দেবীর কাছে।

এবারে নজরে পড়ল দুই চোখের কোল বেয়ে দুটি অশ্রুর ধারা। হিরণ্ময়ী দেবী কাঁদছিলেন। তাঁর চোখে জল।

আমি আর অগ্রসর হলাম না। দেওয়াল ঘেঁষে একটা থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে কোন শব্দ না করে কেবল নিঃশব্দে চোখের ইঙ্গিতে ঘোষালকে এগিয়ে যেতে বললাম। ঘোষাল চলে গেলেন বারান্দার অন্য প্রান্তে দ্বারের দিকে।

হরবিলাস বোধ হয় এতক্ষণ ঘরের মধ্যেই ছিলেন, বের হয়ে এলেন। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে হিরণ্ময়ীর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা স্ত্রীর স্কন্ধের ওপরে রাখলেন। মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, হিরণ!

তথাপি নিশ্চল স্তব্ধ হিরণ্ময়ী। এতটুকু কম্পনও নেই। স্বামীর ডাক যেন তাঁর কানে পৌঁছয়নি।

ঘরে চল হিরণ!

তথাপি হিরণ্ময়ীর দিক থেকে কোন সাড়া এল না। পূর্ববৎ নিশ্চল স্তব্ধ।

হিরণ! আবার মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন হরবিলাস।

স্বামী-স্ত্রীর এই শোকের মধ্যে নিজেকে কেমন যেন আমার বিব্রত মনে হতে লাগল। এমন সময় এখানে না থাকাই উচিত বোধ হয়। স্থানত্যাগ করাই কর্তব্য।

আচমকা এমন সময় হিরণ্ময়ীর পাথরের মত স্তব্ধ দেহটা ঈষৎ নড়ে উঠল। হিরণ্ময়ী স্বামীর দিকে চোখ তুলে তাকালেন। নিষ্প্রাণ অর্থহীন দৃষ্টি। স্বামী ডাকলেও যেন কিছু বুঝতে পারেননি তিনি।

ঘলে চল।

সীতাকে কি ওরা নিয়ে গিয়েছে? ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন হিরণ্ময়ী।

ঘরে চল হিরণ। স্নিগ্ধ কণ্ঠে হরবিলাস কেবল বললেন।

তুমি দেখেছ? সত্যিই সীতা মরে গিয়েছে? মনে নেই তোমার, ছোটবেলায় ওর ফিটের ব্যামো ছিল! ফিট হয়নি তো? সত্যিই হয়তো ও মরেনি, ফিট হয়ে আছে। Smelling Salt-এর শিশিটা নিয়ে যাও—

না, তুমি ঘরে চল।

না, ঘরে যাব না। এখান দিয়েই তো সীতাকে ওরা নিয়ে যাবে!

তা তো জানি না। ওসব কথা আর ভেবে কী হবে হিরণ? মনকে শক্ত করা ছাড়া তো আর উপায় নেই।

কিরীটীবাবু কোথায়?

উপরেই আছেন।

তিনি কি বললেন? তিনিও ধরতে পারলেন না কে আমার সীতাকে খুন করল?

কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ হিরণ্ময়ী দেবী চুপ করে রইলেন, তারপর আবার যেন আপন মনেই বলে উঠলেন, সে ঠিক ধরতে পারবে, আমার সীতাকে কে মেরেছে। সে ধরতে পারবে—পারবে।

ক্ষীণ পদশব্দ কানে এল।

চেয়ে দেখি ঘোষাল ফিরে আসছেন, আমিও আর বিলম্ব না করে পা টিপে টিপে সোজা দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। সত্যিই ঐ শোকের দৃশ্য যেন আর সহ্য করতে পারছিলাম না।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখি, কিরীটী নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে আপনমনে পায়চারি করছে। মুখে পাইপ। শতদলবাবু সোফার ওপরে যেমন অর্ধশয়ান অবস্থায় ছিল তেমনই আছে।

আমার পদশব্দে কিরীটী পায়চারি থামিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, ঘোষাল কই?

আসছেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘোষাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

ডাক্তারকে ডাকতে লোক পাঠিয়েছেন?

হ্যাঁ। বিপিনও সেই লোকটির কথা বললে মিঃ রায়।

কার কথা?

মিস সেন যে লোকটির কথা বলছিলেন! লোকটাকে বিপিন সদর দিয়ে বের হয়ে যেতে দেখেছে। রাত তখন পৌনে নটা হবে।

আসতে দেখেনি লোকটাকে? কিরীটী প্রশ্ন করে।

না। কেবল বের হয়ে যেতেই দেখেছে। তবে মিস সেন তার বেশভুষার যে description দিয়েছেন তার সঙ্গে মিল নেই।

কি রকম?

গায়ে একটা কালো রঙের গ্রেট কোট ছিল, আর মাথায় একটা কালো রঙের ফেল্ট ক্যাপ ছিল। ক্যাপটা ডানদিকে একটু টেনে নামানো ছিল। চেহারার বর্ণনায় মিল আছে। উঁচু, লম্বা বলিষ্ঠ গড়ন। এবং সদর দিয়ে বের হয়ে যাবার সময় সদরের আলোয় লোকটার মুখের একাংশ যা দেখতে পেয়েছিল, বললে মুখে নাকি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি ছিল, কিছুদিন যে লোকটা shave করেনি

বোঝা যায়।

ঘোষালের কথা শেষ হতেই কানে এল একটা কুকুরের গুরুগম্ভীর ডাক।

চমকে উঠেছিলাম প্রথমটায়, পরক্ষণেই মনে পড়ল সীতার কুকুরের ডাক। আজ সন্ধ্যায় এখানে লোক-সমাগমের জন্য সীতার কুকুরটাকে নিচের তলার একটা ঘরে চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল।

ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে ডাকতে কুকুরটা একলাফে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল এবং সোজা এসে সীতার ভূপাতিত নিষ্প্রাণ হিমশীতল দেহটার সামনে দাঁড়িয়ে গেল।

সকলেই আমরা স্তব্ধ-বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি অ্যালসেসিয়ান প্রকাণ্ড কুকুরটার দিকে। স্থির দৃষ্টিতে সীতার মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুকুরটা।

হঠাৎ কুকুরটা হাঁটু ভেঙে সীতার মৃতদেহের সামনে বসে পড়ল। তারপর মুখটা সীতার গায়ের উপর রেখে কুঁই কুঁই শব্দ করতে লাগল।

কুকুরটা কাঁদছে।

অত বড় একটা জানোয়ার যে অমন করে তার প্রভুর জন্য কাঁদতে পারে, অমন করে তার শোক প্রকাশ করতে পারে, দেখে সত্যিই যেন বিস্ময়ের অবধি ছিল না। নির্বাক আমরা সকলেই। একটা জানোয়ারের শোকপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে সমস্ত ঘরের আবহাওয়াটাও যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে।

ঠিক এমনি সময় হাঁপাতে হাঁপাতে খালি গায়েই হরবিলাস ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন। হাতে তাঁর কুকুর বাঁধার মোটা শিকলটা।

কুকুরটা কিছুতেই তাঁর প্রভুর মৃতদেহের পাশ হতে নড়বে না। একপ্রকার জোর করেই গলার বকলসে শিকল এঁটে হরবিলাস কুকুরটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন।

রাত প্রায় পৌনে বারোটায় ডাক্তার আদিত্য চ্যাটার্জী এলেন, বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। দার্শনিকের মত এলোমেলো কাঁচা-পাকা চুল। মিঃ ঘোষালই ডাঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে আমাদের সকলের পরিচয়টা করিয়ে দিলেন এবং 'নিরালা'র দুর্ঘটনাটাও সংক্ষেপে তাঁর গোচরীভূত করলেন।

ডাঃ চ্যাটার্জী ওখানকার অনেক দিনের বাসিন্দা। শহরেই প্র্যাকটিস করেন এবং নিজের একটি ছোটখাটো নার্সিং হোমও আছে। মিঃ ঘোষালের মুখে সমস্ত কাহিনী শুনে তিনি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কেবল একবার মৃদুকণ্ঠে বললেন, How horrible!

আরও বললেন, এ গৃহ তাঁর পরিচিত, আগেও নাকি দু-একবার এসেছেন এখানে শিল্পী রণধীর চৌধুরীকে দেখতে। এবং সীতাকেও তিনি চিনতেন। এই বাড়িতেই আলাপ হয়েছিল রণধীর চৌধুরীর জীবিতকালে।

কিরীটীর অনুরোধে শতদলকে ডাঃ চ্যাটার্জী পরীক্ষা করলেন। বললেন, Simple nervous shock! একটু স্টিমিউলেণ্ট ও কটা দিন বিশ্রাম পেলেই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

এমন সময় কিরীটী ডাঃ চ্যাটার্জীকে অনুরোধ জানাল, আমারও তাই মত ডাঃ চ্যাটার্জী। এবং আমার ইচ্ছে, শতদলবাবুর উপর দিয়ে উপর্যুপরি কয়েক দিন ধরে যে নার্ভাস স্ট্রেন গিয়েছে তাতেই তিনি আজকের দুর্ঘটনায় একেবারে ব্রেকডাউন করেছেন, এ অবস্থায় আমার মনে হয়—যদিও আমি ডাক্তার নই—ওঁর

কিছুদিন রেস্ট নেওয়া অবশ্যই কর্তব্য—complete bodily and mental rest এবং এখানে নয়—অন্য কোন জায়গায়—স্থান-পরিবর্তন করা এখন বিশেষ প্রয়োজন। আপনি কী বলেন ডাঃ চ্যাটার্জী?

খুব ভাল হয় তাহলে! You are right!

আপনার নার্সিং হোমে সুবিধা হয় না?

আমার নার্সিং হোমে?

হ্যাঁ। আমার তো মনে হয়, ওঁর পক্ষে আপনার নার্সিং হোমই সব চাইতে ভাল জায়গা হবে। আপনার কেয়ারেও থাকবেন উনি এবং strict order থাকবে কেউ যেন ওঁর সঙ্গে দেখা না করতে পারে।

বেশ তো। তা হতে পারে।

কোন সিঙ্গল রুম খালি আছে কি?

তা আছে।

তবে সেই ব্যবস্থাই ভাল। এখুনি ওঁকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা তাহলে করুন।

বেশ তো, আমার টমটম এনেছি—আমার সঙ্গে উনি চলুন।

সেই মত ব্যবস্থাই হল। আমার ওপরেই কিরীটী ভার দিল ডাঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে শতদলবাবুকে নিয়ে গিয়ে একেবারে নার্সিং হোমে পৌঁছে দিয়ে আসার।

কিরীটী ও মিঃ ঘোষাল থেকে গেলেন মৃতদেহের একটা ব্যবস্থা করবার জন্য।

গতকাল থেকে শতদলবাবু ডাঃ চ্যাটার্জীর নার্সিং হোমেই আছেন। নার্সিং হোমে স্ট্রিক্ট অর্ডার দেওয়া আছে একমাত্র কিরীটী ও রসময়বাবু ছাড়া এবং তাঁদের বিনানুমতিতে কোন ভিজিটার্সকেই কোন উপলক্ষে শতদলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে না।

সীতার আকস্মিক মৃত্যুর পর হতেই কিরীটীকে লক্ষ্য করেছিলাম হঠাৎ যেন সে বেজায় গম্ভীর হয়ে উঠেছে। কি একটা চিন্তা যেন তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

আরো একদিন পরের ঘটনা। হঠাৎ নার্সিং হোম থেকে একজন লোক সংবাদ নিয়ে এল, সন্ধ্যার কিছু পরে ঘণ্টাখানেক আগে থেকে শতদলবাবু নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং ডাঃ চ্যাটার্জী অবিলম্বে কিরীটীকে একবার নার্সিং হোমে যেতে বলেছেন। ডাক্তার তাঁর টমটম পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমি ও কিরীটী আর কালবিলম্ব না করে তখুনি নার্সিং হোমে যাবার জন্য টমটমে উঠে বসলাম।

ছোট্ট শহর। হোটেল থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে স্টেশনের কাছে ডাঃ চ্যাটার্জীর নার্সিং হোম। প্রায় একবিঘে জমির ওপরে বাগান, এক-মানুষ সমান উঁচু প্রাচীর-ঘেরা সীমানার মধ্যে দোতলা একটি বাড়ি—নার্সিং হোম। বাইরে থেকে একমাত্র গেট ছাড়া নার্সিং হোমের মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না।

সোজা আমরা টমটম থেকে নেমে দোতলার কোণের ঘরে যেখানে শতদল-বাবু আছেন সেই ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

শয্যার ওপরে শতদলবাবু শুয়ে। বুক পর্যন্ত চাদরে আবৃত। চোখ

দুটি বোজা।

পাশে দাঁড়িয়ে ডাঃ চ্যাটার্জী শতদলকে একটা ইনজেকশন দিচ্ছেন। পাশেই দাঁড়িয়ে একজন নার্স।

ইনজেকশন দেওয়া শেষ হলে আমাদের মুখের দিকে তাকালেন ডাক্তার নার্সের হাতে সিরিঞ্জটা দিয়ে, চলুন আমার ঘরে। ভয় বোধ হয় কেটে গিয়েছে।

ডাঃ চ্যাটার্জীর ঘরে এসে আমরা বসলাম।

কি ব্যাপার ডাঃ চ্যাটার্জী ?

Morphia poisoning—কেউ বোধ হয় শতদলবাবুকে মরফিয়া খাইয়ে মারবার চেষ্টা করেছিল।

বলেন কি ? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। হঠাৎ নার্স এসে ঠিক সময়মত আমায় খবরটা না দিলে বোধ হয় রক্ষা করা যেত না life। অতঃপর একটু থেমে বললেন, এখন তো দেখছি সেদিন ওঁকে এখানে এনে ভালই করেছি।

কিন্তু কি করে সম্ভব হল ? How it was done ? প্রশ্ন করলাম আমি।

প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। এখন বুঝতে পারছি দুপুরের দিকে কে একজন ভিজিটার্স দেখা করতে এসেছিল, কিন্তু দেখা করার অর্ডার না থাকায় নার্স দেখা করতে দেয়নি। ভদ্রলোক কিছু ফুল ও একটা কাগজের বাক্সে কিছু মিঠাই রেখে যান ওঁকে দেবার জন্য। সেই মিঠাই খেয়েই নাকি—

হুঁ। আচ্ছা ডাক্তার, আপনার সেই নার্স—যার হাতে সেই ভদ্রলোক ফুল ও মিঠাই দিয়ে গিয়েছিল, এখানে তাকে একবার ডাকতে পারেন ? তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

নিশ্চয়ই।

ডাক্তার বেল বাজালেন। বেয়ারা এসে ঘরে ঢুকল, ডাঃ চ্যাটার্জী তাকে বললেন, নার্স সরলা মিত্রকে ডেকে দিতে। নিচের ওয়ার্ডে সরলা মিত্র তখন ডিউটিতে ছিল।

ভাল কথা ডাঃ চ্যাটার্জী, যে মিষ্টি খেয়ে শতদলবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন তার কিছু অংশ এখনো বাকি আছে নিশ্চয়ই! কিরীটী ডাক্তারকে শুধায়।

হ্যাঁ, বোধ হয় গোটা দুই সন্দেশ খেয়েছিলেন—বাকিটা এখনো বাক্সেই আছে, রেখে দিয়েছি বাক্সটা সমেত—, বলতে বলতে বসবার টেবিলের ডানদিককার ড্রয়ার চাবি দিয়ে খুলে ড্রয়ারটা টেনে কাগজের একটি ফ্যান্সি চৌকো বাক্স বের করে দিলেন ডাঃ চ্যাটার্জী।

ফ্যান্সি কাগজের চৌকো বাক্স। বাক্সের উপরে চমৎকার একটা ডিজাইন ও দোকানের নাম লেখা—বান্ধব সুইট হোম। কাগজের বাক্সের উপর লেখা নামটা পড়তে পড়তে কিরীটী বললে, এ তো দেখছি এখানকারই দোকান!

ডাক্তার জবাব দিলেন, হ্যাঁ, এখানকার বিখ্যাত মিষ্টান্নের দোকান। এদের কড়াপাকের সন্দেশ খুবই বিখ্যাত এবং খেতেও খুব ভাল।

বাক্সের ডালা খুলতেই দেখা গেল, গোটা-বারো সন্দেশ তখনও অবশিষ্ট আছে।

সরলা মিত্র এসে কক্ষে প্রবেশ করল, আমাকে ডেকেছিলেন ডাঃ চ্যাটার্জী ?

কে, সরলা ? এস। আমি ঠিক নয়, ইনি। এঁকে তুমি চেন না, বিখ্যাত লোক—কিরীটী রায়।

নমস্কার। সরলা হাত তুলে নমস্কার জানায়।

চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স হবে মিস মিত্রের। বেশ গোলগাল চেহারা এবং চোখে-মুখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে।

নমস্কার। আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই মিস মিত্র। কিরীটী বললে।

বলুন!

৩নং কেবিনে অর্থাৎ শতদলবাবুর কাছে আজ যখন ভিজিটার্স আসেন, আপনি সে সময় নিচে ডিউটিতে ছিলেন শুনলাম!

হ্যাঁ।

সময়টা আপনার মনে আছে কি?

হ্যাঁ, সাড়ে তিনটে হবে।

যিনি এসেছিলেন তিনি দেখতে কেমন?

বাইশ-তেইশ বছরের একজন সুশ্রী সুবেশা মহিলা।

মহিলা!

হ্যাঁ। তিনি শতদলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে বললাম পারমিশন নেই—তখন একথোকা গোলাপফুল ও একটি মিষ্টির বাক্স দিয়ে আমায় অনুরোধ জানান শতদলবাবুর ঘরে সেগুলো পৌঁছে দিতে।

সঙ্গে তাঁর আর কেউ ছিল?

না।

তাঁকে দেখলে চিনতে পারবেন?

হয়তো চিনতে পারব, তবে চোখে কালো চশমা ছিল।

॥ ১৩ ॥

বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সের একজন সুশ্রী সুবেশা মহিলা কিছু রক্তলাল গোলাপ ও এক বাক্স মিষ্টি—কড়াপাকের সন্দেশ—সঙ্গে নিয়ে শতদলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন! চোখে তাঁর কালো লেন্সের চশমা ছিল অর্থাৎ সুস্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, মহিলা যেই হোন না কেন, তিনি তাঁর মুখখানির স্পষ্ট পরিচয়টা দিতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু তার চাইতেও মারাত্মক ব্যাপার, তাঁর দেওয়া মিষ্টি খেয়েই শতদল অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি ডাঃ চ্যাটার্জী এসে পড়ায় কোনমতে শতদলকে সুস্থ করে তোলা হয়েছে। মরফিন পয়েজনিং কেস। শতদলকে মিষ্টির সঙ্গে মরফিন দিয়ে কৌশলে তাহলে হত্যা করারই চেষ্টা করা হয়েছিল। আবার শতদলের প্রাণহরণের প্রচেষ্টা এবং এবারে ডাঃ চ্যাটার্জী ঠিক সময়ে শতদলের অসুস্থতার সংবাদ না পেলে তাঁকে হয়তো বাঁচানোই যেত না! পরিকল্পনাটিও চমৎকারই বলতে হবে—মিষ্টির সঙ্গে বিষপ্রয়োগ! কিন্তু কে সেই ভদ্রমহিলা?

ভাল কথা মিস মিত্র, ভদ্রমহিলা তাঁর নাম বলেননি? আমিই প্রশ্ন করি।

না। নাম তো কিছু তিনি বলেননি, তবে একটা মুখ-আঁটা নীল খামে চিঠি দিয়েছিলেন ঐ সঙ্গে, শতদলবাবুর নাম উপরে লেখা। চিঠিটা দিয়ে বলেছিলেন, ঐ চিঠিটা দিলেই সব তিনি বুঝতে পারবেন। আমি সেই চিঠি,

ফুল ও মিষ্টির বাক্সটা এনে উপরের ইনচার্জ নার্স মিসেস মহান্তির হাতে দিই।

ও, তাহলে মিসেস মহান্তিই তখন উপরে ডিউটিতে ছিলেন! কথাটা বলে কিরীটী মিস মিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, মিসেস মহান্তি কি এখন এখানে উপস্থিত আছেন? তাঁকে একটিবার অনুগ্রহ করে যদি এই ঘরে ডেকে আনেন মিস মিত্র!

মণিকার এখন off-duty হলেও বোধ হয় নার্সিং হোমেই আছে। দেখছি যদি না বাইরে গিয়ে থাকে তো পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মিস মিত্র ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

কিরীটী চেয়ারের ওপরে বসে অন্যমনস্ক ভাবে সম্মুখের টেবিলের উপর থেকে একটা কাচের কাগজ চাপা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। চোখের দৃষ্টি স্তিমিত। অন্যমনা।

বুঝতে পারলাম, কোন একটা বিশেষ চিন্তা ঐ মুহূর্তে তার মনের অবগহনে আলোড়ন তুলেছে। কোন একটা সূত্রকে ধরবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। তাই তার দেহে ও মনে একটা শিথিল নিষ্ক্রিয়তা।

শতদলকে কেন্দ্র করে একটা দুর্বোধ্য রহস্য ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছিল—সীতার আকস্মিক রহস্যজনক মৃত্যু সেটাকে আরো জট পাকিয়ে তুলেছে।

ঘটনাগুলো যেন পরস্পরের সঙ্গে একান্তভাবেই বিচ্ছিন্ন। শতদলকে হত্যা প্রচেষ্টার সঙ্গে সীতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করবার কী এমন কার্য-কারণ থাকতে পারে বুঝতে পারছি না। হত্যার মোটিভ কী? শতদলকে হত্যা করবার তবু একটা কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সীতা নিহত হল কেন? কী উদ্দেশ্য নিহিত আছে তার হত্যার সঙ্গে? তবে কি দুটো ব্যাপারের সঙ্গে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক নেই? শতদলকে হত্যা-প্রচেষ্টা ও সীতাকে হত্যা করা—একের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অন্যের উদ্দেশ্যের কোন সম্পর্কই নেই? ঘটনাচক্রে একটির সঙ্গে অন্যটি জড়িয়ে গিয়েছে মাত্র?

বাইরে পদশব্দ পাওয়া গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দরজার ভারী নীল রঙের পর্দাটা তুলে কক্ষে প্রবেশ করলেন ৩০/৩২ বৎসরের একটি নার্স।

ডক্টর চ্যাটার্জী, আপনি আমাকে ডেকেছিলেন?

মিসেস মহান্তি! হ্যাঁ, আসুন। পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি মিঃ রায়—উনিই আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চান। ডাঃ চ্যাটার্জীই মিসেস মহান্তিকে আহ্বান জানালেন।

মুখের দিকে চেয়ে কেবলমাত্র মুখাবয়ব থেকে মিসেস মহান্তির বয়স নিরূপণ করা কষ্ট। বেশ গোলগাল স্থূল চেহারা—চোখেমুখে একটা সরল নিরীহ বোকা বোকা ভাব।

মিসেস মহান্তি ডাঃ চ্যাটার্জীর কথায় কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়েই বারেকের জন্য দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন।

মিসেস মহান্তি, আপনি তো আজ উপরে ডিউটিতে ছিলেন?

মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালেন মিসেস মহান্তি।

কেবিনে শতদলবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে আপনি বোধ হয় ডক্টর চ্যাটার্জীকে সংবাদ পাঠান?

হ্যাঁ, সে সময় আমিই ঘরে ছিলাম। মৃদুকণ্ঠে জবাব এল।

কিরীটী হঠাৎ সোজা হয়ে বসল, আপনি সেই সময় শতদলবাবুর কেবিনের

মধ্যেই উপস্থিত ছিলেন?

হ্যাঁ।

আগে থাকতেই আপনি কেবিনের মধ্যে ছিলেন, না ঠিক ঐ সময়টিতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন?

ওঁর সঙ্গে বসে গল্প করছিলাম। সরলা আমাকে কিছু গোলাপফুল, একটা চিঠি ও একবাক্স মিষ্টি এনে দেয় শতদলবাবুকে দেবার জন্য। সেগুলো নিয়ে কেবিনে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু উনি আমাকে কথায় কথায় আটকে রেখেছিলেন।

আপনার সামনেই তাহলে শতদলবাবু মিষ্টি খান?

হ্যাঁ।

মিসেস মহান্তি, যদি কিছু মনে না করেন তো in details আজকের ঘটনাটা আমাকে খুলে বলুন!

জিনিসগুলো নিয়ে শতদলবাবুর কেবিনে ঢুকতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, ওগুলো কী? আমি জিনিসগুলো তাঁর হাতে দিয়ে সব বললাম। তারপর বেরিয়ে আসতে যাব, শতদলবাবু আমাকে ডেকে বললেন, সিস্টার, ঐ ভাসে এই ফুলগুলো একটু সাজিয়ে দিন না, please! ভাসের ফুল যা ছিল সেগুলো তুলে নিয়ে গোলাপ ফুলগুলো সাজিয়ে দিচ্ছিলাম যখন, শতদলবাবু সে-সময় চিঠিটি পড়ছিলেন। তারপরই মিষ্টির বাক্সটা খুলে বললেন, How lovely! কড়াপাকের সন্দেশ! বলতে বলতেই গোটা-দুই সন্দেশ মুখে পুরে দিলেন। এবং আমাকে বললেন এক্‌গ্লাস জল দিতে। ঘরের কোণায় কুঁজোতে জল ছিল। গ্লাসে জল ভরে তাঁর সামনে নিয়ে দাঁড়াতেই দেখি, শতদলবাবুর সমস্ত চোখে-মুখে যেন একটা আতঙ্ক। কোনমতে ঢোক গিলতে গিলতে বললেন, সিস্টার, শীগ্‌গির ডক্টর চ্যাটার্জীকে খবর দিন। আমি অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছি। Quick! যান—। সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রায় ছুটে গিয়ে ডক্টর চ্যাটার্জীকে ডেকে আনি।

সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কিরীটী নিশ্চলভাবে বসে মিসেস মহান্তি বর্ণিত কাহিনী শুনছিল, হঠাৎ যেন তার নিশ্চল দেহটা একটা বিদ্যুৎস্পর্শে সজাগ প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। কিরীটীর ক্ষণপূর্বের স্তিমিত চোখের তারা দুটো যেন আচমকা বিদ্যুৎ-শিখার মত জ্বলে উঠল। ঝকঝক করে উঠলো ধারালো ছুরির ফলার মত। কিরীটীর ঐ দৃষ্টিকে আমি চিনি। সহসা উপবিষ্ট কিরীটী চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করে। দু-চার মিনিট কেটে গেল একটা অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে। ঘরের আমরা বাকি তিনজন নির্বাক হয়ে আছি। আমি আর ডক্টর চ্যাটার্জী উপবিষ্ট। মিসেস মহান্তি আমাদের সামনেই দণ্ডায়মান।

হঠাৎ আবার কিরীটীই ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে, ডক্টর, এবারে আমরা শতদলবাবুকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। চলুন।

সকলে আমরা কেবিনে এসে প্রবেশ করলাম।

চক্ষু দুটি মুদ্রিত। শতদলবাবু শয্যার ওপরে শুয়েছিলেন। আমাদের পদশব্দে চোখ মেলে তাকালেন। ডাঃ চ্যাটার্জীই সর্বপ্রথমে এগিয়ে গিয়ে শতদলের পাল্‌সটা দেখলেন, এখন বেশ সুস্থ বোধ করছেন তো শতদলবাবু?

হ্যাঁ, ধন্যবাদ। অতঃপর কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি কখন এলেন মিঃ রায়?

এই তো কিছুক্ষণ হল।

ডক্টর চ্যাটার্জীর মুখে সব শুনেছেন বোধ হয়! There was another attempt! স্মিতকণ্ঠে শতদল বললে।

হ্যাঁ, শুনলাম। ভয় পাবেন না মিঃ বোস—this is last! কিরীটীর কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত একটা দৃঢ়তা।

আর কারো কানে সেটুকু না ধরা পড়লেও আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে সেটা ফাঁকি দিতে পারে না।

সত্যি! ভাবতেই পারিনি সন্দেশের মধ্যে—

শতদলকে বাধা দিয়ে কিরীটী বললে, কে আপনাকে ফুল ও মিষ্টি পাঠিয়েছিল শতদলবাবু?

সত্যি কথা বলতে কি, মিঃ রায়, এতক্ষণে শুয়ে শুয়ে সেইটাই ভাবছিলাম। আপনিও তাকে চেনেন—রাণু!

বজ্রের মতই যেন দু-অক্ষরের নামটি আমার কর্ণে ধ্বনিত হল, রাণু!

কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি সেও কম বিস্মিত হয়নি। এবং কণ্ঠস্বরেও তার সে বিস্ময়টুকু ধ্বনিত হয়ে উঠল, রাণু দেবী!

হ্যাঁ। এই দেখুন না চিঠি—, বলে শয্যার আশেপাশে চিঠিটা খুঁজতে থাকে শতদল, চিঠি—চিঠিটা গেল কোথায়?

মিসেস মহান্তি এমন সময় এগিয়ে এলেন এবং বালিশের তলা থেকে নীল খাম সমেত খোলা চিঠিখানা বের করে শতদলের হাতে তুলে দিলেন, এই যে!

কিরীটী চিঠিটা শতদলের হাত থেকে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরল। আমিও আরো এগিয়ে গেলাম। নীল রঙের পুরু লেটার-পেপারে রয়েল ব্লু কালিতে লেখা চিঠি।

মুক্তোর মতো ঝরঝরে পরিষ্কার হাতের গোটা অক্ষর। এবং হাতের লেখা দেখলে কোন পুরুষের নয়—মেয়ের বলেই মনে হয়। সংক্ষিপ্ত চিঠি।

শতদল,

একান্ত ইচ্ছা থাকলেও তোমার সঙ্গে দেখা করবার উপায় নেই। কড়া হুকুম কিরীটী রায়ের। নার্সিং হোমে প্রবেশ নিষেধ। তুমি রক্তগোলাপ ভালবাস, তাই কিছু রক্তগোলাপ ও তোমার বান্ধব মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের প্রিয় কড়াপাকের সন্দেশ পাঠালাম। ভালবাসা নিও। 'রাণু'।

চিঠিটি পড়ে ভাঁজ করতে করতে কিরীটী শতদলের দিকে তাকিয়ে বললে, চিঠিটা আমার কাছে থাক শতদলবাবু।

বেশ।

কিরীটী চিঠিটা জামার পকেটে রেখে দিল, চলুন ডাক্তার। ওঁকে আমাদের বিশ্রাম দেওয়াই প্রয়োজন। উনি বিশ্রাম করুন।

আমরা সকলে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

ডাক্তারের কাছে বিদায় নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ কিরীটী ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, তুই এগো সুব্রত, আমি ডাক্তারকে একটা কথা বলে আসি!

কিরীটী আবার উপরে চলে গেল। মিনিট পনের বাদে কিরীটী ফিরে এল।

* * *

হোটেলে ফিরে এলাম। ডাক্তারের টমটমই আমাদের হোটেলে পেঁছে দিয়ে গেল।

কিরীটীর পকেটে যে নীল লেটার-প্যাডের কাগজে লেখা চিঠিটা ছিল, আমার মনের মধ্যে সবটুকু সেটাই অধিকার করে ছিল। চিঠিটা সম্পর্কে কিরীটী আর কোন উচ্চবাচ্য না করলেও আমি কিন্তু চিঠিটার কথা কোনমতেই ভুলতে পারছিলাম না। আশা করেছিলাম, হোটেলে ফিরেই কিরীটী রাণুকে ডেকে নিশ্চয়ই চিঠিটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে কিন্তু কিরীটী সেদিক দিয়েই গেল না। সোজা ঘরে ঢুকে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

আমি বাইরের বারান্দায় একটা আরাম-কেদারার উপরে গা এলিয়ে দিলাম।

শীতের ঘনায়মান সন্ধ্যায় চারিদিক অস্পষ্ট। একটানা সমুদ্রগর্জন দূরের সন্ধ্যার অস্পষ্টতার মধ্য হতে কানে এসে প্রবেশ করছে। ইতিমধ্যেই হোটেলের ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে।

কতক্ষণ অন্ধকারে চেয়ারটার ওপরে বসেছিলাম মনে নেই, হঠাৎ রাণুর কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙল।

কে, সুব্রতবাবু নাকি?

কে—ও মিস মিত্র!

অন্ধকারে চুপটি করে বসে আছেন যে?

না, এমনিই। বসুন।

রাণু পাশের চেয়ারটায় বসল।

উঃ, আজ অনেক ঘুরেছি। একা একা বেড়াতে যাব না বলে আপনাদের খুঁজতে এসেছিলাম। বেয়ারাটা বললে, বিকেলের দিকে টমটম করে আপনি আর মিঃ রায় শহরের দিকে গিয়েছেন। কোথায় গিয়েছিলেন? রাণু জিজ্ঞাসা করে।

ডক্টর চ্যাটার্জীর নার্সিং হোমে।

শতদল কেমন আছে? বেচারা একটু সামলাতে পেরেছে কি?

হ্যাঁ। অদম্য কৌতূহলটাকে আর নিজের মধ্যে চেপে রাখতে পারলাম না। প্রশ্ন করলাম আপনি তো আজ ফুল আর মিষ্টি পাঠিয়েছিলেন রাণু দেবী শতদলবাবুকে!

হ্যাঁ, পেয়েছে?

শান্তকণ্ঠে উচ্চারিত রাণুর কথাটা যেন মুহূর্তে একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গাঘাতে আমাকে একেবারে বিবশ করে দিল। কয়েক মুহূর্ত আমার যেন বাক্যস্ফূর্তি হল না। আমি বোবা হয়ে গিয়েছি। অন্ধকারেই তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকালাম রাণুর মুখের দিকে, কিন্তু অন্ধকারে রাণুর মুখখানা অস্পষ্ট একটা ছায়ার মত মনে হয়।

আপনিই তাহলে শতদলবাবুকে আজ ফুল আর মিষ্টি পাঠিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলুন তো? উৎকণ্ঠা-মিশ্রিত কণ্ঠে রাণু প্রশ্ন করে।

সেই সন্দেশ খেয়ে শতদলবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন!

বলেন কি?

হ্যাঁ, ডক্টর চ্যাটার্জীর ধারণা সেই সন্দেশের মধ্যে মরফিন ছিল।

মরফিন! কী বলছেন যা-তা সুব্রতবাবু!

বললাম তো, ডাক্তারের তাই বিশ্বাস। সন্দেশ আপনি কি নিজে হাতে কিনেছিলেন ?

না।

তবে ?

সন্দেশ হোটেলের বেয়ারাকে দিয়ে কিনিয়ে আনিয়েছিলাম।

আর ফুলগুলো ? অকস্মাৎ কিরীটীর কণ্ঠস্বর, শুনে আমি ও রাণু দুজনেই যুগপৎ পশ্চাতের অন্ধকারে ফিরে তাকালাম।

ইতিমধ্যে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কখন যে কিরীটী পশ্চাতের অন্ধকারে এসে দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দে এবং আমাদের পরস্পরের কথোপকথন শুনেছে, তার বিন্দুমাত্র টের পাইনি। কয়েকটা মুহূর্ত আমরা দুজনেই চুপ করে থাকি। কিরীটী দ্বিতীয়বার আবার প্রশ্ন করে, আর গোলাপ ফুলগুলো ?

ওগুলো শরৎবাবুর মেয়ে মিস কবিতা গুহ পাঠিয়েছিলেন।

মিস গুহ—মানে সে-রাত্রে নিরালায় যার সঙ্গে আলাপ হল ? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ।

কবিতা গুহর সঙ্গে কি শতদলবাবুর পূর্ব-পরিচয় ছিল ?

কবিতা আমার ক্লাস-ফ্রেন্ড। শতদলের সঙ্গে কবিতার আমাদের বাড়িতেই আলাপ হয়।

হুঁ।

পরের দিন প্রত্যুষে আমি ও কিরীটী রাণুকে সঙ্গে নিকে কবিতা গুহর বাসায় গেলাম।

কবিতা ভিতরে ছিল। রাণুকে পাঠানো হল তাকে ডেকে আনবার জন্য। কিরীটী অবশ্য রাণুকে নিষেধ করে দিয়েছিল, পূর্বাহ্নে কবিতাকে কোন কথা না বলতে।

একটু পরেই রাণুর সঙ্গে কবিতা বাইরের ঘরে এল। শরৎ উকিল ঐ সময় বাসায় না থাকায় আমাদের কথাবার্তা বলবার বিশেষ সুবিধাই হল।

দু-চারটে মামুলী কথাবার্তার পর কিরীটী ফুলের প্রসঙ্গে এল।

আপনি কাল শতদলবাবুকে নার্সিং হোমে গোলাপফুল পাঠিয়েছিলেন কবিতা দেবী ?

হ্যাঁ। হাসপাতাল থেকে শতদলবাবুর কাছ হতে কাল সকালে একজন লোক এসে বললে, শতদলবাবু কিছু ফুল পাঠাতে বলেছেন—আমাদের বাগানের গোলাপ। এ-ও সে বলেছিল, ফুলগুলো যেন আমি রাণুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিই। তাই—

আশ্চর্য ! লোকটা কী রকম দেখতে বল তো কবিতা ? কথাটা বললে রাণু।

এখানকার স্থানীয় লোক বলেই মনে হয়। বোধ হয় নার্সিং হোমেই কাজ করে। কবিতা জবাব দেয়, কালো ঢ্যাঙা লম্বা মত। একটু খুঁড়িয়ে চলে।

Exactly ! সেই লোকটা কাল সকালে আমার সঙ্গে হোটেলে দেখা করে বলে, শতদলবাবু কিছু কড়াপাকের সন্দেশ তাঁকে পাঠাতে বলেছেন। কথাগুলো বললে রাণু।

এবারে কথা বললে কিরীটী, রাণু ও কবিতা দুজনকেই সম্বোধন করে, তাহলে আপনারা দুজনেই সেই লোকটির মুখে সংবাদ পেয়েই ফুল আর মিষ্টি নার্সিং হোমে পাঠিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। দুজনেই একসঙ্গে জবাব দেয়।

বলাই বাহুল্য, অতঃপর শরৎ উকিলের বাসা থেকে সোজা আমরা রাণুকে নিয়েই নার্সিং হোমে গেলাম। এবং ডাক্তার চ্যাটার্জীকে সব বলে কিরীটী ডাক্তারের কাছে জানতে চাইলে, কবিতা ও রাণু বর্ণিত ঐ ধরনের বা চেহারার কোন লোক নার্সিং হোমে আছে কিনা!

ডাক্তার শুনে তো বিস্মিত, কই, ও-ধরনের চেহারার কোন লোকই তো আমার এখানে কাজ করে না! চারজন সুইপার, দুজন দারোয়ান ও দুজন কুক। তাদের ডাকা হল, কিন্তু রাণু বললে, ওদের মধ্যে কেউ নয়।

কিরীটী আর আমি তখন শতদলের সঙ্গে দেখা করলাম।

তাকে প্রশ্ন করায় সে বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। বললে, সে কি! সন্দেশ কড়াপাকের আমি খেতে ভালবাসি সত্য এবং লাল গোলাপও আমার খুব প্রিয়, কিন্তু মনের অবস্থা কদিন ধরে আমার এমন চলছে যে, ওসব তুচ্ছ কথা ভাববারই অবকাশ পাইনি!

নার্সিং হোম হতে বিদায় নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। সত্যি কথা বলতে গেলে, মনের মধ্যে কিছুটা হতাশা ও ঘনীভূত একটা বিস্ময় নিয়েই।

হোটেলে আমাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য যে আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছে তা বুঝতে পারিনি। হোটেলের বারান্দায় উঠতেই দেখি, থানার দারোগা রসময় ঘোষাল আমাদের জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে বসে আছেন। আমাদের দেখেই রসময় বললেন, এই যে কিরীটীবাবু, কোথায় ছিলেন? কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি!

ব্যাপার কী? কিরীটী প্রশ্ন করে।

কাল রাত্রে যে 'নিরালা'য় চোর এসেছিল!

'নিরালা'য় চোর এসেছিল?

হ্যাঁ, স্টুডিও-ঘরের তালা ভেঙে চোর ঢুকেছিল—

কিরীটী কথাটা শুনে যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে ওঠে, কী বললেন, স্টুডিও-ঘরে চোর ঢুকেছিল?

হ্যাঁ।

কিছু চুরি গিয়েছে জানেন?

তা তো বলতে পারি না, তবে অবিনাশের হাত দিয়ে হরবিলাস ঘোষ চিঠি পাঠিয়েছেন। এই সেই চিঠি।

রসময় ঘোষাল একটা চিঠি কিরীটীর দিকে এগিয়ে দিলেন।

॥ ১৪ ॥

কিরীটী হাত বাড়িয়ে থানা-অফিসার রসময় ঘোষালের প্রসারিত হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরল।

আমিও কৌতূহল দমন করতে না পেরে পশ্চাৎ দিক হতে ঝুঁকে কিরীটীর হস্তধৃত খোলা চিঠিটায় দৃষ্টিপাত করলাম।

সংক্ষিপ্ত চিঠি। হরবিলাস ঘোষ লিখেছেন থানা-অফিসার রসময় ঘোষালকে সম্বোধন করে।

থানা ইনচার্জ শ্রীরসময় ঘোষাল সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন, দারোগাবাবু, আপনাকে জানানো কর্তব্য বলিয়া জানাইতেছি—গতকাল রাত্রে 'নিরালা'য় চোর আসিয়াছিল এবং চোর কিছু চুরি করিয়া গিয়াছে কিনা বলিতে পারি না ; তবে দ্বিতলের স্টুডিও-ঘরের ও শতদলের ঘরের তালা দুটি ভগ্ন অবস্থায় দরজার কড়ার সঙ্গে ঝুলিতেছে দেখিতে পাই এবং উভয় ঘরের দরজাই খোলা ছিল। শতদলের ঘর হইতে কোন মূল্যবান কিছু চুরি গিয়াছে কিনা বলিতে পারি না। কারণ ইতিপূর্বে তার ঘরে আমি প্রবেশ করি নাই এবং সে-ঘরে তাহার মূল্যবান কিছু ছিল কিনা বলিতে পারি না। যাহা হউক, এ ব্যাপারে কোন কিছু করণীয় থাকিলে করিতে পারেন। আর একটা কথা—এই সপ্তাহের শেষেই আমি ও আমার স্ত্রী এখান হইতে চলিয়া যাইতে চাই। নমস্কার।

ইতি ঃ হরবিলাস ঘোষ

কিরীটী চিঠিটা একবার মাত্র পড়ে রসময় ঘোষালের হাতে প্রত্যর্পণ করল।

চিঠিটা হাতে নিয়ে রসময় কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, যাবেন নাকি একবার 'নিরালা'য়?

হ্যাঁ, যেতে হবে বৈকি। চলুন, এখুনি না হয় একবার ঘুরে আসা যাক!

এখুনি যাবেন?

হ্যাঁ—না, আর একটু দেরি করাই ভাল।

রাণুও এতক্ষণ আমাদের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে এবারে মন্থর পায়ে উপরের সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

আমরা তো প্রস্তুত হয়েই ছিলাম সকলে 'নিরালা'য় যাবার জন্য। রাস্তায় নেমে সমুদ্রকিনারের পথ ধরে পাহাড়ের দিকে চলতে শুরু করলাম। রসময় ঘোষালের সঙ্গে যে লাল পাগড়ি এসেছিল সেও আমাদের অনুসরণ করে। শীতের রোদ আরামদায়ক হলেও এখনো বেশ কনকনে। কষ্টকর মনে হয়। বেলা প্রায় পৌনে এগারোটা হবে।

এখনো সমুদ্রে স্নানার্থীদের ভিড় কমেনি। বহু পুরুষ-নারী বালক-বালিকা যুবক-যুবতী হৈ-চৈ করে সমুদ্রের জলে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করছে। তাদের উল্লাস কানে আসে। নিঃশব্দে কিরীটী ও রসময় ঘোষাল পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। ওদের পশ্চাতে আমি। 'নিরালা'য় স্টুডিও-ঘরে বা শতদলের ঘরে এমন কী ছিল যার জন্য কাল রাত্রে চোরের আবির্ভাব হল! শতদলের ঘরে তবু কিছু থাকতে পারে, কিন্তু স্টুডিও-ঘরে কেবল কতকগুলো ছবি আর স্ট্যাচু! খেয়ালী ধনী আর্টিস্টের বাড়ি—স্টুডিও-ঘরের মধ্যে কোন গুপ্ত কক্ষ বা আলমারি বা চোরা জায়গা ছিল না তো? ছিল না তো তার মধ্যে এমন কোন মূল্যবান বস্তু, যার জন্য চোরের উপদ্রব হয়েছিল গতরাত্রে? ইতিপূর্বেও রাত্রে 'নিরালা'য় যার আবির্ভাব ঘটেছিল একবার, সে শতদলের প্রাণহরণের চেষ্টা করেছিল এবং দ্বিতীয়বারের উদ্দেশ্যটা ঠিক পরিস্ফুট না হলেও সীতার কুকুরটাকে জখম করে গিয়েছিল!

হঠাৎ আবার সীতার কথা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।

সীতা!

মনে হয় সে বুঝি মরেনি। নিষ্ঠুরভাবে অদৃশ্য আততায়ীর হাতে পিস্তলের বুলেটে নিহত হয়নি। সে যেন এখনো মনে হয় 'নিরালা'তেই আছে। এই যাচ্ছি—গেলেই দেখা হবে! শ্যামাঙ্গী অপরাজিতার মত ঢলঢলে মেয়েটি। স্মৃতির পাতাগুলো যেন জ্বলজ্বল করছে।

মরে গিয়েছে—চোখের সামনে তার রক্তাক্ত মৃতদেহটা অসাড় অসহায় অবস্থায় ঘরের মেঝের ওপরে কার্পেটে আমরা সকলেই পড়ে থাকতে দেখেছি। মৃতদেহের অবস্থায়—ভিতর থেকে রিভলভারের বুলেটও পাওয়া গিয়েছে, তবু মনে হচ্ছে মরেনি সে, এখনো বেঁচে আছে!

কেন এমন হয়?

কিন্তু কে অমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলে মেয়েটিকে, আর কী উদ্দেশ্যেই বা হত্যা করলে? সীতার কুকুর টাইগার যে-রাত্রে জখম হয়, সে-রাত্রেও আততায়ী সীতাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল। আচমকা কুকুরটা সামনে পড়ায় শেষ পর্যন্ত তাকেই জখম করে পালিয়ে যায়। হঠাৎ রসময়ের কথা কানে এল, রসময় কিরীটীকে প্রশ্ন করছেন, সক্কালবেলাতেই কোথায় গিয়েছিলেন মিঃ রায়?

শরৎবাবু উকিলের বাসায় তাঁর মেয়ে কবিতা গুহর সঙ্গে দেখা করতে।

হঠাৎ?

নার্সিং হোমে ফুল-সন্দেশ তারই পরামর্শমত শতদলবাবুকে রাণু দেবী পাঠিয়েছিলেন!

তার মানে? বিস্মিত রসময় কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

তার মানে ঐটাই সব ও শেষ নয়। ওটা তো প্রদীপের আলো। আলো জ্বালাবার ইতিহাস আরো পশ্চাতে। সে আর এক ভগ্নদূত-সংবাদ! কিরীটী মৃদু হাস্যসহকারে জবাব দেয়।

ভগ্নদূত-সংবাদটি আবার কী!

কে এক খোঁড়া দূত শতদলবাবুর পরিচিত কবিতা দেবীকে এসে জানায়, শতদলবাবু নাকি অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন তাঁকে যেন কিছু লাল গোলাপ নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যে কারণেই হোক, কবিতা দেবী নিজে ফুলটা না পাঠিয়ে ফুলগুলো রাণু দেবীকে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ জানায়। রাণু দেবী সেই ফুলই শুধু নয়—ঐ সঙ্গে মিষ্টি যোগ করে দেন, অর্থাৎ কিছু কড়াপাকের সন্দেশ দিয়ে আসেন।

ঐ হোটেলের বেয়ারাদের মধ্যেই তাহলে কেউ একজন সন্দেশ কিনে এনে দিয়েছিল?

হ্যাঁ। কিন্তু ঘোষাল সাহেব, জল সেখানেও গভীর। অনুসন্ধানে জেনেছি রামকানাই নামে এক বেয়ারাই সন্দেশ কিনে এনে দিয়েছিল এবং রাণু দেবী স্বয়ং সন্দেশ ও ফুল নার্সিং হোমে পেঁৗছে দিয়ে আসেন।

রাণু দেবীকে আপনি ঐ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেননি?

সুব্রতই গতরাত্রে করেছিল। দু-একটা আমিও করেছি, কিন্তু যে মৎস্যটি গভীর জলে থেকে ল্যাজের ঝাপটা মেরেছেন, সে তো রাণু দেবী নন! রাণু দেবীর বুদ্ধি ও চিন্তারও অগোচরে। কিন্তু তিনি যত গভীরেই থাকুন, তাঁর ল্যাজের আঁশ আমার চোখে পড়েছে।

বলেন কী! কাউকে সন্দেহ—

হ্যাঁ, অন্ধকারে আলো দেখতে পাওয়া গিয়েছে ঘোষাল সাহেব। কিন্তু মাত্র একটি জায়গায় সূত্র এসে একটা জট পাকিয়ে রয়েছে। সেই জটটি খুলতে পারলেই সব বোঝা যাবে।

কিরীটীর কথায় বিস্মিত আমিও কম হইনি। কিরীটী তাহলে সমাধানে প্রায় পেঁছে গিয়েছে! 'নিরালা'-রহস্য মীমাংসার চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে!

বলতে বলতে কিরীটী থেমে গিয়েছিল। যতটুকু কিরীটী এইমাত্র বললে, তার চাইতে একটি কথাও বেশী এখন আর সে বলবে না, এও আমার জানা। তাই সে ঐ পর্যন্ত বলে থেমে গেল, কিন্তু কিরীটীর চরিত্রের সঙ্গে রসময় ঘোষালের সম্যক পরিচয় নেই, তাই তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, লোকটি কে?

দু-একদিনের মধ্যেই জানতে পারবেন! গম্ভীর কণ্ঠে কিরীটীর সংক্ষিপ্ত জবাব শোনা গেল।

ইতিমধ্যে আমরা আমাদের গন্তব্য স্থান 'নিরালা'র গেটে পেঁছে গিয়েছিলাম। সেই দিকেই কিরীটী রসময়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, চলুন দেখা যাক 'নিরালা' কী বলে!

দরজা বন্ধ ছিল।

বন্ধ দরজার একপাশে দরজা খোলবার জন্য ভিতরে সাংকেতিক ঘণ্টার সঙ্গে ঝুলন্ত সংযুক্ত দড়িটার প্রান্ত ধরে কিরীটী বার-দুই টান দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে গেল। খোলা দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে হরবিলাস।

আসুন। হরবিলাস আমাদের আহ্বান জানালেন।

হরবিলাস এগিয়ে চললেন, পশ্চাতে রসময় ঘোষাল, আমি ও কিরীটী। সর্বশেষে সঙ্গের সেই কনস্টেবলটি।

সীতার মৃত্যুর প্রায় পাঁচদিন পরে 'নিরালা'য় এসে আমরা প্রবেশ করলাম। হঠাৎ নজরে পড়ল, হরবিলাস যেন ডান পা-টা একটু টেনে টেনে চলেছেন মন্থর ভাবে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় কিরীটীর কণ্ঠস্বর শুনলাম।

ডান পায়ে আপনার কী হল হরবিলাসবাবু?

চলতে চলতেই হরবিলাস জবাব দিলেন, কয়েক দিন আগে বাগানে কাজ করবার সময় পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছিল। সেটাই পেকে গিয়ে—নচেৎ নিজেই আপনাদের কাছে যেতাম।

কাঁটা ফুটেছিল! কিরীটী পাল্‌টা প্রশ্ন করে।

কিরীটীর প্রশ্নের জবাবে হরবিলাস কী জবাব দিতেন জানি না, কিন্তু জবাব দেবার পূর্বেই কথা বললেন রসময় ঘোষাল।

ক'দিন বাড়ি থেকে তাহলে বের হননি বলুন!

না, মেয়েটা বুকটা একেবারে ভেঙে দিয়ে গিয়েছে। অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল হরবিলাসের কণ্ঠস্বর।

কিন্তু আপনি মিথ্যা কথা বলছেন হরবিলাসবাবু! কঠিন কণ্ঠে বললেন এবারে রসময় ঘোষাল কথাগুলো।

মিথ্যা কথা বলছি! প্রশ্নটা যেন পাল্‌টা উচ্চারণ করে ঘুরে দাঁড়ালেন হরবিলাস রসময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।

চোখ দুটো তাঁর অদ্ভুত একটা দীপ্তিতে ঝকঝক করছে কিসের এক প্রত্যাশায়।

আমরাও নির্বাক।

হ্যাঁ, মিথ্যা বলেছেন। বলতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ পরশু সকালে বাজারে একটা ওষুধের দোকানের সামনে আপনাকে আমি দেখেছি। দোকান থেকে আপনি বের হয়ে আসছেন, হাতে আপনার একটা প্যাকেট ছিল।

ক্ষণপূর্বে যে বিস্ময় ও চাপা একটা ক্রোধ হরবিলাসের মুখখানার ওপরে থমথমে হয়ে উঠেছিল, মুহূর্তে যেন সেটা মেঘমুক্ত চাঁদের মত নির্মল হাস্য-দীপ্তিতে ঝলমল করে উঠল। স্মিতকণ্ঠে হরবিলাস এবারে বললেন, ভুল দেখেছেন দারোগা সাহেব! আমি নয়—এই পাঁচদিন বাড়ি থেকে এক পা-ও আমি বের হইনি কোথাও!

স্পষ্ট দিনের আলোয় স্পষ্টই দেখেছি হরবিলাসবাবু! ভুল হতে পারে না।

পারে বৈকি। ভুল তো আমরা কত সময়েই করি। বিশেষ করে দেখার ভুল—দেখবার ভুল!

হরবিলাসের শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়, যেন কোন একটি শিশুকে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে কিছু বোঝাচ্ছেন। কিরীটীর দিকে একবার বক্রদৃষ্টিতে না তাকিয়ে পারলাম না। কিন্তু সে-মুখ যেন পাষাণে কুঁদে তোলা। কোথায়ও এতটুকুও উত্তেজনা বা দীপ্তিমাত্রও নেই। এতটুকু আগ্রহের চিহ্ন পর্যন্তও যেন ওর মুখের ভাবে চোখের দৃষ্টিতে নেই।

দেখবার ভুল! আপনি বলছেন দেখবার ভুল? রসময় ঘোষালের স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে যেন এবারে একটা পুলিসী কাঠিন্য ফুটে ওঠে।

তা ছাড়া আর কী বলি বলুন! চারদিন পায়ের যন্ত্রণায় পায়ের পাতা ফেলতে পারি নি, নিজে বসে হট্ ফোমেণ্টশন দিয়েছি—আজই সবেমাত্র একটু যা হাঁটা-চলা শুরু করেছি। আর আপনি কিনা দেখলেন আমায় বাজারে!

হরবিলাসবাবু, শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার মিথ্যা চেষ্টা করছেন! পনের বছর এই পুলিস লাইনে চাকরি করছি। অত সহজে আমাদের দৃষ্টিভ্রম হয় না। আপনি সাপ নিয়ে খেলা করছিলেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, গতকাল হঠাৎ নার্সিং হোমে শতদলবাবু কড়াপাকের সন্দেশ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন—

মুহূর্তে যেন রসময় ঘোষালের কথাটা শুনে হরবিলাসের কৌতুকোদ্ভাসিত উজ্জ্বল মুখখানা নিষ্প্রভ হয়ে গেল। হরবিলাসের মুখের চেহারার হঠাৎ পরিবর্তন আমার দৃষ্টিতেও এড়ায় না, কিন্তু হরবিলাস ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। মৃদু উৎকণ্ঠামিশ্রিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তাই নাকি? সন্দেশ খেয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল কেন?

কারণ সে সন্দেশের মধ্যে বিষ ছিল!

বিষ! একটা আর্ত শব্দের মতই হরবিলাসের কণ্ঠ হতে কথাটা উচ্চারিত হল।

হ্যাঁ, বিষ। মরফিন।

হরবিলাস স্থির অচঞ্চল দৃষ্টিতে কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন ঘোষালের মুখের দিকে।

রসময় ঘোষালের তীক্ষ্ন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিও হরবিলাসের দুটি চোখের প্রতি অপলক হয়ে আছে। চারজোড়া চোখের দৃষ্টি যেন পরস্পরকে লেহন

করছে।

আপনি কী বলতে চান ঘোষাল সাহেব?

শতদলবাবুকে নার্সিং হোমে লাল গোলাপ ও কড়াপাকের সন্দেশ পাঠাতে হবে, আপনিই কবিতা দেবীকে অনুরোধটা জানিয়ে এসেছিলেন গত পরশু কোন এক সময়, তাই নয় কি?

একেবারে স্পষ্টাস্পষ্টি মুখের ওপরে অভিযোগ। একেবারে সম্মুখ-যুদ্ধে আহ্বান। আবার কয়েক সেকেন্ডের জন্য কঠিন স্তব্ধতা।

ওঃ, আপনি এতক্ষণ ধরে তাহলে এই কথাটাই আমাকে বলতে চাইছিলেন ঘোষাল সাহেব! হরবিলাসের শান্ত-গম্ভীর কণ্ঠস্বরে যেন একটা অস্পষ্ট ব্যঙ্গের হুল উদ্যত হয়ে ওঠে।

রসময় কোন জবাব দেন না। কেবল স্থিরদৃষ্টিতে ঘোষালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

আপনার অনুমান তাহলে আমিই শতদলকে সন্দেশের মধ্যে বিষ দিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলাম? হরবিলাসই দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ। যতক্ষণ না বলছেন কেন আপনি গত পরশু সকালে বাজারে গিয়েছিলেন এবং ওষুধের দোকানে ঢুকেছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে আমি সন্দেহ করব।

কিন্তু শতদলকে মেরে আমার লাভ কী ঘোষাল সাহেব?

মারবার কথা তো এর মধ্যে উঠছে না হরবিলাসবাবু! এতক্ষণে কিরীটী কথা বলে, আপনার ঐ সময়ে সেদিন বাজারে উপস্থিতিটাই ওঁর মনে সন্দেহ আনছে কতকগুলো ব্যাপারে।

কিন্তু সেইটাই তো মিথ্যা!

মিথ্যা নয়। কিরীটীর কণ্ঠস্বরটা যেন বজ্রের মত ধ্বনিত হল, উনি ঠিকই বলেছেন।

তার মানে? মিনমিনে গলায় হরবিলাস কথাটা বললেন।

আপনার ডান হাতের আংটির প্রবাল পাথরটা কই?

প্রবাল পাথর! বিস্ময়ে যেন স্তম্ভিত হরবিলাস।

হ্যাঁ, প্রবালটা! কোথায় সেটা? দেখুন তো হাতের আঙুলের আংটিটা আপনার!

তাই তো! পাথরটা? চোখের সামনে ডান হাতটা তুলে আংটিটার দিকে তাকালেন হরবিলাস।

সত্যি হরবিলাসের হাতের আঙুলের আংটিটার পাথরটা নেই!

লক্ষ্যও করেননি হরবিলাসবাবু যে, আংটির পাথরটা আপনি ইতিমধ্যে হারিয়েছেন! যাক, এই নিন পাথরটা—; বলতে বলতে কিরীটী জামার পকেটে হাত চালিয়ে একটি বড় মটরের দানার মত প্রবাল পাথর বের করে হাতের পাতায় পাথরটা নিয়ে এগিয়ে ধরলে হরবিলাসের সামনে। দেখুন এটাই আপনার অজ্ঞাত হারানো প্রবাল। দেখুন ঠিক আংটিটায় বসে যাবে।

সত্যি হরবিলাসেরই আংটির পাথর সেটা।

সকলেই আমরা বিস্মিত ও নির্বাক। অকস্মাৎ অন্ধকার কক্ষের মধ্যে যেন রৌদ্রালোক এসে পড়েছে। কিরীটী আবার বলে, পাথরটা আজই সকালে শরৎবাবু উকিলের বাসার বৈঠকখানায় কুড়িয়ে পেয়েছি হরবিলাসবাবু। একটু আগে

রসময়বাবু যখন আপনাকে গত পরশু সকালে বাজারে দেখেছেন বলে জেরা করছিলেন, হঠাৎ আপনার হাতের আঙুলের আংটিটার প্রতি আমার নজর পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হয়, এই পাথরটাই ইতিপূর্বে আপনার আঙুলের আংটিতে বসানো আমি দেখেছি। একেবারে সাধারণ যোগ—দুয়ে দুয়ে চার। এখন আর নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না হরবিলাসবাবু যে আপনি এতক্ষণ যা বলছিলেন তা সত্য নয়!

হরবিলাস একেবারে নির্বাক। স্তব্ধ নিশ্চল। প্রাণহীন পাষাণমূর্তির মত দাঁড়িয়ে।

এবারে বলতে বাধা নেই নিশ্চয়ই হরবিলাসবাবু, কেন গত পরশু সকালে আপনি বাজারে গিয়েছিলেন আর কেনই বা কবিতা দেবীর বাড়িতে গিয়ে শতদলকে ফুল ও সন্দেশ পাঠাবার জন্য বলে এসেছিলেন! ঝাঁজিয়ে উঠলেন ব্যঙ্গে রসময় ঘোষাল।

কিন্তু নির্বাক হরবিলাস। টুঁ শব্দটি বের হয় না মুখ দিয়ে।

কী, চুপ করে কেন? জবাব দিন?

আমার কিছুই বলবার নেই দারোগা সাহেব। আপনার যা খুশি করতে পারেন।

আমার প্রশ্নের আপনি জবাব দেবেন না?

না।

বেশ, তাহলে শতদলবাবুকে সন্দেশের মধ্যে বিষ মিশিয়ে হত্যা করবার প্রচেষ্টার জন্য আপনাকে আমি আরেস্ট করতে বাধ্য হচ্ছি। কানু সিং!

বেশ, আপনার যেমন অভিরুচি। বললেন শান্তভাবে হরবিলাস।

কানু সিং এগিয়ে এল জুতোর মচমচ শব্দ তুলে।

বাবুকে থানায় নিয়ে গিয়ে হাজতঘরে রাখ। রসময় বললেন।

দাঁড়ান!

নারীকণ্ঠ শুনে সকলেই আমরা একসঙ্গে ফিরে তাকালাম।

ইতিমধ্যে কখন একসময় নিঃশব্দে আমাদের পশ্চাতে হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর ইনভ্যালিড চেয়ার চালিয়ে নিয়ে এসেছেন তা টেরও পাইনি।

আমার স্বামীকে আরেস্ট করবার আগে আমার কিছু বক্তব্য আছে কিরীটী-বাবু! হিরণ্ময়ী দেবী শান্তকণ্ঠে বললেন।

॥ ১৫ ॥

হিরণ্ময়ী দেবীর কণ্ঠস্বরটা যেন মুহূর্তে একটা মোচড় দিয়ে আমাদের সকলের মনই তাঁর দিকে আকর্ষণ করল। তাঁর দু চোখের ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি কিরীটীর দু চোখের ওপরে নিবদ্ধ। সমস্ত মুখে একটা গভীর উত্তেজনা যেন থমথম করছে। দু'হাতের মুষ্টি যেন উপবিষ্ট ইনভ্যালিড চেয়ারটার হাতল দুটোর ওপরে লৌহ-কঠিন ভাবে চেপে বসে আছে।

কয়েকটা মুহূর্ত কারো কণ্ঠ হতে কোন শব্দ বের হল না। হরবিলাসকে কেন্দ্র করে ক্ষণপূর্বে যে সংকটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, হিরণ্ময়ী দেবীর আকস্মিক আবির্ভাব ও নাটকীয় উক্তি সেটাকে যেন আরো রহস্যঘন করে তুলল। একমাত্র কিরীটী ছাড়া আমরা উপস্থিত সেখানে সকলেই হিরণ্ময়ী

দেবীর মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল কিরীটী। পকেট হতে সোনার সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট দুই ওষ্ঠের বন্ধনীতে চেপে ধরে অগ্নিসংযোগ করবার জন্য ফস করে একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল। এবং প্রজ্বলিত কাঠিটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে ফেলে দিতে দিতে শান্ত কণ্ঠে বললে, আপনার কিছু বলবার থাকলে নিশ্চয় আমরা শুনব হিরণ্ময়ী দেবী। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো শোনা যাবে না। চলুন আপনার ঘরে চলুন!

আমরা সকলে অতঃপর কিরীটীর আহ্বানেই যেন কতকটা হিরণ্ময়ী দেবীর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

সেই ঘর। ঠিক তেমনি ভাবে ঘরের সমস্ত জানালাগুলো বন্ধ। ঘরের দেওয়ালে সেই পাশাপাশি দুটি নারীর অয়েল-পেন্টিং, দেখলে মনে হয় যেন একই জনের দুটি প্রতিকৃতি। যে ফটো দুটি সম্পর্কে কয়েকদিন পূর্বে কিরীটী হিরণ্ময়ী দেবীকে প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন, কার ছবি তিনি জানেন না। এ কথাও মনে পড়ল, তার উত্তরে কিরীটী পুনরায় প্রশ্ন করেছিল ওঁকে, শতদলবাবুর মা হিরণ্ময়ী দেবীর ভাইঝি কিনা? জবাবে হিরণ্ময়ী দেবী বলেছিলেন, হ্যাঁ।

বলুন হিরণ্ময়ী দেবী, আপনার কী বলবার আছে? কিরীটীই বলে হিরণ্ময়ী দেবীকে।

আপনার অনুমান ভুল। আমার স্বামী শতদলকে হত্যা করবার কোন চেষ্টাই করে নি।

কিন্তু আপনার স্বামী যে গত পরশু সকালে বাজারে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে কবিতা দেবীর বাড়িতে গিয়েছিলেন এ কথাও ঠিক, জবাবে বলে কিরীটী।

গত পরশু উনি বাজারে গিয়েছিলেন সত্যি, তবে—

হঠাৎ এমন সময় বাধা দিলেন হরবিলাস। এতক্ষণ তিনি চুপ করেই ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, না হিরণ, চুপ কর। কোন কথাই তোমায় বলতে হবে না। মিঃ ঘোষাল, আপনি আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন চলুন, আমি প্রস্তুত!

তুমি থাম, আমাকে বলতে দাও। কতকটা যেন ধমকের সুরেই হিরণ্ময়ী তাঁর স্বামীকে থামিয়ে দিলেন।

কিন্তু আজ হরবিলাস যেন স্ত্রীর কর্তৃত্বে বাধা মানলেন না। জোর গলায় বলে উঠলেন, কেন—কেন মিথ্যে একটা কেলেঙ্কারি করছ হিরণ! যে গেছে সে তো ফিরবে না! চলুন না মিঃ ঘোষাল, কেন দেরি করছেন? চলুন না, কোথায় নিয়ে যাবেন আমায়!

না, না—আমাকে বলতে দাও। পাষাণের মত গুরুভার হয়ে আমার বুকের মধ্যে চেপে বসেছে। এ আর আমি সহ্য করতে পারছি না—আর আমি সহ্য করতে পারছি না—, উত্তেজনার আবেগে হিরণ্ময়ী দেবীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

হিরণ—হিরণ, চুপ করো—ভুলে যাও। ভুলে যাও ওসব কথা। মিনতিতে করুণ হয়ে ওঠে হরবিলাসের কণ্ঠস্বর।

শুনুন মিঃ রায়, সীতাকে আমি—হ্যাঁ, মা হয়ে আমিই তাকে হত্যা

করেছি।

হিরণ—হিরণ! চিৎকার করে ওঠে হরবিলাস, কী বলছ তুমি পাগলের মত?

হিরণ্ময়ী দেবীর কথায় ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল। স্তম্ভিত বিস্ময়ে আমরা সকলেই নির্বাক।

হ্যাঁ, আমি। আমিই সীতাকে হত্যা করেছি। আর যে আক্রোশের বশে সীতাকে আমি হত্যা করেছি, সেই আক্রোশের বশেই শতদলকেও আমি হত্যা করতে চেয়েছিলাম। আমার স্বামী সম্পূর্ণ নির্দোষ। এ ব্যাপারে তাঁর কোন হাত নেই। অ্যারেস্ট যদি করতে হয় কাউকে, আমাকেই করুন। আমিই দোষী। সমস্ত দোষ আমারই। কান্নায় গলার স্বর বুজে এল হিরণ্ময়ী দেবীর।

না, না—মিঃ রায়, হিরণ নির্দোষ। দোষী আমিই। সীতাকে আমিই হত্যা করেছি। বাধা দিলেন হরবিলাস।

থাম তো তুমি, আমাকে বলতে দাও! চিরাচরিত হিরণ্ময়ী যেন আবার জেগে উঠলেন। সেই আধিপত্যলোভী নারী। নিজস্ব স্বকীয়তায়, নিজস্ব অহমিকায়। স্ত্রীর তর্জনে হরবিলাস একেবারে ঝিমিয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত আগেকার তাঁর কষ্টার্জিত পৌরুষ যেন একটিমাত্র তর্জনে ভেঙে চুপসে গেল। তবু শেষবারের মত বুঝি স্ত্রীকে নিরস্ত করবার চেষ্টায় ক্ষীণ মিনতি-ভরা কণ্ঠে বললেন, যা চুকে-বুকে গিয়েছে, সেই অতীতকে দিনের আলোয় টেনে এনে কী লাভ আর হিরণ!

না, আমাদের যদি শাস্তি পেতেই হয়, সব কথাই বলে যাব। কারণ আমি জানি, এখানে এমন একজন আছেন যাঁর দৃষ্টির সামনে সত্যকে একটা আবরণ দিয়ে কেউ ঢেকে রাখতে পারবে না, বলতে বলতে হিরণ্ময়ী দেবী বারেকের জন্য কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

আর কেউ ঘরের মধ্যে উপস্থিত হিরণ্ময়ী দেবীর শেষের কথাগুলোর তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করতে না পারলেও আমি পারলাম।

কিরীটীবাবু, সব কথাই আমি বলব। কিন্তু বলবার আগে একমাত্র আপনি ও ইচ্ছা করলে সুব্রতবাবু ব্যতীত আর সকলকে, এমন কি আমার স্বামীকেও অনুগ্রহ করে এ ঘর থেকে যেতে বলুন।

হিরণ্ময়ী দেবীর অনুরোধ কিরীটী চোখের ইঙ্গিতে বাকি সকলকে ঘর ছেড়ে যেতে বলল। এবং সকলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

ঘরের মধ্যে রইলাম আমি, কিরীটী ও হিরণ্ময়ী দেবী।

ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা বিরাজ করছে, আর সেই স্তব্ধতার বুক চিরে অদূরে টেবিলের ওপর রক্ষিত টাইমপিসটা কেবল একটানা টিক-টিক শব্দ করে চলেছে।

হিরণ্ময়ী দেবীর অনুরোধে সকলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেও কিন্তু কয়েকটা মুহূর্ত হিরণ্ময়ী কোন কথাই বলতে পারলেন না। মাথাটা বুকের কাছে ঝুঁকে পড়েছে। স্তব্ধ অনড় পাষাণ-প্রতিমার মত বসে আছেন হিরণ্ময়ী দেবী ইনভ্যালিড চেয়ারটার ওপরে।

সামনেই দুটি চেয়ারে আমি আর কিরীটী বসে।

হিরণ্ময়ী একসময় মুখ তুলে কারো দিকে না তাকিয়েই বলতে শুরু

করলেন। এবং বলবার সঙ্গে সঙ্গে কোলের উপর থেকে এতক্ষণ পরে উলের বুননটা তুলে নিয়ে দুই হাতে বুনে চললেন।

শিল্পী রণধীর চৌধুরী তাঁর পিতা লক্ষপতি শশাঙ্কশেখর চৌধুরীর একমাত্র পুত্রসন্তান ছিলেন। পূর্ববঙ্গে শুধু জমি-জমাই নয়, ব্যাঙ্কেও মজুত ছিল শশাঙ্ক চৌধুরীর লক্ষাধিক টাকা, তিন-চার পুরুষ ধরে অর্জিত বিত্ত। শশাঙ্ক ছিলেন যেমনি হিসাবী তেমনি অর্থগৃধ্নু। আর তাঁর একমাত্র ছেলে রণধীর হল ঠিক উল্টো। যেমন খেয়ালী তেমনি দিলদরিয়া স্বভাবের। অল্প বয়সেই শশাঙ্ক চৌধুরীর স্ত্রী জগত্তারিণীর মৃত্যু হয়। লৌকিক ভাবে তিনি আর দ্বিতীয়বার বিবাহ না করলেও তাঁর এক বিধবা শালী জ্ঞানদা তাঁর গৃহে ছিল। তাকে তিনি এনেছিলেন অসুস্থ স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষা করতে, কারণ মৃত্যুর আগে বৎসর-চারেক জগত্তারিণী নিদারুণ পক্ষাঘাত রোগে একপ্রকার শয্যাশায়িনী ছিলেন। সেই জ্ঞানদারই গর্ভে জন্ম হল হিরণ্ময়ীর। লোকে হিরণ্ময়ীকে জগত্তারিণীর সন্তান জানলেও আসলে তার জন্ম জ্ঞানদারই গর্ভে। রণধীর আর হিরণ্ময়ী মাত্র তিন বৎসরের ছোট-বড় ছিল এবং রণধীর বহুদিন পর্যন্ত জানতে পারেনি হিরণ্ময়ী তার মায়ের পেটের বোন নয়। জানতে পারে তার পিতার মৃত্যুর পাঁচ মাস আগে। কিন্তু সে-কথা পরে। শশাঙ্ক জীবিত-কালেই হিরণ্ময়ীর খুব অল্প বয়সেই হরবিলাসের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে যান। শশাঙ্কর মৃত্যুর সময় হিরণ্ময়ী কাছে ছিলেন না। তবে তাঁর মৃত্যুর মাস-দুই পূর্বে পিতার লিখিত এক চিঠিতে হিরণ্ময়ী জানতে পেরেছিলেন, শশাঙ্ক তাঁর যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সমান দুই ভাগে রণধীর ও হিরণ্ময়ীকে ভাগ করে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর হিরণ্ময়ী যখন পিতৃগৃহে এলেন এবং কথায় কথায় একদিন পিতার অর্ধেক সম্পত্তির দাবি তুললেন, রণধীর হা-হা করে হেসে উঠলেন।

সম্পত্তি! সম্পত্তি কিসের? কী তুই বলছিস হিরু!

ঠিক বলছি। বাবার সম্পত্তিতে আমাদের দুজনের সমান অধিকারই আছে, কারণ—

কারণটা বলেই ফেল তাহলে শুনি!

কারণ তুমিও যেমন বাবার সন্তান, আমিও তেমনি তাঁর সন্তান।

সন্তান! হ্যাঁ, তা বটে। তবে অবৈধ সন্তান।

দাদা! তীক্ষ্ম চিৎকার করে ওঠেন হিরণ্ময়ী দেবী।

হ্যাঁ। আইন বলে, জারজ সন্তানের পিতৃসম্পত্তির ওপরে কোন অধিকার বা দাবিই থাকতে পারে না।

দাদা!

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। তোমার মা অর্থাৎ আমার বিধবা মাসী—বাবার সঙ্গে তাঁর যা-ই সম্পর্ক থাক্, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মন্ত্র বা আইনসিদ্ধভাবে বাবা তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা বা অধিকার দেননি এবং তিনি এখনো জীবিত। তাঁকে ডেকে শুধালেই সমস্ত কিছু জানতে পারবে।

রাগে, ঘৃণা লজ্জা ও অপমানে হিরণ্ময়ীর সর্বাঙ্গ তখন থরথর করে কাঁপছে। চেঁচামেচি বা ঝগড়া করবারও উপায় নেই। স্বামী হরবিলাস তখন নীচে। হরবিলাস যদি সব কথা শুনতে পায়, তার বিবাহিত-জীবন সেখানেই শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু তার আগে মা—হ্যাঁ, মাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। পাশের ঘরে গেলেন হিরণ্ময়ী। জ্ঞানদা দেবী পাশের ঘরেই ছিলেন। শুভ্র থান-পরিহিতা জ্ঞানদা দাঁড়িয়েছিলেন প্রস্তরমূর্তির মত ঘরের জানালার সামনে। মেয়ে এসে ডাকলে, মাসী! চিরদিন যে ডাকে অভ্যস্ত সেই মাসী ডাকেই ডাকল সে।

জ্ঞানদার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অবশ্য হিরণ্ময়ীর বুঝতে বাকি ছিল না, পাশের ঘর হতে তার ও রণধীরের ক্ষণপূর্বের কথাবার্তা সমস্তই তাঁর কানে এসে'ছ। সব কিছুই তিনি শুনেছেন।

মাসী!

এবারে জ্ঞানদা মেয়ের ডাকে ফিরে দাঁড়ালেন।

দুই চক্ষুর কোণ বেয়ে নিঃশব্দ ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সেই পাষাণের মত স্তব্ধ মূর্তি। সেই নিঃশব্দ অশ্রুধারা মুহূর্তে যেন একটা চরম হাহাকারে হিরণ্ময়ীর বুকের মধ্যে এসে আছড়ে পড়ল।

হ্যাঁ হিরণ, সব—সব সত্যি। তুই এই অভাগিনীরই কলঙ্কের ফুল। বলতে বলতে জ্ঞানদা দুই হাতে বোধ করি নিজের দুঃসহ লজ্জাটাকে ঢাকবার জন্যই মুখ ঢাকলেন।

হিরণ্ময়ী নির্বাক।

জ্ঞানদা এগিয়ে আসছিলেন দুই হাতে মেয়েকে বুকে নেবার জন্য, কিন্তু পাগলের মত ক্ষিপ্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন হিরণ্ময়ী, না, না—তুমি আমায় ছুঁয়ো না। তুমি আমার কেউ নও। আমি তোমার কেউ নই।...কলঙ্কিনি! রাক্ষুসী! বলতে বলতে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে হুড়মুড় করে পা পিছলে গড়াতে গড়াতে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল হিরণ্ময়ী।

সেই পড়ে গিয়ে পিঠের শিরদাঁড়ায় প্রচণ্ড আঘাত লাগল। তিন মাস শয্যায় পড়ে রইলাম। সুস্থ হলাম, কিন্তু—

কিন্তু জন্মের মত আপনার শিরদাঁড়ার হাড় নষ্ট হয়ে গিয়ে একটা কুঁজের মত হয়ে গেল! কথাটা বললে কিরীটী।

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি জান'লন কী করে?

কারণ প্রথম দিন আপনার দুই পা ও কোমরের গঠন থেকেই বুঝেছিলাম, আপনি যে বলেছিলেন paralysis-এ আপনি ভুগছেন সেটা সত্যি নয়। কোমরে বা পায়ে আপনার কোন রোগ নেই। ইনভ্যালিড চেয়ারের আপনি ভেক নিয়েছেন অন্য কোন কারণে। এবং দ্বিতীয় দিনেই আমার দৃষ্টিতে আপনার পিঠের কুঁজটা ধরা পড়ে গিয়েছিল এবং বুঝেছিলাম ঐ কারণেই নিজের বিকল দেহটাকে ঢেকে রাখবার জন্য আপনি সর্বদা ইনভ্যালিড চেয়ারে বসে থাকেন।

ঠিক তাই। দীর্ঘদিন ধরে ইনভ্যালিড চেয়ার ব্যবহার করে করে এখন এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু যা বলছিলাম—

হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর অসমাপ্ত কাহিনী আবার শুরু করলেনঃ

হিরণ্ময়ী কিন্তু তবু পিতৃসম্পত্তির লোভ দমন করতে পারলেন না। রণধীরের কাছে বাপের লেখা চিঠিটার কথা উল্লেখ করলেন।

বাবার চিঠির দ্বারাই আমি প্রমাণ করব বাবার সম্পত্তির অর্ধেক আমার!

তা করতে পার, তবে ঐ সময় এ কথাও আমি কোর্টে প্রকাশ করব—তোমার সত্যকার পরিচয়। তার চাইতে আমি যা বলি তাই করো।

কি?

বিশ হাজার টাকা তোমাকে আমি নগদ দেব। আর আমার উইলে provision রেখে যাব, তোমার ও আমার সন্তান আমার সম্পত্তি সমান ভাগে পাবে।

কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস কি! যদি তুমি তোমার কথা না রাখ?

লিখে দিচ্ছি—

বেশ, তাহলে রাজী আছি।

কিন্তু চিঠির মধ্যে এই শর্তও থাকবে, কোনক্রমে ঐ চিঠি যদি আমার মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশ পায় তো ঐ condition নাকচ হয়ে যাবে। রাজী আছ তাতে?

রাজী।

সেই ভাবেই রণধীর একখানা চিঠি লিখে দিলেন।

নগদ কুড়ি হাজার টাকা ও চিঠি নিয়ে হিরণ্ময়ী ফিরে গেলেন স্বামীকে নিয়ে কলকাতায়। একেবারে রিক্তহস্তে ফিরে যাওয়ার চাইতে তবু কিছু পাওয়া গেল।

তার পর দীর্ঘ ষোল বৎসর দুজনে আর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। তবে হিরণ্ময়ী শুনেছিলেন, রণধীর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর দুই যমজ কন্যা বনলতা ও সোমলতাকে নিয়ে 'নিরালা'য় এসে বসবাস করছেন।

কিরীটী আবার এইখানে বাধা দিল, ঐ ছবি দুটি তাহলে তাদেরই?

হ্যাঁ, বনলতা আর সোমলতা দুই বোন। দাদারই হাতে আঁকা ছবি।

তবে যে আপনি সেদিনকার আমার প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, বনলতা আর সোমলতা একে অন্য হতে চার-পাঁচ বছরের ছোট-বড়? মিথ্যা বলেছিলেন বলুন?

হ্যাঁ।

॥ ১৬ ॥

আমি তাকিয়ে ছিলাম দেওয়ালে টাঙানো পাশাপাশি অয়েল-পেন্‌টিং দুটোর দিকে।

সোমলতা আর বনলতা শিল্পী রণধীর চৌধুরীর দুই মেয়ে। টুইন—যমজ বোন। এবং ওদেরই একজনের ছেলে শতদল। কিন্তু শতদল কার ছেলে—বনলতার না সোমলতার! শশাঙ্ক চৌধুরীর ছেলে রণধীর চৌধুরী আর হিরণ্ময়ী দেবী।

হিরণ্ময়ী দেবীর মুখের দিকে তাকালাম। মনে হচ্ছে আরো যেন তাঁর কিছু বলার আছে, কিন্তু তিনি যেন বলতে পারছেন না। চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে কিরীটীর দিকে তাকালাম। গভীর কোন চিন্তার মধ্যে ও ডুবে আছে। হস্তধৃত জ্বলন্ত সিগারেটটা নিঃশব্দে পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই। কোন একটা বিশেষ চিন্তাই তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু সেটা কী? হিরণ্ময়ী দেবী বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে কী এমন সে পেল চিন্তার খোরাক? শতদল-রহস্য-কাহিনীর কোন সূত্র কি সে খুঁজে পেল? একটু

আগে রাস্তায় আসতে আসতে কিরীটী বলেছিল, অন্ধকারে সে আলো দেখতে পেয়েছে। মাত্র একটি জায়গায় সূত্র এসে জট পাকিয়ে রয়েছে। সেই জটটি খুলতে পারলেই সব বোঝা যাবে। হিরণ্ময়ী দেবী বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে কি সেই সূত্রটিই ও খুঁজে পেল? আমি তো কই কিছুই এখনো ভেবে পাচ্ছি না! কেন শতদলবাবুর প্রাণের ওপরে এমনি বার বার প্রচেষ্টা হল? আর কেই বা তাঁকে বার বার হত্যা করবার চেষ্টা করছে?

আচমকা কিরীটীর কণ্ঠস্বরে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

এইটুকুই কি আপনার বলবার ছিল হিরণ্ময়ী দেবী? আর কি কিছুই আপনার বলবার নেই? কিরীটীর দুচক্ষুর শাণিত দৃষ্টি সম্মুখে উপবিষ্ট হিরণ্ময়ী দেবীর মুখের ওপরে স্থিরনিবদ্ধ।

অ্যাঁ! হিরণ্ময়ী যেন চমকে উঠলেন।

আপনার কি বলবার আর কিছুই নেই?

না। ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিত হল একটিমাত্র শব্দ।

আপনি তো কই এখনো বললেন না, আপনার স্বামী কবিতা দেবীর বাড়িতে কেন গিয়েছিলেন?

আমি যতদূর জানি আমার স্বামী এ দুদিন মোটে বাড়ি থেকে বেরই হননি।

হ্যাঁ, আপনার জানিত-ভাবে বের হননি এটা বিশ্বাস করি, কিন্তু তিনি যে গিয়েছিলেন এটাও ঠিক। কারণ দৈবক্রমে তাঁর হাতের আংটির পাথরটা সেখানে খসে পড়ে গিয়েই, সেখানে যে তিনি গিয়েছিলেন সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে হিরণ্ময়ী দেবী! এক্ষেত্রে অস্বীকার করেও তো উপায় নেই। দৈবই যে প্রতিকূল!

কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, আমার স্বামীর শতদলকে হত্যা করবার কোন কারণই নেই এবং তিনি তা করবার চেষ্টাও করেননি।

আমি বিশ্বাস করি হিরণ্ময়ী দেবী, হরবিলাসবাবু সে কাজ করেননি কিন্তু তিনি যে শরৎবাবুর বাসায় গিয়েছিলেন, যে কোন কারণেই হোক—সেটা আমার স্থিরবিশ্বাস। এবং অনুমান যদি আমার মিথ্যা না হয় তো হরবিলাসবাবু আপনার জ্ঞাতসারেই সেখানে গিয়েছিলেন!

কিরীটীর স্পষ্টাস্পষ্টি অভিযোগেও হিরণ্ময়ী দেবী নিঃশব্দে বসে রইলেন। কোন সাড়া দিলেন না।

আমার কি বিশ্বাস জানেন হিরণ্ময়ী দেবী! কিরীটী আবার কথা বললে।

হিরণ্ময়ী কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

দুতরুপেই মিঃ ঘোষ কবিতা দেবীর ওখানে গিয়েছিলেন। এবং সে-কথা কবিতা দেবীর কাছ হতে বের করতে আমায় বিশেষ কষ্ট পেতে হবে না। কিন্তু আমি চাই আপনিই সব কথা আমাকে খুলে বলুন।

আমি কিছু জানি না। হিরণ্ময়ী দেবীর সমস্ত মুখখানা যেন পাথরের মত কঠিন মনে হয়।

তাহলে একান্ত দুঃখের সঙ্গেই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, এর পর আপনার স্বামীকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া আর আমাদের দ্বিতীয় পথ থাকবে না!

কিন্তু আপনি নিজের মুখেই তো একটু আগে বললেন যে, আমার স্বামী শতদলকে হত্যা করবার প্রচেষ্টার ব্যাপারে নির্দোষ?

তা বলেছি। তবে তাঁকে ঘিরে যে সন্দেহ জমে উঠেছে, সেটা যতক্ষণ না পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ তাঁকে মুক্তি দেওয়াও তো সম্ভব নয়। আপনিই বলুন না! শুনুন হিরণ্ময়ী দেবী, আমি জানি এ সব কিছুর মূলে কে—

বিদ্যুৎ-চমকের মতই হিরণ্ময়ী কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন, আপনি—আপনি জানেন?

হ্যাঁ, জানি।

তবে—তবে আপনি তাকে ধরিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

ব্যস্ত হবেন না। সময় হলে আপনা হতেই তাকে হাজতে গিয়ে ঢুকতে হবে।

কিন্তু—

আপনার কাছে আমি যা জানতে চাইছি বলুন!

কি বলব?

বলুন কেন সেদিন আমাদের কাছে আপনি মিথ্যা কথা বলেছিলেন যে, স্বর্গত রণধীর চৌধুরীর দ্বিতীয় মেয়েটির কথা আপনি কিছু জানেন না? সোমলতা আর বনলতা—তাদের সমস্ত কথা এখনো আপনি বলেননি!

বনলতা আর সোমলতা দুজনেই মারা গেছে—

শতদলবাবু কার ছেলে?

সোমার।

আর বনলতার স্বামীই বা কে? আর তার সন্তান কটি?

বনলতার স্বামীর নাম ডঃ শ্যামাচরণ সরকার।

হিরণ্ময়ী দেবী কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটীর সমস্ত সত্তা যেন সহসা বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত সজাগ হয়ে ওঠে। উদ্‌গ্রীব ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কী—কী বললেন?

ডঃ শ্যামাচরণ সরকার—বনলতার স্বামী।

কোন্‌ শ্যামাচরণ সরকার? অধ্যাপক ডঃ শ্যামাচরণ সরকার কি?

হ্যাঁ।

কিরীটীর চোখে-মুখে ক্ষণপূর্বে যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল, সেটা যেন আবার নিভে এল। সে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলে, তাহলে—তাহলে হরবিলাসবাবু কবিতা দেবীর ওখানে গিয়েছিলেন কেন?

আপনাকে তো আমি বললাম, আমার স্বামী সেখানে যাননি! এবং কবিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও নেই।

তা হতে পারে না। Simply absurd! একেবারে অসম্ভব। নিশ্চয়ই হরবিলাসবাবু কবিতা দেবীর ওখানে গিয়েছিলেন। এবং তিনি শতদলবাবুকে নার্সিং হোমে ফুল ও মিষ্টি পাঠাতে বলেও এসেছিলেন, এ-ও সত্যি। কিন্তু এইটাই বোঝা যাচ্ছে না, কেন—কেন তিনি ও-কথা কবিতা দেবীকে বলতে গেলেন? তারপর একটু থেমে কতকটা আত্মগত ভাবেই বললে, আর আমার অনুমান যদি মিথ্যা হয় তাহলে—, কিরীটী শেষের কথাগুলো খুব ধীরে যেন উচ্চারণ করল এবং পরক্ষণেই হিরণ্ময়ী দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, আপনার স্বামীর হাতের আংটিটা কত দিন ওঁর হাতে আছে বলতে পারেন?

তা দশ-বারো বছর তো হবেই।

বলতে পারেন আপনার স্বামীর হাতের আংটিটার পাথরটা—যেটা তাঁর আংটিতেই আছে, শেষবারে কবে আপনার নজরে পড়েছিল?

সীতার মৃত্যুর আগের দিনও আংটির পাথরটা ঠিক ছিল—যেন দেখেছি বলেই মনে হয়।

তাহলে আর কি হবে! চল সুব্রত, ওঠা যাক। আমার দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে।

কিরীটীই প্রথমে কক্ষত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয় এবং আমিও উঠে দাঁড়াই।

আমাদের কক্ষত্যাগ করতে উদ্যত দেখে ব্যাকুল কণ্ঠে হিরণ্ময়ী বলে ওঠেন, কিন্তু আমার স্বামী?

কিরীটী ঘুরে দাঁড়িয়ে শান্তকণ্ঠে বললে, আংটির পাথরের ব্যাপারটা যতক্ষণ না মীমাংসিত হচ্ছে, আপনার স্বামীকে হাজতে নজরবন্দী থাকতেই হবে হিরণ্ময়ী দেবী। আমি দুঃখিত।

বিনা দোষে আমার স্বামীকে হাজত-বাস করতেই হবে?

দোষের কথা তো এখানে নয়, সন্দেহক্রমে—

অতঃপর হরবিলাসকে সংগে নিয়েই আমরা 'নিরালা' থেকে বের হয়ে এলাম। পথে বের হয়ে কিরীটীর নির্দেশক্রমে দুজন সেপাইয়ের হেপাজতে হরবিলাসকে থানায় পাঠিয়ে দিয়ে কিরীটী ঘোষাল সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললে, চলুন, আর একবার শরৎ উকিলের বাসাটা ঘুরে যাওয়া যাক!

এখুনি? বেলা অনেক হয়েছে, সন্ধ্যার দিকে গেলে হত না? প্রশ্নটা করলেন থানা-অফিসার রসময় ঘোষাল।

না, শুভস্য শীঘ্রম্। কিরীটীর কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত একটা দৃঢ়তা প্রকাশ পায়।

শহরের পথে চলতে চলতে আমি একটা কথা কিরীটীকে না স্মরণ করিয়ে দিয়ে পারলাম না, 'নিরালা'র উপরের ঘর—যার তালা ভাঙা ছিল, সে ঘর দেখা হল না!

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বললে, ব্যস্ততার কী আছে? দেখলেই হবে!

বেলা তখন প্রায় একটা হবে।

মধ্যাহ্ন-সূর্য মাথার উপরে প্রচণ্ড তাপ বর্ষণ করছে। কিরীটীর দ্রুত পদ-বিক্ষেপ দেখে মনে হচ্ছিল, মনে মনে সে যেন বিশেষ কোন একটা মীমাংসায় উপনীত হতে চলেছে। বারবারই লক্ষ্য করেছি, কিরীটী যখন কোন একটা জটিল ব্যাপারে মীমাংসার কাছাকাছি আসে, তার চালচলন কথাবার্তা এমনি দ্রুত ও ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে। তার অত্যন্ত ধীর-স্থির ভাব যেন সহসা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ঠিক দ্বিপ্রহরে ঐদিন দ্বিতীয়বার আবার আমাদের তাঁর ওখানে আসতে দেখে কবিতা দেবী বেশ যেন কিছুটা বিস্মিতই হন।

শরৎবাবু বাসায় ছিলেন না, একটু আগে আদালতে বের হয়ে গিয়েছেন।

কবিতা দেবী আমাদের বসতে বললেন।

আবার আপনাকে বিরক্ত করতে আসতে হল কবিতা দেবী! কিরীটীই কথা শুরু করে।

না, না—এর মধ্যে বিরক্তির আর কী আছে!

ঘোষাল সাহেব হরবিলাসবাবুকে শতদলবাবুর হত্যা-প্রচেষ্টার ব্যাপারে

অ্যারেস্ট করেছেন কিছুক্ষণ আগে—

সে কি! হরবিলাসবাবু—

হ্যাঁ, তবে তাঁর মুক্তির ব্যাপারটা নির্ভর করছে আপনার evidence-এর ওপরে।

আমার evidence-এর ওপরে?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না মিঃ রায়!

হরবিলাসবাবু বলতে চান যে, তিনি আপনার কাছে গত পরশু এসে শতদলবাবুকে ফুল ও সন্দেশ পাঠাতে বলেননি, অথচ ঘোষাল সাহেবের ধারণা তিনিই এসেছিলেন! কিরীটী জবাব দিল।

কিন্তু আমি তো বলিনি যে হরবিলাসবাবু এসেছেন! একটা ঢোক গিলে কবিতা জবাব দেন।

তিনি যদি না-ই এসে থাকবেন, তাহলে তাঁর হাতের আংটির পাথরটা আজ সকালে আপনার এই ঘরে কুড়িয়ে পাওয়া গেল কি করে? কথাটা বললেন ঘোষাল।

আংটির পাথর কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছে এই ঘরে?

হ্যাঁ।

কে পেয়েছেন?

মিঃ রায়।

সত্যি! কথাটা বলে কবিতা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ।

কই দেখি সে পাথরটা?

কিরীটী একান্ত নির্বিকার ভাবেই যেন জামার পকেট হতে হাত ঢুকিয়ে প্রবাল পাথরটা বের করে কবিতার চোখের সামনে ধরল।

আশ্চর্য! এই তো—এটা তো আমার আংটির পাথরটা! কাল কখন আংটি থেকে পড়ে গিয়েছে, খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আপনার আংটির পাথর! কই, আপনার আংটিটা কই?

আংটি হতে পাথরটা পড়ে যাওয়ায় আজ সকালেই বাক্সে তুলে রেখেছি।

দয়া করে আংটিটা আনবেন কি?

নিশ্চয়ই। কিরীটীকে আর দ্বিতীয় প্রশ্নের সময় না দিয়ে কবিতা উঠে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাথরহীন একটা আংটি নিয়ে এল।

এই দেখুন!

কিরীটী আংটিটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে আড়চোখে একবার কবিতার দিকে তাকিয়ে বললে, কিন্তু এ আংটিটা তো আপনার হাতের আঙুলে fit করবার কথা নয় কবিতা দেবী! এটা কার আংটি?

কেন, আমার?

উঁহু। কই পরুন তো!

এবারে কবিতা দেবী যেন একটু বিমূঢ় হয়ে পড়েন। একটু বিহ্বল। হতচকিত।—অবিশ্যি আংটিটা একটু আঙুলে আমার বড়ই হয়—

তাই তো বলছিলাম, সত্যি করে বলুন তো আংটিটা কার?

আমারই।

না, কেউ নিশ্চয়ই আপনাকে আংটিটা দিয়েছেন! তাই নয় কি কবিতা দেবী?

হ্যাঁ। নিম্নকণ্ঠে জবাব দিলেন কবিতা।

কে—কে দিয়েছেন?

ক্ষমা করবেন কিরীটীবাবু, ব্যাপারটা আমার ব্যক্তিগত।

হুঁ।

অতঃপর কিরীটী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে।

পরশু কে আপনাকে এসে বলেছিল, শতদলবাবুকে ফুল ও সন্দেশ পাঠাতে নার্সিং হোমে?

তাকে চিনি না, দেখিনি কখনো।

দেখতে কেমন?

বয়েস পঞ্চাশের নীচে হবে বলে মনে হয় না। মুখে দাড়ি-গোঁফ ছিল। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছিল।

নাম কিছু বলেনি?

না, জিজ্ঞাসা করিনি।

কোথা হতে আসছে তা বলেনি?

হ্যাঁ, বলেছিল নার্সিং হোম থেকেই। সেখানেই নাকি কাজ করে।

আচ্ছা কবিতা দেবী, বিখ্যাত সুইমার কুমারেশ সরকারের নাম শুনেছেন?

কিরীটীর আচমকা বিষয়ান্তরে গিয়ে সম্পূর্ণ ঐ নতুন প্রশ্নে কবিতা প্রথমটা বোধ হয় একটু কেমন বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং ক্ষণকাল কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়েই জবাব দেয়, নাম শুনেছি, কিন্তু সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় নেই।

কিরীটী এরপর আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আচ্ছা তাহলে চলি। নমস্কার।

হোটেলে প্রত্যাগমন করে আহারাদির পর কিরীটী ঘরের মধ্যে একটা আরামকেদারায় শুয়ে চোখ বুজল।

আমি একটা বাংলা বই নিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিলাম। সারা সকাল হাঁটা-হাঁটির ক্লান্তিতে কখন দু-চোখের পাতা বুজে এসেছিল টের পাইনি।

ঘুম ভাঙল একেবারে সন্ধ্যার দিকে। তাড়াতাড়ি শয্যার ওপরে উঠে বসতেই নজরে পড়ল কিরীটী নিঃশব্দ অস্থির পদে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। এবং হাতে তার শতদলবাবুর নিকট হতে চেয়ে নিয়ে আসা রণধীরের চিত্রাঙ্কিত চিঠিটা।

চা খেয়েছিস? প্রশ্ন করলাম।

বাবাঃ, ঘুম ভাঙল তোর?

হ্যাঁ। খুব ঘুমিয়েছি নাকি?

না, মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা! চল্ চা খেয়ে একটু বেরুনো যাক।

আগে শয্যা হতে উঠে সুইচ টিপে আলোটা জ্বাললাম। তারপর বেরিয়ে গিয়ে বেয়ারাকে চায়ের অর্ডার দিয়ে ফিরে এসে দেখি, চেয়ারটার উপরে

উপবেশন করে সেই চিত্রাঙ্কিত হিজিবিজি-মার্কা চিঠিটা কিরীটী গভীর মনোযোগ সহকারে দেখছে।

ব্যাপার কি তোর বল্ তো কিরীটী? চিঠিটার মর্মোদ্ধারের প্রতিজ্ঞা নিয়েছিস নাকি?

মর্মোদ্ধার হয়ে গিয়েছে এবং 'নিরালা'র রহস্যের উপরেও কাল প্রত্যুষেই যবনিকাপাত!

সত্যি?

হ্যাঁ।

চা-পান করে দুজনে হোটেল থেকে বের হলাম।

পথে নেমে কিরীটী বললে, চল্ একবার ঘোষাল সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসি।

ঘোষাল সাহেব থানাতে ছিলেন না। কাছে-পিঠেই নাকি কোথায় এন-কোয়ারিতে গিয়েছেন। এ, এস, আই, রামকিঙ্কর ওঝা ছিলেন। খসখস করে কাগজ ও পেন দিয়ে একটা চিঠি লিখে চিঠিটা খামের মধ্যে পুরে সেটা ওঝার হাতে দিয়ে আমরা থানা হতে বের হয়ে এলাম। বুঝতে পারছি কিরীটীর বাইরের শান্ত ভাবটা মুখোশ মাত্র। ভিতরে তার যে ঝড় চলেছে সেটাকে সে চাপা দিতে পারছে না। এবং রহস্যের মীমাংসার শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে বলেই নিজেকে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে বাইরে ধীর ও শান্ত রাখার জন্য।

শামুকের মত নিজেকে ও এখন গুটিয়ে রেখেছে। হাজার খোঁচাখুঁচি করলেও এখন ও মুখ খুলবে না। এ যেন ওর রহস্যের মীমাংসার শেষ চৌকাঠের সামনে এসে নিঃশব্দে শক্তিসঞ্চয় করা। ঘণ্টাখানেক প্রায় সমুদ্রের কিনারে কাটিয়ে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ হোটেলে ফিরে এলাম। এবং হোটেলে পৌঁছেই আমাকে কোন কথার অবকাশ মাত্র না দিয়ে কিরীটী দোতলার দিকে চলে গেল।

আমি দ্বিপ্রহরের অর্ধসমাপ্ত উপন্যাসটা নিয়ে চেয়ারে বসলাম।

উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়েছিলাম, হোটেলের ওয়েটারের ডাকে খেয়াল হল।

সার, আপনাদের খানা কি ঘরে দিয়ে যাব?

খানা! হ্যাঁ, নিয়ে এস।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত সাড়ে নটা। আশ্চর্য! এখনো কিরীটী ফিরল না? উঠে ডাকতে যাব, কিরীটী এসে ঘরে প্রবেশ করল।

এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

সমুদ্রের ধারে রাণু দেবীর সঙ্গে গল্প করছিলাম।

এতক্ষণ ধরে কি এমন গল্প করছিলি?

গল্প নয়, শুনছিলাম। এক প্রেমের জটিল উপাখ্যান।

কার—রাণুর?

হ্যাঁ—তা নয় তো কি হিরণ্ময়ী দেবীর!

ওয়েটার ট্রেতে করে খানা সাজিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করল।

খানা খাবার পর কিরীটী চেয়ারে শুয়ে একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করল।

শয়নের যোগাড় করছি, কিরীটীর কথায় ফিরে তাকালাম, উঁহু, এখন নয়।

তার মানে?

এখন একবার বেরুতে হবে।

এত রাত্রে আবার কোথায় যাবি?

'নিরালা'য়।

॥ ১৭ ॥

কালো অন্ধকার রাত।

সমুদ্রের কিনারা দিয়ে হেঁটে চলেছি দুজনে 'নিরালা'র দিকে।

ডাইনে অন্ধকারে গর্জমান সমুদ্র যেন কি এক মর্মভাঙা যাতনায় আছাড়ি-পিছাড়ি করছে।

'নিরালা'র সামনে এসে যখন পৌঁছলাম হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত প্রায় সোয়া এগারটা।

কিরীটী কিন্তু 'নিরালা'র সম্মুখ দিক দিয়ে না প্রবেশ করে পশ্চাতের দিকে এগিয়ে চলল। প্রায় দেড়মানুষ সমান উঁচু প্রাচীর দড়ির মইয়ের সাহায্যে প্রথমে কিরীটী ও পশ্চাতে আমি টপকে 'নিরালা'র পশ্চাতে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

জমাট অন্ধকারে বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকাটা একটা স্তূপের মত মনে হয়।

'নিরালা'র মধ্যে প্রবেশ করতে চলেছে কিরীটী, কিন্তু কেন, সেটাই ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না! কী তার মতলব?

বাগানের চারিদিকে অযত্ন-বর্ধিত জঙ্গল। অন্য কিছুর না থাক্, সাপের ভয়ও তো আছে!

প্রথম দিনের সেই সীতার সতর্কবাণী মনে পড়ে। 'নিরালা'য় ভয়ানক সাপের উপদ্রব।

শুধু কি তাই? সীতার কুকুর টাইগার! কে জানে সেই মৃত্যুসদৃশ অ্যালসেসিয়ান কুকুরটা ছাড়া আছে কিনা? সীতার মুখখানা যেন কিছুতেই ভুলতে পারি না। কেবলই ঘুরে-ফিরে মনে পড়ে সেই মুখখানা। সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে অন্ধকারে এগুচ্ছি কিরীটীর পিছু পিছু।

কী কুক্ষণেই যে সমুদ্রের ধারে হাওয়া বদলাতে এসেছিলাম ওর প্ররোচনায় পড়ে!

পৈতৃক প্রাণটা শেষ পর্যন্ত বেঘোরে না হারাতে হয়!

কোন প্রশ্ন যে করব ওকে তারও কি জো আছে? এখনি হয়তো খিঁচিয়ে উঠবে। নচেৎ বোবা হয়ে থাকবে। হঠাৎ একটা খস-খস শব্দ কানে এল।

চকিতে কিরীটী আমাকে ঈষৎ আকর্ষণ করে একটা ঝোপের মধ্যে টেনে বসে পড়ল। আবছা আলো-অন্ধকারে শ্যেনদৃষ্টি মেলে সামনের দিকে তাকিয়ে আছি। কিছুক্ষণ পূর্বে আকাশে একফালি চাঁদ জেগেছে। ক্ষীণ অস্পষ্ট সেই চাঁদের আলো আশপাশের গাছপালার উপরে প্রতিফলিত হয়ে অদ্ভুত একটা আলো-ছায়ার সৃষ্টি করেছে।

খুব স্পষ্ট না হলেও দেখতে কষ্ট হয় না। ঢ্যাঙা-মত একটা ছায়া অন্ধকারে

'নিরালা'র পশ্চাতের বারান্দায় দেখা গেল। বারান্দা দিয়ে লোকটা পা টিপে টিপে এই দিকেই আসছে।

আরো একটু কাছে এলে দেখলাম, লোকটার দুই হাতে ধরা প্রকাণ্ড একটা কি বস্তু!

কিরীটীর দিকে তাকালাম। তার শ্বাস-প্রশ্বাসও যেন পড়ছে না। স্থির অপলক দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে।

কে লোকটা? হাতে ওর ধরাই বা কী?

আরো একটু এগিয়ে আসতেই এবারে বুঝতে কষ্ট হল না, লোকটার হাতে ধরা বস্তুটি কী? প্রকাণ্ড একটা ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি। ছবির ফ্রেমে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে চিকচিক করছে। এবং লোকটাকেও এবারে চিনতে কষ্ট হল না। এ বাড়ির সেই বোবা-কালা ভুখনা! কিন্তু কোথায় যাচ্ছে ভুখনা ছবিটা নিয়ে?

চাপা স্বরে আস্তে আস্তে কিরীটীকে সম্বোধন করে বললাম, ভুখনা!

হ্যাঁ, চুপ!

ভুখনা ছবিটা নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল বাগানের মধ্যেই। বাগানের দক্ষিণ কোণে একটা প্রশস্ত ঝাউগাছ, তার নীচে এসে দাঁড়াল ভুখনা এবং ছবিটা মাটিতে নামিয়ে রাখল।

চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় পরিষ্কার না হলেও আমরা সবই দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ দেখলাম পাশের ঝোপ থেকে আর একটি ছায়ামূর্তি বের হয়ে এল। ছায়ামূর্তির সর্বাঙ্গ একটা কালো কাপড়ে ঢাকা। মুখে বাঁধা একটা কালো রুমাল, সর্বাঙ্গ কালো কাপড়ে আবৃত ছায়ামূর্তি ভুখনাকে চাপা স্বরে কী যেন বললে।

ওদের ব্যবধান আমাদের থেকে প্রায় হাত-আষ্টেক হওয়ায় বুঝতে পারলাম না কী কথা বললে!

কিন্তু ও কি? ভুখনা ও ছায়ামূর্তির ঠিক পশ্চাতে গুটি গুটি পা ফেলে তৃতীয় আর একজন এগিয়ে আসছে। এসব কী ব্যাপার!

অতি সতর্কতার সঙ্গে পিছন থেকে তৃতীয় আগন্তুক এগিয়ে আসলেও, কালো কাপড়ে আবৃত ছায়ামূর্তির অতি সতর্ক শ্রবণেন্দ্রিয়কে ফাঁকি দিতে পারেনি। মুহূর্তে চোখের পলকে কাপড়ে আবৃত ছায়ামূর্তি ঘুরে দাঁড়ায় ও আধো-আলো আধো-অন্ধকারে একটা অগ্নিঝলক ঝলসে ওঠে ও সেই সঙ্গে শোনা যায় পিস্তলের আওয়াজ—দুড়ুম! সেই সঙ্গে শোনা গেল একটা অস্ফুট আর্ত চিৎকার।

সমস্ত ব্যাপারটা এত দ্রুত এত আকস্মিক ভাবে ঘটে গেল যে, প্রথমটায় আমরা হতচকিত ও বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

কেমন করে যে কী ঘটে গেল যেন বুঝতেই পারলাম না।

খেয়াল হতেই দেখি, কিরীটী লাফিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। আমিও ক্ষিপ্রগতিতে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম।

কিন্তু অকুস্থানে পৌঁছে দেখি, ভুখনা বা সেই কালো কাপড়ে আবৃত ছায়ামূর্তির সেখানে চিহ্নমাত্রও নেই। কেবল কে একজন সুট-পরিহিত ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতটা চেপে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে যন্ত্রণাকাতর শব্দ করছে।

উপবিষ্ট লোকটির ওপরে কিরীটীর হস্তধৃত টর্চের তীব্র একটা আলোর-

রশ্মি গিয়ে পড়ল ও সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী প্রশ্ন করে, কে? এ কি কুমারেশ সরকার!

কুমারেশ সরকার! আমিও বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালাম।

কে আপনি? যন্ত্রণাক্লিষ্ট কুমারেশ সরকার প্রশ্ন করেন কিরীটীকে।

আমি কিরীটী। কোথায় গুলি লাগল? দেখি! কিরীটী এগিয়ে গেল।

গুলি করবার আগেই চট করে হেলে পড়েছিলাম ডান দিকে। গুলিটা বাঁ হাতের পাতায় লেগেছে। একটুর জন্য শয়তানটাকে ধরতে পারলাম না, উঃ!

দেখি হাতটা? কিরীটী এগিয়ে গিয়ে কুমারেশ সরকারের গুলিবিদ্ধ আহত রক্তাক্ত বাঁ হাতটা টর্চের আলোয় পরীক্ষা করতে লাগল। পরীক্ষা করে বললে, না, গুলি pierce করে বেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু woundটার তো এখনি একটা ব্যবস্থা করা দরকার! বুলেট-উন্ড—neglect করা যায় না। আমার রুমালটা অপরিষ্কার। সুব্রত, তোর কাছে পরিষ্কার রুমাল আছে।

কুমারেশ বললেন, দেখুন আমার শার্টের ভিতরের পকেটে কাচা রুমাল আছে, বের করুন!

কুমারেশের বুকপকেট হতে পরিষ্কার রুমালটা বের করে কিরীটী কুমারেশের আহত হাতটা বেঁধে দিল।

কিন্তু লোকগুলো যে পালিয়ে গেল! কুমারেশ বলেন।

পালাবে আর কোথায়? নিজের জালে নিজেই আটকে পড়েছে। অন্যের সঞ্চিত গুপ্তধনের প্রতি লোভ একবার জন্মালে সে লোভ সংবরণ করা বড় দুঃসাধ্য মিঃ সরকার! তাড়াতাড়িতে প্রাণভয়ে সেই বস্তুটিকেই তাঁদের এখানে ফেলে পালাতে হয়েছে যখন, এ জায়গা ছেড়ে তারা বর্তমানে খুব বেশী দূরে যাবে না। না জেনে আগুনে হাত দিলে হাত পোড়েই। সেটাই আগুনের ধর্ম। সে পোড়া হাত খুঁজে বের করতে আমাদের আর খুব বেশী বেগ পেতে হবে না। কিন্তু কালো কাপড়ে আবৃত মূর্তিটিকে অন্তত আপনার তো চেনা উচিত ছিল মিঃ সরকার, চিনতেই পারলেন না?

না। ভুখনাকে চিনেছিলাম, কিন্তু—

যাক, চলুন আপনার হাতের ক্ষতস্থানটির সর্বাগ্রে একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। চলুন দেখি উপরের তলায় শতদলবাবুর ঘরে, যদি কোন ঔষধপত্র থাকে! বলতে বলতে কিরীটী আমার দিকে চেয়ে তার বক্তব্য শেষ করল, ছবিটা একা নিয়ে যেতে পারবি না?

কেন পারব না! চল্—

আগে আগে কিরীটী ও কুমারেশ সরকার ও পশ্চাতে আমি ছবিটা তুলে নিয়ে অগ্রসর হলাম। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যেতে হঠাৎ নজরে পড়ল হিরণ্ময়ী দেবীর ঘরের ভেজানো দ্বারপথের ঈষৎ ফাঁক দিয়ে মৃদু একটা আলোর ইশারা।

আশ্চর্য, হিরণ্ময়ী দেবীর ঘরে এখনো আলো জ্বলছে! বলতে বলতে সর্বাগ্রে কিরীটী ও পশ্চাতে আমরা দুজনে এগিয়ে গেলাম।

ভেজানো দরজার ঈষৎ ফাঁক দিয়ে বারেকের জন্য কিরীটী দৃষ্টিপাত করেই দরজাটা খুলে ফেলল। খোলা দ্বারপথে কক্ষের অভ্যন্তর আমাদের দৃষ্টিগোচর হল এবং থমকে দাঁড়ালাম। নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার মতই ইনভ্যালিড চেয়ারটার উপরে স্থির অচঞ্চল বসে আছেন হিরণ্ময়ী দেবী।

দৃষ্টি তাঁর মাটিতে নিবদ্ধ।

আর সামনেই পায়ের নীচে একরাশ পোড়া কাগজ।

সর্বপ্রথমে কিরীটী ও পশ্চাতে আমি ও কুমারেশ সরকার ছবিটা ঘরের বাইরে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

ঘরের বাতাসে একটা কাগজপোড়া কটু গন্ধ এবং তখনও পাতলা একটা ধোঁয়ার পর্দা ঘরের মধ্যে ভাসছে।

আমরা যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম তা যেন হিরণ্ময়ী দেবী টেরই পেলেন না। নিজের মধ্যে এমন গভীর ভাবে নিমগ্ন যে তিনজনের আমাদের কক্ষের মধ্যে প্রবেশের ব্যাপারটা পর্যন্ত তাঁর সমাধিগ্রস্ত মৌনতাকে এতটুকু নাড়াও দিতে পারলে না।

আরো কাছে এগিয়ে গেলাম।

তবু আশ্চর্য, হিরণ্ময়ী দেবীর কোন সাড়া-শব্দ নেই! নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ।

হিরণ্ময়ী দেবী! মৃদুকণ্ঠে কিরীটী ডাকল।

না, তবু সাড়া নেই।

হিরণ্ময়ী দেবী! শুনছেন? ঈষৎ উচ্চকণ্ঠেই এবারে কিরীটী ডাক দিল।

এবারে মুখ তুলে তাকালেন হিরণ্ময়ী দেবী।

ঘরের আলোয় হিরণ্ময়ী দেবীর মুখের দিকে তাকালাম। মড়ার মত ফ্যাকাশে রক্তহীন মুখ। আর দুই চোখের দৃষ্টিও যেন ঘষা কাঁচের মত নিশ্চল প্রাণহীন।

কিরীটী আবার ডাকল, হিরণ্ময়ী দেবী!

ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন হিরণ্ময়ী দেবী। কোন সাড়া-শব্দই দেন না।

সর্বস্ব হারানোর এক মর্মান্তিক বেদনা যেন হিরণ্ময়ী দেবীর মুখখানিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

সামনের ঐ ভস্মস্তূপের মত যেন তাঁরও সব কিছু আজ শেষ হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ কথা বলেন হিরণ্ময়ী দেবী, সব পুড়িয়ে ফেলেছি মিঃ রায়! সীতার শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকুও পুড়িয়ে ফেলেছি! কিন্তু কই, তবু তো তাকে ভুলতে পারছি না? কিছুতেই তো মন থেকে তাকে মুছে ফেলতে পারছি না?

যে গিয়েছে তার কথা আর মিথ্যে ভেবে কী লাভ বলুন হিরণ্ময়ী দেবী! বাকি জীবনটা এমনি করেই তার স্মৃতি বার বার আপনার মনের মধ্যে এসে উদয় হবেই। ভেবেছেন কি তার চিঠিপত্রগুলো পুড়িয়ে ফেললেই তার স্মৃতির হাত হতে আপনি রেহাই পাবেন! তা আপনি পাবেন না। বরং যে রহস্য এতকাল আপনার কাছে অজ্ঞাত ছিল, তার বাক্স ঘেঁটে তার চিঠিপত্রগুলো পড়ে—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, হিরণ্ময়ী দেবী চকিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি—আপনি সেসব কথা কেমন করে জানলেন মিঃ রায়!

আপনি না জানলেও আমি জানতাম হিরণ্ময়ী দেবী, আপনার মেয়ে সীতার মনটা কোথায় পড়ে আছে! আরও একটা কথা আপনি হয়তো জানেন না!

কী?

যে ভালবাসার মধ্যে সীতা নিজেকে অমনি নিঃস্ব করে বিকিয়ে দিয়েছিল সেই ভালবাসাই কালসাপ হয়ে তার বুকে মৃত্যু-ছোবল হেনেছে, অথচ বেচারী সে কথা তার শেষ মুহূর্তে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি!

কিরীটীবাবু? আর্ত চিৎকারের মতই ডাকটা শোনায় হিরণ্ময়ীর কণ্ঠে।

হ্যাঁ, হিরণ্ময়ী দেবী। একটা দিকই আপনার নজরে পড়েছে। মালাটাই আপনি দেখেছেন কিন্তু সেই মালার মধ্যেই যে ছিল দংষ্ট্রা কীট সেটা আপনার নজরে পড়েনি!

আমি—আমার যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মিঃ রায়! এ সব আপনি কি বলছেন?

সময় আর তো নেই হিরণ্ময়ী দেবী। এখুনি একবার আমাকে নার্সিং হোমে যেতে হবে। কুমারেশবাবুর হাতে গুলি লেগেছে। একটা dressing-এর বিশেষ প্রয়োজন।

কুমারেশ!

হ্যাঁ। দেখুন এঁকে চিনতে পারছেন কিনা?

এতক্ষণ কিরীটী কুমারেশ সরকারকে আড়াল করে দাঁড়িয়েই কথাবার্তা চালাচ্ছিল। এবারে সরে দাঁড়াল।

কে?

চিনতে পারছেন না? বনলতা দেবী ও অধ্যাপক ডঃ শ্যামাচরণ সরকারের একমাত্র ছেলে কুমারেশ সরকার!

সে কি! তবে যে শুনেছিলাম—

কি শুনেছিলেন? তার কোন পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না, তাই না?

হ্যাঁ।

তার জবাব অবিশ্যি উনিই সঠিক দিতে পারবেন। আচ্ছা এবারে আমরা চলি হিরণ্ময়ী দেবী।

আমরা দুজনে কিরীটীর পিছু পিছু দরজার দিকে অগ্রসর হতেই কিরীটী হঠাৎ আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, হ্যাঁ, একটা ছবি আপনার জিম্মায় রেখে যেতে চাই হিরণ্ময়ী দেবী। সুব্রত, ছবিটা ওঁর কাছেই রেখে যাও। আমার দিকে তাকিয়ে কিরীটী তার বক্তব্য শেষ করল।

ছবি, কিসের ছবি?

আমি ততক্ষণে ঘরের বাইরে গিয়ে ছবিটা এনে হিরণ্ময়ী দেবীর পায়ের সামনে দিলাম। ছবিটা দেখে হিরণ্ময়ী দেবী সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, এ কী! এ ছবিটা দাদার স্টুডিও-ঘরে ছিল না?

হ্যাঁ। আর যত বিভ্রাট এই ছবিটা নিয়েই। এইটা চুরি করবার মতলবেই গতরাত্রে এ বাড়িতে চোরের আবির্ভাব ঘটেছিল।

এই ছবিটা চুরি করতে? কী বলছেন আপনি মিঃ রায়?

হ্যাঁ, বললাম তো। 'নিরালা'-রহস্যের মূলে এই ছবিটাই।

তবে—তবে আমার মেয়ে সীতাকে—

প্রাণ দিতে হল কেন, তাই না আপনার জিজ্ঞাসা হিরণ্ময়ী দেবী? একান্ত অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবেই আপনার মেয়ে হত্যাকারীর স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল, তাই তাকে প্রাণ দিতে হল। কিন্তু আমার আর দেরি করা তো চলবে না—ওদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে।

একটা কথা মিঃ রায়—

বলুন।

আমার স্বামী—

সে কথার জবাব তো আজ সকালেই দিয়ে দিয়েছি হিরণ্ময়ী দেবী!

আমরা সকলে অতঃপর নিরালা থেকে বের হয়ে এলাম।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রাত দুটো বেজে গিয়েছে।

॥ ১৮ ॥

রাস্তায় পৌঁছে হনহন করে হাঁটতে শুরু করে আমি আর কুমারেশবাবু তাকে অনুসরণ করি।

কিরীটীর শেষের কথাগুলো সমস্ত সংশয়ের অবসান ঘটিয়েছে।

অথচ আশ্চর্য! বার বার ঐ কথাটাই মনে হচ্ছিল। এই দিকটা একবারও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি কেন? আগাগোড়া ঘটনাটা একটিবারও ঐ দিক দিয়ে আমি বিশ্লেষণ করে দেখিনি কেন?

তাড়াতাড়ি একটু পা চালিয়ে আয় সুব্রত! কুমারেশবাবুর উণ্ডটা dress করাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিরীটী চলতে চলতেই আমাকে একবার তাড়া দিল।

নার্সিং হোমে পৌঁছে দেখি, সেখানে আবার বেশ শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ডাঃ চ্যাটার্জী নিজেই একজন ভৃত্যের সঙ্গে কী যেন কথা বলছিলেন।

আমাদের প্রবেশ করতে দেখে বলে উঠলেন, এই যে মিঃ রায়! আবার শতদলবাবুর life-এর ওপরে another attempt হয়েছে। ওকেই আপনার কাছে পাঠাচ্ছিলাম।

ডাঃ চ্যাটার্জীর কণ্ঠস্বরে একরাশ উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ে।

কিন্তু প্রত্যুত্তরে কিরীটীর কণ্ঠস্বরে কোনোরূপ উৎকণ্ঠাই প্রকাশ পেল না। অত্যন্ত শান্ত ও নিরুৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, আবার হয়েছিল বুঝি?

হ্যাঁ।

এবারেও poison, না বুলেট!

সেই পূর্বের মতই মরফিন হাইড্রোক্লোর—

হুঁ। চলুন দেখা যাক।

এবারেও ঠিক সময়মত ব্যাপারটা জানতে পারায় কোনমতে ভদ্রলোককে বাঁচানো গিয়েছে। কিন্তু আর না মশাই। ও ঝঞ্ঝাট আর আমার নার্সিং হোমে রাখতে সাহস হচ্ছে না মিঃ রায়, আপনারা অন্য ব্যবস্থা করুন।

ভয় নেই ডক্টর চ্যাটার্জী, হত্যাকারীর এইটাই last show! খেলা তার ফুরিয়েছে, কিন্তু এবারেও কি কড়াপাকের সন্দেশ নাকি?

না, এবারে আরও serious—

কি রকম?

হাসপাতালের দেওয়া দুধ পান করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন।

হুঁ। তা দুধটা দিয়ে এসেছিল কে কেবিনে?

নার্সই। সে বললে, রাত দশটায় দুধ নিয়ে এসে শতদলবাবুর কেবিনে ঢুকে

দেখে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে ঘরের আলো নিবিয়ে শতদলবাবু ঘুমোচ্ছেন—তাই আর তাঁকে বিরক্ত না করে দুধটা মাথার ধারে মেডিসিন ক্যাবার্ডের ওপরে একটা কাচের প্লেট দিয়ে ঢেকে রেখে কেবিন থেকে বের হয়ে আসে।

তারপর? কিরীটী পূর্ববৎ নিরাসক্ত ভাবেই প্রশ্ন করে।

তারপর রাত যখন দেড়টা, নার্স বদলির সময় নতুন ডিউটি-নার্স মণিকা গুহ শতদলবাবুর কেবিনের সামনে দিয়ে যেতে যেতে একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করে আলো জেবলে দেখে, শতদল শয্যার উপরে গোঁ-গোঁ করছে। তাড়াতাড়ি আমাকে খবর দেয়, আমি ছুটে যাই—

এখন কেমন আছেন?

এখন একটু ভাল।

হুঁ। ভাল কথা ডাঃ চ্যাটার্জী, কুমারেশবাবুর হাতটা জখম হয়েছে, একটু দেখে ব্যবস্থা করে দিন—

নিশ্চয়ই। কিন্তু—

সব বলব আপনাকে। আগে হাতটা পরীক্ষা করে ব্যবস্থা করুন—আমরা ততক্ষণ শতদলবাবুর সঙ্গে একটিবার দেখা করে আসি। কথাগুলো বলতে বলতে আরো একটু ডাঃ চ্যাটার্জীর দিকে এগিয়ে গিয়ে নিম্নকণ্ঠে কিরীটী তাঁকে যেন কী নির্দেশ দিল, তারপর আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, চল সুব্রত!

*　　　*　　　*

নির্জীবের মত শতদলবাবু তার নির্দিষ্ট কেবিনের মধ্যে শয্যায় শুয়ে ছিল। মাথার সামনে একজন নার্স একটা টুলের উপর বসে ছিল। আমাদের দুজনকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে উঠে দাঁড়াল।

কিরীটী চোখের ইঙ্গিতে নার্সকে কক্ষত্যাগ করতে বললে।

নিঃশব্দে নার্স কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

কিরীটী অতঃপর শয্যার সামনে এগিয়ে গিয়ে ক্ষণকাল শয্যায় শায়িত নির্জীব শতদলের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর এগিয়ে গিয়ে উদ্যানের দিকে খোলা জানলাটার সামনে নিঃশব্দে দাঁড়াল। এবং জানালাপথে ঝুঁকে কী যেন দেখতে লাগল বাইরে।

এমন সময় শতদলবাবু চোখ মেলে তাকাল এবং ক্ষীণকণ্ঠে ডাকল, নার্স!

আমি নার্সকে ডাকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কিরীটী চোখের ইঙ্গিতে আমাকে নিষেধ করে শয্যার কাছে এগিয়ে এল।

শতদলবাবু!

কে?

আমি কিরীটী, কেমন আছেন?

মিঃ রায় এসেছেন! আবার আমার life-এর ওপরে attempt নিয়েছিল!

তাই তো শুনলাম।

এবার দুধের সঙ্গে—

হ্যাঁ, বড্ড কাঁচা কাজ করে ফেলেছে।

কাঁচা কাজ!

হ্যাঁ। আর সেই জন্যেই সে আমার চোখে ধরাও পড়ে গিয়েছে।

ধরা পড়েছে! শতদলবাবুর কণ্ঠে বিস্ময়।

হ্যাঁ, শতদলবাবু। জানেন একটা কথা, আপনি যে রণধীর চৌধুরীর চিঠিটা আমাকে দিয়েছিলেন—তার মর্মার্থ আমি উদ্ধার করতে পেরেছি।

চিঠি!

হ্যাঁ, মনে নেই আপনার? যে চিঠিটা আপনার কাছ থেকে আমি চেয়ে নিয়েছিলাম?

ও—

আর সেই চিঠির মর্মোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে হত্যাকারীও আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হত্যাকারী?

হ্যাঁ—সীতাকে যে হত্যা করেছে। চিঠিটা শিল্পীর একটা অদ্ভুত খেয়ালই বলতে হবে! আর আপনার কথাই ঠিক শতদলবাবু। ঐ চিঠিটাই রণধীর চৌধুরীর উইল!

আমি তো আপনাকে সেই দিনই বলেছিলাম, কিন্তু দিদিমা মানতে চাননি—

ভুল করেছিলেন তিনি।

আমি আর নিজের কৌতূহলকে দমন করতে পারলাম না। প্রশ্ন করলাম কিরীটীকে, সত্যি তুই চিঠিটার মর্মোদ্ধার করতে পেরেছিস কিরীটী?

হ্যাঁ রে। চিঠিটার প্রত্যেকটি লাইনের পাশে পাশে যে সাংকেতিক অঙ্ক বসানো আছে সেইটাই চিঠিটার মর্মোদ্ধারের সংকেত। এই দেখ পড়। বলতে বলতে চিঠিটা পকেট হতে বের করে কিরীটী আমার হাতে দিয়ে বললে, মোটা-মুটি চিঠিটায় বলেছে বটে, 'নিরালা' বাড়ি ও তার যাবতীয় সব কিছু আমাদের শতদলবাবুই পাবেন—তবে তার মধ্যে আরো একটা নির্দেশ আছে, সেটা হচ্ছে ঐ সাংকেতিক অঙ্কগুলোর মধ্যে। অঙ্ক অনুসারে প্রত্যেক লাইনের সমান-সংখ্যক কথাগুলো নিলে তার অর্থ এই দাঁড়ায়—

নির্দেশঃ 'আমার মৃত্যুর পর স্টুডিওতে প্রপিতামহের ছবির স্বত্ব কুমারেশের হইবে।'

কী বলছেন আপনি মিঃ রায়? শতদল বলে ওঠে।

হ্যাঁ শতদলবাবু। আমার কথা যে মিথ্যা নয় এই চিঠিই তার প্রমাণ দেবে এবং 'নিরালা' ও তার মধ্যেকার যাবতীয় সম্পত্তি আপনি পেলেও, রণধীর চৌধুরীর প্রপিতামহের ছবিটা কুমারেশ সরকারই পাবেন।

কুমারেশ সরকার!

হ্যাঁ, কুমারেশ সরকার। তিনিও আজ এখানে উপস্থিত।

কুমারেশ! কুমারেশকে তাহলে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে?

নিশ্চয়ই। ঐ যে—

ঠিক সেই সময় ডাঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে সঙ্গে কুমারেশ সরকার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় কেবিনের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

কুমারেশবাবু, let us hear your story! আপনি কেমন করে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিলেন, আর কোথায়ই বা এতদিন বন্দী হয়ে ছিলেন কেমন করে?

বিস্মিত কুমারেশ সরকার কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন,

আপনি সে কথা কী করে জানলেন মিঃ রায়?

অনুমান। অনুমানের ওপর নির্ভর করেই জেনেছি মিঃ সরকার। এখন তো বুঝতে পারছেন, অনুমান আমার ভুল হয়নি! Now let us have the story! কিরীটী বললে।

আশ্চর্য মিঃ রায়, সত্যি আগাগোড়া ব্যাপারটা এখনো আমার কাছে একটা দুর্বোধ্যের মতই মনে হয়। মনে হয় সবটাই যেন প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত একটা দুঃস্বপ্ন। তবু বলছি শুনুন। কুমারেশ সরকার তাঁর কাহিনী শুরু করলেনঃ আপনি হয়তো জানেন না মিঃ রায়, শিল্পী রণধীর চৌধুরীর আমি দৌহিত্র হলেও তাঁর সংগে আমাদের কোনদিন কোন সম্পর্ক ছিল না। আমার মাকে তিনি ত্যাজ্য করেছিলেন। আমরাও অর্থাৎ আমার মা-বাবা বা আমি কোনদিন তাঁর সংগে কোন সম্পর্ক রাখবারই চেষ্টা করিনি। সেই দাদুর কাছ হতে তাঁর মৃত্যুর মাসখানেক আগে একটা আবোল-তাবোল লেখা চিত্রবিচিত্র চিঠি পেলাম। আশ্চর্যই হয়েছিলাম। এবং চিঠিটার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারিনি বলে সে চিঠিটা ড্রয়ারের মধ্যেই অবহেলায় পড়ে ছিল, তারপর সাত-আট মাস পরে হঠাৎ হরবিলাস দাদুর একখানা চিঠি পেলাম—

হরবিলাসবাবুর চিঠি? কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। চিঠিতে তিনি লেখেন, অবিলম্বে কোন বিশেষ অথচ গোপনীয় ব্যাপারের জন্য যেন চিঠি পাওয়া মাত্রই এখানে এসে তাঁর সংগে 'নিরালা'য় সাক্ষাৎ করি। অন্যথায় আমার নাকি সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে। চিঠিতে এ-ও লেখা ছিল, যাবার আগে তাঁকে যেন আমি পত্র দিয়ে জানাই কবে যাচ্ছি।

হুঁ। তারপর?

চিঠি পেয়ে আমি এখানে আসব কিনা ভাবছি, এমন সময় রাণুর একখানা চিঠি পাই। সেও আমাকে দার্জিলিং থেকে লিখেছে দু-এক দিনের মধ্যেই তারা এখানে আসছে। তখন স্থির করলাম এখানে আসব। মনে মনে যে একটা কৌতূহল হয়নি তাও নয়। যা হোক, এখানে এসে পৌঁছুলাম রাত্রের ট্রেনে এবং বলাই বাহুল্য, আগে হরবিলাস দাদুকে চিঠিও দিলাম। কুমারেশ থামলেন।

থামলেন কেন? বলুন—শেষ করুন। কিরীটী তাগিদ দেয়।

স্টেশনে নেমে বাইরে আসতেই একজন ঢ্যাঙামত লোক এগিয়ে এসে আমাকে প্রশ্ন করল, আমার নাম কুমারেশ সরকার কিনা এবং আমি কলকাতা হতেই আসছি কিনা। জবাবে আমি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে সে বললে সে 'নিরালা'র হরবিলাসবাবুর লোক। আমাকে সে নিতে এসেছে। একটা ট্যাক্সি স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করছিল। তার মধ্যে তার কথামত উঠে বসতেই অন্ধকারে ট্যাক্সির মধ্যে থেকেই কে যেন মাথায় আমার অতর্কিতে আঘাত হানল। সংগে সংগে আমি জ্ঞান হারালাম। জ্ঞান ফিরে আসবার পর দেখি, ছোট্ট একটা ঘরে আমি বন্দী। পরে জেনেছিলাম সেটা 'নিরালা'র পিছনে জংগলাকীর্ণ বাগানের মধ্যের আউটহাউস—

একটা কথা মিঃ সরকার, আপনি চেঁচামেচি করে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেননি কেন বন্দী অবস্থায়?

সেও এক বিচিত্র ব্যাপার। ঢ্যাঙা লোকটা আমাকে শাসিয়েছিল, তারা নাকি

চিঠি দিয়ে আমার রক্তচাপের রোগী বৃদ্ধ অধ্যাপক বাপকেও নাকি আমারই মত এখানে ধরে এনে অন্য একটা ঘরে আটকে রেখেছে। আমি যদি চেঁচামেচি করি বা গোলমাল করি তারা আমার বৃদ্ধ বাপকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেবে। আর যদি চুপচাপ থাকি তো এক মাস বাদে ছেড়ে দেবে। বাবাকে যে আমি কতখানি ভালবাসি ঐ শয়তানরা জানত বোধ হয়। বাধ্য হয়েই তাই আমাকে কতকটা ঐ বন্দী জীবন মেনে নিতে হয়েছিল। একটিমাত্র জানালা ছিল ঘরের। সেই জানালাপথে সেই ঢ্যাঙা লোকটা প্রত্যহ এসে আমাকে খাবার দিয়ে যেত রাত্রে একবার করে। বন্দী অবস্থায় আমার কেবলই ঘুম পেত।

Is it?

হ্যাঁ, কেবলই ঘুম পেত। উপযুক্ত আহার না পেয়ে এদিকে ক্রমেই দুর্বল হয়েও পড়ছিলাম।

আপনি টেরও পাননি মিঃ সরকার—খাদ্যের সঙ্গে মরফিয়া দিয়ে আপনাকে ঘুম পাড়াত আর উপযুক্ত পরিমাণ আহার না দিয়ে ক্রমে আপনাকে দুর্বল করে ফেলছিল! কিরীটী বললে।

পরে বুঝতে পেরেছিলাম সব।

তারপর?

তারপর যে রাত্রে সীতা মারা যায়—সেই দিন বিকেলের দিকে ঐ উদ্যানের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সে একসময় ঐ outhouse-এর কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ আমাকে দেখতে পায় এবং সীতাই আমাকে উদ্ধার করে ঐদিন সন্ধ্যার দিকে। এবং আমাকে সে অবিলম্বে এখান থেকে চলে যেতে বলে। কারণ, তার বাপ ব্যাপারটা জানতে পারলে নাকি আমাকে হত্যা করবে। আমিও তার নির্দেশমত চলে যাই, কিন্তু পথে গিয়ে মনে হয় শতদলকে সব ব্যাপারটা জানানো উচিত। সঙ্গে সঙ্গে 'নিরালা'য় ফিরে আসি। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে সামনেই সীতার দেখা পাই। সে তখন ছাদ থেকে নীচে নেমে আসছে। সীতা আমাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি বসবার ঘরে টেনে নিয়ে যায়।

সে আমাকে বলে, এ কী! আবার আপনি এখানে এসেছেন কেন? একটা সর্বনাশ না করে আপনি ছাড়বেন না দেখছি! বাবা নীচে আছেন এখন, যদি তাঁর চোখে পড়ে যান?

শতদলের সঙ্গে একবার আমি দেখা করতে চাই। তুমি একবার যেমন করে হোক শতদলকে এই ঘরে ডেকে নিয়ে এস।

কিন্তু—

না, তার সঙ্গে দেখা না করে আমি যাব না। আমি বললাম সীতাকে। কিন্তু কথা আমার শেষ হল না, ঠিক এমনি সময় দরজার ও-পাশ থেকে একটা গুলির আওয়াজ এল ও সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত চিৎকার করে সীতা মাটিতে পড়ে গেল। আমিও আকস্মিক সেই ব্যাপারে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। এবং ঐ মুহূর্তেই সেখান থেকে পালালাম। পালাই যখন তখন সিঁড়ি দিয়ে কে যেন একটি মহিলা ছাদ থেকে নেমে আসছিল। সে বোধ হয় আমাকে দেখে ফেলেছিল—

হ্যাঁ, শরৎ গুহর মেয়ে কবিতা গুহ। কিরীটী বললে, কিন্তু সে-রাত্রে ভয়ে আপনি যদি অমন করে হঠাৎ না পালিয়ে যেতেন তো আজ রাত্রে আপনাকে গুলি খেতে হত না। তবু ভাগ্য বলতে হবে যে, গুলিটা আপনার হাতের

উপর দিয়েই গিয়েছে। যাক, শেষ করুন আপনার কথা।

নিরালা থেকেও আমি পালালাম। কিন্তু এখান থেকে যেতে পারলাম না। কটা দিন আত্মগোপন করে বেড়িয়েছি আর ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করেছি—কী হল। হঠাৎ সীতাকে কে গুলি করে মারল? এমন সময় হরবিলাস দাদু অ্যারেস্ট হয়েছেন আজ সকালে শুনতে পেলাম। তখন ঠিক করলাম সীতার মা হিরণ্ময়ীদির সঙ্গে দেখা করব। এবং তাঁকে সব ব্যাপারটা খুলে বলব। কিন্তু সদর গেট দিয়ে 'নিরালা' ঢুকতে সাহস হল না, সদরে পুলিস মোতায়েন দেখে। একটা বাঁশ যোগাড় করে পোলভল্টের সাহায্যে প্রাচীর টপকে 'নিরালা'র পিছনের বাগানে প্রবেশ করলাম। তারপর এগুচ্ছি—

এই সময় কিরীটী বাধা দিল, দেখলেন ভুখনা ও কালো কাপড়ে সর্বাঙ্গ আবৃত ছায়ামূর্তিকে বাগানের মধ্যে—তাই না?

হ্যাঁ, আমার ইচ্ছে ছিল লোকটাকে পিছন থেকে গিয়ে জাপটে ধরব, কিন্তু তার আগেই সে আমার উপস্থিতি টের পেয়ে—

গুলি করে! কিন্তু he missed the chance! এবং হত্যাকারী জানতে না যে তার আগেই বাগানে প্রবেশ করে একটা ঝোপের মধ্যে অনতিদূরে আমি আর সুব্রত আত্মগোপন করে আছি!

ঘোষাল-সাহেব এই সময় এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

ব্যাপার কি কিরীটীবাবু! এত জরুরী তলব কেন? ঘোষাল প্রশ্ন করেন।

এই যে আসুন ঘোষাল সাহেব। আপনার নিরালা ও সীতা-হত্যা রহস্যের মীমাংসা হয়েছে। কিরীটী আহ্বান জানাল ঘোষালকে।

সত্যি!

হ্যাঁ।

কিন্তু ইনি—ইনি কে?

বিখ্যাত স্পোর্টসম্যান আমাদের কুমারেশ সরকার।

নমস্কার। তা উনি—

ঘটনাচক্রে উনিই তো যত অনর্থের মূল! কিরীটী জবাব দেয়।

কি বলছেন আপনি মিঃ রায়? প্রশ্নটা করল শতদল।

হ্যাঁ। বর্তমান রহস্যের উনিই নিউক্লিয়স! ওঁকে কেন্দ্র করেই সব কিছু ঘটেছে!

তার মানে?

তার মানেটা আপনার চাইতেও কারো বেশী জানবার কথা নয় শতদল-বাবু। গম্ভীর কিরীটীর কণ্ঠস্বর।

আমি!

হ্যাঁ আপনি। চমৎকার খেলা খেলেছেন শতদলবাবু, কিন্তু বড়ের চালে মারাত্মক ভুল করে ফেলেছেন—তাতেই কিন্তু মাত হয়ে গিয়েছেন!

আপনি—

শতদলবাবু, আমি কিরীটী রায়।

মিঃ রায়! ঘোষাল সাহেব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকান কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ মিঃ ঘোষাল, উনি—আমাদের শতদল বোসই এই নাটকের প্রধান চরিত্র। সকল রহস্যের মেঘনাদ। সীতা দেবীর হত্যাকারী।

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল।

'নিরালা'তেই আমরা সকলে উপস্থিত ছিলাম—আমি, হিরণ্ময়ী দেবী, হরবিলাস, কুমারেশ, রাণু, কবিতা গুহ ও ঘোষাল। এবং ঘোষাল সাহেবের অনুরোধেই কিরীটী নিরালা ও সীতার হত্যা-রহস্য সবিস্তারে বর্ণনা করল পরের দিন।

'খেয়ালী শিল্পী রণধীর চৌধুরীর নিজের কন্যা বনলতা অধ্যাপক শ্যামাচরণ সরকারকে তাঁর অমতে ভালবেসে অসবর্ণ বিবাহ করায় ত্যাগ করলেও কন্যাকে তিনি কোন দিনই ভুলতে পারেননি এবং যদিও কন্যার জীবিতকালে কন্যা বনলতার কোন দিন মুখদর্শন করেননি, কন্যার মৃত্যুর পর ও নিজের মৃত্যুর পূর্বে বোধ হয় পিতার মনে অনুশোচনা এসেছিল। ফলে তাঁর সত্যিকারের যে সম্পদ ছিল, কতকগুলো বহু মূল্যবান জুয়েল, সেগুলো তাঁরই হাতে অংকিত প্রপিতামহের অয়েল-পেণ্টিংটার ফ্রেমের মধ্যে কৌশলে ভরে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেগুলো তাঁর মৃতা কন্যার একমাত্র পুত্র কুমারেশবাবু-কেই দিয়ে যান উইল করে। অবশ্য শিল্পীর খেয়ালী মন তাঁর, তাই উইলটাকে একটা বিচিত্র চিঠির মত করে রেখে গিয়েছিলেন এবং তার একটি কপি নিরালার সিন্দুকে রেখে অন্য একটি কপি ডাকে কুমারেশের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে অবশ্য একটা কথা উঠতে পারে, জুয়েলগুলো কুমারেশবাবুকেই যদি তাঁর দেবার ইচ্ছে ছিল—খোলাখুলিভাবেই তো একটা চিঠিতে সেকথা কুমারেশবাবুকে জানিয়ে যেতে পারতেন বা দিয়ে যেতে পারতেন। তবু যে কেন তা না করে অমন একটা কৌতুক করে রেখে গিয়েছিলেন তা তিনিই জানতেন। তবে মনে হয়, এও তাঁর খেয়ালী মনের একটা বিচিত্র খেয়াল ভিন্ন কিছু নয়। যা হোক, রণধীর চৌধুরীর মৃত্যুর পর শতদলবাবু এখানে 'নিরালা'য় এসে ঐ চিঠির সরল মানে অনুযায়ীই সমস্ত সম্পত্তি নিজের হাতে নেন। চিঠিটার অপ্রকাশ্য সাংকেতিক অর্থটা তিনি প্রথমে ধরতে পারেননি। তারপর হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে যখন সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়, তখন হয়তো হিরণ্ময়ী দেবীকে শতদল ঐ চিঠিটা দেখায়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী হিরণ্ময়ী দেবী চিঠিটা পড়ে মনে মনে সন্দেহযুক্ত হয়ে ওঠেন। এবং খুব সম্ভবত ঐ চিঠিটার কথা ভাবতে ভাবতে কোন এক মুহূর্তে চিঠির সাংকেতিক রহস্যটা তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। এবং তিনি কোন সময়ে হয়তো শতদলকে কিছু বলেন। এই গেল প্রথম পর্ব বা অধ্যায়। এবারে আসব আমি রহস্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। শতদল যে মুহূর্তে জানতে পারলে চিঠির আসল রহস্য, মনে মনে তার প্ল্যান ঠিক করে নিল। হরবিলাসের নামে বেনাম চিঠি দিয়ে ভুখনার সাহায্যে প্রথমেই কুমারেশবাবুকে এনে 'নিরালা'র বাগানের মধ্যে secluded outhouse-এ বন্দী করে ধীরে ধীরে মরফিয়ায় addict করে তুলতে লাগল ও সেই সঙ্গে অপর্যাপ্ত আহার দিয়ে দুর্বল করে ফেলতে লাগল। তার ইচ্ছা ছিল হয়তো চট করে কুমারেশকে হত্যা না করে ধীরে ধীরে তাকে morphiaর নেশা ধরিয়ে cripple করে ফেলবে এবং পরে হয়তো প্রয়োজনমত সুযোগ বুঝে একেবারে শেষ করে ফেলতেও কষ্ট পেতে হবে না। দ্বিতীয়

অধ্যায়ে এই তার প্রথম খেলা। দ্বিতীয় খেলা শুরু হল হরবিলাস ও হিরণ্ময়ী দেবীর উপরে সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে তাঁদেরও নিজের পথ থেকে সরানো। ঘটনাচক্রে এই সময় আমি ও সুব্রত এখানে এলাম এবং এখানকার স্থানীয় সংবাদপত্রে আমার এখানে আগমনের সংবাদ পেয়ে আমাকেও এই ঘটনার মধ্যে টেনে এনে নিজেকে আরও safe করবার মতলব করলে। আমার সংগে চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও সংবাদপত্রের মারফৎ আমার চেহারা ও আমার পরিচয় শতদলের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। এবং এখানে এসে যে হোটেলে উঠেছি সেও শতদলের পূর্বাহ্নেই জানা ছিল। একটা নাটকীয় কৌতুকের মধ্যে দিয়ে নিজে যেন আচমকা কোন অদৃশ্য আততায়ীর হাতে পিস্তলের গুলিতে আহত হয়েছে এই রকম pose নিয়ে শতদল আমার সামনে এসে আবির্ভূত হয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদের পরিচয় ঘটাল। প্রথমটায় frankly বলতে গেলে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি। পরে যখন তলিয়ে ভাবি, তখনই সর্বপ্রথম আমার মনে সন্দেহ জাগে। শতদলের life-এর উপরে তিন-চারবার attempt হয়েছে—একবার হোটেলের সামনে গুলি করে, একবার নিরালার পথে পাথর গড়াবার গল্প বলে, একবার শয়নঘরে ছবির তার কেটে, একবার নিজের ঘরে রিভলবার ছুঁড়ে আলোর চিমনি ভেংগে—সে আমার কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছে ব্যাপারটা। প্রতিবারই ব্যাপারগুলো আমি প্রথমে genuine ভেবেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা ব্যাপার মনের মধ্যে আমার সর্বদাই খচ-খচ করে অদৃশ্য কাঁটার মত বিঁধেছে—why at all somebody should be after his life? কেন কেউ তাকে হত্যা করতে চাইবে? কী মোটিভ—কী উদ্দেশ্য, এবং ঐ সংগে আরো একটা যুক্তি মনের মধ্যে এসে আমার উদয় হয়েছে—হত্যার attemptগুলোর মধ্যে কোথায় যেন একটু ফাঁক আছে। একটা বা দুটো attempt ব্যর্থ হতে পারে কিন্তু বার বার চার বার কেন attempt বিফল হবে? শেষবারের attempt-এর পর যে মুহূর্তে ঐ ধরনের অসামঞ্জস্যটা আমার মনকে আকর্ষণ করল, সেই মুহূর্ত হতেই মন আমার সজাগ হয়ে উঠেছে। কঠিন বিশ্লেষণে যুক্তি ও নিরঙ্কুশ বিচারে ঘটনাগুলোকে চিন্তা করতে শুরু করলাম এবং চিন্তা করতে গিয়ে একই জায়গায় এসে বারবার শুরু করলাম এবং চিন্তা করতে গিয়ে একই জায়গায় এসে বার বার থেমে যেতে হল আমাকে। ব্যাপারটা যুক্তিহীন। এলোমেলো। তারপরই তৃতীয় অধ্যায়ে আমি আসবঃ শতদল ও সীতার ব্যাপারে। সীতা ভালবেসেছিল সমস্ত প্রাণ দিয়ে শতদলকে কিন্তু শতদল চাইছিল রাণুকে। রাণু ভালবাসে আবার শতদলকে নয়, কুমারেশকে। অর্থ অনর্থ তো ছিলই সংগে এসে যোগ দিল প্রেমের ব্যাপার। একটা জটিল পরিস্থিতির হল উদ্ভব। শতদল চায় রাণুকে, রাণু চায় কুমারেশকে, সীতা চায় শতদলকে। আবার শতদল চায় কুমারেশের ন্যায্য পাওনা থেকে তাকে বঞ্চিত করতে। কুমারেশই হল এক শতদলের পথের কাঁটা দুই দিক দিয়ে। একা রামে রক্ষা নেই তাতে সুগ্রীব দোসর! আকাঙ্ক্ষিতা নারী ও আকাঙ্ক্ষিত অর্থ। অতএব কুমারেশকে সরাতে পারলেই দুদিক পরিষ্কার শতদলের। কাজেই কুমারেশের ওপরেই পড়ল শতদলের যত আক্রোশ। শতদল আটঘাট বেঁধে আসরে অবতীর্ণ হল। শতদলের বুদ্ধির প্রশংসাই করতাম যদি না বড়ের চালে দুটো মারাত্মক ভুল করে নিজে মাত হয়ে না যেত শেষ পর্যন্ত! এক নম্বর ভুল সে করলে, কুমারেশকে হত্যা না করে এনে বন্দী

করে রেখে—কারণ তাতে করে সীতাকে হত্যা করতে হত না। সীতা কুমারেশের কথা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই তাই হতভাগিনীকে সরাতে হল ইহজগৎ হতে। আর সেইটেই হল শতদলের দ্বিতীয় মারাত্মক ভুল—অর্থাৎ সীতাকে হত্যা করা। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত সন্দেহের মীমাংসা হয়ে গেল। আমি বুঝলাম সকল রহস্যের মেঘনাদ কে! সীতাকে হত্যা করবার পূর্ব-মুহূর্তে নিজের লাল রঙের শালটা সীতার গায়ে দিয়ে ব্যাপারটা শতদল এমন করে সাজাতে চেয়েছিল, যাতে করে লোকের ধারণা হয় আসলে হত্যাকারী শতদলকেই হত্যা করতে চেয়েছিল কিন্তু আলোয়ানের ব্যাপারে ভুল করে সীতাকে হত্যা করে ফেলেছে! সীতার হত্যা একটা pure accident ভিন্ন কিছুই নয়! বলতে বলতে কিরীটী থামল।

হাতের পাইপটা কখন একসময় নিবে গিয়েছিল। সেটায় আবার অগ্নি-সংযোগ করে কিরীটী তার অসমাপ্ত কাহিনী শুরু করলে।

এবারে আমি আসব চতুর্থ অধ্যায়ে। রাণু দেবীর সহাধ্যায়ী কবিতা দেবী, রাণুদের কলকাতার বাসাতেই শতদলের সঙ্গে কবিতা দেবীর পরিচয় হয়। এবং কবিতা দেবীর মনে সেই পরিচয়টা গাঢ় হয়ে উঠে ভালবাসায় পরিণত হয়। প্রথম victim সীতা ও দ্বিতীয় victim হলেন কবিতা দেবী।

কবিতা দেবীর দিকে তাকালাম। মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে তাঁর।

কিরীটী বলে চলে, টের পেলাম আমি ব্যাপারটা একটি প্রবাল পাথর থেকে।

হিরণ্ময়ী দেবী এবার কথা বললেন, সেদিন আপনাকে আমি বলিনি মিঃ রায়, একই ধরনের প্রবাল পাথর দেওয়া দুটি আংটি ছিল বাবার! একটি দাদা নিয়েছিল, অন্যটি আমি নিয়েছিলাম। আমার আংটিটা আমার স্বামীকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলাম—আর দ্বিতীয়টি রণধীর চৌধুরীর মৃত্যুর পর শতদলের হাতে যায়। পরে আমার মনে পড়ে, শতদলের হাতে প্রথম দিন আংটিটা দেখেছিলাম। এবং সেটাই বোধ হয় শতদল কবিতা দেবীকে দেয়। কেমন তাই না কবিতা দেবী?

কবিতা গুহ মৃদুভাবে ঘাড় নাড়লেন।

এবং সেই জন্যই পাথরটা কবিতা দেবীর বাইরের ঘরে কুড়িয়ে পাওয়ায় ও পরে কবিতা দেবীর আংটির পাথরটা হারানোর সংবাদে কবিতা দেবী যখন আংটিটা এনে আমাকে দেখালেন, চকিতে আমার সব কথা মনে পড়ে গেল। ও সেই সঙ্গে সঙ্গে কবিতা দেবী ও শতদলের relationটা চোখের উপরে আমার স্পষ্ট হয়ে উঠল। বুঝলাম কবিতা দেবীও শতদলের ফাঁদে পা দিয়ে মজেছেন। ডন জুয়ান শতদল! যাক, আবার পূর্বের কথায় ফিরে যাই। সীতাকে হত্যা করবার পরই আমি সাবধান হলাম। শতদলকে আর free রাখতে সাহস হল না। নার্সিং হোমে নিয়ে চোখে চোখে রাখলাম—so that he might not play any more dirty tricks। কিন্তু এবারে কবিতা দেবী হলেন তার সহায়। নার্সিং হোমের ব্যাপারগুলো সব কবিতা দেবীর সাহায্যেই ঘটে। কবিতা দেবীর বাড়িতে সন্দেশ ও ফুল নার্সিং হোমে পাঠাবার জন্য কেউ সংবাদ দেয়নি তাঁকে। A made-up story কবিতা দেবীর! শতদলের পরামর্শমতই কবিতা দেবী যা করবার করেছেন। এদিকে শতদল নার্সিং হোমে বন্দী থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে উঠেছিল, কারণ কুমারেশ একবার যখন ছাড়া পেয়েছে সমস্ত

planটাই তার বানচাল হয়ে যেতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। সে ভয়ও ছিল, তাই ভুখনার সাহায্যে ফটোটা চুরি করে রাতারাতি এখান হতে সরে পড়বার মতলব ছিল! নার্সিং হোমের জানালাপথে ধুতি ঝুলিয়ে তার সাহায্যে নেমে গিয়ে নিরালায় যায়। নার্স দুধ নিয়ে যখন তার কেবিনে যায় শতদল আলো নিবিয়ে তখন ঘুমের ভান করেছে। এবং নার্স চলে যাবার সংগে সংগেই কেবিন ত্যাগ করে। কিন্তু ধর্মের কল নড়ে উঠল বাতাসে—ভাগ্যচক্রে সব গেল ভেস্তে, বাধ্য হয়েই তাকে তাই ছবিটা ফেলে কেবিনে ফিরে আসতে হল। এবং আবার করতে হল অভিনয়—তার উপরে আর-একবার attempt হয়েছে। কিন্তু তখন বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে। রঙের খেলার আগেই ড্রপ পড়েছে!

ঘোষাল সাহেব প্রশ্ন করলেন, কিন্তু শতদলবাবুই যে সব কিছুর মূলে জানলেন কী করে মিঃ রায় সর্বপ্রথম?

বললাম তো। সীতা নিহত হবার পরই। তার আগে পর্যন্তও সন্দেহটা দৃঢ় হতে পারেনি। ভাসা-ভাসা অবস্থাতেই মনের মধ্যে ছিল। সে রাত্রে সর্বক্ষণই আমার দুজনের ওপরে নজর ছিল, একজন সীতা ও অন্যজন শতদল। সীতা ছাদ থেকে নেমে যাওয়ার পরই কিছুক্ষণ বাদে শতদলকে আমি নীচে যেতে দেখেছি এবং ঠিক তার পশ্চাতেই দেখেছিলাম নীচে যেতে কবিতা দেবীকে। কবিতা দেবীর চিৎকারেই আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, সীতার হত্যার ব্যাপারটা কবিতা দেবী সবটা না জানলেও যে অনেক কিছুই জানেন, সেটা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই সে রাত্রে বুঝেছিলাম। তখুনি মনে হয় কবিতা দেবী কাউকে shield করছেন deliberately! কিন্তু কাকে? হঠাৎ চকিতে একটা কথা ঐ সংগে মনে হয়, কবিতা দেবী শতদলকেই shield করছেন না তো! ভাবতে গিয়ে দেখলাম সেটাই সম্ভব। সেটাই স্বাভাবিক। আর তখন সন্দেহ রইল না। বুঝলাম এ খেলা শতদলেরই। ইতিমধ্যে রণধীরের চিঠির কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। তাই শতদলকে দোষী বুঝতে পেরেও, strong একটা motive খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কবিতা দেবীর বাড়ি থেকে ফিরবার পথে আংটির পাথর-রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় ব্যাপারটা আর একবার গোড়া থেকে নতুন করে ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল চিঠিটার কথা। হোটেলে ফিরেই চিঠিটা নিয়ে বসলাম। ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই সব স্পষ্ট হয়ে গেল, দুয়ে দুয়ে চার অঙ্ক মিলে গেল। তখুনি বুঝলাম, গত রাত্রে ছবিটা চুরি করবার চেষ্টা করে যখন হত্যাকারী সফল হয়নি, আর একবার সে সম্ভবত ঐ রাত্রেই attempt নেবে। সংগে সংগে 'নিরালা'য় গিয়ে হানা দিলাম এবং অনুমান যে আমার মিথ্যা হয়নি তার প্রমাণও পাওয়া গেল হাতে হাতে। কিরীটী তার কথা শেষ করল।

দিন-দুই বাদে ফিরবার পথে ট্রেনের কামরায় কিরীটী বলছিল, হিরণ্ময়ী দেবীর কথাই ঘুরে-ফিরে মনে পড়ছে সুব্রত। একমাত্র মেয়ে সীতার মৃত্যুটা সত্যিই বড় মর্মান্তিক হয়েছে তাঁর কাছে, ঘুণাক্ষরেও তিনি সন্দেহ করেননি কখনো যে সীতা শতদলকে ভালবাসে। এবং সেটাই যখন প্রকাশ পেল, তাঁর মুখের দিকে তখন যদি তুমি তাকাতে দেখতে কি সর্বস্ব হারানোর বেদনাই না তাঁর মুখের ওপরে ফুটে উঠেছিল। একেই বলে মর্মান্তিক বিয়োগান্ত ব্যাপার। যে সম্পত্তির লোভে তিনি 'নিরালা' আঁকড়ে পড়েছিলেন সে সম্পত্তিও তাঁর হস্তগত হল না, ঐ সংগে হারাতে হল মর্মান্তিক দুঃখ ও লজ্জার মধ্যে

দিয়ে একমাত্র কন্যাকেও। শতদলও শূন্য হাতে চরম দণ্ডের জন্য অপেক্ষা করছে, হিরণ্ময়ীকেও ফিরে যেতে হল শূন্য হাতে। সীতাকে শূন্য হাতে বিদায় নিতে হল, কবিতা ফিরে গেল শূন্য হাতে। রণধীর চৌধুরীর এত সাধের 'নিরালা'—তাও পড়ে রইল শূন্য, কুমারেশ বা রাণু কোনদিনই হয়তো ওখানে পা দেবে না। হিরণ্ময়ী ও হরবিলাস তো দেবেনই না।

কথা শেষ করে কিরীটী পাইপটা মুখে তুলে নিল।

ট্রেন ছুটে চলেছে কলকাতা অভিমুখে।

বৌরাণীর বিল

॥ ১ ॥

প্রথম আষাঢ়ের নববর্ষা।

কলকাতা শহরে বর্ষাটা এবারে বেশ দেরি করেই নেমেছে। তাপদগ্ধ ধরিত্রী যেন জলস্নান করে জুড়িয়ে গিয়েছে। মেঘলা ভিজে আকাশে সন্ধ্যার তরল অন্ধকার যেন ঘন হয়ে চাপ বেঁধে উঠেছে। ঘরের মধ্যে কিরীটী আর সত্যজিৎ মুখোমুখি দুজনে দুটো সোফার ওপরে বসে। সত্যজিৎ তার বক্তব্য শেষ করে এনেছে তখন; দীর্ঘ উনিশ বছরের ব্যবধানে দুটো হত্যা। প্রথমটি স্ত্রী, উনিশ বৎসর পরে তার স্বামী। এবং দুটি হত্যারই অকুস্থান বৌরাণীর বিলের মধ্যে সেই দ্বীপ। দ্বীপটির মধ্যে আছে একটি বিরাম কুটির—তার চারপাশে ফুলের বাগান। দ্বীপটিকে ওখানকার লোকেরা 'নন্দন কানন' বলে।

আরো আশ্চর্য কি জানেন মিঃ রায়! নন্দন কাননের মধ্যে একটি শাখা-প্রশাখা বকুল বৃক্ষ আছে, সেই বকুল বৃক্ষের তলাতেই দুটি মৃতদেহ পাওয়া যায়।

কিরীটী মৃদু স্বরে বলে, Queer coincidence!

তাই। জবাব দেয় সত্যজিৎ।

কিরীটী ঘরের মধ্যে জমাট বেঁধে ওঠা আবছা আলো-আঁধারের দিকে তাকিয়ে আর একবার সত্যজিতের বর্ণিত কাহিনীটা প্রথম থেকে ভাবতে শুরু করে।

মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী আর ইহজগতে নেই। তিনি নিহত।

পিতা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর নিহত হওয়ার সংবাদটা কন্যা সবিতাকে যেন একেবারে কয়েক মুহূর্তের জন্য অসাড় ও পঙ্গু করে দিল। ক্ষণপূর্বে পাওয়া তারবার্তাটা হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে হস্টেলের কমনরুমের বারান্দায় অসহায় স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে সবিতা।

আজই মাত্র কলেজের গ্রীষ্মের ছুটির বন্ধ হলো।

কাল রাত্রের ট্রেনে সবিতা বাড়ি যাবে, দুপুরে সে বাবাকে একটা তারও করে দিয়েছে তার যাত্রার সংবাদ দিয়ে। কয়েকটা আবশ্যকীয় জিনিসপত্র কিনবার জন্য মার্কেটে গিয়েছিল সবিতা, হস্টেলে ফিরে আসতেই হস্টেলের দারোয়ান তারটা তার হাতে দিল। একটু আশ্চর্যই হয়ে গিয়েছিল সবিতা হঠাৎ এসময় একটি তার পেয়ে। হঠাৎ তার এলো কেন? ভয়ে ও সংশয়ে তারটা খুলে পড়তেই মুহূর্তে যেন সবিতা একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গাঘাতে একেবারে অসাড় হয়ে গিয়েছে।

তারটা করেছেন নায়েব কাকা বসন্ত সেন। মর্মঘাতী তার।

Baboomahashaya Killed! Come Sharp!

Naeb-Kaka—Basanta

নায়েব কাকা যে ওকে তার করেছেন ওর তারটা যাওয়ার আগেই, তার প্রেরণের সময়টা দেখেই সবিতা সেটা বুঝতে পারে।

বিমূঢ় হতচকিত ভাবটা কতকটা সামলে নিয়ে সবিতা তার হাতঘড়িটার

দিকে তাকাল; সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা তখন সবেমাত্র। ইচ্ছা করলে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে রওনা হতে পারলেই তো অনায়াসেই সে আজকের রাত্রের ট্রেনটাই ধরতে পারে। ট্রেন তো সেই রাত সাড়ে নটায়। এখনো পুরো দুটো ঘণ্টা সময় ওর হাতে আছে। হ্যাঁ, যেমন করেই হোক আজকের রাত্রের ট্রেনটাই ওকে ধরতে হবে। সবিতা সহসা যেন জোর করেই মনের ও দেহের অসহায়, বিমূঢ় পঙ্গু অবস্থাটাকে ঝেড়ে ফেলে, আর মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে বারান্দাটা পার হয়ে সোজা দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। এবং সিঁড়ি অতিক্রম করে সোজা একেবারে এসে দোতলার বারান্দার শেষপ্রান্তে হস্টেল সুপারিন্‌টেনডেণ্ট মিসেস্ ব্যানার্জীর ভেজানো দ্বারের সামনে এসে দরজার গায়ে মৃদু আঘাত করল।

মিসেস্ ব্যানার্জী ঘরের মধ্যেই ছিলেন, মৃদুকণ্ঠে আহ্বান জানালেন, কে, ভিতরে এসো।

সবিতা দরজা ঠেলে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল।

সবিতার চোখমুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস্ ব্যানার্জী যেন বেশ একটু বিস্মিত হন, ব্যাপার কি সবিতা! কি হয়েছে? অসুখ করেনি তো?

নিঃশব্দে কোন কথা না বলে সবিতা ক্ষণপূর্বে পাওয়া তারটা মিসেস্ ব্যানার্জীর দিকে এগিয়ে দিল।

বিস্মিতা মিসেস্ ব্যানার্জী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তারটা পড়ে সবিতার মুখের দিকে তাকালেন, কখন পেলে এ তার?

এই কিছুক্ষণ আগে দারোয়ান দিল—

হুঁ!

আমি আজকের রাত্রের গাড়িতেই যেতে চাই মিসেস্ ব্যানার্জী!

আজ রাত্রের গাড়িতেই যাবে, ক'টায় গাড়ি জান কিছু?

হ্যাঁ, জানি।

বেশ, পার তো যাও।

সবিতা আর দ্বিরুক্তি না করে সুপারিন্‌টেনডেণ্টের ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

কোনমতে একটা সুটকেসের মধ্যে কিছু জামা-কাপড় নিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে সবিতা ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বললে, শিয়ালদহ স্টেশন!

একটা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কেটে সবিতা যখন ট্রেনের একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় এসে উঠে বসল, গাড়ি ছাড়তে তখন আর মাত্র মিনিট সাতেক বাকি।

গাড়িতে সে ছাড়াও আরো চারজন যাত্রী ছিল।

একটা বার্থ খালি।

একটু পরে সে বার্থটাও একজন অল্পবয়সী যুবক গাড়ি ছাড়বার ঠিক মিনিট চারেক আগে এসে অধিকার করল।

গাড়ি ছাড়ল।

একটা গুমোট গরমে এতক্ষণ কামরাটা যেন ঝলসে যাচ্ছিল, গাড়ি ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে চলমান গাড়ির খোলা জানালা-পথে একটা তৃপ্তির পরশ দিয়ে গেল।

স্টেশন ইয়ার্ডের আলোগুলো ক্রমে একটা দুটো করে গাড়ির ক্রমবর্ধমান

গতির সঙ্গে পিছিয়ে পড়ছে।

হারিয়ে যাচ্ছে আলোগুলো পশ্চাতের অন্ধকারে একটি দুটি করে।

জ্যৈষ্ঠের একেবারে গোড়ার দিক। এবারে একদিনের জন্যও কালবৈশাখী এখনও দেখা দেয়নি কে জানে কেন!

সেই সন্ধ্যা থেকেই আকাশে মেঘ করে আছে, একটা থমথমে ভাব।

সবিতা গাড়ির খোলা জানলা-পথে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণ যেন শ্বাস নেবার অবকাশ পায়।

ভাল করে একবার ভেবে দেখবার চেষ্টা করে সমগ্র ব্যাপারটা আগাগোড়া।

মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী—তার বাবা। এই পৃথিবীতে তার একমাত্র আশ্রয়স্থল আর ইহজগতে নেই।

বাড়ি গিয়ে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই দেউড়ি পার হয়েই কাছারী-বাড়ির দালানে তাঁর সেই সৌম্য প্রশান্ত চেহারাটা আর চোখে পড়বে না।

সস্নেহ মধুর সেই হাসি দিয়ে কেউ আর অভ্যর্থনা জানাবে না, পথে কোন কষ্ট হয়নি তো মা! গাড়ি ঠিক সময়ে স্টেশনে পৌঁছেছিল?

প্রত্যেকবার ছুটিতে যাবার পর প্রথম দর্শনে কেউ আর বলবে না, তুই হাতমুখ ধুয়ে চা খা, আমি এখুনি আসছি সবু!

ও আর কাউকে প্রত্যুত্তরে আব্দার-ভরা কণ্ঠে বলবে না, দেরি করো না বাবা, এখুনি এসো কিন্তু। তুমি এলে তবে দুজনে একসঙ্গে বসে চা খাবো। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে কিন্তু—

না রে না। আসছি, তুই যা—

এগিয়ে যেতে পিছন থেকে আর ও শুনতে পাবে না বাবার গলা, বসন্ত, আজ আমাকে ছুটি দাও। নকাইচকাই এসেছে, আজ ওর অনারে আমার ছুটি।

ওকে আদর করে বাবা নকাইচকাই বলে ডাকেন।

নকাইচকাই ওঁর আদরের ডাক।

ওর চার বছর বয়সে মা মারা গিয়েছেন। বাবার কাছেই ও মানুষ। মাকে ওর কিছুই মনে নেই।

বাবার শোবার ঘরে শিয়রের ধারে মায়ের এনলার্জড্ ফটোটার দিকে কত-বার ও অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থেকেছে, কিন্তু কিছুই মনে করতে পারেনি। মা! মায়ের স্মৃতিটা এমন অস্পষ্ট!

মা-বাপ বলতে ঐ একজনকেই চিরদিন জেনে এসেছে।

কি শান্ত চরিত্রের মানুষ ওর বাবা! লোকে বলত অজাতশত্রু।

অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির জমিদার হলেও কাউকে একটা চড়া বা উঁচু কথা বলেননি। উদার শিশুর মত প্রকৃতি তার বাপের। কে শত্রুতা করে হত্যা করলে, নায়েব কাকা বসন্তবাবু তার বিশেষ কিছুই জানাননি, কেবল টেলিগ্রামে লিখেছেন :

Baboo Mahashaya killed! Come sharp!

Killed! নিহত!

কে-ই বা তাঁকে হত্যা করলে এবং কেনই বা তাঁকে হত্যা করলে!

ব্যাপারটা আগাগোড়া কিছুই যেন এখনো সবিতা বুঝে উঠতে পারছে না।

মেল ট্রেন।

এখন বেশ জোরেই চলেছে। লোহার চাকার একঘেয়ে ঘটাং ঘটাং শব্দটা শ্রবণকে পীড়িত করে তোলে।

আকাশে ইতিমধ্যে একসময় কখন মেঘটা বেশ চাপ বেঁধে ঘন হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ কয়েকটা বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা ওর চোখেমুখে এসে পড়তেই ওর চমক ভাঙল। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের সোনালী আলোয় মেঘাবৃত আকাশটা যেন ঝলকিয়ে উঠছে।

সবিতা ঘুরে বসে গাড়ির কামরার মধ্যে দৃষ্টিপাত করল।

উপরের দুটো বার্থ ও নিচের দুটো বার্থ অধিকার করে ইতিমধ্যে কখন একসময় চারজন যাত্রী নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে।

দুজন তারা এখনো কেবল জেগে।

সে ও সর্বশেষের আগন্তুক যাত্রী সেই তরুণ যুবকটি। যুবকটির সংগে কেবলমাত্র একটি মাঝারি আকারের চামড়ার সুটকেস ও হোল্ডলে বাঁধা একটি বেডিং।

বেডিংটা এখনো সে খোলেনি। তারই গায়ে হেলান দিয়ে সুটকেসটার উপরে জুতোসমেত পা দুটো তুলে দিয়ে কামরার আলোয় গভীর মনোযোগের সংগে কি একটা মোটা ইংরাজী বই পড়ছে।

সবিতা কতকটা অন্যমনস্কভাবেই তার ঠিক সামনের মধ্যকার বার্থে উপবিষ্ট, পাঠরত একমাত্র জাগ্রত তরুণ সহযাত্রীটির দিকে তাকাল।

বছর সাতাশ-আটাশ হয়ত বয়স হবে ওর।

দোহারা লম্বা গড়ন।

চোখেমুখে অর্থাৎ মুখের গঠনে একটা অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা যেন ফুটে বের হয়।

তৈলহীন রুক্ষ লম্বা চুলগুলো কামরার মধ্যস্থিত ফ্যানের হাওয়ায় কপালের উপর এসে থেকে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বাঁ গালের উপরে একটা দীর্ঘ গভীর ক্ষতচিহ্ন।

হঠাৎ ভদ্রলোকের বার্থের উপরে রক্ষিত চামড়ার সুটকেসটার উপরে নজর পড়ল সবিতার।

সত্যজিৎ রায়, রেংগুন।

বাংলায় লেখা সত্যজিৎ রায়, রেংগুন।

রেংগুন! সত্যজিৎ রায়! কথা দুটির মধ্যে কোথায় যেন একটা পরিচয়ের ইংগিত রয়েছে।

খুব বেশী দিনের কথা নয়। মাত্র বৎসরখানেক আগের কথা।

বাবার মুখে ইদানীং অনেকবার রেংগুনে অবস্থিত ঐ নামটির উল্লেখ ও শুনেছে।

বাবার ছোটবেলার বন্ধু সত্যভূষণ রায়ের একমাত্র ছেলে, সত্যজিৎ রায়।

বিলেত-ফেরত ইলেকট্রিক্যাল ইন্‌জিনীয়ার।

সংগে সংগে আবার বাবার কথা মনে পড়ে যায়। বাবা নিহত হয়েছেন। বাবা নিহত হয়েছেন কেবল এই কথাটাই ও নায়েব কাকার তারবার্তায় জেনেছে, তার চাইতে বেশী কিছুই ও জানতে পারেনি এখনো পর্যন্ত।

নিজের চিন্তার মধ্যেই সবিতা আবার তলিয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ অপরিচিত

কণ্ঠের সম্বোধনে চমকে মুখ তুলে তাকাল।

রাত বারোটা বাজে, ঘুমোবেন না? প্রশ্নকারী সম্মুখের মধ্যকার বার্থে উপবিষ্ট যুবক।

হ্যাঁ। মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় সবিতা।

কিন্তু আপনার তো দেখছি সঙ্গে কোন বেডিং পর্যন্ত নেই! যুবক স্মিতভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে আবার।

সত্যি! এতক্ষণে সবিতার খেয়াল হয়। তাড়াতাড়িতে বেডিংটা পর্যন্ত সঙ্গে আনেনি সবিতা।

অবিশ্যি আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহ'লে আমার সঙ্গে যা বেডিং আছে সেটা শেয়ার করে নিতে পারি—

না না, তার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি—

আপনি হয়ত ভাবছেন আমাকে আপনি বিব্রত করবেন! কিন্তু মোটেই তা নয় মিস্—

আমার নাম সবিতা চৌধুরী।

কতদূর যাবেন আপনি মিস্ চৌধুরী?

সবিতা তার গন্তব্যস্থানের কথা বলতেই যুবক সবিস্ময়ে বলে ওঠে, আশ্চর্য! আমিও তো একই জায়গার যাত্রী। আপনি কি মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর—

হ্যাঁ। আমি তাঁর মেয়ে—, বলতে বলতে সহসা এতক্ষণে সবিতার দু'চোখের দৃষ্টি অশ্রুবাষ্পে ঝাপসা হয়ে আসে নিজের অজ্ঞাতেই।

নিরুদ্ধ অন্তর-বেদনায় এতক্ষণ সবিতা ভিতরে ভিতরে গুমরে মরছিল। সেই সন্ধ্যায় পিতার নিহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া থেকে এই পর্যন্ত একফোঁটা অশ্রুও তার চোখ দিয়ে পড়েনি।

সহসা সত্যজিৎ রায়ের প্রশ্নে সে যে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীরই কন্যা এই পরিচয় দিতে গিয়ে তার চোখের পাতা দু'টো অশ্রুজলে ভিজে গেল।

সত্যজিৎ অবাক বিস্ময়ে সবিতার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

পিতার পরিচয় দিতে গিয়ে হঠাৎ তার দু'চোখের পাতা অশ্রুভারে টলমল করে উঠলো কেন ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

আমার নামটা আপনি শুনেছেন কিনা মিস্ চৌধুরী জানি না, আমার বাবা সত্যভূষণ রায় আপনার বাবা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর বাল্যবন্ধু। আপনার বাবার আমন্ত্রণ পেয়েই আমি বর্মা থেকে আপনাদের ওখানে যাচ্ছি।

সবিতা কি জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না। নিঃশব্দে সত্যজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এ একপক্ষে ভালই হলো। গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পৌঁছতে আমাদের কাল প্রায় দ্বিপ্রহর হবে। দীর্ঘ পথে আপনাকে সঙ্গী পেয়ে মন্দ হলো না। পথের একঘেঁয়েমিটা অনেকটা সহ্য হবে। সত্যি, কি আশ্চর্য যোগাযোগ দেখুন! বলতে বলতে মৃদু হাসে সত্যজিৎ।

সহসা একসময় সত্যজিৎ লক্ষ্য করে, তার এতগুলো কথার জবাবে একটি কথাও বলেনি এতক্ষণ সবিতা। একতরফা সে-ই কেবল এতক্ষণ বক্‌বক্ করে চলেছে।

এবং শুধু তাই নয়, যদি দেখবার তার না ভুল হয়ে থাকে তো সবিতার চোখে সুস্পষ্ট অশ্রুর আভাসও লক্ষ্য করেছে।

নিজের কৌতূহলকে আর দমন করতে পারে না সত্যজিৎ। এবং কোন প্রকার ইতস্তত না করে সোজাসুজিই প্রশ্ন করলে, মাফ করবেন মিস্ চৌধুরী, একটা কথা না বলে আর থাকতে পারছি না। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে বিশেষ রকম চিন্তিত ও অন্যমনস্ক আপনি। পরস্পরের পরিচয় থেকে যখন জানা গেছে এতদিন আমাদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও পরিচয়ের দাবী একটা উভয়েই আমরা উভয়ের কাছে করতে পারি, সেই পরিচয়ের দাবীতেই জিজ্ঞাসা করছি কথাটা। আশা করি মনে কিছু করবেন না।

না। আপনি হয়ত জানেন না মিঃ রায়, অতি বড় একটা দুঃসংবাদ পেয়েই আমি এই ট্রেনে দেশের বাড়িতে যাচ্ছি—

দুঃসংবাদ! বিস্মিত কণ্ঠে সত্যজিৎ প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। আমার বাবা, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, হঠাৎ নিহত হয়েছেন।

নিহত হয়েছেন! মৃদু কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করে বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে সত্যজিৎ তাকিয়ে থাকে সবিতার মুখের দিকে।

হ্যাঁ।

আর একটু স্পষ্ট করে বলুন মিস চৌধুরী, আমি যে আপনার কথা কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

এর চাইতে বেশী আমিও কিছুই জানি না মিঃ রায়। বসন্ত কাকা তার করে কেবলমাত্র ঐটুকুই আমায় জানিয়ে যেতে লিখেছেন।

কিন্তু—

আমি নিজেও এতক্ষণ ধরে ভেবে ভেবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না, কেমন করে এত বড় দুর্ঘটনাটা সম্ভব হলো! আমার অজাতশত্রু বাপকে কে হত্যা করতে পারে!

বাইরে থেকে একজন মানুষকে সব সময় সম্পূর্ণভাবে বিচার করা চলে না সবিতা দেবী। তাছাড়া আপনার বাবার মত অত বড় একটা জমিদারী চালাতে গেলে নিজের অজ্ঞাতেই দু'একজন শত্রু সৃষ্টি করা এমন একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু সে-সব কথা পরে ভাবলেও চলতে পারে। সব চাইতে বড় কথা হচ্ছে এখন তিনি নিহত হয়েছেন। এবং এক্ষেত্রে আমি বা আপনি সে ব্যাপারে কতদূর কি করতে পারি—

আমরা আর কি করতে পারি বা পারবো! কতকটা যেন হতাশাই সবিতার কণ্ঠে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নিশ্চয়ই। আমাদের দুজনেরই অনেক কিছুই করণীয় আছে। আপনার পিতা এবং আমার পিতা বাল্যবন্ধু। আগে চলুন সেখানে পেঁাছই, তারপর সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে জেনে নিয়ে যেমন করেই হোক এ হত্যা-রহস্যের মীমাংসা করবারও তো অন্তত একটা চেষ্টা করতে পারি।

সত্যজিতের কথাটা সবিতা যেন ঠিক হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারে না।

ও বুঝে উঠতে পারে না, ওরা দুজনে ওখানে গিয়ে পেঁাছেই বা কি করে তার পিতার হত্যা-রহস্যের মীমাংসা করতে পারে।

কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তার পিতার মৃত্যু-রহস্যের মীমাংসা হোক বা না হোক, পথের মাঝখানে সত্যজিতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এবং তার সরস মধুর কথাবার্তায় পিতার হত্যা-সংবাদে যে অসহনীয় দুঃখ তাকে একেবারে বিমূঢ় ও অসহায় করে ফেলেছিল তা থেকে ও যেন কতকটা সান্ত্বনা পায়।

অন্তত তার দুঃখের ভাগীদার যে নিঃসম্পর্কীয় হলেও একজন আছে, এ কথাটা জেনেও যেন ও মনের মধ্যে অনেকটা সান্ত্বনা পায়। অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়।

॥ ২ ॥

নায়েব বসন্তবাবু নিজেই স্টেশনে এসেছিলেন সবিতা তার পেয়েই রওনা হবে এই আশা করে।

বসন্তবাবুর বয়স ষাটের কোঠা প্রায় পার হতে চললেও বার্ধক্য এখনো তাঁকে খুব বেশী কাবু করতে পারেনি।

চুলগুলো পেকে একেবারে সাদা হয়ে গেলেও শরীরের গঠন ও কার্য-ক্ষমতার মধ্যে কোথায়ও এতটুকু বার্ধক্যের ছায়া পড়েনি এখনো। তাঁর পেশল উঁচু লম্বা দেহের গঠন দেখলে মনে হয় দেহে এখনও তাঁর প্রচুর ক্ষমতা। এখনো তিনি দশ-পনের মাইল পথ অনায়াসে হেঁটে চলে যেতে পারেন।

লাঠি হাতে পেলে এখনো দু'জন লোকের মহড়া অনায়াসেই নিতে পারেন।

বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে চাকরিতে তিনি এসে ঢুকে-ছিলেন, আজ দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর এই জমিদারীতে তিনি চাকরি করছেন।

এই চৌধুরী-বাড়িতে তাঁর একটা যুগ কেটে গেল।

জমিদার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী বয়সে তাঁর চাইতে বছর তিনেক মাত্র বড় ছিলেন।

একটু বেশী বয়সেই মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী বিবাহ করেছিলেন এবং বিবাহের প্রায় বছর দশেক বাদে সবিতার জন্ম হয়।

সবিতার যখন চার বছর বয়স তখন সবিতার মা হেমপ্রভা মারা যান।

মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী আর বিবাহ করেননি।

বসন্তবাবু অকৃতদার। এবং যতদূর তাঁর সম্পর্কে জানা যায়, ত্রিসংসারে তাঁর সত্যিকারের আপনার বলতে কেউ নেই এবং কোনদিন কেউ তাঁর আত্মীয়-স্বজন আছে বলেও তিনি স্বীকার করেন না।

দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছরের মধ্যে মাত্র বারচারেক তিনি তীর্থভ্রমণের নাম করে মাস-দুই করে ছুটি নিয়ে বাইরে গিয়েছেন।

ঐ চারবার ছাড়া কেউ তাঁকে কোনদিন ঐ জায়গা ছেড়ে একটা দিনের জন্যও বাইরে যেতে দেখেনি।

যত বড় বিপদই হোক—বিপদে ভেঙে পড়া বা বিমূঢ় হয়ে পড়ার মত লোক নন বসন্তবাবু।

সবিতা ও সত্যজিৎকে পাশাপাশি ট্রেন থেকে নেমে আসতে দেখে বসন্তবাবু আর অগ্রসর না হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে ছিলেন সত্যজিতের দিকে।

সত্যজিৎ কিন্তু নিজেই এগিয়ে এসে নিজের পরিচয়টা দিল, আমি রেঙ্গুনের সত্যভূষণবাবুর ছেলে সত্যজিৎ।

সত্যজিৎ সম্পর্কে সকল ব্যাপার জানা থাকলেও ইতিপূর্বে বসন্তবাবু সত্যজিৎকে দেখেননি।

নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন, এসো। তোমার আসবার কথা ছিল আমি বাবুর মুখেই শুনেছিলাম।

অতঃপর সবিতার দিকে ফিরে তাকিয়ে সস্নেহে বললেন, চলো মা, বাইরে টমমম দাঁড়িয়ে আছে।"

মালপত্র সামান্য যা সঙ্গে ছিল সহিস লছমনের সাহায্যে টমটমের পিছনে তুলে দিয়ে তিনজন পাশাপাশি টমটমে উঠে বসলেন।

বসন্তবাবু নিজেই টমটম হাঁকিয়ে নিয়ে এসেছেন।

জায়গাটা আধা শহর আধা গ্রামের মত।

বেলা প্রায় পড়ে এলো।

আজ গাড়িটা প্রায় ঘণ্টা আড়াই লেট্ ছিল।

নিঃশেষিত দ্বিপ্রহরের ম্লান বিধুর আলোয় উঁচু কাঁচা মাটির সড়কের দু'পাশের গাছপালা, গৃহস্থের ক্ষেতখামার, ঘরবাড়িগুলো কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে বলে মনে হয়।

সারাটা দিনের অসহ্য গ্রীষ্মের রৌদ্রতাপে সব কিছু যেন ঝলসে গিয়েছে বলে মনে হয়। বসন্তবাবু একধারে বসে নিঃশব্দে টমটম চালাচ্ছেন, অন্য পাশে ওরা সবিতা ও সত্যজিৎ নিঃশব্দে বসে আছে গা ঘেঁষে পাশাপাশি।

তিনজনের কারো মুখেই কোন কথা নেই।

স্টেশন থেকে বর্তমান জমিদারবাড়ি প্রায় দীর্ঘ পাঁচ মাইল পথ হবে।

স্টেশন থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে ছোট শহরটি গড়ে উঠেছে হাজার দশেক লোকজন নিয়ে, জমিদারের বর্তমান বাসভবন শহর থেকেও প্রায় তিন মাইল দূরে নির্জন একটা বিলের ধারে।

বর্তমান জমিদারদের বাসভবনের আশেপাশে কোন বসতবাটিই নেই।

প্রথম দিকে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী বাপের আমলের পুরাতন যে জমিদার বাটি একটা ছিল তাতেই বাস করতেন।

প্রমোদভবনে এসে বসবাস করছিলেন তাও আজ দীর্ঘ উনিশ বৎসর হয়ে গেল।

মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর পূর্বপুরুষেরা বছরের কিছুটা সময় এই দূরবর্তী নিরালা প্রমোদভবনে এসে আনন্দ ও স্ফূর্তি করে কাটিয়ে যেতেন মাত্র।

প্রমোদভবনের ব্যবহারটা ক্রমে কমে আসতে থাকে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর পিতার আমল থেকেই।

দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর প্রমোদভবন অব্যবহার্য হয়ে পড়ে থাকবার পর আবার একদা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী প্রমোদভবনের সংস্কার সাধন করে পুরাতন পৈতৃক আমলের জমিদার-বাটি থেকে অসুস্থা স্ত্রী হেমপ্রভা ও একমাত্র চার বৎসরের কন্যা সবিতাকে নিয়ে কিছুকাল বাস করবেন বলে এসেছিলেন। কিন্তু প্রমোদ-ভবনে আসবার চারদিনের মধ্যেই হেমপ্রভা অকস্মাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায় অসুস্থা স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে গেলেন এবং ফিরে এসে পুরাতন জমিদার-ভবনে গিয়ে উঠলেও একটা বেলাও সেখানে কাটাতে পারলেন না।

হেমপ্রভার সহস্র স্মৃতি-বিজড়িত বিরাট প্রাসাদের কক্ষগুলো দিবারাত্রি যেন মৃত্যুঞ্জয়কে পীড়িত ও ব্যথিত করে তুলতে লাগল। সন্ধ্যার দিকেই আবার পালিয়ে এলেন ঐ দিনই তিনি পুরাতন জমিদার-ভবন ত্যাগ করে প্রমোদ-

ভবনেই।

সবিতার বাল্য ও শৈশব ঐ প্রমোদভবনে কেটেছে।

জমিদারী আর মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর চাল ও পাটের ব্যবসা ছিল।

পরিত্যক্ত বিরাট প্রাসাদটা জুড়ে মৃত্যুঞ্জয় তাঁর কাছারী করলেন।

প্রত্যহ টমটমে চড়ে দ্বিপ্রহরের আহারাদির পর মৃত্যুঞ্জয় পুরাতন প্রাসাদে আসতেন এবং নিজে উপস্থিত থেকে সমস্ত কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করে, ব্যবস্থা-পত্র করে রাত্রে একেবারে ফিরতেন।

ঘোড়ার গলার ঘণ্টিটা ঠুং ঠুং করে সায়াহ্নবেলার মন্থর বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বৈশাখের করুণ রিক্ততা।

আজও আকাশের পশ্চিম প্রান্তে মেঘের ইশারা দেখা দিয়েছে। গতকালের মত এবং আজও হয়ত কালবৈশাখী দেখা দিতে পারে।

ক্রমে আদালত, স্কুলবাড়ি, বাজার ছাড়িয়ে টমটম শহরকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলে।

এর পর মাঝখানে সরু কাঁচামাটির অপ্রশস্থ সড়ক এবং দুপাশে চষা ভূমি।

শহর ছাড়িয়ে প্রায় মাইল দুই গেলে বৌরাণীর বিল।

বৌরাণীর বিলের ধার দিয়ে প্রায় সোয়া ক্রোশটাক পথ এগিয়ে গেলে রাস্তাটা যেন বিলের জলের মধ্যে গিয়ে দুহাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হঠাৎ।

বিলের মধ্যেই দোতলা পাকা ইটের গাঁথুনি বাড়িটাই প্রমোদভবন, বর্তমান জমিদারের বসতবাটি।

প্রমোদভবনে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

সহিসের হাতে ঘোড়ার লাগাম তুলে দিয়ে বসন্তবাবু টমটম থেকে নেমে ওদের দুজনকেও নামতে বললেন।

সামনেই একটা টানা প্রকাণ্ড বারান্দা রেলিং দিয়ে ঘেরা।

বারান্দার ঝোলানো বাতিটা জেবলে দেওয়া হয়েছে। বাইরে বাতাস ছেড়েছে, বাতিটা দুলছে বাতাসে।

সবিতা প্রমোদভবনের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যেন হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়।

সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে সমগ্র প্রমোদভবনের উপরে যেন একটা বিষাদের করুণ ছায়া নেমে এসেছে।

ক্রমেই বাতাসের বেগ বাড়ছে।

সকলে এসে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

তোমরা হাতমুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম করো মা—আমি ততক্ষণ হাতে-মুখে একজু জল দিয়ে আহ্নিকটা সেরেই আসছি।

সারাটা পথ একেবারে কঠিন মৌনব্রত অবলম্বন করে থেকে এই সর্বপ্রথম বসন্তবাবু ওদের সঙ্গে কথা বললেন।

এবং ওদের জবাবের কোনরূপ প্রতীক্ষা মাত্রও না করে সোজা তাঁর মহলের দিকে চলে গেলেন।

বনমালী ও কানাইয়ের মা।

বনমালী চৌধুরী-বাড়ির বহুদিনকার পুরাতন ভৃত্য।

আর দাসী কানাইয়ের মাও চৌধুরী-বাড়িতে আছে—তাও আজ পঁচিশ

বছর হবে বৈকি।

কানাইয়ের মা-ই কোলে-পিঠে করে সবিতাকে মানুষ করেছে

বনমালী আর কানাইয়ের মা দুজনেই একসঙ্গে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

বনমালীর হাতে একটা লণ্ঠন।

কানাইয়ের মা ঘরের মধ্যে ঢুকেই সবিতাকে লক্ষ্য করে বোধ হয় কাঁদতে যাচ্ছিল, কিন্তু সহসা সবিতার পাশে সত্যজিৎকে দেখে সে অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিল।

বনমালীর চোখেও জল আসছিল, সেও কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে সবিতাকেই সম্বোধন করে ভাঙা গলায় বললে, ভিতরে চল দিদিমণি।

হ্যাঁ, আপনি যান সবিতা দেবী, হাত-মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম করুন গে। আমি এই ঘরেই বসছি ততক্ষণ—

আপনিও আসুন সত্যজিৎবাবু। বলে কানাইয়ের মার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, কানাইয়ের মা, দোতলায় আমার পশের ঘরটাতেই এই বাবুর থাকবার ব্যবস্থা করে দাও। বনমালী, তুমিও যাও—ঘরটা কানাইয়ের মাকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি একটু গুছিয়ে দাও গে।

সত্যজিৎ বাধা দেয়, আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন সবিতা দেবী। ওসব হবে'খন।

বাবা থাকলে কোন কিছুর জন্যেই অবিশ্যি আমাকে ভাবতে হতো না সত্যজিৎবাবু! বলতে বলতে সবিতার চোখের কোল দুটো জলে চকচক করে ওঠে।

রাত বোধ করি দশটা হবে। কিছুক্ষণ আগে কালবৈশাখীর একপশলা ঝড়জল হয়ে গিয়েছে। খোলা জানালা-পথে ঝিরঝির করে জলে ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে ঘরের মধ্যে।

সবিতার কক্ষের মধ্যেই বসন্তবাবু, সত্যজিৎ ও সবিতা তিনজনে বসে কথা হচ্ছিল।

ঘরের এক কোণে কাঠের একটা ত্রিপয়ের উপরে সবুজ ঘেরাটোপ দেওয়া কেরোসিনের টেবিল-বাতিটা কমানো, মৃদুভাবে জ্বলছে। বাতির শিখাটা ইচ্ছে করে কমিয়ে রাখা হয়েছে। মৃদু আলোয় কক্ষের মধ্যে একটা আলোছায়ার স্বপ্ন যেন গড়ে উঠেছে।

বসন্তবাবু বলছিলেনঃ

ব্যাপারটা শুধু আশ্চর্যই নয়, রহস্যময়! পরশুদিন সকালে বৌরাণীর বিলের মধ্যে নন্দনকাননে বকুল গাছটার তলায় চৌধুরী মশাইয়ের মৃতদেহটা যখন আবিষ্কৃত হলো—

সত্যজিৎ বাধা দিল, মৃতদেহ প্রথম কে আবিষ্কার করে?

আমি। আমিই প্রথমে মৃতদেহ দেখতে পাই। সাধারণত চৌধুরী মশাইয়ের ইদানীং মাসখানেক ধরে শরীর একটু খারাপ যাওয়ায় বেলা করেই ঘুম থেকে উঠছিলেন।

তাহ'লেও সাতটার মধ্যেই তিনি শয্যাত্যাগ করতেন। পরশু সকালে আটটা বেলা পর্যন্তও যখন চৌধুরী মশাই শয়নঘর থেকে বের হলেন না, বনমালীই চৌধুরী মশাইকে ডাকতে গিয়ে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখে

ঘর খালি। ঘরের মধ্যে কেউ নেই। বনমালী এদিক ওদিক বাড়ির মধ্যে খোঁজা-খুঁজি করে আমাকে সংবাদ দেয়। আমি তো আশ্চর্যই হলাম বনমালীর কথা শুনে। কারণ এত সকালবেলা বেড়ানো বা বাড়ি থেকে কোথাও বের হওয়া তো তাঁর কোন দিনই অভ্যাস নেই। যাহোক সমস্ত বাড়িটা খুঁজেপেতেও যখন তাঁকে পেলাম না তখন বাড়ির চারপাশে খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম। তারপর আমিই খুঁজতে খুঁজতে তাঁর মৃতদেহ বৌরাণীর বিলের মধ্যে নন্দন কাননে গিয়ে দেখতে পেলাম।

কি অবস্থায় দেখলেন? সত্যজিৎ প্রশ্ন করল আবার।

দেখলাম বকুল গাছতলায় দেহটা লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছে। পরিধানে সেই আগের দিনেরই ধুতিটা, খালি গায়ে একটা মুগার চাদর জড়ানো। এক পায়ে চটিটা আছে, অন্য পায়ের চটিটা একটু দূরে পড়ে আছে।

মৃতদেহে কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল? সত্যজিৎ আবার প্রশ্ন করে।

না, তেমন কোন বিশেষ আঘাতের চিহ্নই দেহের কোথায়ও ছিল না, তবে নাকে ও মুখে রক্তমিশ্রিত ফেনা জমে ছিল।

আপনার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে তাঁকে কেউ বোধ হয় throttle—শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। তাই কি?

সত্যজিতের প্রশ্নে তার মুখের দিকে তাকালেন বসন্তবাবু এবং বললেন, এখানকার সরকারী ডাক্তারের তাই অভিমত। মৃতদেহ ময়না-তদন্তের ফলে নাকি তাঁকে শ্বাসরোধ করেই হত্যা করা হয়েছে, এইটাই প্রমাণ হয়।

সত্যজিৎ তাকাল বসন্তবাবুর মুখের দিকে।

সবিতা নিজের অজ্ঞাতেই একটা অর্ধস্ফুট আর্তকাতর শব্দ করে ওঠে।

বসন্তবাবুর বুকখানা কাঁপিয়েও একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল।

বললেন, মৃতদেহ কালই প্রত্যুষে সৎকার করা হবে।

কথাটা যেন কোনমতে জানিয়ে দিয়ে নিজের দায় থেকে মুক্তি পেলেন বসন্তবাবু।

পাষাণের ভারের মত যে ব্যথাটা এ দু'দিন তাঁর বুকের মধ্যে জমাট বেঁধে ছিল, সবিতার কাছে সব খুলে বলবার পর থেকে যেন কতকটা লাঘব বোধ করলেন।

আচ্ছা নায়েব মশাই, এই মৃত্যুরহস্য তদন্ত করে কোন কিছুই কি আপনারা জানতে পারেননি?

না। কিছুই আজ পর্যন্ত জানতে পারা যায়নি। দারোগা সাহেব এ বাড়ির চাকর-বাকর ঝি দারোয়ান সহিস সকলকেই যতদূর সম্ভব জেরা করেছেন, কিন্তু—

বনমালী ও কানাইয়ের মা ছাড়া এ বাড়িতে আর কারা আছে?

আমি, সরকার রামলোচন, দারোয়ান ঝোটন সিং, সহিস লছমন, ঠাকুর শিবদাস—

এরা কেউ কিছু বলতে পারলে না?

না।

এরা সকলেই বিশ্বাসযোগ্য?

হ্যাঁ, তা বৈকি। অনেকদিন ধরেই তো ওরা এ বাড়িতে কাজ করছে। তাছাড়া চৌধুরী মশাইকে গলা টিপে হত্যা করে এদের কারই বা কি লাভ

হতে পারে!

লাভালাভের কথাটা কি অত সহজেই বিচার করা চলে নায়েবমশাই? মানুষের লাভক্ষতির তুলাদণ্ডটি এত সূক্ষ্ম ভারবৈষম্যেই এদিক-ওদিক হয় যে ভাবতে গেলে যেন অনেক সময় বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। অবশ্য আপনি আমার চাইতে অনেক বেশী প্রবীণ ও বিচক্ষণ—, শেষের দিকের কথা কটা সত্যজিৎ যেন কতকটা ইচ্ছে করেই যোগ করে দেয় নিজের বক্তব্যের সঙ্গে; কারণ সত্যজিৎ কথা বলতে বলতেই লক্ষ্য করেছিল ওঁর শেষের কথাগুলি শুনে, বসন্তবাবুর মুখের রেখায় একটা চাপা বিরক্তি ভাব যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে!

সত্যজিতের শেষের কথাগুলোতেও কিন্তু বসন্তবাবুর মুখের বিরক্তি ভাবটা গেল না। এবং সত্যজিতের কথার উত্তরে তিনি যখন কথা বললেন, তাঁর কণ্ঠস্বরে একটা বিরক্তির আভাস স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছিল, তোমার কথাটা যে মিথ্যে তা আমি বলছি না সত্যজিৎ। তবে এ বাড়িতে যারা আজ ৮/১০ বছর ধরে কাজ করছে তাদের সম্পর্কে আর যে যাই ধারণা করুক না কেন, আমি জানি অন্ততঃ তারা সকল প্রকার সন্দেহেরই অতীত।

নিশ্চয়ই তো। কিন্তু এটাও আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে probabilityর বা সম্ভাবনার দিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে এক্ষেত্রে একটা কথা আমরা না ভেবে পারছি না যে, চৌধুরী মশাইয়ের হত্যার ব্যাপারে সব কিছু বিবেচনা করে দেখতে গেলে একটা কথা আমাদের স্বতই মনে হবে এ বাড়িতে ঐ সময় যে বা যারা ছিল তাদের মধ্যে কেউই সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ যায় না বা যেতে পারে না।

সহসা বসন্তবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং সত্যজিতের কথার জবাব মাত্রও না দিয়ে এবং সোজা একেবারে সবিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, রাত অনেক হয়েছে মা, কাল সারা রাত ট্রেনে জেগে এসেছো, এবারে শুয়ে পড়। আমিও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত—আমি শুতে চললাম।

বসন্তবাবু সোজা ঘর থেকে চলে গেলেন।

ক্রমে তাঁর পায়ের চটিজুতোর শব্দটা সিঁড়ি-পথে মিলিয়ে গেল।

॥ ৩ ॥

অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই হঠাৎ কথার মধ্যে একপ্রকার জোর করেই যেন পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে বসন্তবাবু ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ায় সত্যজিৎ যেন নিজেই অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।

এ বাড়ির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সম্পূর্ণ তৃতীয় ব্যক্তি সে। তাছাড়া বসন্তবাবু এই পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট তো বটেই, এ পরিবারের একজন পরম হিতৈষীও বটে। বলতে গেলে একদিক থেকে এ পরিবারের আত্মীয়েরও অধিক বসন্তবাবু। এবং সেদিক দিয়ে সবিতার পিতার হত্যার ব্যাপার নিয়ে এরূপ স্পষ্টভাবে মতামত প্রকাশ করাটা হয়ত তার উচিত হয়নি।

বসন্তবাবুর চটির শব্দটা ক্রমে মিলিয়ে যাওয়ার পরও সত্যজিৎ ও সবিতা

কেউই কোন কথা বললে না কিছুক্ষণ ধরে।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

সত্যজিৎ মনে মনে ভাবছিল হয়ত সবিতাও তার কথায়বার্তায় অসন্তুষ্ট হয়েছে।

তাই সে ভাবছিল কিভাবে সমস্ত পরিস্থিতিটাকে সহজ করে আনা যেতে পারে।

হঠাৎ এমন সময় সবিতার ডাকে সত্যজিৎ মুখ তুলে তাকাল।

সত্যজিৎবাবু!

বলুন? সাগ্রহে সত্যজিৎ সবিতার মুখের দিকে তাকাল।

একটা কথা আপনাকে আমি বলে রাখি। যে বা যারা আমার দেবতার মত বাপকে এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে তাকে বা তাদের আমি কোনমতেই ক্ষমা করব না এবং এই নিষ্ঠুর হত্যা-রহস্যের মীমাংসার জন্য যতপ্রকার চেষ্টা সম্ভব সবই আমি করব। তার জন্য বাবার জমিদারীর শেষ কপর্দকটি পর্যন্তও যদি আমাকে ব্যয় করতে হয় তাতেও আমি পশ্চাৎপদ হবো না।

ঠিক এমনিটিই আমি আশা করেছিলাম সবিতা দেবী আপনার কাছ থেকে। দেখুন আপনার বুঝবার মত যথেষ্ট বয়স হয়েছে। যে স্নেহময় পিতাকে আপনি হারিয়েছেন, হাজারবার চোখের জল ফেলে বুক চাপড়ে কাঁদলে বা হা-হুতাশ করলেও আর তাঁকে জীবিত ফিরে পাওয়া যাবে না। এবং এও আমরা সকলেই জানি মা বাপ কারো চিরদিন বেঁচে থাকে না। কিন্তু এক্ষেত্রে সে যুক্তিকে মেনে নিয়েও চুপ করে থাকতে আমরা পারব না, কারণ তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়। নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। আর সেই কারণেই যেমন করে যে উপায় হোক এই হত্যা-রহস্য আপনাকে উদ্ঘাটন করতেই হবে। আমি সুনিশ্চিত যে এর মধ্যে কোন foul play রয়েছে।

সবিতার মনের মধ্যেও একটা প্রতিজ্ঞা সত্যজিতের কথায় ক্রমে ক্রমে দানা বেঁধে উঠছিল। বাপকে সে আর ফিরে পাবে না ঠিকই। কিন্তু সেও সহজে নিশ্চিন্ত হবে না। পিতার হত্যাকারীকে সে খুঁজে বের করবেই। কিন্তু কোন্ পথ ধরে সে এই রহস্যের মীমাংসায় অগ্রসর হবে?

হঠাৎ সে সত্যজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা সত্যজিৎবাবু, আপনার কি সত্যি-সত্যিই মনে হয় এ বাড়িতে যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যেই কেউ—

কথাটা যেন কেন সবিতা শেষ করতে পারে না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সবিতা সত্যজিতের মুখের দিকে।

চারিদিক ভেবে দেখতে গেলে ওদের কাউকেই তো আমরা সন্দেহের তালিকা থেকে বর্তমানে বাদ দিতে পারছি না সবিতা দেবী! কথাটা আপনিই চিন্তা করে দেখুন না!

কিন্তু—

অবশ্য এও ঠিক যে, এ কথা ধরে নিচ্ছি বলেই যে তাঁদের মধ্যেই কেউ একজন এক্ষেত্রে হত্যাকারী সুনিশ্চিতভাবে তাও তো নয়। কিন্তু যাক সে কথা, এদিকে রাত অনেক হল। আজকের মত আপনি বিশ্রাম নিন গিয়ে। কাল এদিককার কাজ মিটে গেলে আমি এখানকার থানার দারোগার সংগে একটিবার দেখা করব। তাঁর কাছে হয়ত আরো অনেক কিছুই আমরা জানতে পারব

সবিতা দেবী—

কিন্তু তিনি যদি আপনাকে সাহায্য না করেন?

সেও আমি ভেবে দেখেছি; পুলিসের লোকদের আমি জানি তো। পথ আমাদেরও আছে সেক্ষেত্রে—

কি? সবিতা তাকায় সত্যজিতের মুখের দিকে।

কলকাতার সি. ডি'র সুব্রত রায়কে আমার এক বন্ধু চেনে। শুধু চেনে নয়, সুব্রতবাবু তার বিশেষ বন্ধুও বটে। কাল সকালেই তাঁকে সব কথা জানিয়ে চিঠি দিতে আমি চাই। অবিশ্যি এতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে—

আপত্তি! কেন আপত্তি থাকবে? নিশ্চয়ই তাঁকে আপনি চিঠি লিখবেন।

বেশ, তবে সেই কথাই রইল।

এরপর পরস্পর পরস্পরকে শুভরাত্রি জানিয়ে সত্যজিৎ সবিতার কক্ষ হতে বের হয়ে এল।

রাত্রি প্রায় দেড়টা। সত্যজিতের চোখে ঘুম আসছিল না।

ঘরের মধ্যে গরমও খুব বেশী। দরজা খুলে ঘরের সংলগ্ন ছাতে এসে দাঁড়াল সত্যজিৎ। সন্ধ্যার কালবৈশাখীর ছায়ামাত্রও আর এখন আকাশের কোথাও অবশিষ্ট নেই। তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদও আকাশে অস্তমিতপ্রায়। রাত্রির কালো আকাশটা তারায় যেন ছেয়ে আছে। ছাতটা বেশ ঠাণ্ডা। অস্তমিতপ্রায় চাঁদের ক্ষীণ আলো সমস্ত প্রকৃত জুড়ে যেন পাতলা একটা পর্দার মত থিরথির করে কাঁপছে।

ছাতের চারিপাশে প্রায় বুক-সমান উঁচু প্রাচীর। প্রাচীরের গা ঘেঁষে দাঁড়াল সত্যজিৎ। প্রমোদভবনের তিন দিক বৌরাণীর বিল বেষ্টন করে রেখেছে। খুব প্রশস্ত বিল, এপার-ওপার নজর চলে না।

স্তিমিত চন্দ্রালোকে বিলের কালো জলে যেন অদ্ভুত একটা চাপা রহস্য ঘনিয়ে উঠেছে। বিলের এপারে ঝাউগাছের সারি। ঝাউয়ের সরু চিকন পাতাগুলো হাওয়ায় দুলে দুলে যেন একটা চাপা কান্না কাঁদছে।

জনমানবের বসতি থেকে অনেক দূরে নির্জন এই বৌরাণীর বিলের ধারে এই জমিদারের কোন পূর্বপুরুষ যিনি এই প্রমোদভবন তৈরী করেছিলেন, কালের অদৃশ্য কালো হাত তাঁকে নিশ্চিহ্নভাবে গ্রাস করতে পারেনি—অতীতের সাক্ষী হয়ে আজও সে দাঁড়িয়ে আছে।

কত রজনীর প্রমোদ-বিলাসের কত কাহিনী না জানি এই প্রমোদভবনের কক্ষে কক্ষে অশ্রুত আনন্দ বেদনায় গুমরে উঠেছে।

যারা একদা এই ভবনের কক্ষে কক্ষে বিলাস আনন্দ করে গিয়েছে তারা কি এখানকার স্মৃতি ভুলতে পেরেছে? অদেহী অশরীরীর দল আজও হয়ত প্রতি রাত্রে এখানে এসে ভিড় করে দাঁড়ায় পাশাপাশি হাত-ধরাধরি করে।

আসর জমায়। কান্না-হাসির দোল দোলানো অতীত স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো উল্টে যায় হয়ত।

কালো আকাশের বুকে চাঁদ হারিয়ে গিয়েছে।

সত্যজিৎ কক্ষের দিকে এগিয়ে চলল। ঘরের ভেজানো দরজাটার সামনে এসে কিন্তু সত্যজিৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল! ঘরের মধ্যে স্পষ্ট পদশব্দ।

সত্যজিৎ কান পেতে শোনবার চেষ্টা করে।

শুধু পদশব্দ কি। সেই সংগে যেন আসছে একটা মিষ্টি নূপুরের আওয়াজ।

অত্যন্ত মৃদু পদবিক্ষেপে কে যেন হাঁটছে, সেই সঙ্গে সংগে নূপুরের মিষ্টি আওয়াজ রুণু-ঝুনু রুণ-ঝুন। ধীরে অতি সন্তর্পণে দরজার কবাট দুটো ঈষৎ ফাঁক করতেই সংগে সংগে যেন পদশব্দ ও নূপুরের ধ্বনি বাতাসে মিলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল মুহূর্তে।

ঘরের আলোটা কমানোই ছিল। অদ্ভুত একটা আলো-আঁধারিতে ঘরটা রহস্যময়।

কিন্তু কোথায় কে! ঘর শূন্য, কেউ নেই।

ভারী আশ্চর্য তো! সত্যজিৎ যেন বেশ বিস্মিতই হয়। ঘরের ওপাশের অন্য দরজাটা হা হা করছে খোলা।

বিস্মিত সত্যজিৎ খোলা দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল, সামনেই একটা ছোট অলিন্দ মত, তারপরই নেমে গেছে অন্ধকার সিঁড়ি নিচের দিকে।

কোথায় গিয়েছে এই সিঁড়ি?

কোন্ ঘন অন্ধকারের রহস্যের মধ্যে এই সিঁড়িপথ গিয়ে মিশেছে কে জানে?

একটু পূর্বে এই ঘরের মধ্যে যে পদশব্দ, যে নূপুরের ধ্বনি শোনা গিয়েছিল সেই কি এই সিঁড়ি-পথ দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল?

সত্যজিৎ মুহূর্তের জন্য সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল, তারপর ঘরের মধ্যে আবার প্রবেশ করে সুটকেস থেকে টর্চটা নিয়ে দরজা দিয়ে বের হয়ে দাঁড়াল সিঁড়ির মাথায়।

প্রথম সিঁড়ির উপর পা দিতেই সত্যজিৎ তার সমস্ত শরীরে যেন একটা অহেতুক শিহরণ অনুভব করে।

কে যেন তার কানে কানে অশ্রুত সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেঃ কোথায় চলেছ সত্যজিৎ?

নাগিনীর মায়ায় ভুলো না।

নাগিনী!

তা হোক, তবু সত্যজিৎ এগিয়ে যাবে।

সত্যজিৎ এগিয়ে চলল।

ধাপের পর ধাপ সিঁড়ি অতিক্রম করে সত্যজিৎ নেমে চলল।

সিঁড়ির প্রায় শেষ ধাপে এসে পৌঁচেছে, সহসা আবার কানে এসে বাজল যেন সেই মিষ্টি নূপুরের ধ্বনি।

অন্ধকারে কে যেন পায়ের নূপুর রুণু-ঝনু বাজিয়ে এগিয়ে চলেছে।

অদৃশ্য অশরীরী কোন মায়াবিনী যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে নূপুর-সংকেতে সম্মুখের ঐ নিশ্ছিদ্র রহস্যময় অন্ধকার থেকে।

নিজের অজ্ঞাতেই সত্যজিৎ সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

এ কি সত্যি কোন মায়াবিনীর মায়া, না তারই শোনবার ভুল!

সবিতার চোখেও ঘুম আসছিল না। চোখ দুটো যেন জ্বালা করছে।

সবিতা তার শিয়রের কাছের জানালাটার সামনে এসে দাঁড়াল, হাত দিয়ে ঠেলে খুলে দিল জানালার কবাট দুটো।

অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল অন্ধকার আকাশের দিকে।

দীর্ঘ ছ'মাস পরে সে বাড়িতে এল অথচ যার স্নেহসিক্ত মধুর ডাকটি শোনবার জন্যে তার বিদেশে সমস্ত অন্তর তৃষিত হয়ে থাকে সেই স্নেহময় পিতা আজ তার কোথায়?

আর কেউ আদর করে ডাকবে না সাবি মা আমার। বিদেশ যাত্রাকালে আর কেউ তার মাথায় হাতটি রেখে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলবে না, গিয়েই কিন্তু চিঠি দিস মা। ভুলিস না যেন তোর বুড়ো বাপ আবার ছুটি হলে একদিন তুই ফিরে আসবি সেই দিনটির আশায় দিন গুনছে এখানে বসে একলাটি।

ওর নাকি যখন চার বছর বয়স তখন মা মারা যান।

ভাল করে সঠিকভাবে জানে না বটে তবে কানাঘুষোয় শুনেছিল একদিন ওর মার মৃত্যুর সঙ্গেও যেন কি একটা রহস্য জড়িয়ে আছে।

অবশ্য সে সম্পর্কে কোন দিনই তার মনে কখনো অকারণ কৌতূহল দেখা দেয়নি।

বাবাও তার মার সম্পর্কে কখনো কোন কথা বলেননি এবং তারও কোন দিন বাবাকে মার কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয়নি।

সাত বছর বয়সের সময় ও দেশ ছেড়ে কলকাতার বোর্ডিংয়ে গিয়ে থেকে পড়াশুনা শুরু করেছে।

আজ পনের বৎসর সে কলকাতাতেই আছে। কেবল বৎসরে দু'বার ছুটিতে মাসখানেকের জন্য এখানে এসে থেকে গিয়েছে, তাও প্রতি ছুটিতেই যে এসেছে তা নয়।

মধ্যে মধ্যে ছুটিতে এদিক-ওদিক বেড়াতেও গিয়েছে। দু'খানা ঘরের পরের ঘরটাতেই বাবা শুতেন।

কি এক দুর্নিবার আকর্ষণ ওকে যেন সেই ঘরটার দিকেই টানতে থাকে।

নিজের ঘর থেকে বের হয়ে একটা মোমবাতি জেলে নিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে চলল সবিতা সেই ঘরটার দিকে।

ঘরের দরজা ভেজানোই ছিল। বাঁ হাতে ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল।

ঘরটা আজ শূন্য। কিন্তু ঘরের মধ্যে বাবার ব্যবহৃত প্রত্যেকটি জিনিস যেখানকারটি যেমন তেমনই আছে।

একধারে ঘরের প্রকাণ্ড সেই কারুকার্যমণ্ডিত মেহগনি কাঠের পালঙ্কের উপর এখনও তেমনি শয্যাটি বিস্তৃত।

মাথার ধারে চৌকির উপরে দেওয়ালে সেই লোহার সিন্দুকটি তেমনই আছে বসানো।

শয্যার ঠিক শিয়রে মাথার উপরে দেওয়ালে টাঙানো মায়ের এনলার্জড্ তৈলচিত্রটি। ঘরের দক্ষিণ কোণে আয়না-বসানো কাঠের আলমারিটা। তারই পাশে কাপড়ের আলনা।

আলনায় এখনো বাবার ব্যবহৃত ধুতি, চাদর ও জামা রাখা রয়েছে।

পূর্ব কোণে লিখবার টেবিলটি ও বসবার চেয়ারটি। এবং তারই পাশে বেতের আরাম কেদারাটা ও তার পাশে বাবার নিত্যব্যবহার্য গড়গড়াটা।

অনির্দিষ্ট লক্ষ্যহীনভবে ঘরের এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ সবিতার নজরে পড়ল, তার ও বাবার ফটোটা দেওয়ালে পাশাপাশি টাঙানো।

হাতের মোমবাতিটা উ'চু করে তুলে ধরে মোমবাতির আলোয় বাবার ফটোটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সবিতা।

চিরদিনের বাবার সেই সুন্দর হাসিটি ওষ্ঠপ্রান্তে যেন সজীব বলেই ছবির মধ্যেও মনে হয় এখনো।

সহসা চোখের কোল দুটি জলে ছলছল করে ওঠে।

বাবা! সত্যি কি তুমি আর নেই! আর কি সত্যিই এ জীবনে কোন দিনও তোমার ডাক শুনতে পাব না!

কোথায় গেলে তুমি এমনি করে আমায় না জানিয়ে?

সত্যিই কি কেউ তোমাকে হত্যা করল?

বলে দাও বাবা! তাই যদি হয়, আমি তোমার হত্যার প্রতিশোধ নেব।

প্রতিজ্ঞা করছি আমি, যে তোমাকে হত্যা করেছে কোনোমতেই তাকে আমি নিষ্কৃতি দেব না।

প্রতিশোধ আমি নেব! নেব! নেব!

সত্যজিৎ হাতের টর্চের বোতামটা টিপে আলোটা জ্বালল। সম্মুখের অন্ধকারে হস্তধৃত টর্চের আলোর রশ্মিটা ছড়িয়ে গেল। একটা অপ্রশস্ত সরু গলিপথ সম্মুখে। সত্যজিৎ হাতের টর্চের আলো ফেলে ফেলে দেখল পথটা বেশ লম্বা। এগিয়ে গেল সত্যজিৎ আলো ফেলতে ফেলতে সেই অপ্রশস্ত গলিপথে।

আশ্চর্য! চারিদিকেই ঘেরা দেওয়াল পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে, কোথাও কোন নির্গমনের পথই নেই।

অন্ধ গলিপথ।

তার ঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে কেউ যে এই গলির মধ্যে এসে অন্য কোথাও অদৃশ্য হয়ে যাবে তারও কোন রাস্তা নেই। তবে?

সবই কি তাহলে তার ভ্রম!

কেউ তার ঘরে যায়নি বা কেউ নূপুর পায়ে হেঁটে যায়নি!

কিন্তু একটা ব্যাপার সত্যজিৎ কোনোমতেই যেন বুঝে উঠতে পারে না, যদি এই গলিপথ দিয়ে অন্য কোথাও নিষ্ক্রমণের কোনও রাস্তা নাই থাকে তবে ঐ গোপন সিঁড়ি-পথ ও এই গলি-পথের তাৎপর্য কি?

অনাবশ্যক নিশ্চয়ই এ গলির পথ তৈরী করা হয়নি।

নিশ্চয়ই এই গলি-পথ থেকে অন্য কোন ঘরে বা বাইরে যাবার কোন পথ বা দ্বার আছে যেটা নজরে পড়ছে না।

কোন গুপ্ত-পথ বা গুপ্ত-দ্বার!

সত্যজিৎ আবার আলো ফেলে ফেলে চারিদিককার দেওয়ালে অনুসন্ধান করতে লাগল।

দেওয়ালের গায়ে ঠুকে ঠুকে দেখতে লাগল।

কিন্তু আশ্চর্য! কোন কিছুরই হদিস ও পেল না। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পূর্বশ্রুত সেই নূপুরের শব্দও আর কই ও শুনতে পেল না।

কতকটা যেন বিফলমনোরথ হয়েই সত্যজিৎ তার ঘরে আবার ফিরে এল

এবং সিঁড়িপথের সঙ্গে সংযুক্ত দরজা বন্ধ করে দিল শিকল তুলে।

॥ ৪ ॥

পরের দিন সত্যজিতের ঘুম ভাঙল অনেক বেলায় সবিতার ডাকে।

সত্যজিৎবাবু উঠুন! নায়েব কাকা নিচে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, দারোগাবাবু নাকি এসেছেন!

লজ্জিত সত্যজিৎ চোখ রগড়াতে রগড়াতে শয্যা হতে উঠে নেমে দাঁড়াল। খোলা জানালা-পথে প্রভাতী রৌদ্র এসে সমস্ত কক্ষটা আলোয় ঝলমল করছে।

সবিতার পরিধানে একটা সাধারণ মিলের কালোপাড় শাড়ি। রুক্ষ তৈলহীন চুলের রাশ বুকে পিঠে ছড়িয়ে আছে।

যেন একখানি পরিপূর্ণ বিষাদের সকরুণ প্রতিচ্ছবি।

কানাইয়ের মাকে এই ঘরে আপনার চা দিতে বলেছি। দোতলার বাথরুমেই জল আছে, হাত মুখ ধুয়ে আসুন।

পায়ে জুতোটা গলাতে গলাতে সত্যজিৎ বললে, আপনি চা খাবেন না!

না।

কেন, আপনার কি চা খাওয়া অভ্যাস নেই?

আছে। তবে—, সকরুণ বিষন্ন হাসি সবিতার ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে ওঠে।

সহসা সত্যজিতের মনে পড়ে যায়, তিনদিন পিতার মৃত্যুতে সবিতাকে নিয়মপালন করতে হবে।

গত প্রত্যুষেও ট্রেনে চা-পান করেনি।

লজ্জিত সত্যজিৎ তাড়াতাড়ি বাইরে বাথরুমের দিকে চলে যায়—যেন ঘটনাটাকে কতকটা সহজ করে দেবার জন্যই।

নায়েব বসন্তবাবু ওদের অপেক্ষাতেই বাইরের ঘরে একটা চেয়ারের ওপর বসে অন্য একটি চেয়ারের পার্শ্বে উপবিষ্ট থানার দারোগা লক্ষ্মীকান্তবাবুর সঙ্গে নিম্নস্বরে কি সব কথাবার্তা বলছিলেন।

দারোগা লক্ষ্মীকান্ত সাহার বয়স চল্লিশের ঊর্ধ্বে নয়; বয়স যাই হোক মাথার সবটুকু জুড়ে বিস্তীর্ণ একটি টাক। কেবল পশ্চাতে ঘাড়ের দিকে সামান্য যা চুল আছে তার মধ্যে বেশীর ভাগই পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে।

নাদুসনুদুস নাড়ুগোপাল প্যাটার্নের চেহারা। মুখখানা বর্তুলাকার, ছড়ানো নাসিকা, ওপরের ওষ্ঠটি স্বাভাবিক রকমের পুরু।

লক্ষ্মীকান্তর মস্তকের চুলের অপ্রতুলতার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করবার জন্যই হয়ত সর্বাঙ্গে লোমের প্রাচুর্য।

লক্ষ্মীকান্ত দারোগা সবিতার একেবারে অপরিচিত নয়, কারণ ইতিপূর্বে দু-একবার এই বাড়িতেই চৌধুরী মশাই বেঁচে থাকতে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে।

সবিতা ও সত্যজিৎকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে বসন্তবাবুই সর্বপ্রথমে সবিতাকে আহ্বান জানালেন, এস মা। ঐ চেয়ারটায় বস। লক্ষ্মীকান্তবাবু অনেকক্ষণ তোমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছেন—তিনদিন হয়ে গেল, আর তো বাসি মড়া এমনি করে রাখা যায় না—

কথাটা শেষ করলেন লক্ষ্মীকান্ত দারোগা, হ্যাঁ সবিতা দেবী, কেবল

আপনি যাতে আপনার পিতাঠাকুরকে একটিবার শেষবারের মত—

তার আর কোন প্রয়োজন নেই নায়েব কাকা। মৃতদেহ সৎকারের আয়োজন করুন।

কিন্তু তুমি একবার—

সে সৎকারের সময়েই হবে। আপনি আর দেরি করবেন না।

সবিতার কণ্ঠস্বর ক্লান্ত ও নিস্তেজ হলেও যেন একটা দৃঢ়তায় সুস্পষ্ট মনে হয়।

বেশ। তাহলে আমি সব ওদিককার যোগাড়যন্ত্র করি গে। আচ্ছা লক্ষ্মীকান্তবাবু, আমি তাহলে —

হ্যাঁ আসুন। সবিতা দেবীর সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা আছে, সে-গুলো ইতিমধ্যে সেরে নিই।

বসন্তবাবু আর অপেক্ষা করলেন না, কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

বসন্তবাবু কক্ষ হতে চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ ধরে যেন ঘরের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করে।

লক্ষ্মীকান্তবাবু, সবিতা ও সত্যজিৎ কারো মুখেই কোন কথা নেই।

ঠিক কি ভাবে বক্তব্যটা শুরু করলে নেহাত অশোভন বা পীড়াদায়ক হবে না সেই কথাটাই লক্ষ্মীকান্ত চিন্তা করতে থাকেন বোধ হয়।

এমন সময় সবিতাই শুরু করে, ইনি সত্যজিৎ রায়, বাবার ছোটবেলার বন্ধুর ছেলে। আমাদের আত্মীয়ের মতই। বাবাই ওঁকে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এ'র উপস্থিতিতে আমরা সকল প্রকার আলোচনাই করতে পারি লক্ষ্মীকান্তবাবু।

ও। মৃদুভাবে প্রত্যুত্তর দিলেন লক্ষ্মীকান্ত।

হ্যাঁ, এবারে আপনি আপনার আমাকে যে প্রশ্ন তা করতে পারেন।

এক্সকিউজ মি ফর এ মিনিট লক্ষ্মীকান্তবাবু—ইফ্ ইউ ডোণ্ট্ মাইণ্ড—, সহসা কথার মাঝখানে লক্ষ্মীকান্তকে কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই সত্যজিৎ বলে ওঠে, অপনাকে আমি দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

নিশ্চয়ই। বলুন কি জিজ্ঞাসা করতে চান?

লক্ষ্মীকান্ত পূর্ণ দৃষ্টিতে সকৌতুকে তাকালেন প্রশ্নকারী সত্যজিতের মুখের দিকে।

আপনাদের ধারণাও বটে এবং শুনলাম ময়না তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে, চৌধুরী মশাইকে কেউ না কেউ হত্যাই করেছে, তাই না?

হ্যাঁ। শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে।

আচ্ছা যেখানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল তার আশেপাশে বা চৌধুরী মশায়ের দেহে ও জামাকাপড়ে এমন কোন চিহ্ন কি পাওয়া গিয়েছে—অবশ্য একমাত্র ময়না-তদন্তের ফলাফল ছাড়া যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তাঁকে শ্বাস-রোধ করেই হত্যা করা হয়েছে?

লক্ষ্মীকান্ত দারোগা এই সব খুন-জখমের তদন্ত কুড়ি বছর ধরে করছেন।

বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ও কথাবার্তা হয়েছে, কিন্তু সত্যজিৎ যেভাবে তাঁকে প্রশ্নটা করল ঠিক এই ধরণের প্রশ্ন যে ঐরকম জায়গা

থেকে শুনতে পাবেন এ যেন তাঁর স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

বিস্মিত লক্ষ্মীকান্ত কিছুক্ষণ প্রশ্নকারীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি ঠিক কি জানতে চান সত্যজিৎবাবু?

জানতে চাই কি কি কারণে আপনারা এক্ষেত্রে যে চৌধুরী মশাইকে শ্বাসরোধ করেই হত্যা করা হয়েছে বলে স্থিরসিদ্ধান্ত হয়েছেন, অবশ্য ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ছাড়া—

ময়না-তদন্তে যখন শ্বাসরোধ করা হয়েছে বলেই প্রমাণিত হয়েছে, তখন আবার কি প্রয়োজন বলুন?

তা বটে! আচ্ছা চৌধুরী মশাইয়ের গলায় কোন দাগ বা চিহ্ন কি ছিল যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তাঁকে—

না, এমন কোন চিহ্নই তাঁর গলায় ছিল না।

মৃতদেহের গায়ে কোন জামা ছিল না শুনেছি—

না, একটা চাদর জড়ানো ছিল মাত্র।

কোন struggle বা ধস্তাধস্তির চিহ্ন তাঁর গায়ে পরিধেয় বস্ত্রে ছিল না?

না।

যেখানে মৃতদেহ পাওয়া যায় সেই আশেপাশের জমিতে কোন চিহ্ন বা—

না, তাও ছিল না।

কোন পদচিহ্ন?

না।

আচ্ছা শুনেছি একপাটি জুতো মৃতদেহের পায়েই ছিল, আর অন্য পাটি জুতো কিছুদূরে ঘাসের উপরে পড়েছিল?

তাই।

হুঁ। আচ্ছা মনে করুন শ্বাসরোধ করেই যদি তাঁকে হত্যা করা হয়ে থাকে—তাহলে সেই শ্বাসরোধের ব্যাপারটা কোথায় সংঘটিত হয়েছিল? মানে সেইখানেই যেখানে মৃতদেহ পাওয়া যায়, না অন্য কোথায়ও বলে আপনাদের ধারণা?

এ তো সহজেই অনুমান করা যায়, নিশ্চয়ই সেই নন্দনকাননেই!

কেন বলুন তো?

লক্ষ্মীকান্ত এবারে যেন সত্যজিতের প্রশ্নে বেশ একটু বিরক্তই হয়েছেন তাঁর কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল, তা ছাড়া আর কি! নইলে কি আপনার ধারণা শ্বাসরোধ করে তাঁকে হত্যা করে, হত্যাকারী শেষে মৃতদেহটা ঐ দীর্ঘ পথ বহন করে নিয়ে গিয়েছে বোকার মত!

সম্ভবত সেটা হয়ত হত্যাকারী করেনি, কারণ সেটা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে আপনাদের রিপোর্ট শুনে মনে হচ্ছে সেই নন্দনকাননেই যে চৌধুরী মশাইকে হত্যা করা হয়েছে সেটাও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না।

কেন বলুন তো? একটা ব্যঙ্গ ও তাচ্ছিল্য-মিশ্রিত কৌতূহলের সঙ্গেই যেন লক্ষ্মীকান্ত সত্যজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন।

কারণটা হয়ত চট্ করে আপনাকে এখুনি বুঝিয়ে বলতে পারছি না লক্ষ্মীকান্তবাবু, তবে সাধারণ বুদ্ধি যাকে আমরা common sense বলি তা থেকে মনে হয় মৃতদেহ ও তার আশপাশের যে বর্ণনা আপনারা দিচ্ছেন তাতে করে বরং উল্টোটাই মনে হয়—হত্যা করবার পর মৃতদেহ সেখানে নিয়ে গিয়ে

ফেলে রাখা হয়েছে।

এবারে লক্ষ্মীকান্ত হেসে ফেললেন, চমৎকার যুক্তি আপনার মশাই! কে এমন আহাম্মক আছে বলুন যে হত্যা করবার পর মৃতদেহটাকে অতখানি risk নিয়ে ঐ নন্দনকাননের মধ্যে গিয়ে ফেলে রেখে আসবে? কাজ হাসিল করবার পর অকুস্থান থেকে খুনী যত তাড়াতাড়ি গা-ঢাকা দিয়ে সরে যেতে পারে তাই সে যায় এবং সেটাই এযাবৎকাল স্বাভাবিক বলে জেনে এসেছি মশাই। এ লাইনে একটা জীবনই তো কেটে গেল।

আপনার ও-কথার মধ্যে যুক্তি আছে বৈকি লক্ষ্মীকান্তবাবু, তবে কি জানেন, আপনিও হয়ত শুনে থাকবেন, এমনও বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, যে ধরনের risk-এর কথা আপনি বলছেন সেই ধরনের প্রচুর risk থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কোন উদ্দেশ্যেরই বশবর্তী হয়ে অনেক সময় হত্যাকারী হত্যা করবার পর অকুস্থান হতে মৃতদেহ টেনে বা বহন করে নিয়ে গিয়ে দূরবর্তী কোন স্থানে ফেলে রেখে এসেছে।

দেখুন মশাই, আপনার সঙ্গে অত চুলচেরা তর্ক-বিচার করবার মত পর্যাপ্ত সময় আমার হাতে বর্তমানে নেই। আমি case-এর investigation-এর জন্য সবিতা দেবীকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই একটু private-এ—

সুস্পষ্ট বিরক্তি ও কতকটা তাচ্ছিল্যই যেন ঝরে পড়ল লক্ষ্মীকান্তর কণ্ঠস্বরে এবারে।

কিন্তু সত্যজিৎ কোন জবাব দেবার পূর্বেই সবিতা বলে উঠল, আমাকে যা আপনি জিজ্ঞাসা করতে চান লক্ষ্মীকান্তবাবু ওঁর সামনেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আপনাকে তো একটু আগেই আমি বলেছি—উনি বাবার বন্ধুপুত্র ও আমাদের আত্মীয়েরই মত।

না না—তার কোন প্রয়োজন নেই সবিতা দেবী। বেশ তো, উনি যখন বিশেষ করে private-এ আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান, আমি না হয় পাশের ঘরেই কিছুক্ষণের জন্য—

সত্যজিৎ উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু সবিতার দৃঢ় সংযত কণ্ঠস্বরে সহসা ও ফিরে দাঁড়াল, না, আপনি যাবেন না মিঃ রায়। এই ঘরেই থাকুন। ওঁকে জিজ্ঞাসা করতে দিন আপনার উপস্থিতিতেই উনি কি জানতে চান—

সত্যজিৎ ও লক্ষ্মীকান্তবাবু দুজনেই যেন বেশ একটু সবিতার আচরণে ও কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হয়ে একই সময়ে যুগপৎ সবিতার মুখের দিকে তাকায়।

সবিতা তার অর্ধসমাপ্ত কথাটা শেষ করে বলে, হ্যাঁ, যেহেতু বাবার এই হত্যা-রহস্যের মীমাংসার জন্য ওঁর সাহায্য ও সহানুভূতিও যেমন আমার প্রয়োজন তেমনি আপনার সাহায্য ও সহানুভূতিও আমার প্রয়োজন এবং সেই কারণেই আমি চাই গোড়া থেকেই যেন আমাদের তিনজনের মধ্যে একটা সহজ বোঝাপড়া থাকে।

ওঃ! তা বেশ। সত্যজিৎবাবু, আপনিও তাহলে বসুন।

পূর্বের মতই বিরক্তি-মিশ্রিত কণ্ঠে লক্ষ্মীকান্ত বলে ওঠেন।

সত্যজিৎ আবার পূর্বের আসনটিতে বসে পড়ল।

শুনুন লক্ষ্মীকান্তবাবু, আপনি জানেন আমার টাকার অভাব নেই। বাবার এই হত্যা-রহস্যের মীমাংসার জন্য আপনাদের ব্যাঞ্চের কোন বিশেষ অভিজ্ঞ ও

নামকরা ব্যক্তিকেও যদি চান আনতে পারেন, তার যাবতীয় খরচও আমি দেব।

বেশ তো। আনন্দের কথা। তবে এক্ষেত্রে তাতেও কোন সুরাহা হবে বলে তো আমার মনে হয় না!

কেন বলুন তো? প্রশ্নটা করে সত্যজিৎ।

আমারও তো মশাই বিশ বছরের অভিজ্ঞতা এ লাইনে। খুনীর ধরা-ছোঁয়াও পাবেন না।

ধরা-ছোঁয়াও পাব না?

পাবেন কি করে! আমার যতদূর মনে হয় খুনী এক্ষেত্রে কোন বাইরের লোক। এ বাড়ির তো কেউ নয়ই, এ শহরেরও কেউ নয়। এ বিষয়ে আমি একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত—

কেন বলুন তো?

কারণ আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে যাবতীয় সকলের জবানবন্দি নিয়ে এটা অন্ততঃ বুঝতে পেরেছি, হত্যাকারী এখানকার কেউ নয়।

আপনি তাহলে বলতে চান বাইরের কেউ? প্রশ্ন করে সত্যজিৎ!

নিশ্চয়ই।

কিন্তু উদ্দেশ্য?

তা উদ্দেশ্যও একটা আছে বৈকি। গম্ভীর স্বরে প্রত্যুত্তর দেন লক্ষ্মীকান্তবাবু।

আপনি ধরতে পেরেছেন নাকি কিছু?

সেটা অবশ্য ভেবে দেখতে হবে।

বিশ বছরের অভিজ্ঞতার উপরে ভিত্তি করে লক্ষ্মীকান্তর অকাট্য যুক্তির বহর শুনে সত্যজিৎ মনে মনে কৌতুক অনুভব না করে পারে না। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। সকৌতুকে চেয়ে থাকে লক্ষ্মীকান্তর মুখের দিকে।

অতঃপর লক্ষ্মীকান্ত সবিতাকে জিজ্ঞাস্য প্রশ্নগুলি করতে লাগলেন।

আচ্ছা সবিতা দেবী, আপনি বলতে পারেন, আপনার পিতার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এমন কেউ আছে কিনা যার সংগে আপনার বাবার শত্রুতা ছিল?

না।

কেন বলুন তো—

কারণ বাবার পিতৃবংশের দিক থেকে তাঁর কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল বলে জানি না। বাবা ঠাকুর্দার একমাত্র ছেলে।

আপনার পিতার একটি ভগ্নী ছিলেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা—

পিসিমা আমার জন্মের পূর্বেই মারা যান শুনেছি। তাঁর একমাত্র পুত্র শুনেছি বর্মা না মালয় কোথায় ডাক্তারী করেন। তাঁকে জীবনে দেখিওনি কখনো, তাঁর সংগে আমার পরিচয় হবারও কোন সৌভাগ্য হয়নি। আর বাবার মাতৃবংশে শুনেছি বাবার দুই মামা বাবার চাইতে বয়সে ছোট, এখনও বেঁচে আছেন, বিক্রমপুরের ওদিকে কোথায় জমিদার। তাঁদের সংগেও আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

হুঁ। আচ্ছা দেখুন, জমিদারী ও ব্যবসা চালাতে গেলে বহু লোকের

সঙ্গে শত্রুতা ইচ্ছা না থাকলেও হয়ে যায় জানি তো—এখন ব্যক্তিবিশেষের কথা—

না, সেরকম শত্রুও বাবার কেউ কোন দিন ছিল বলে জানি না।

ভাল করে ভেবে বলুন সবিতা দেবী, এমনও হতে পারে আপনি জানেন না!

আমার বাবাকে আমি খুব ভালভাবেই জানতাম।

কিন্তু আমি তো শুনেছি আপনি আপনার সাত বছর বয়স থেকেই বিদেশে। কেবল মধ্যে মধ্যে ছুটিতে যা এখানে আসতেন।

তাহলেও আমি তাঁকে খুব ভাল করেই জানতাম।

ও! তাহলে এবারে আমি উঠব।

আসুন।

লক্ষ্মীকান্ত বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

শ্মশান হতে ফিরে সবিতা স্নান সেরে তার নিজের ঘরে শয্যার উপরে গা এলিয়ে পড়েছিল। সমস্ত শরীরে একটা ক্লান্ত অবসন্নতা।

কানাইয়ের মা এক গ্লাস সরবৎ হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

দিদিমণি, এই সরবৎটুকু খেয়ে নাও দেখি—

ওই টেবিলের উপর রেখে যা কানাইয়ের মা।

না। এই সরবৎটুকু তুমি খেয়ে নাও।

বিরক্ত করিস না। যা বলছি তাই শোন্। সত্যজিৎবাবুকে চা-জলখাবার দিয়েছিস?

হ্যাঁ, তৈরী হয়ে গেছে, এবার দেব।

তোদের দিয়ে কোন কাজ হয় না। আগে কোথায় তাঁকে চা-জলখাবার দিবি, তা নয় আমার জন্য সরবৎ নিয়ে এসেছিস!

লজ্জিত কানাইয়ের মা সরবতের গ্লাসটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে সত্যজিৎকে চা-জলখাবার দেবার জন্য ঘর হতে বের হয়ে গেল।

সত্যজিৎ তার নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে জানালার ধারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চুপটি করে বসেছিল।

বনমালী ঘরের মধ্যে সেজ্ বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে বটে তবে আলোর শিখাটা কমানো।

খাবারের প্লেট ও চায়ের কাপ হাতে কানাইয়ের মা ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল, বাবু!

কে?

চা এনেছি বাবু।

তোমার দিদিমণিকে কিছু খেতে দিয়েছিলে কানাইয়ের মা?

হ্যাঁ, সরবৎ দিয়ে এসেছি।

খাবারের প্লেটটা ও চায়ের কাপ পাশের একটা চৌকির উপরে নামিয়ে রেখে কানাইয়ের মা ঘর হতে বের হয়ে যাবার জন্য উদ্যত হল।

সত্যজিৎ ডাকল, কানাইয়ের মা!

সত্যজিতের ডাকে কানাইয়ের মা ফিরে দাঁড়াল।

ওইখানে এসে বসো কানাইয়ের মা। তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

সত্যজিতের আহ্বানে কানাইয়ের মা তার সামনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওইখানে বসো।

কানাইয়ের মা মাটিতেই বসল।

চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে বললে, তুমি তো এ বাড়িতে অনেক দিন আছ শুনলাম, পুরনো লোক—

দিদিমণির এককুড়ি তিন বছর বয়স হল। তা ধর না গো—তারও দু'বছর আগে থেকে এ বাড়িতে আমি আছি বাবু। পুরনো নোক বইকি।

আর দিদিমণিও তো শুনেছি তোমারই কোলেপিঠে মানুষ।

তা ছাড়া আর কার? আমারই কোলেপিঠে দিদিমণি মানুষ হল তো!

আচ্ছা কানাইয়ের মা, তোমাদের দিদিমণির বাবা মানে কর্তাবাবু, তুমি তো জান তাকে কেউ খুন করেছে—

আহা! আর বোলোনি গো বাবু, মেয়েটার কি দুঃখের কপাল! ওর মা—আহা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-ঠাকরুণ ছিলেন গো—স্বগ্‌গের দেবী, মেয়েটার চার বছর বয়সের সময় অঘোরে মারা গেল এই হতচ্ছাড়া বাড়িতেই। কত্তাবাবুও এই বাড়িতেই মারা গেল অঘোরে। এই বাড়িটাই অলুক্ষুণে বাবু—

তোমার দিদিমণির মাও এই বাড়িতেই মারা গিয়েছিলেন নাকি?

তাছাড়া আর কি! এই বাড়িতেই তো!

কি হয়ে মারা যান তিনি?

কাউকে বোলোনি বাবু। কেউ জানে না। কত্তাবাবুর মানা ছিল, এতদিন কাউকে বলিনি—

তোমার দিদিমণিও জানে না?

না। এক কত্তাবাবু জানতেন—আর জানতাম আমি—

সত্যজিৎ কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

সবিতার মার মৃত্যুর মধ্যেও তাহলে একটা রহস্য রয়ে গিয়েছে! কেবল জমিদার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীরই রহস্যময় মৃত্যু ঘটেনি, উনিশ বছর আগে সবিতার মার মৃত্যুর ব্যাপারেও এমনি কোন রহস্য ছিল। এবং শুধু তাই নয়, উভয়েরই মৃত্যু একই বাড়িতে ঘটেছে।

কানাইয়ের মা অনেক কথা জানে। হয়ত সেসব কথা জানতে পারলে বর্তমান রহস্যের উপরে অনেকখানি আলোকসম্পাত হবে।

সব গুছিয়ে কৌশলে কানাইয়ের মার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

কানাইয়ের মার কয়েকটি কথাতেই সত্যজিৎ বুঝেছিল, মেয়েমানুষ হয়েও এতকাল একমাত্র জমিদার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর ভয়েই হয়ত কানাইয়ের মা যেসব গোপন কথা এতকাল কারো কাছে মন খোলসা করে বলতে সাহস পায়নি, অথচ ভিতরে ভিতরে যে কথাগুলো তার স্বাভাবিক নারীমনের বৃত্তিতে কারো কাছে উগরে দেবার জন্য ছট্‌ফট করেছে—সত্যজিতের কাছে তারই কিছু হয়ত হঠাৎ বলে ফেলেছে।

সত্যজিতের ধারণা যে মিথ্যে নয় সেটা সে পরমুহূর্তে বুঝতে পারে কানাইয়ের মায়ের পরবর্তী কথায়, অনেক কথা বলে ফেলনু বাবু। কাউকে আবার যেন বলোনি। কত্তাবাবু আজ আর বেঁচে নেই বটে তবে ধর্মের ভয় তো আছে গো।

তা তো নিশ্চয়ই। তোমার কোন ভয় নেই কানাইয়ের মা। আমি সব শুনেছি, তুমি এঁদের কত বড় আপনার লোক। দিদিমণির তুমি মায়ের সমান। দিদিমণিই বলছিল তুমি তো তার মায়ের মতই—

তা বইকি বাবু! আনন্দে গদগদ হয়ে ওঠে কানাইয়ের মা। হাজার হলেও নারীর মন তো। সত্যজিতের কথাগুলো তার নারীচিত্তের ঠিক জায়গাটিতেই গিয়ে ঘা দিয়েছে।

আমিও তো তাই বলি কানাইয়ের মা। পেটে ধরলেই কি কেবল মা হয়! দেখো তোমরা যাই বল, অপঘাতে বাবুর মৃত্যু হয়েছে, আমার কিন্তু ধারণা এ কোন দুষ্ট লোকের কাজ—

বাইরে এমন সময় বনমালীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, অ কানাইয়ের মা, সত্যজিতের মুখের দিকে।

হ্যাঁ। সব তোমাকে আমি বলব কিন্তু তার আগে তোমার কাছ থেকে আমার কতকগুলো কথা জানা দরকার।

আমি কি জানি বাবু—

আজ রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর একবার আসতে পার কানাইয়ের মা এ ঘরে? আমি আর তোমার দিদিমণি থাকব। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

তা আর পারবোনি কেন, আসবোখন।

বাইরে এমন সময় বনমালীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, অ কানাইয়ের মা; কুণ্ঠে গেলি—

মুখপোড়া বনমালী মিনষে আবার চেঁচাতে নেগেছে, যাই বাবু—

বলি অ কানাইয়ের মা, কানের মাথাটি খেয়ে বসে আছিস নাকি! রা-টি কাড়ছিসনি কেন রে বুড়ী—

বলতে বলতে ঘরের মধ্যে বনমালীর আবির্ভাব, এই যে তু ইখানটিতে বসে। ঠাকুর যে উঁদিকে চেঁচায়ে মরছে। রান্নাবান্না হবেক, না হবেকনি—

যাচ্ছি, যাচ্ছি—চল।

কানাইয়ের মা বনমালীকে সঙ্গে করে নিয়েই ঘর হতে বের হয়ে গেল।

সবিতা এসে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল, সত্যজিৎবাবু—

আসুন সবিতা দেবী।

কানাইয়ের মা বুঝি বকরবকর করে আপনাকে বিরক্ত করছিল?

সত্যজিৎ সবিতার কথায় মৃদু হাসল, না, বরং আমিই তাকে দিয়ে কথা বলাচ্ছিলাম।

অমন কাজটিও করবেন না। একবার বকতে শুরু করলে ও আর থামতে চায় না।

বসুন মিস চৌধুরী।

সবিতা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সত্যজিতের মুখোমুখি উপবেশন করল।

আপনি হয়ত জানেন না মিস চৌধুরী, অনেক সময় অবান্তর বাজে কথার মধ্যে থেকেই কাজের ও প্রয়োজনীয় কথা খুঁজে পাওয়া যায়।

কিন্তু ওর যে ষোল আনার মধ্যে সাড়ে পনের আনা কথাই অবান্তর!

তা হোক, বুড়ী লোকটি ভাল।

কি করে বুঝলেন?

শুনুন মিস্ চৌধুরী, ওকে আজ রাত্রে এ ঘরে আসতে বলেছি। আরো বলেছি, আমি ও আপনি এ ঘরে থাকব।

কেন বলুন তো?

আচ্ছা আপনি আপনার মায়ের মৃত্যু-ব্যাপার সম্পর্কে কিছু জানেন?

বিস্ময়ের সঙ্গে সবিতা সত্যজিতের মুখের দিকে তাকায়, কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন হঠাৎ? কানাইয়ের মা কিছু সে সম্পর্কে বলছিল নাকি?

না, কিছু বলেনি বটে তবে আমার মনে হয় কানাইয়ের মা হয়ত কিছু জানে।

সবিতা প্রথমটায় একটু ইতস্তত করে, তারপর বলে, হ্যাঁ। আমিও একবার ছোটবেলায় কানাঘুষোয় মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে কি একটা রহস্য জড়িয়ে আছে শুনেছিলাম বটে, তবে details কিছুই জানি না। কিন্তু কানাইয়ের মা সে কথা জানবে কি করে—

সত্যজিৎ তখন একটু পূর্বে কানাইয়ের মার সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল, সব বিশদভাবে খুলে বললে।

সবিতা নিঃশব্দে সব শুনে গেল।

তাই আমি ঠিক করেছি, যতটা পারি প্রশ্ন করে ওর কাছ থেকে আমাদের জেনে নিতে হবে। আরো একটা কথা, আপনার মাও নাকি এই বাড়িতেই মারা যান!

কই, সে কথা তো আমি শুনিনি?

শুনলেও হয়ত আপনার মনে নেই। একেবারে ছোট্টটিই তো ছিলেন আপনি তখন।

আপনার কি মনে হয় সত্যজিৎবাবু, এ রহস্যের আপনি মীমাংসা করতে পারবেন?

আমার কি ধারণা জানেন মিস চৌধুরী? মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। মানুষই যদি হত্যা করে থাকে তাঁকে তবে মানুষই হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে পারে। মানুষই problem তৈরী করে, আবার মানুষই সেটা solve করে।

দীর্ঘ উনিশ বছর ধরে কানাইয়ের মা যে কথাগুলো একমাত্র চৌধুরী মশায়ের ভয়ে বুকের মধ্যে জমা রেখে দিয়েছিল, সেগুলো সত্যজিৎ ও সবিতার কাছে বলতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দীর্ঘ উনিশ বছর আগেকার কাহিনী।

সবিতার মা হেমপ্রভার শরীরটা কিছুদিন ধরে ভাল যাচ্ছিল না।

তাই স্ত্রী হেমপ্রভা, ছোট চার বছরের মেয়ে সবিতা ও কানাইয়ের মাকে নিয়ে প্রমোদভবনে এক মাসের জন্যে বিশ্রাম নিতে এলেন মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী।

চারদিকে খোলা-মেলা বিলের হাওয়া, নির্জনতা স্ত্রীর মন ও শরীরের উপরে একটা পরিবর্তন ঘটাবে এইটাই ভেবেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়।

শহর থেকে দূরে নির্জন এই বিলের ধারে যেন অবারিত মুক্তির একটা কোমল স্পর্শ।

প্রমোদভবনের তিন দিক ঘিরে দেড়মানুষ সমান উঁচু প্রাচীর।

বায়ুর তাড়নায় বিলের জল প্রাচীরের গায়ে ছলছলাৎ করে আছড়ে আছড়ে পড়ছে।

প্রমোদভবনের পশ্চাতের দ্বার খুললেই চোখে পড়ে প্রায় শ'দুই গজ দূরে একটা ছোট দ্বীপের মত। প্রমোদভবন থেকে সেই দ্বীপে যাওয়ার জন্য সেগুন, শালকাঠ ও পাথর বিলের জলের মধ্যে ফেলে একটা রাস্তা তৈরী করা হয়েছে।

রাস্তাটা অপ্রশস্ত—দুতিনজনের বেশী লোক একত্রে পাশাপাশি হাঁটতে পারে না।

দ্বীপটা ত্রিভুজাকার। দ্বীপের মধ্যে ছোট বড় নানাজাতীয় বৃক্ষ যেন একটা অরণ্যস্তব্ধতা এনেছে। দ্বীপের ঠিক মধ্যস্থলে একটি চমৎকার পাথরের তৈরী একতলা ছোট বাড়ি। বাড়ির মধ্যে খানতিনেক ঘর মাঝারি আকারের। বাড়িটার চতুষ্পার্শ্বে দেশী-বিদেশী নানাজাতীয় ফুলের গাছ।

বহুদিনের অযত্ন-বর্ধিত হয়ে এখন সম্পূর্ণ বাগানটি একটা যেন ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে।

আপন মনেই এখন ফুল ফোটে, ফুল ঝরে, আগাছা বেড়ে চলে।

দীর্ঘকালের অযত্নে বাড়িটার ঘরের জানালা-কবাটগুলো জীর্ণ ও ধ্বংসপ্রায়।

দিবারাত্র বাতাসে মচ্‌মচ্‌ খট্‌খট্‌ শব্দ করে।

জমিদার বাটি থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে ছিল এক দিগন্তপ্রসারী বিল। এই বিলের যোগাযোগ ছিল একেবারে পদ্মার সঙ্গে।

চারপুরুষ আগে করালীপ্রসন্ন চৌধুরী তাঁর প্রিয়তমা মহিষী রাণী কাঞ্চনমালার জন্যে ঐ বিলের মধ্যে পাথর ফেলে এক প্রমোদভবন গড়ে তোলেন। এবং বিলের মধ্যেই পাথর ফেলে মাটি ঢেলে তৈরী করেন এক নকল দ্বীপ। ফলফুলের গাছগাছড়া লাগিয়ে দ্বীপের প্রাণসঞ্চার করেন।

নির্মাণ করেন দ্বীপের মধ্যস্থলে একটি সুরম্য ছোট বিশ্রামভবন। তার চারপাশে দিগ্‌দেশ হতে নানাবিধ, আকার, গন্ধ ও বর্ণ-বৈচিত্র্যের ফুলের গাছ এনে রচনা করেন এক উদ্যান ; তারই নাম দেন নন্দনকানন।

মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী যখন তাঁর স্ত্রী হেমপ্রভাকে নিয়ে প্রমোদভবনে এলেন, বহুদিনের অবহেলায় ও অব্যবহার্যে এবং কালের নিষ্ঠুর আঘাতে আঘাতে প্রমোদভবন জীর্ণ ভগ্নপ্রায় এবং দ্বীপের মধ্যে নন্দনকানন জঙ্গলাকীর্ণ ও ভীষণ কালনাগের আবাসস্থল হয়ে উঠেছে।

প্রমোদভবনকে যথাসাধ্য মেরামত ও সংস্কার করে নিলেন মৃত্যুঞ্জয়।

অল্পদিনের মধ্যেই হেমপ্রভার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি দেখা গেল। কিন্তু নিষ্ঠুর ভবিতব্য যা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর জন্যে অলক্ষ্যে অপেক্ষা করছিল, জীবনের সুধার পূর্ণ পাত্রটিকে সহসা ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

দাসী কানাইয়ের মা ও সবিতাকে নিয়ে রুগ্না হেমপ্রভা একটি কক্ষে শুতেন। পাশের ঘরেই শয়ন করতেন মৃত্যুঞ্জয়।

কানাইয়ের মার নিদ্রারোগটা চিরদিনই বেশী। একদিন সকালে কানাইয়ের মার ডাকাডাকি ও চেঁচামেচিতে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ঘুম ভেঙে জানলেন হেমপ্রভাকে বাড়ির মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

হন্তদন্ত হয়ে মৃত্যুঞ্জয় ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন, শয্যার উপরে তখনও চার বছরের শিশুকন্যা সবিতা অঘোরে ঘুমিয়ে আছে।

মাকে যে তার পাওয়া যাচ্ছে না, কিছুই তার সে জানে না।

বাড়ির অন্যান্য ভৃত্যরা—তখনও সকলে ঘুম ভেঙে ওঠেনি।

মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী যেন পাগলের মত হয়ে গেলেন।

কোথায় গেল হেমপ্রভা কাউকে কিছু না জানিয়ে! তাঁদের দীর্ঘ দশ বৎসরের বিবাহিত জীবনের প্রতিটি দিনরাত্রির ইতিহাসকে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী হেমপ্রভার আকস্মিক অন্তর্ধানের কোন কারণ বা মীমাংসা খুঁজে পেলেন না।

কোনদিনের জন্যও তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এতটুকু ভুল বোঝাবুঝি বা মনোমালিন্যের কারণ ঘটেনি যাতে করে সহসা এমনিভাবে হেমপ্রভা কাউকে কিছু না জানিয়ে গৃহত্যাগ (?) করতে পারে।

হেমপ্রভাকে যে পাওয়া যাচ্ছে না, একমাত্র কানাইয়ের মা ও তিনি নিজে ছাড়া তৃতীয় আর কেউ জানে না।

কানাইয়ের মাকে নিজের ঘরে ডেকে এনে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ঘরের দরজায় খিল তুলে দিলেন।

শোন্ কানাইয়ের মা, তোর মাকে যে পাওয়া যাচ্ছে না একথা যেন কেউ না জানতে পারে। একমাত্র তুই ও আমি ছাড়া তৃতীয় কেউ জানে না। ঘুণাক্ষরেও একথা কেউ কোনদিন যদি জানতে পারে তবে তোকে জ্যান্ত নন্দন-কাননে মাটির তলায় কবর দেব।

কানাইয়ের মা থরথর করে কাঁপছিল। গলাটা তার শুকিয়ে গিয়েছে, কোনমতে একটা ঢোক গিলে শুষ্ক নিম্নকণ্ঠে বললে, মরে গেলেও কেউ জানতে পারবে না বাবু—

মনে থাকে যেন। হ্যাঁ দেখ্, আজই রাতে আমি সবিতাকে নিয়ে কাশী যাব। তুইও আমার সংগে যাবি। নিচের ঠাকুর চাকর কেউ যেন ওপরে না আসে। বলবি তোর মার কাল রাত থেকে অসুখের খুব বাড়াবাড়ি হয়েছে। যা—

বাড়ির সকলেই জানল গত রাত থেকে হেমপ্রভা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় এখন খুব খারাপ অবস্থা চলছে। আজ রাত্রেই জমিদারবাবু অসুস্থা স্ত্রী, কন্যা সবিতা ও কানাইয়ের মাকে সঙ্গে নিয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যাচ্ছেন।

স্ত্রীর অসুখের সংবাদ দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী রাত এগারোটায় স্টেশনে যাবার জন্যে দুখানা পাল্কির ব্যবস্থা করতে বললেন নায়েবকে। রাত দুটোর গাড়িতে তিনি সস্ত্রীক কলকাতায় যাবেন।

নায়েব বসন্ত সেনকে আদেশ দিয়েই মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী আবার দোতলায় চলে গেলেন।

সমস্ত দিন বাড়িটা অসহ্য নিস্তব্ধতায় থমথম করতে লাগল।

যেন একটা ভয়াবহ সতর্কবাণী বাড়ির লোকজনদের বিভীষিকার মত

ঘিরে রইল।

সমস্ত বাড়িটার মধ্যে কোথাও এতটুকু কোন শব্দ নেই, এমন কি ছোট মেয়ে সবিতার কণ্ঠস্বরটা পর্যন্ত একবারের জন্যে শোনা গেল না।

নিচের তলায় ঠাকুর চাকর দাসীর দল কেবল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

রাত এগারোটার সময় একখানা পাল্কি বেহারারা উপরে নিয়ে গেল এবং আধ ঘণ্টা বাদে কাহার-বাহিত কবাট-বন্ধ করা পাল্কির পিছনে পিছনে ঘুমন্ত সবিতাকে বুকে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী নেমে এলেন এবং তাঁর পশ্চাতে নেমে এল কানাইয়ের মা।

কানাইয়ের মা সবিতাকে নিয়ে অন্য খালি পাল্কিটায় গিয়ে উঠে বসল।

ঘোড়ায় জিন দেওয়া ছিল।

নিঃশব্দে রাত্রির অন্ধকারে পাল্কি দুটো প্রমোদভবনের গেট দিয়ে বের হয়ে গেল।

পশ্চাতে ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে পাল্কি দুটোকে অনুসরণ করলেন জমিদার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী।

মাথার উপরে নক্ষত্রখচিত রাতের কালো আকাশ কেমন বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, আর বৌরাণীর বিলের ধারে ধারে ঝাউগাছগুলো নিঃশব্দে অন্ধকারে সকরুণ একটা দীর্ঘশ্বাস যেন সেই বোবা আকাশের গায়ে ছড়িয়ে দিতে লাগল।

চারদিন বাদে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী আবার কন্যা সবিতা ও কানাইয়ের মাকে নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। এবং এসে উঠলেন আবার প্রমোদভবনেই।

লোকে জানল কলকাতাতেই হেমপ্রভার মৃত্যু হয়েছে।

কিন্তু ঐ চারদিনের মধ্যেই অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর। তাঁর মাথার অর্ধেকের বেশী চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে, আর তাঁর দু'-চোখের কোলে পড়েছে গাঢ় কালো একটা রেখা।

সারাটা রাত মৃত্যুঞ্জয় ঘুমাল না।

নিঃশব্দে রাতের অন্ধকারে ভূতের মত প্রমোদভবনের কক্ষে কক্ষে ছাতে ও বারান্দার অলিন্দে ঘুরে ঘুরে বেড়ান।

দিন দুই বাদে কি খেয়াল হ'তে ভোররাতের দিকে হাঁটতে হাঁটতে নন্দন-কাননের দিকে চললেন প্রমোদভবনের খিড়কির দরজাটা খুলে।

বহুদিন মানুষের পায়ের ছাপ এখানে পড়েনি।

জঙ্গলে আকীর্ণ চারিদিক। পা ফেলা যায় না।

হঠাৎ সেই নন্দনকাননের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে প্রকাণ্ড একটা বকুল গাছের তলায় এসে হঠাৎ ভূত দেখার মতই যেন চমকে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঠিক সামনেই বকুল গাছটার তলায় ঘাসের উপরে পড়ে আছে হেমপ্রভার মৃতদেহটা।

ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে দেহটা। এই সাতদিনে পচে দেহটা একটু ফুলেও উঠেছে।

পরিধানে এখনো সেই সাতদিন আগেকার চওড়া লালপাড় শাড়িটা।

চিরদিন চওড়া লালপাড় শাড়ি পরতেই হেমপ্রভা ভালবাসতেন।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে মৃত্যুঞ্জয় কতক্ষণ যে ঐখানে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর শবদেহের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন মনে নেই।

শোক দুঃখ বেদনা সকল অনুভূতি যেন বুকের মধ্যে জমে পাথর হয়ে গিয়েছে।

সহসা একটা খস্‌খস্‌ শব্দে চমকে ফিরে তাকালেন মৃত্যুঞ্জয়। ঠিক পশ্চাতে হাত-চারেকের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে কানাইয়ের মা।

কানাইয়ের মা তুই এখানে? কঠিন একটা উষ্মার ভাব মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ে।

কানাইয়ের মা কোন জবাব দিতে পারে না।

নিঃশব্দে মাথা নিচু করে যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনিই দাঁড়িয়ে থাকে।

কানাইয়ের মাও হেমপ্রভার মৃতদেহটা দেখতে পেয়েছিল।

সত্যই কানাইয়ের মা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত ও ভালবাসত।

হেমপ্রভাই তাঁর বাপের বাড়ি থেকে অল্পবয়সী বিধবা সদ্যপুত্রহারা কানাইয়ের মাকে খাস দাসী করে নিয়ে এসেছিলেন।

কলকাতা থেকে ফিরে রাত্রে যখন অত বড় বাড়িটার মধ্যে নিঃশব্দে একা একা ছায়ার মত মৃত্যুঞ্জয় ঘুরে বেড়াতেন, অলক্ষ্যে থেকে সদাসতর্ক দৃষ্টি দিয়ে কানাইয়ের মা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর উপরে নজর রাখছিল। মৃত্যুঞ্জয় যে তাঁর স্ত্রী হেমপ্রভাকে কত গভীরভাবে ভালবাসতেন কানাইয়ের মা তা জানত। এবং সেই কারণেই হেমপ্রভার এই আকস্মিকভাবে অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারটা মৃত্যুঞ্জয়ের মনের মধ্যে যে কত নিদারুণ আঘাত হেনেছে তাও সে বুঝেছিল।

স্ত্রীর শোকে মনের ঝোঁকে মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ আত্মহত্যা বা ঐ ধরনের কিছু করে ফেলেন এই ভয়েই কানাইয়ের মা সদা-সতর্ক দৃষ্টিতে মৃত্যুঞ্জয়কে দিবারাত্র অলক্ষ্যে থেকে ছায়ার মত অনুসরণ করছিল।

এবং ঐভাবে অনুসরণ করতে করতে ভোররাত্রে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর পিছু পিছু নন্দনকাননে এসেছিল সে।

হেমপ্রভার মৃতদেহ ঐভাবে নন্দনকাননের বকুলতলায় দেখে সেও কম বিস্মিত হয়নি।

বল্‌, কেন তুই এখানে এসেছিস?

আবার রুক্ষকঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী।

কানাইয়ের মা তখন অকপটে প্রভুর কাছে সব কথা খুলে বললে।

মৃত্যুঞ্জয় এর পর আর কিছু বলতে পারলেন না কানাইয়ের মাকে। কানাইয়ের মা যে তাঁর প্রতি গভীর মমতাবশেই ঐখানে ঐভাবে তাঁকে অনুসরণ করে এসেছে জানতে পেরে কেন যেন তাঁর অন্তরটা স্নিগ্ধ হয়ে এল।

ঐদিনই গভীর রাত্রে নিজ হাতে বকুলতলাতেই মাটি খুঁড়ে কানাইয়ের মার সাহায্যে মৃতা স্ত্রীর শেষকৃত্যটুকু পালন করলেন মৃত্যুঞ্জয়।

কানাইয়ের মা ভিন্ন আর দ্বিতীয় কোন প্রাণীই ঐ ব্যাপারটা জানতে পারল না।

এবং সেই দিন থেকেই মৃত্যুঞ্জয় সবিতার সমস্ত ভার কানাইয়ের মার

হাতেই তুলে দিলেন।

আর কানাইয়ের মাকে বিশেষ করে সাবধান করে দিলেন লোকে যেমন জেনেছে যে হেমপ্রভার কলকাতাতেই রোগের মৃত্যু হয়েছে তাই যেন জানে, এর বেশী কেউ যেন কিছু না জানতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয় জমিদার-ভবনে আর ফিরে গেলেন না।

প্রমোদভবনকেই আরো ভাল করে সংস্কার করে নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে দিলেন।

আর কেউ না জানলেও কানাইয়ের মা জানত, প্রায়ই গভীর রাত্রে জমিদার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী নন্দনকাননে গিয়ে অন্ধকারে বকুলতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ান।

প্রিয়তমা স্ত্রীকে যেখানকার মাটিতে শেষ শয়ানে শুইয়ে রেখেছিলেন, সেখানকার মাটিই যেন তাঁকে অন্ধকার নিঝুম রাতে হাতছানি দিয়ে ডাকত।

এ খবর আর কেউ জানে না বাবু একমাত্র আমি ছাড়া। বলে চুপ করল কানাইয়ের মা।

সবিতার চোখের কোল দুটো ছলছল করছিল জলে ভরে গিয়ে।

তার মায়ের মৃত্যুর সকরুণ কাহিনী তাকে যেন নির্বাক করে দিয়েছে।

এদিকে রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

রাত্রিশেষের ঠান্ডা হাওয়া ঝিরঝির করে খোলা জানলা-পথে কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করছিল।

কানাইয়ের মার কণ্ঠনিঃসৃত বেদনাক্লিষ্ট কাহিনী যেন সমগ্র কক্ষটা জুড়ে জমাট বেঁধে আছে এখনো!

অন্ততঃ বোঝা যাচ্ছে, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর হত্যার ব্যাপারে একটা মস্ত বড় রহস্য

॥ ৬ ॥

সত্যজিৎই প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কথা বললে, চৌধুরী মশাইয়ের মৃত-দেহও ঐ বকুলতলাতেই পাওয়া গেছে, তাই না?

হ্যাঁ।

এবং মৃতদেহ প্রথমে দেখতে পান বসন্তবাবুই না?

হ্যাঁ।

আচ্ছা কানাইয়ের মা, তোমার মার মৃত্যু ও তোমার বাবুর মৃত্যু এ দুটো ব্যাপার তোমার কি বলে মনে হয়?

আজ্ঞে দাদাবাবু, আমি তো বলেছিই আমার মনে হয় এ দুটোই কোন অপদেবতার কাজ।

কেন বল তো?

কানাইয়ের মা অতঃপর কেমন যেন একটু ইতস্ততঃ করতে থাকে।

কি যেন বলতে চায়, অথচ ঠিক বলতে সাহস পাচ্ছে না। সঙ্কোচ বোধ করছে।

বল না কি বলতে চাও? কেন তোমার মনে হয় এ অপদেবতার কাজ?

দেখুন দাদাবাবু, এ বাড়িটাই ভাল না!

বাড়িটা ভাল না?

আজ্ঞে। আমি অনেকদিন টের পেয়েছি এ বাড়িটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন অপদেবতা ভর করে আছে—

অপদেবতা ভর করে আছে? কি পাগলের মত যা-তা বকছ কানাইয়ের মা!

হ্যাঁ বাবু, ঠিকই বলছি। নানা রকমের শব্দ রাত্রে অনেক সময় এ বাড়িতে শোনা যায়। অনেক রাত্রে ঘুঙুরের শব্দও শুনেছি।

চকিতে সত্যজিতের প্রথম রাত্রির কথা মনে পড়ে যায়।

সেই মিষ্টি নূপুরের আওয়াজ! সেই নূপুরের আওয়াজকে অনুসরণ করে তার সিঁড়িপথে নিচে নেমে যাওয়া!

সেও তো জাগ্রত অবস্থাতেই সুস্পষ্ট সেই নূপুরের আওয়াজ শুনেছিল!

সে কাউকে দেখতে পায়নি বটে তবে স্পষ্ট কি সে শোনেনি কে যেন নূপুর পায়ে তার ঘরের মধ্যে চলে বেড়াচ্ছিল!

তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, মিলিয়ে গেল একটু একটু করে সেই নূপুরের মিষ্টি আওয়াজ।

তাছাড়া তার ঘরের ওপাশের দরজাটাও তো খোলা দেখতে পেয়েছিল।

তবে কি কানাইয়ের মা যা বলছে তাই ঠিক? সত্যি এ বাড়িতে কোন অপদেবতা আছে?

রাত্রের অন্ধকারে চারিদিক নিঝুম হয়ে এলে, সবাই গাঢ় ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেলে অশরীরী কেউ এ বাড়ির কক্ষে কক্ষে অলিন্দে প্রাঙ্গণে সিঁড়ি-পথে নূপুর পায়ে দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়!

এই বাড়ি ছেড়ে যায়নি! সে-ই নাকি আজও নিষুতি রাতে ঘুঙুর পায়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়!

বৌরাণী! বৌরাণী আবার কে? কথাটা বলে বিস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় সত্যজিৎ কানাইয়ের মার দিকে।

তাও জাননি! বৌরাণীর নামেই তো এই এত বড় বাড়ি তৈরী হয়েছিল গো। ঐ বিলের জলেই তো বৌরাণী ডুবে মরেছিল গো। তাই তো লোকে ঐ বিলকে আজও বলে বৌরাণীর বিল!

এবারে সত্যজিৎ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় সবিতার দিকে।

সবিতাই এবারে অনুচ্চারিত প্রশ্নের যেন জবাব দেয়, হ্যাঁ। আমিও শুনেছি বটে। তবে আমি কখনো কোন আওয়াজ বা শব্দ নিজের কানে শুনিনি।

আপনার বাবার কাছে কোনদিন কিছু এ সম্পর্কে শুনেছেন মিস চৌধুরী?

না। বাবা আমাকে কখনো কোনদিন আমাদের বংশের কোন কথা বা গল্প বলেননি। বরাবরই লক্ষ্য করেছি, বাবা যেন ওসব ব্যাপারে অদ্ভুত একটা সংযম রক্ষা করে চলতেন। বহুদিন মনে পড়ে, বাবাকে দেওয়ালে টাঙানো মার এনলার্জড ফটোটার সামনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি কিন্তু একটা দিনের জন্যেও বাবা আমার সঙ্গে মার কোন কথাই আলোচনা করেননি। এখন অবশ্য বুঝতে পারছি কেন তা করেননি।

রাত্রি শেষ হয়ে পূর্বদিগন্তে প্রথম আলোর রক্তিম ইশারা যেন দেখা দিয়েছে।

খোলা জানলা-পথে সেই রক্তিম আলোর আভাস যেন ওদের অন্তরকে পর্যন্ত এসে স্পর্শ করে গেল।

কানাইয়ের মাকে বিদায় দিয়ে সত্যজিৎ সবিতাকেও যেন একপ্রকার ঠেলেই তার ঘরে পাঠিয়ে দিলে, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে।

সারাটা রাত্রি জাগরণের পর সত্যজিতের নিজের চোখ দুটোও জ্বালা করছিল। সে ছাদে এসে দাঁড়াল।

চাপা লালচে আলোয় সমস্ত প্রকৃতি যেন সারা রাত্রির অন্ধকারকে অতিক্রম করে রক্তিম চক্ষু মেলে সবে তাকাচ্ছে।

প্রভাতী বায়ুতরঙ্গে বিলের বুকে ক্ষুদ্র ঢেউগুলো ছন্দের আলপনা বুনে চলেছে।

দূরে নজরে পড়ল সেই দ্বীপটা।

দূর থেকে দ্বীপের গাছপালাগুলো তখনও খুব স্পষ্ট মনে হয় না। যেন একটা অস্পষ্টতার কুয়াশায় ঘোমটা টেনে রহস্যে ঘনীভূত হয়ে আছে।

ঐ দ্বীপের মধ্যেই একদিন রহস্যজনকভাবে সবিতার মায়ের মৃত্যু হয়েছিল, আবার দীর্ঘ উনিশ বছর বাদে ঐ দ্বীপের মধ্যেই একদা প্রত্যূষে পাওয়া গেল সবিতার পিতা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর মৃতদেহ।

উনিশ বছর পূর্বে যে হত্যাকাণ্ড (?) সংঘটিত হয়েছিল এবং উনিশ বছর পরে মাত্র কয়েকদিন আগে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল, আছে কি তার মধ্যে কোন যোগাযোগ! দুটি হত্যাকাণ্ডই কি একই সূত্রে গাঁথা, না একের সঙ্গে অন্যের কোন সম্পর্ক নেই!

ক্ষণপূর্বে কানাইয়ের মার বর্ণিত অতীতের সুদীর্ঘ কাহিনী হতে এইটুকু অন্ততঃ বোঝা যাচ্ছে, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর হত্যার ব্যাপারে একটা মস্ত বড় রহস্য জড়িয়ে আছে এবং যে রহস্যের মূলটা হয়ত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

কিন্তু কে করবে সেই অতীতের যবনিকাকে উত্তোলন?

কেমন করে উদ্‌ঘাটিত হবে সত্যিই কোন অতীত রহস্য যদি এই হত্যাকাণ্ডের মূলে থাকেই, সেই অবশ্য প্রয়োজনীয় সত্যটুকু!

অতীতের কথা কানাইয়ের মা যতটুকু জানত বলেছে।

আর এ বাড়িতে বহুদিনকার পুরাতন লোক কে আছে? বনমালী। আর আছেন এদের নায়েব বসন্ত সেন।

কিন্তু বসন্ত সেনের মুখ থেকে কি কোন কথা বের করা যাবে?

বিশেষ করে পরশু রাত্রের আলোচনার ব্যাপারে তিনি যেন একটু তার উপরে অসন্তুষ্টই হয়েছেন বলে ওর ধারণা।

এক্ষেত্রে কোন কথাই হয়ত তিনি বলবেন না।

কিন্তু কেনই বা বলবেন না, পরক্ষণেই মনে হয় কথাটা সত্যজিতের, তার উপরে অসন্তুষ্ট হয়েছেন তো কি!

মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর হত্যার ব্যাপারে তাঁরও তো কম interest থাকবার কথা নয়! আর কেবল interestই বা কেন, কর্তব্যও তো একটা আছে। এবং সব কিছুর উপরে নায়েব বসন্ত সেনের এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কটা!

আত্মীয় বন্ধু বা অভিভাবক বলতে সবিতা দেবীর একমাত্র উনিই—বসন্ত

সেন।

নিকটতম আত্মীয়ের পর্যায়েই আজ উনি সবিতা দেবীর পড়েছেন।

হ্যাঁ, তাঁকেই আরো ভাল করে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে অতীতের কোন কথা যা হয়ত একমাত্র উনি ব্যতীত আর কেউই জানেন না।

তাছাড়া একবার ঘুরে দেখে আসতে হবে বোরাণীর বিলের ঐ দ্বীপটি।

ঐ দ্বীপই হচ্ছে অকুস্থান।

মনের মধ্যে সহসা কেমন যেন একটা অদ্ভুত প্রেরণা ঐ মুহূর্তেই অনুভব করে সত্যজিৎ। বোরাণীর বিলের ঐ দ্বীপটা যেন অদ্ভুত ভাবেই ওর মনকে আকর্ষণ করতে থাকে।

সত্যজিৎ আর দেরী করে না।

মস্ত বড় একটা প্রাঙ্গণ পার হয়ে একটা সরু অন্ধকার অলিন্দ মত, সেই অলিন্দেরই শেষপ্রান্তে যে দরজাটা সেটা খুলতেই সত্যজিতের চোখে পড়ল, বিলের জলে বড় বড় পাথর ফেলে, মাটি ও কাঁকর বিছিয়ে পায়ে চলা রাস্তাটা বরাবর দ্বীপের সঙ্গে গিয়ে সংযুক্ত হয়েছে।

এটি যেন প্রমোদভবন ও দ্বীপের সংযুক্ত একটি সেতু।

রাস্তাটি জল থেকে মাত্র হাতখানেক উঁচু।

বড় বড় পাথর দিয়ে বাঁধানো, দুদিকটা ক্রমশঃ ঢালু হয়ে জলের মধ্যে নেমে গিয়েছে।

দীর্ঘ কয় বৎসরের জলের স্পর্শে পাথরগুলোর বুকে সবুজ শ্যাওলার একটা আস্তরণ পড়েছে। যেন সবুজ মখমলের একখানা কার্পেটকে কে বিছিয়ে দিয়েছে রাস্তাটার দুধারে।

এই জায়গাটায় বিলের জল খুব গভীর বলে মনে হয় না। কাকচক্ষুর মত পরিষ্কার জল যেন টলটল করছে।

রাস্তাটার দুপাশে বড় বড় বুনো ঘাস গজিয়েছে, আর তার মধ্যে মধ্যে একপ্রকার জলজ কাঁটালতা।

ছোট্ট ছোট্ট লাল ফুল সেই কাঁটা লতায় ফুটে আছে। ঘন সবুজের মধ্যে সেই লাল ফুলগুলো যেন রক্তপ্রবালের মত জ্বলছে।

সত্যজিৎ পথ অতিক্রম করে দ্বীপে এসে উঠল। ত্রিভুজাকার দ্বীপটি।

পথটা এসে যেখানে দ্বীপটায় শেষ হয়েছে, সেই মুখেই একটা আমলকী গাছ, ভোরের আলো আমলকী গাছের চিকণ পাতার উপরে বড়ে যেন পিছলিয়ে যাচ্ছে।

একটা দোয়েল আমলকী গাছটার ডালে বসে শিস্ দিচ্ছে।

সামনেই ডানহাতে একটা বাঁশঝাড়। বাতাসে বাঁশঝাড়টা আন্দোলিত হয়ে কট্‌কট্‌ শব্দ তুলছে।

দ্বীপের মধ্যে পায়ে-চলা একটা পথ ছিল বটে এককালে, তবে এখন বহুদিনের যত্ন ও সংস্কারের অভাবে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ঘন আগাছায় সে পথের আর চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না।

চারিদিকে ঘন সন্নিবেশিত গাছপালা অদ্ভুত একটা আলোছায়ার রহস্য দিয়ে ঘেরা। মধ্যে মধ্যে বায়ুর তাড়নায় বৃক্ষের পত্র ডালপালা আন্দোলিত হয়ে রহস্যময় এক শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করছে।

মনে হয় কারা যেন চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে কি বলতে চায়।

অদ্ভুত একটা শিহরণ সর্বাঙ্গে অনুভব করে সত্যজিৎ।

অস্পষ্ট অনুচ্চারিত কার সাবধান-বাণী যেন বলছে, এগিয়ো না! এগিয়ো না! ওখানে মৃত্যু! ওখানে বিভীষিকা!

তবু এগিয়ে চলে সত্যজিৎ।

আরো কিছুটা অগ্রসর হবার পর গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে নজরে পড়ে দ্বীপের মধ্যস্থিত বিরাম কুটীর।

কুটীরের ঠিক পশ্চাতেই একটা প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষের তলায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল সত্যজিৎ।

এই সেই বকুল বৃক্ষ।

এরই তলায় উনিশ বছর আগে একদিন নিরুদ্দিষ্টা হেমপ্রভার গলিত মৃতদেহটা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে।

আর দীর্ঘ উনিশ বছর পরে মাত্র সাতদিন আগে এই বকুল বৃক্ষের তলাতেই নায়েব বসন্ত সেন মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর মৃতদেহটা দেখতে পেয়েছিলেন। তিনিও কি বিস্ময়ে নির্বাক হয়েছিলেন?

আশ্চর্য! উনিশ বছরের হলেও এই একই বৃক্ষতলে স্বামী ও স্ত্রীর মৃত-দেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর নির্মম পরিহাস!

ময়না-তদন্তের রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর শ্বাসরোধ করে মৃত্যু ঘটানো হয়েছে।

পরিষ্কার সহজ কথায় তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

কে হত্যা করল এমন করে স্বামী ও স্ত্রী—মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ও হেমপ্রভাকে।

একই লোকের হাতে কি স্বামী-স্ত্রী দুজনই নিহত হয়েছেন!

কিন্তু এই বা কেমন? একই দিনে তো সেই সময় দুজনকেই হত্যা করা চলতে পারত?

একজনকে হত্যা করবার পর দীর্ঘ উনিশ বছরের ব্যবধানে আর একজনকে হত্যা করবার কারণটা কি! প্রয়োজন কি ছিল এই দীর্ঘ উনিশ বছর ধরে প্রতীক্ষা করবার!

তবে কি একই হত্যাকারী দুজনকে হত্যা করেনি? দু'জন হত্যাকারী দু'জনকে হত্যা করেছে? হত্যাকারী দু'জন!

হত্যার কারণ উভয় ক্ষেত্রেই কি এক, না বিভিন্ন! বিভিন্ন কারণ হলেও অকুস্থান সেই বকুল বৃক্ষতল হল কেন?

একটার পর একটা চিন্তা সত্যজিতের মাথার মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে ফিরতে লাগল।

দু'টি হত্যাই একই সূত্রে গাঁথা, না একটির সঙ্গে অন্যটির আদৌ কোন সম্পর্ক নেই! সম্পূর্ণ বিভিন্ন! কেবল ঘটনাচক্রে দু'টি হত্যাকাণ্ডের মধ্যে একটা অদ্ভুত পারম্পর্য এসে গিয়েছে মাত্র!

জট পাকিয়ে গিয়েছে দু'টি হত্যা-রহস্য একত্র।

হত্যা-রহস্য দু'টি যতই পাক খেয়ে খেয়ে জট পাকিয়ে তোলে, সত্যজিতের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা জিদ চেপে যায়।

মীমাংসা যতই সুদূরপরাহত বলে মনে হয়, মনের মধ্যে ততই যেন আরো তীব্র করে ও একটা রহস্যের হাতছানি অনুভব করে।

কানাইয়ের মা যে বলতে চায় এর মধ্যে কোন অপদেবতার কাণ্ডকারখানা আছে, তা ও বিশ্বাস করে না এবং যুক্তি দিয়েও মানতে পারে না।

অশিক্ষিতা কানাইয়ের মার কাছে যেটা সম্ভবপর বলে মনে হয়েছে, সত্যজিতের কাছে সেটা একেবারে সম্ভবপর বলে মনে হয় না।

মনে হয় একটিবার কলকাতায় যেতে পারলে বোধ হয় ভাল হতো। সেখানে গিয়ে কোন ভাল ডিটেক্‌টিভের সন্ধান করে তাকে যদি এই কাজে নিযুক্ত করা যেত, হয়ত সহজেই এই রহস্যের মীমাংসায় পৌঁছনো যেত।

ভাবতে ভাবতে সত্যজিৎ দ্বীপের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

দ্বীপের মধ্যে যে বিরাম কুটীর, সেটা একটা একতলা পাকা বাড়ি।

রৌদ্র বৃষ্টি দীর্ঘদিন ধরে বাড়িটাকে পুড়িয়েছে ও ভিজিয়েছে। বাড়িটার আসল রং কবে পুড়ে ঝলসে ধুয়ে মুছে গিয়েছে।

দেওয়ালের গায়ে ছাদের কার্নিশে ধরেছে ফাটল আর সেই ফাটলের মধ্যে নির্বিবাদে বেড়ে উঠেছে বট-অশ্বত্থের গাছগুলো।

জানলার কবাটগুলো কোনটা কবজার সঙ্গে ঝুলছে, কোনটার একটা পাল্লা বন্ধ করা, কোনটার দুটো পাল্লাই হা-হা-করছে খোলা। মধ্যে মধ্যে হাওয়ার মরিচা-ধরা কবজার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ শোনা যায়। রং চটে গিয়েছে।

চারিদিকেই একটা হতশ্রী অযত্ন অবহেলার ছবি।

বাড়িটার চতুষ্পার্শ্বে এককালে যে চমৎকার একটি ফুলের বাগান ছিল, বিগত দিনের সেই সৌন্দর্য-সৃষ্টির ক্ষয়িষ্ণু চিহ্ন আজও চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, দৈন্য অবহেলায় বুনো আগাছায় সমাকীর্ণ হয়ে।

সেই গোলাপ, গন্ধরাজ, যুঁই, চামেলীর সমারোহ কাঁটালতা ও বুনো ফুলের পর্যাপ্ততায় লজ্জায় যেন মুখ ঢেকেছে।

এই হয়ত সেই চৌধুরীদের নন্দনকানন।

চৌধুরীবাড়ির আদরিণী বিলাসিনী বধূদের অলক্তরাগরঞ্জিত চরণের নূপুরনিক্বণে অতীতে হয়ত একদিন এই নন্দনকানন শব্দমুখরিত হয়ে উঠত।

অন্তঃপুরের সলজ্জ বধূটি হয়ত এখানে আপন খেয়াল-খুশিতে অবাধ স্বচ্ছন্দ গতিতে ঘুরে বেড়িয়েছে।

কখনো হয়ত কোন ফুলগাছের সামনে দাঁড়িয়ে ডাল থেকে ফুলটি ছিঁড়ে আপন কবরীতে লীলাভরে গুঁজে দিয়েছে।

আজ তারা কোথায়?

এই ভগ্ন বিরাম কুটীরের কক্ষের বায়ুতরঙ্গে কি তাদের দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়?

সম্মুখে ছোট অপরিসর একটি বারান্দা এবং বারান্দার সামনেই পর পর তিনখানা ঘর।

পর পর তিনটি ঘরের মধ্যেই গিয়ে প্রবেশ করল সত্যজিৎ। ঘরের মেঝেতে একপর্দা ধুলো জমে আছে। কতদিন এখানে মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি কে জানে!

॥ ৭ ॥

কথাটা সত্যজিৎ ঐদিনই সকালবেলায় চা-পান করতে করতে সবিতার কাছে বললে, আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে মিস্ চৌধুরী, তাহলে কলকাতায় একজন ভাল ডিটেকটিভকে এনগেজ করে আসি এ ব্যাপারে!

আমিও গত রাত থেকে ঐ কথাই ভাবছিলাম সত্যজিৎবাবু। কিন্তু নায়েবকাকাকে কি একটিবার জিজ্ঞাসা করে তাঁর মতামত নেওয়া উচিত নয়?

সত্যজিৎ সবিতার প্রশ্নের জবাবে বলতে যাচ্ছিল, নিশ্চয়ই। তাঁকে অবশ্যই একবার জিজ্ঞাসা করতে হবে বৈকি, কিন্তু তার পূর্বেই ঘরের দরজার উপরে নায়েবমশাইয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কিসের মতামত মা সবি?

উভয়েই চমকে ফিরে তাকাল।

পায়ে হরিণের চামড়ার চটিজুতো থাকা সত্ত্বেও ইতিমধ্যে কখন একসময় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নায়েব বসন্ত সেন একেবারে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং ওদের পরস্পরের আলোচনার শেষ কথাগুলো শুনতে পেয়েছেন, এরা টেরও পায়নি।

এই যে নায়েবকাকা, আসুন! সবিতাই আহ্বান জানাল।

কর্তার শ্রাদ্ধের যোগাড় তো এবারে দেখতে হয়, সেই ব্যাপারেই একটা পরামর্শ করবার জন্য তোমার কাছে আসছিলাম মা। কিন্তু একটু আগে কি যেন মতামতের কথা বলছিলে মা!

সবিতা সত্যজিতের মুখের দিকে একবার পলকের জন্য দৃষ্টিপাত করে। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বলে, বলছিলাম নায়েবকাকা, বাবার এই মৃত্যুর কথাটা—একটু ইতস্ততঃ করে সবিতা আবার বলে, ব্যাপারটাকে আমরা এত সহজে ভুলে যাব কেন?

কিন্তু মা এক্ষেত্রে আমাদের আর করবারই বা কি আছে? দারোগাবাবুর সঙ্গে তুমি এখানে এসে পৌঁছবার পূর্বেও অনেক পরামর্শ করেছি। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা অস্পষ্ট ধোঁয়ার মত মনে হয়। কোন দিক দিয়ে কোন সূত্রেরই সন্ধান আমরা পাচ্ছি না, অন্তত যার সাহায্যে একটা অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

সূত্র হয়ত আমরা আপাততঃ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু এসব ব্যাপারে যোগ্য ব্যক্তিও তো আছেন। তাঁরা চেষ্টা করলে—

সবিতার কথায় বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন নায়েব বসন্ত সেন ওর মুখের দিকে।

হ্যাঁ নায়েবকাকা, ভাবছি কলকাতা থেকে একজন সুদক্ষ ডিটেক্টিভ এনে—

ডিটেক্টিভ্।

হ্যাঁ, ডিটেক্টিভ্। আপনি কি বলেন?

সবিতার প্রস্তাবে বসন্ত সেনের চোখেমুখে একটা সুস্পষ্ট বিরক্তির রেখা যেন দেখা দিয়ে পরক্ষণেই মিলিয়ে যায়।

একবার আড়চোখে বসন্ত সেন সত্যজিতের দিকেও তাকালেন।

বেশ তো মা। তোমার যদি তাই ইচ্ছা হয়—

তাহলে সত্যজিৎবাবু, আপনি আজই কলকাতায় চলে যান। একজন ভাল

দেখে ডিটেকটিভ্ একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

নায়েব বসন্ত সেন কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন, তারপর হঠাৎ যেন গা-ঝাড়া দিয়ে গলাটা খাকারি দিয়ে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, ভাল কথা মা, তোমার মামাবাবু নিত্যানন্দ সান্যাল মশাই এখানে আসছেন দু'চার দিনের মধ্যেই। আমাকেও একটা চিঠি দিয়েছেন, আর এই নাও তোমারও একটা চিঠি আছে।

বসন্ত সেন একটা খাম এগিয়ে দিলেন সবিতার দিকে!

মামাবাবু! মামাবাবু আসছেন? সবিতার মনে পড়ে নিত্যানন্দ সান্যালকে। মধ্যে মধ্যে কলকাতায় এসে ওর হস্টেলে ওর সঙ্গে দেখা করেছেন এবং এখানেও এসেছেন। তার মা হেমপ্রভার দূরসম্পর্কীয় পিসতুত ভাই। আপন মায়ের পেটের ভাই নয়। ওর মায়ের মৃত্যুর আগে মধ্যে মধ্যে এ বাড়িতে আসতেন। কানাইয়ের মার মুখেই শোনা, তার মা নাকি ঐ সান্যাল-বাড়িতেই মানুষ। ছোটবেলায় মা-বাপ মারা যাওয়ায় ঐ মামাবাবুর মার কাছেই নাকি মা মানুষ হয়েছে এবং ঐ সান্যাল-বাড়ি থেকেই মার বিবাহ হয়।

পরবর্তীকালে নিত্যানন্দ সান্যাল চাকরিব্যাপদেশে পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন।

তবে দূর পাঞ্জাবে চলে গেলেও মামাবাবুর সঙ্গে ওদের সম্পর্ক বা যোগাযোগটা ছিন্ন হয়নি, এমন কি তার মায়ের মৃত্যুর পরও। কারণ বলতে গেলে তার মায়ের দিক দিয়ে একমাত্র আত্মীয় ঐ নিত্যানন্দ সান্যালই ছিলেন বেঁচে। দূরসম্পর্কীয় ভাই বোন হলেও সেই শিশুকাল হ'তে একই গৃহে পাশাপাশি মানুষ হওয়ার দরুন ও মায়ের ইহজগতে আর আপনার জন বলতে দ্বিতীয় কেউ না থাকায় নিত্যানন্দ সান্যাল অর্থাৎ তার ঐ মামাবাবুর মায়ের পরমাত্মীয়ই কেউ না থাকায় নিত্যানন্দ সান্যাল অর্থাৎ তার ঐ মামাবাবু মায়ের পরমাত্মীয়ই

লোকটিও চমৎকার। বাঙালীর মধ্যে সচরাচর অমন চমৎকার দেহসৌষ্ঠব বড় একটা চোখে পড়ে না। টকটকে উজ্জ্বল গায়ের বর্ণ। খড়্গের মত নাসিকা। চোখ দু'টো কি হাস্যময়! একমুখ দাড়ি।

ইদানীং চুল দাড়ি সব প্রায় পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। কারণে অকারণে হা-হা করে প্রাণ খুলে হাসেন।

একমাত্র মাথায় শ্বেতশুভ্র কেশ ও দাড়ি ছাড়া বুঝবার উপায় নেই লোকটার বয়স হয়েছে।

বয়সে তাঁর বাবার মতই।

দিন কুড়ি আগেও কলকাতায় কি একটা কাজে হঠাৎ এসেছিলেন একদিনের জন্য, তবু ওর সঙ্গে দেখা করতে ভোলেননি।

বলেছিলেন এবারে পরীক্ষা হয়ে গেলে ওর বাবাকে বলে কিছুদিনের জন্য ওঁর কর্মস্থল লুধিয়ানায় ওকে নিয়ে যাবেন। সেখানে ওরই প্রায় সমবয়সী ওঁর একটি মেয়ে আছে—নাম তার কল্যাণী। অবশ্য কল্যাণীকে আজ পর্যন্ত সে দেখেনি।

বসন্ত সেন বললেন, তাহলে আমি উঠি মা। সত্যজিতের যাবার ব্যবস্থা দেখি গে।

সবিতা নিজের চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। বললে, হ্যাঁ, তাই যান নায়েব কাকা।

বসন্ত সেন বিদায় নিয়ে ঘর হ'তে বের হয়ে গেলেন।

সবিতা নিত্যানন্দ সান্যালের চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল।

নিত্যানন্দ সান্যালের চিঠিটা সংক্ষিপ্ত।

কল্যাণীয়া মা সবিতা,

সংবাদপত্র মারফৎ তোমার পিতার আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে বিস্মিত ও মর্মাহত হইয়াছি। একাকিনী নিশ্চয়ই তুমি বিশেষ বিপদে ও অসুবিধায় পড়িয়াছ। তোমার বর্তমান অবস্থা আমি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। শ্রীশ্রী দয়াময় দীনবন্ধু তোমাকে সহসা এইভাবে কেন যে বিপদ-গ্রস্ত করলেন বুঝিতে পারিতেছি না। প্রভুর লীলা বোঝা সত্যই ভার। যাহা হউক চিন্তা করিও না, এদিককার যা হয় একটা ব্যবস্থা করিয়া শীঘ্রই দু'চার দিনের মধ্যে আমি রাজবাটি পৌঁছিব।

পুঃ। কল্যাণীকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেছি।

ইতি—

আঃ তোমার মামাবাবু

পত্রখানা পড়ে সবিতা নিজেও যেন কতকটা স্বস্তি ও শান্তি বোধ করে।

অনেকক্ষণ পরে সত্যজিৎ কথা বলে, যাক এ একপক্ষে আপনার ভালই হলো, আপনার মামা আসছেন তাঁর মেয়েকে নিয়ে। কিন্তু এত বড় একটা দুঃসংবাদ, তাঁকেই তো সর্বাগ্রে সংবাদ দিয়ে এখানে আনানো উচিত ছিল। বলতে গেলে এখনও তো দেখতে পাচ্ছি উনিই আপনার একমাত্র আত্মীয়।

সবিতা এবার সংক্ষেপে মামার পরিচয়টা দেয় সত্যজিতের কাছে, ইনি অবিশ্যি আমার নিজের আপন মামা নন। তবে আপনার জনের চাইতেও বেশী। মার দূরসম্পর্কীয় পিসতুত ভাই। এবং মা ঐ মামাদের বাড়িতেই মানুষ এবং শুনেছি ওখান থেকেই মার বিবাহও হয়েছিল।

তা যাই হোক, উনি এলে আপনি অনেকটা বল-ভরসা পাবেন তো বটেই, তাছাড়া ওঁর মেয়েও যখন ওঁর সঙ্গেই আসছেন—একজন সঙ্গী পাবেন, নিঃসঙ্গতাও অনেকটা আপনার লাঘব হবে।

মামার মেয়ে কল্যাণীকে কখনো আমি দেখিনি তবে শুনেছি সে আমারই সমবয়েসী।

তাহলে তো খুবই ভাল হবে।

*　　*　　*

ঐদিন রাত্রের গাড়িতে সত্যজিৎ কলকাতায় চলে গেল।

॥ ৮ ॥

কিরীটীর টালিগঞ্জের বাড়িতে সত্যজিৎ, সুব্রত ও কিরীটীর মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল।

সত্যজিৎ তার এক বন্ধু অমিয়র চিঠি নিয়ে প্রথমে সুব্রতর সঙ্গে দেখা করে এবং সুব্রত সত্যজিৎকে সঙ্গে নিয়ে কিরীটীর ওখানে আসে।

কিরীটী হাসতে হাসতে একসময় বললে কিন্তু একটা কথা যদি আমাকে

খুলে বলেন সত্যজিৎবাবু, তাহলে বড়ই সুখী হই।

বলুন কি জানতে চান!

আপনি তো সম্পূর্ণ তৃতীয় ব্যক্তি, but why you are so much interested?

কিরীটীর প্রশ্নে সত্যজিতের মুখটা রাঙা হয়ে ওঠে।

সেটুকু কিরীটীর দৃষ্টি এড়ায় না। মৃদু হেসে সে বলে, বুঝেছি। আর বলতে হবে না। আচ্ছা আপনাদের মধ্যে কোন পূর্ব-পরিচয় বা সাক্ষাৎ আলাপ ছিল?

সত্যজিৎ এতক্ষণে লজ্জা ও সংকোচটা কাটিয়ে উঠেছে, স্মিতকণ্ঠে বললে, তাহলে আপনাকে কথাটা খুলেই বলি কিরীটীবাবু। আপনাকে বলেছি, আমার বাবা ও মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী গ্রামে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়তেন। আমাদের বাড়ি রাজবাড়িরই পাশের গ্রামে মহেশডাঙায়। মাঝে থাকে একটা খাল। মহেশডাঙা থেকে প্রত্যহ খাল পার হয়ে বাবা পাশের গ্রামের স্কুলে পড়তে আসতেন। মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী জমিদার-বাড়ির ছেলে; এণ্ট্রান্স পাস দেবার পর আর তিনি লেখাপড়া করেননি। বাবারও লেখাপড়া হয়ে ওঠেনি অর্থাভাবে। এবং পাস দেবার কিছুদিন পরেই বাবা একবস্ত্রে কোনমতে ভাগ্যান্বেষণে পালিয়ে যান সুদূর বর্মায়। ক্রমে বাবা সেখানে গিয়ে কাঠের ব্যবসা করে নিজের অবস্থা ফেরান। দুই বন্ধুর মধ্যে ভাগ্যক্রমে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেও যোগাযোগটা ছিন্ন হয়নি কখনও। নিয়মিত পত্রমারফৎ পরস্পর পরস্পরকে সকল সংবাদ দেওয়া-নেওয়া করতেন। আমার চাইতে সবিতা বছর ছয়েকের ছোট। দুই বন্ধুর মধ্যে পত্র মারফৎই কথা হয়েছিল, আমার সঙ্গে বাবা সবিতার বিবাহ দেবেন। অবশ্য এসব কথা কিছুই আমি জানতাম না। পরে মাস পাঁচেক আগে বিলেত থেকে ফিরে আসার পর বাবা একদিন আমাকে ঘরে ডেকে বললেন সব কথা। এবং তাঁর ইচ্ছাটুকুও জানালেন। কিন্তু আমি রাজী হলাম না। যাকে কোনদিন দেখিনি, যার সম্পর্কে কিছুই জানি না বলতে গেলে, তাকে হঠাৎ বিবাহ করে ঘরে আনব, কেন যেন মনের থেকে এ ব্যাপারে কিছুতেই সাড়া পাচ্ছিলাম না। কিন্তু বাবা বার বার আমাকে বলতে লাগলেন তাঁর বাল্যবন্ধুকে তিনি কথা দিয়েছেন, অন্যথায় তিনি দত্তাপহারক হবেন। অবশেষে বাবার পীড়াপীড়িতে কতকটা বাধ্য হয়েই আমি বললাম, বেশ, এখানে এসে সেই মেয়েকে দেখে যদি আমার পছন্দ হয় তাহলে আমি এ বিবাহে রাজী আছি। বাবা তাঁর বন্ধুকে পত্র মারফৎ সব কথা জানালেন। মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীও এ বিষয়ে দেখলাম অত্যন্ত আধুনিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি পত্রোত্তরে জানালেন, তাই হবে, আমি যদি গিয়ে তাঁর মেয়েকে দেখে পছন্দ করি তাহলে এ বিবাহ হবে। আর তাছাড়া এও তিনি জানালেন, আজ পর্যন্ত তাঁর মেয়েকে এ বিবাহ সম্পর্কে কোন কথাই জানাননি যখন তখন আমার গিয়ে তাঁর মেয়েকে দেখার মধ্যে কোন অসুবিধাই থাকতে পারে না। সেই অনুসারেই সামনের গ্রীষ্মের বন্ধে সবিতা বাড়ি যাবে, আমাকেও ঐ সময়েই যেতে লিখলেন।

আপনি তাহলে সেই ব্যবস্থা অনুযায়ীই এসেছেন বাংলাদেশে?

হ্যাঁ।

আচ্ছা পরে আপনার সঙ্গে ও সবিতা দেবীর সঙ্গে ও-সম্পর্কে কোন কথাবার্তা হয়েছে?

না।

ভাল কথা, নায়েব বসন্ত সেন যখন চৌধুরী-বাড়িতে বহুদিন আছেন, এ সম্পর্কে নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু জানেন?

জানাটাই তো স্বাভাবিক। এবং আমার মনে হয় জানেনও, কারণ আমি যে আসছি সে কথাটা যখন তিনি চৌধুরী মশাইয়ের কাছে শুনেছিলেন তখন ও কথাটা কি আর শোনেননি?

তা বটে। তবে আপনার সঙ্গে ঐ সম্পর্কে কোন কথা হয়েছে কি?

না।

আপনার বাবাকে তাঁর বন্ধুর নিহত হবার সংবাদটা নিশ্চয়ই আপনি দিয়েছেন?

দিয়েছি।

আর বিবাহ সম্পর্কে আপনার মতামতটা? কিরীটীর চোখের কোণে কৌতুকের চাপা হাসি।

সত্যজিৎ চাপা হাসির সঙ্গে জবাব দেয়, শুধু আমার মতামত হলেই তো এক্ষেত্রে চলবে না মিঃ রায়। সবিতা দেবীরও এখন বয়স হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছেন, তাঁর নিজস্ব একটা মতামতও তো আছে এ ব্যাপারে।

হ্যাঁ, তা একটা আছে বৈকি। তবে তাঁকে না দেখে এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় না করেই তাঁর সম্পর্কে আপনার মুখ থেকে যতটুকু জেনেছি, আপনার যখন এ বিবাহে অমত নেই তখন তাঁর দিক থেকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

কেন বলুন তো? একজনের সঙ্গে আলাপ করে অন্যের thought-readingও আপনি করতে পারেন নাকি দূর থেকেই?

তা একটু-আধটু পারি বৈকি। নইলে এত সহজে এ ব্যাপারে আমি রাজী হতাম না। বিশেষ করে যখন জানতে পারছি এ ব্যাপারের শেষটুকু মধুরেণ সমাপ্ত হবে; এর আগের অধ্যায়ে যত দুঃখই থাকুক না কেন, সেটাই মনকে আমার inspiration যুগিয়েছে। নইলে সত্য কথা বলতে কি আপনাকে, আজকাল তথাকথিত হত্যা-রহস্যের মীমাংসার ব্যাপারে যেন কোন interestই পাই না। সেই অর্থ, সেই লালসা, সেই প্রেম, সেই প্রতিহিংসা প্রত্যেকটি হত্যার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত শেষ দৃশ্যে হয় হাতকড়া বা ফাঁসির দড়ি দিয়ে এমন একটা করুণ রসের সৃষ্টি করে যে, নিজের উপরও যেন ধিক্কার এসে যায়।

কিন্তু সত্যিকারের culprit বা দোষীকে ধরিয়ে দেওয়াও তো নাগরিক হিসাবে আপনার একটা মহৎ কাজ বা কর্তব্য।

তা ঠিক আমার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত নয় সত্যজিৎবাবু। এককালে একটা মোহ ও vanity বশেই এ lineয়ে হাত দিয়েছিলাম। বুদ্ধির খেলায় একজনকে ধরাশায়ী করতে একটা অপূর্ব পুলক অনুভব করতাম। ক্রমে সেটা একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এখন নেশাটা এসেছে থিতিয়ে।

কেন?

তার কারণ দেখতে পাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তথাকথিত ঐ সব ভিলেনের দল অপরাধই করে বটে, তবে অপরাধের artটাকে জানে না।

অপরাধের আর্ট?

হ্যাঁ। আর্ট বলতে অবশ্য এক্ষেত্রে আমি এখানে ভিলেনের চাতুরীটাকেই mean করেছি। বলাই বাহুল্য আপনার ব্যাপারটা সে পর্যায়ে পড়ে না, কারণ আপনার কাছ হতে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা শুনে আমার যতদূর মনে হচ্ছে, হেমপ্রভা চৌধুরী ও মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর হত্যার ব্যাপার দুটো একসূত্রে তো গাঁথা নয়ই, হত্যাকারীও এক নয়।

সত্যজিৎ যেন একটু বিস্মিত হয়েই কিরীটীর মুখের দিকে তাকায় এবং বলে, কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে দুটো মৃতদেহ একই জায়গায় পাওয়া গেল কেন? Why peculiar coincidence!

ঘটনার পারম্পর্য বা সামঞ্জস্য এক এক সময় এরকম অদ্ভুত ঘটতে দেখা যায় সত্যজিৎবাবু, কিন্তু দীর্ঘ উনিশ বছরের ব্যবধানে একই হত্যাকারী প্রথম হত্যার পর দ্বিতীয়বার হত্যা করবে এটা আদপেই স্বাভাবিক নয়।

কিন্তু—

না সত্যজিৎবাবু, time factor is a very important factor! আমাদের দেশে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যেসব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ে থাকে, হত্যাকারী একটা ক্ষণিক উত্তেজনার মুহূর্তেই হত্যা করে বসে। পূর্ব-পরিকল্পিত ভাবে সব situationকে closely watch করে হত্যা করে না। অবশ্য একেবারেই যে হয় না তা আমি বলতে চাই না, কারণ নজিরের অভাব নেই। যেমন ধরুন পাকুড় মার্ডার কেস, ভাওয়ালের মধ্যম কুমারকে হত্যার প্রচেষ্টা—প্ল্যান করেই এবং সময় নিয়ে ঐ সব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে একটু ভেবে দেখলেই এবং সমগ্র ঘটনাকে ভালভাবে পর্যালোচনা করে দেখলে বুঝতে পারবেন সেরকম কিছু নয়। প্রথমটা দ্বিতীয়টাকে follow করেনি, তবে দ্বিতীয় হত্যাটা প্রথম হত্যাটার cause বা কারণ হতে পারে। সে যাক। এ ধরনের মতামত প্রকাশ করবার আগে আমাদের অনেক কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য এ ব্যাপারে জানা প্রয়োজন। এবং আরো অনেক কিছু বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। অর্থাৎ যাকে আমরা তদন্তের ব্যাপারে findings বলি—সব এখনও আমাদের হাতে তো আসেনি—

তাহলে কবে আমরা রওনা হচ্ছি মিঃ রায়?

শুভস্য শীঘ্রং! আজই রাত্রের গাড়িতে হলেই বা ক্ষতি কি?

বেশ তো, তবে সেই রকম ব্যবস্থাই করি।

করুন।

অতঃপর সত্যজিৎ তখনকার মত কিরীটীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাত্রোত্থান করে।

॥ ৯ ॥

কিরীটীকে নিয়ে সত্যজিৎ রাজবাটিতে পৌঁছবার পরের দিনই সন্ধ্যার দিকে নিত্যানন্দ সান্যাল মশাই তাঁর কন্যা কল্যাণীকে সঙ্গে নিয়ে এসে পৌঁছলেন।

স্টেশনে জমিদার-বাড়ির টমটমই সান্যালমশাইকে আনতে গিয়েছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার সবে তখন চারিদিকে ঘন হয়ে এসেছে। প্রমোদভবনের কক্ষে কক্ষে বাতি জ্বলে উঠেছে।

সত্যজিতের ঘরেই কিরীটী তার থাকবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল।

সত্যজিৎ পাশের ঘরে সবিতার সঙ্গে কথা বলছিল, আর কিরীটী একা ঘরের মধ্যে একটা আরাম-কেদারার উপরে গা এলিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে একটা চুরোটে অগ্নিসংযোগ করে মধ্যে মধ্যে ধূমোদ্‌গিরণ করছিল।

সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল এবং সেই সঙ্গে শোনা গেল গম্ভীর মোটা গলার ডাক, সবি! আমার সবি মা কই!

কণ্ঠস্বর শ্রুতিপটে প্রবেশ করা মাত্রই কিরীটী সহসা যেন নিজের অজ্ঞাতেই আরাম-কেদারাটার উপরে সোজা হয়ে উঠে বসে।

পায়ের শব্দ ক্রমেই সিঁড়ি-পথে উপরের দিকে উঠে আসছে।

সবিতাও বোধ হয় সে কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিল এবং ঘর থেকে বাইরে বারান্দায় বের হয়ে এসেছিল।

কিরীটীও উঠে এগিয়ে যায় খোলা দরজাটার দিকে।

এবং নিজের অস্তিত্বকে গোপন রেখেই ইচ্ছা করে দরজার খোলা কবাট দু'টো ভেজিয়ে দিয়ে ঈষৎ ফাঁক ক'রে বাইরের বারান্দায় দৃষ্টিপাত করে।

সিঁড়ির মাথাতেই আগন্তুক নিত্যানন্দ সান্যালের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল এবং সবিতা নীচু হয়ে নিত্যানন্দর পায়ের ধুলো নিতে যেতেই নিত্যানন্দ পরম স্নেহে প্রসারিত দুই বাহুর সাহায্যে সবিতাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মধুসিক্ত করুণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, থাক মা থাক, হয়েছে—হয়েছে।

কণ্ঠস্বরটা সান্যালমশাইয়ের অশ্রুতে যেন বুজে আসে, চোখের কোলেও দু'ফোঁটা জল চক্‌চক্‌ করে ওঠে বোধ হয়।

সবিতার মাথাটা সান্যালমশাই নিজের প্রশস্ত বক্ষের উপর ন্যস্ত করে ধীরে ধীরে ওর মাথার চুলে সস্নেহে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করতে থাকেন।

বারান্দার যেটুকু আলো সান্যালমশাইয়ের চোখে-মুখে পড়েছিল, সেই আলোতেই কিরীটী দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে, অন্তরের রুদ্ধ শোকাবেগটা সামলাবার জন্য সান্যালমশাই যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে সান্যাল-মশাইয়ের মেয়ে কল্যাণীও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কল্যাণী সবিতার চাইতে বছর চারেকের ছোট হবে বলেই মনে হয়। মেয়েটি কালো দেখতে হলেও সে কালো রূপের মধ্যে অপূর্ব একটা শ্রী আছে। মেয়েটির মুখখানির যেন এক কথায় তুলনা হয় না। ছোট কপাল, কপালের উপর কয়েকগাছি চূর্ণ কুন্তল এসে পড়েছে; দু'চোখের দৃষ্টিতে অপূর্ব একটা বুদ্ধির দীপ্তি যেন ঝক্‌ঝক্‌ করছে।

সবিতা নিজেকে সামলে নিয়ে সান্যাল মশাইয়ের স্নেহের বাহুবন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ধীরকণ্ঠে বলে, চলুন মামাবাবু, ঘরে চলুন।

চল মা।

কল্যাণীর দিকে ফিরে তাকিয়ে সবিতা তাকেও আহ্বান জানায়, এসো কল্যাণী।

প্রভু হে, দয়াময়! সবই তোমার ইচ্ছা! বলতে বলতে সান্যালমশাই সবিতা ও কল্যাণীকে অনুসরণ করে সবিতার ঘরের দিকে অগ্রসর হতেই সবিতার ঘরের দ্বারপথে সত্যজিৎ এসে দাঁড়াল।

সহসা খোলা দ্বারপথে সত্যজিৎকে এসে দাঁড়াতে দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলেন সান্যালমশাই, এবং একবার সত্যজিতের দিকে তাকিয়ে নিমেষেই তার

আপাদমস্তক এক দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে সবিতার দিকে ফিরে তাকালেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

সবিতা কোন প্রকার ইতস্তত মাত্র না করে সান্যালমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, বাবার বন্ধুর ছেলে সত্যজিৎবাবু, বর্মা থেকে এসেছেন।

ও, তুমিই সত্যজিৎ—মৃত্যুঞ্জয়ের বন্ধুপুত্র! মৃত্যুঞ্জয়ের মুখে তোমার সম্পর্কে আমি সব কথাই শুনেছি। তা বেশ বেশ—, কথাটা বলে এবারে সত্যজিতের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়েই প্রশ্ন করলেন, তা বাবাজীর এখানে কবে আসা হলো?

সবিতা দেবীর সঙ্গে একই ট্রেনে এখানে এসেছি। জবাব দিল সত্যজিৎ।

একই ট্রেনে আসা হয়েছে! তা বেশ বেশ! মৃত্যুঞ্জয়ের বন্ধুপুত্র তুমি, এ বাড়ির পরমাত্মীয় বইকি। হ্যাঁ মা সবি, এর এখানে থাকতে কোন কষ্ট বা অসুবিধা হচ্ছে না তো?

না, না, আপনি ব্যস্ত হবেন না মামাবাবু। প্রত্যুত্তর দেয় সত্যজিৎ।

সকলে এসে সবিতার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল।

সত্যজিৎ একটা খালি চেয়ার এগিয়ে দিতে দিতে সান্যালমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, বসুন মামাবাবু।

সান্যালমশাই চেয়ারটার উপর উপবেশন করে একবার ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিলেন।

বসন্তর সঙ্গে দেখা হলো না—সে কি নেই? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন নিত্যানন্দ সবিতার মুখের দিকে।

হ্যাঁ, বসন্তকাকা আছেন তো। সবিতা জবাব দেয়।

কই, নিচে তাকে দেখলাম না তো।

দুপুরের দিকে কাছারীতে গিয়েছেন, এখনো বোধ হয় ফেরেননি।

এমন সময় নীচে একটা উচ্চকণ্ঠের গোলমাল শোনা গেল। গোলমালের শব্দ ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেরই কানে এসেছিল এবং সকলেই প্রায় উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

ব্যাপার কি! নিচে এত গোলমাল কিসের? নিত্যানন্দই কতকটা যেন স্বগতভাবেই প্রশ্ন করলেন।

আমি দেখছি। সত্যজিৎ এগিয়ে যায়।

সবিতাও সত্যজিৎকে অনুসরণ করে।

নিচে বাইরের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সত্যজিৎ ও সবিতা থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

অত্যন্ত দীর্ঘকায় মিলিটারী লংস ও বুসকোট পরিধান এক ভদ্রলোক উচ্চকণ্ঠে নায়েব বসন্তবাবুর সঙ্গে তর্ক করছেন। ঠাকুর, বনমালী, গোবিন্দ প্রভৃতি ভৃত্যের দল চারিদিকে দাঁড়িয়ে ভিড় করে।

আগন্তুকের দীর্ঘ বলিষ্ঠ গঠন প্রথমেই সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। মুখখানা চৌকো। ছড়ানো চোয়াল।

মুখখানা দেখলেই মনে হয় যেন অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ কঠিন ও কর্কশ। চোখ দুটো ছোট ছোট গোলাকার।

লোকটার সামনেই পায়ের কাছে একটা হোল্ডঅল স্ট্রাপ দিয়ে বাঁধা, একটা চামড়ার মাঝারি আকারের সুটকেস ও একটা এ্যাটাচী কেস।

আগন্তুক বসন্তবাবুকেই প্রশ্ন করছিল—আমার চিঠি পাননি মানে কি! এডেন থেকে পর পর দুখানা চিঠি দিয়েছি। এতদূর পথ এই বোঝা নিজের কাঁধে করে নিয়ে আসতে হয়েছে।

না, আপনার কোন চিঠিই পাইনি।

বেশ, চিঠি না পেয়েছেন না পেয়েছেন। চিঠিটা পেলে আর এমনি ঝামেলাটা আমাকে সহ্য করতে হতো না—

কিন্তু আপনার পরিচয় সম্পর্কে যখন আমি এতটুকুও জ্ঞাত নই, তখন এ বাড়িতে আপনাকে আমি উঠতে দিতে পারি না। নায়েব বসন্ত সেন বললেন।

বটে! উঠতে দিতে পারেন না! আমার পরিচয়টা পাবার পরও নয়?

না। দৃঢ়কণ্ঠে বসন্তবাবু প্রত্যুত্তর দেন।

তাহলে আপনি বলতে চান যে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী আমার কাকা ছিলেন না? অর্থাৎ সোজা কথায় আমি তাঁর ভাইপো নই? কিন্তু এ কথাটাও কি কখনও আপনি শোনেননি কাকার মুখে যে, তাঁর এক বড় জাঠতুতো ভাই ছিল শশাংকশেখর চৌধুরী এবং ১৮।১৯ বৎসর বয়সের সময় তিনি ভাগ্যান্বেষণে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান? আপনি তো শুনি বহুকাল এ-বাড়িতে আছেন। এ কথাটা কখনো কাকার মুখে শোনেননি?

শুনেছি। শুনেছি তাঁর এক জাঠতুতো ভাই ছিল কিন্তু—

তবে আবার এর মধ্যে কিন্তুটা কি?

কিন্তুটা যথেষ্ট আছে বৈকি। গম্ভীর দৃঢ় সংযত কণ্ঠে বসন্তবাবু এবারে বললেন, আপনি সন্তোষ চৌধুরী যে সেই গৃহত্যাগী শশাঙ্কশেখর চৌধুরীরই একমাত্র পুত্র তার তো কোন প্রমাণ দেননি, একমাত্র আপনার কথা ছাড়া—

What do you mean! আমার কথা ছাড়া মানে কি? আমার কথার কি কোন মূল্যই নেই? আপনি তাহলে বলতে চান I am an imposter—প্রতারক!

মিথ্যে আপনি চেঁচাচ্ছেন মশাই। গলাবাজি করে এ প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে না। আপনার কাছে কোন লিখিত-পড়িত প্রমাণ আছে কি, যার সাহায্যে আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে আপনিই সেই শশাংকবাবুর পুত্র সন্তোষ চৌধুরী, এই চৌধুরী বংশেরই একজন—

তাও আছে বৈকি! প্রয়োজন হলে আদালতেই সেটা আমি পেশ করবো, আপনাকে নয় অবশ্যি—, ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে জবাব দিল সন্তোষ চৌধুরী।

সবিতা এতক্ষণ নিঃশব্দ বিস্ময়ে ওদের পরস্পরের কথা-কাটাকাটি শুনছিল। কিন্তু চুপ করে থাকতে পারল না, একটু এগিয়ে এসে বললে, কে এই ভদ্রলোক কাকাবাবু?

সন্তোষ চৌধুরী সবিতার কথায় তার দিকে চোখ তুলে তাকাল, তুমিই বোধ হয় সবিতা, কাকার মেয়ে? আমাকে তুমি চিনবে না। আমি তোমার জাঠতুতো ভাই। এডেন থেকে আসছি, আমার নাম সন্তোষ চৌধুরী।

এডেন থেকে আসছেন?

হ্যাঁ। It's a long journey! সব বলবো, আগে একটু চা চাই বোন। তৃষ্ণায় গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। এমন হতচ্ছাড়া জায়গা যে স্টেশনে একটা চায়ের স্টল পর্যন্ত নেই। পরক্ষণেই সবিতার জবাবের অপেক্ষা মাত্রও না করে অদূরে দণ্ডায়মান ভৃত্যের দিকে তাকিয়ে বললে, এই বেটারা, হাঁ

করে ভূতের মত দাঁড়িয়ে দেখছিস কি! জিনিসগুলো উপরে নিয়ে চল্ না। I want some rest, ভীষণ tired!

কিন্তু তার কথায় কেউ কোন আগ্রহ জানায় না। যে যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনিই দাঁড়িয়ে থাকে।

সন্তোষবাবুর জিনিসপত্র নিচের মহলে আমার পাশের খালি ঘরটার রাখ। গোবিন্দর দিকে তাকিয়ে বসন্তবাবু বললেন।

নিচের মহলে থাকতে হবে মানে? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সন্তোষ চৌধুরী বসন্তবাবুর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, নিচের ঘরেই আপনাকে থাকতে হবে যতক্ষণ না আপনার identity আমি সঠিকভাবে পাচ্ছি।

কঠিন স্বরে নায়েব বসন্তবাবু বলে ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন আর দ্বিতীয় কোন বাক্যব্যয় মাত্রও না করে।

বসন্তবাবুর খড়মের শব্দটা খট্‌খট্ করে ঘরের বাইরের বারান্দায় মিলিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে যারা আর সকলে উপস্থিত ছিল, স্থাণুর মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো।

শেষ নির্দেশ যেন জারী হয়ে গিয়েছে। এবং বসন্তবাবুর মুখনিঃসৃত সে নির্দেশের বিরুদ্ধে এ কক্ষের মধ্যে উপস্থিত কারো যেন এতটুকু ক্ষীণ প্রতিবাদ করবারও ক্ষমতা বা দুঃসাহস নেই, সেটুকু বুঝতে কারোরই কষ্ট হয় না।

কক্ষের জমাট স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে প্রথমেই কথা বলল সন্তোষ চৌধুরী, তাহলে আমাকে নিচের ঘরে থাকতে হবে সবিতা? কথাটা বলে সন্তোষ সবিতার মুখের দিকে তাকাল।

ঘটনার পরিস্থিতিতে সত্যজিৎ নিজেকে যেন একটু বিব্রত বোধ করে। সম্পূর্ণ অনাত্মীয় সে।

সত্যিই যদি এই লোকটি একটু আগে যা বলল ঠিক হয় এবং এই চৌধুরীদের আত্মীয়ই হয়, তাহলে একে নিচের একটা ঘরে স্থান দিয়ে নিজের তার উপরের একখানা ঘর দখল করে থাকাটা নিশ্চয়ই শোভনীয় হবে না ও সমীচীনও হবে না।

সত্যজিৎ এবারে কথা বললে, আমিই কেন নিচের একটা ঘরে এসে থাকি না মিস চৌধুরী? উনি বরং—

আপনি! বিস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সন্তোষ চৌধুরী এতক্ষণে সত্যজিতের মুখের দিকে।

আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না সন্তোষবাবু। আপনি এসেছেন এডেন থেকে আর আমি আসছি বর্মামুলুক—রেঙ্গুন থেকে।

এদের কোন আত্মীয় রেঙ্গুনে ছিলেন বলে তো কই জানি না! সন্তোষ চৌধুরী কথাটা বললে।

ঠিকই। আমি এদের আত্মীয় নই—

তবে?

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর বন্ধুপুত্র। এদের গৃহে সামান্য কয়েকটা দিনের জন্য অতিথি মাত্র। শীঘ্রই চলে যাবো।

অঃ—, একান্ত নিরাসক্ত ভাবেই সন্তোষ চৌধুরী শব্দটা উচ্চারণ করল।

আপাততঃ তো ওপরের কোন ঘর খালি নেই সন্তোষদা, আপনি বরং দুটো

দিন কাকা যে ব্যবস্থা করে গেলেন নিচের ঘরেই থাকুন।

সবিতার কথায় যুগপৎ সকলেই যেন একটু বিস্মিত ভাবেই ওর মুখের দিকে তাকাল। গোবিন্দ, বাবুর জিনিসপত্রগুলো নায়েবকাকার পাশে যে ঘরটা খালি আছে, সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে ব্যবস্থা করে দাও। সবিতা এবারে কতকটা দৃঢ়কণ্ঠেই যেন তার বক্তব্যটা জানিয়ে দিল।

গোবিন্দ এগিয়ে এসে সন্তোষ চৌধুরীর মালপত্রগুলো মাটি থেকে তুলে নিতে নিতে বললে, চলেন বাবু—

চল। সন্তোষের কণ্ঠস্বর ও মুখের চেহারাটা কেমন যেন অদ্ভুত শান্ত ও নিরাসক্ত শোনায়।

গোবিন্দ মালপত্রগুলো মাথায় তুলে নিয়ে ঘরের বাইরের দিকে পা বাড়াল এবং সন্তোষ চৌধুরী তাকে অনুসরণ করল।

বসন্তবাবুর পাশের ঘরটা খালিই পড়েছিল।

ঘরটা স্বল্পপরিসর হলেও আলো-হাওয়ার প্রচুর ব্যবস্থাই আছে। জিনিসপত্রগুলো মেঝেতে নামিয়ে রেখে গোবিন্দ সন্তোষের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, বসুন বাবু, আগে একটা আলো জেবলে নিয়ে আসি।

গোবিন্দ ঘর হতে বের হয়ে গেল।

অন্ধকার ঘরটার মধ্যে একাকী সন্তোষ চৌধুরী দাঁড়িয়ে রইলো।

॥ ১০ ॥

পায়ে পায়ে একসময় কিরীটী তার নির্দিষ্ট ঘরটা থেকে বের হয়ে বাইরের বারান্দা অতিক্রম করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো।

সন্ধ্যা থেকেই সারা আকাশটা জুড়ে মেঘে ছেয়ে গিয়েছিল।

শুরু হলো এতক্ষণে বৃষ্টি, সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রবল হাওয়া।

মধ্যে মধ্যে কালো আকাশটার এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুতের নীল আলো যেন চোখ রাঙিয়ে যাচ্ছে। গুরু গুরু মেঘের ডাক থেকে থেকে আকাশটাকে যেন কাঁপিয়ে তুলছে।

বারান্দাটা অতিক্রম করে কিরীটী বাইরের মহলের দিকে অগ্রসর হলো। ইতিমধ্যে বারান্দার ঝোলানো বাতি জেলে দেওয়া হয়েছে। প্রবল বায়ুর ঝাপটায় বাতিটা দুলছে। কাঁপছে বাতির শিখাটা। দেওয়ালের গায়ে প্রতিফলিত আলোটাও সেই সঙ্গে কাঁপছে এধার থেকে ওধারে মৃদুমন্দ।

জলের ঝাপ্‌টা বারান্দাতেও আসছে—বেশিক্ষণ এই খোলা বারান্দায় থাকলে সর্বাঙ্গ ভিজে যাবে। সামনেই একটা ঘরের খোলা দ্বার দেখতে পেয়ে কিরীটী সেই ঘরের মধ্যেই গিয়ে ঢুকে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে ভারী গলায় প্রশ্ন এলো, কে?

কণ্ঠস্বরটা অনুসরণ করে সামনের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই কিরীটীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল নায়েব বসন্তবাবুর।

এইমাত্র বোধ হয় সন্ধ্যা-আহ্নিক সমাপ্ত করে বসন্তবাবু শুধু একটা ধুতি পরিধানে খালিগায়ে ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে। দেওয়ালের গায়ে একটা দেওয়ালবাতি জ্বলছে। তারই আলোয় কিরীটী পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল বসন্ত-

বাবুর মুখের দিকে।

বসন্তবাবুর দু'চোখের তারায় যেন একটা কঠিন প্রশ্ন ছুরির মত ঝিকিয়ে উঠছে।

নায়েব বসন্ত সেনের দুই চক্ষুর ছুরির ফলার মত ধারালো শাণিত দৃষ্টি যেন কয়েকটি মুহূর্ত কিরীটীর দুই চক্ষুর দৃষ্টির সঙ্গে উদ্ধত স্পর্ধায় মিলিত হয়ে স্থির হয়ে থাকে। পলকহীন, অকম্পিত।

কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যই, পরক্ষণেই বসন্ত সেনের চক্ষুর দৃষ্টি ও মুখের একটু আগে কঠিন হয়ে ওঠা সমস্ত রেখাগুলো সহজ ও কোমল হয়ে এলো। বিনীত হাস্যে চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

কিরীটীবাবু যে! হঠাৎ কি মনে করে? বসন্তবাবুই প্রথমে প্রশ্ন করলেন।

কিরীটী স্মিতকণ্ঠে বললে, একা একা ঘরের মধ্যে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না, তাই আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলাম। বসতে পারি সেনমশাই?

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, বসুন। অভ্যর্থনা জানালেন নায়েব বসন্ত সেন। এবং সমস্ত আবহাওয়াটাকে সহজ ও লঘু করে সম্মুখের একটা খালি চেয়ার চোখের নির্দেশে দেখিয়ে দিলেন বসন্তবাবু কিরীটীকে।

আপনার সময় নষ্ট করছি না তো সেনমশাই? চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে কিরীটী কথাগুলো নায়েবমশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই উচ্চারণ করলে।

না, না—সন্ধ্যার পর আমি বিশেষ কোন কাজই করি না। এই সময়টা রাত্রে আহারের আগে পর্যন্ত আমার সম্পূর্ণ বিশ্রামের সময়।

কিরীটী চেয়ারটার উপর নড়েচড়ে একটু আরাম করে বসল এবং পকেট থেকে চামড়ার সিগার কেসটা বের করে কেস থেকে একটা সিগার নিয়ে সেটায় অগ্নি-সংযোগ করল।

নায়েব বসন্ত সেনও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে উপবেশন করলেন। পরিধেয় ধুতিটার কোছাটা খুলে গায়ের উপর জড়িয়ে নিলেন।

খোলা জানলা-পথে জলসিক্ত ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টা আসছে, বেশ শীত-শীত করে।

বৃষ্টিও যেন নেমেছে একেবারে আকাশ ভেঙে।

কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে অতিবাহিত হয়, দুজনের কারো মুখেই কোন কথা নেই। বাইরে শুধু একটা বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ। টেবিলের উপরে একটা সাদা চিমনি দেওয়া কেরোসিনের টেবিল বাতি জ্বলছে। বাতির আলোয় ঘরটা বেশ আলোকিতই হয়ে উঠেছে।

সহসা এক সময় নায়েব বসন্তবাবুই স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন, কর্তার মৃত্যুর সমস্ত ব্যাপারটাই তো আপনি সত্যজিৎ ও সবিতার মুখে শুনেছেন মিঃ রায়?

হ্যাঁ।

এ সম্পর্কে সত্যজিতের যা ধারণা তাও নিশ্চয়ই শুনেছেন?

শুনেছি। কিরীটী মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়।

কিন্তু ব্যাপারটা আপনার কি মনে হয় মিঃ রায়?

দেখুন ঘটনা সম্পর্কে যতটা শুনেছি তাতে অবশ্য আমার মনে হয় এর পিছনে একটা বিশ্রী চক্রান্ত আছে—

চক্রান্ত! কথাটা উচ্চারণ করে নায়েব বসন্ত সেন তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে বিস্ময়-দৃষ্টিতে।

হ্যাঁ। এবং এও ঠিক, মৃত্যুঞ্জয়বাবুর হত্যা-রহস্যের কিনারা করতে হলে আমাদের দীর্ঘ উনিশ বৎসর আগে তাঁর স্ত্রীর হেমপ্রভা দেবীর মৃত্যুকে সর্বাগ্রে মীমাংসা করতে হবে—

হেমপ্রভার মৃত্যু! সে তো উনিশ বছর আগে ঘটেছে। তাছাড়া হেম-প্রভার মৃত্যুও তো যতদূর জানি স্বাভাবিক ব্যাপার। রোগাক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল কিরীটী বসন্ত সেনের মুখের দিকে। কানাইয়ের মার মুখ থেকে শোনা সত্যজিৎ-বর্ণিত হেমপ্রভার সে মৃত্যু-কাহিনী কি তবে বসন্ত সেনের অজ্ঞাত! সত্যই কি বসন্ত সেন সে ব্যাপারের কিছুই জানেন না? না তিনি স্বীকার করতে চাইছেন না? কিন্তু সত্য হোক মিথ্যা হোক, বেশ ভাল করে যাচাই না করে কিরীটী বসন্ত সেনকে মুক্তি দেবে না। সেই কারণেই ব্যাপারটা যেন আজও বসন্ত সেনের অজ্ঞাতই এইভাবে দ্বিতীয় প্রশ্ন করল কিরীটী, কেন, আপনি কিছুই জানেন না—হেমপ্রভা দেবীর সত্যিকারের মৃত্যুর ব্যাপারটা?

কই না! হেমপ্রভার মৃত্যুর মধ্যেও কোন একটা ব্যাপার ছিল, এ তো কই আমার এতদিন জানা ছিল না! তিনি হঠাৎ একদিন সকালে অসুস্থ অবস্থাতেই বেশী রকম অসুস্থ হয়ে পড়ায় কর্তা রাত্রেই তাঁকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় চলে যান এবং কলকাতাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

না, তা বোধ হয় ঠিক নয়। গম্ভীর কণ্ঠে কিরীটী প্রত্যুত্তর দেয়।

কী আপনি বলছেন মিঃ রায়! আমি যে তখন এ বাড়িতেই ছিলাম। আমার চোখের সামনে দিয়ে অসুস্থ হেমপ্রভাকে পাল্কিতে চাপিয়ে কর্তা কলকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান!

হ্যাঁ, পাল্কি যেতে দেখেছেন বটে তবে তার মধ্যে একটা পাল্কিতে কেউ ছিল না—ছিল খালি। এবং তার আগেই হেমপ্রভা দেবীর মৃত্যু ঘটেছিল।

যত সব আজগুবী ব্যাপার। কে বলেছে আপনাকে এসব কথা শুনি?

আমাকে কেউ বলেনি। বলেছে কানাইয়ের মা সবিতা ও সত্যজিৎ-বাবুকে।

কানাইয়ের মা বলেছে! দাঁড়ান তো দেখি, হারামজাদীকে একবার ডাকি—

বসন্ত সেন চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন কিন্তু কিরীটী তাঁকে বাধা দিল, ব্যস্ত হবেন না বসন্তবাবু, বসুন। আমার কথাটা শেষ করতে দিন আগে। এখনও আমার শেষ হয়নি।

কিন্তু এ যা আপনি বলছেন এ তো একেবারে সম্পূর্ণ আরব্য উপন্যাস। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য!

উপন্যাসের চেয়েও অবিশ্বাস্য অনেক ঘটনা অনেক সময়েই আমাদের জীবনে ঘটে নায়েব মশাই। অবশ্য আমার ধারণা ছিল ব্যাপারটা আপনার অজ্ঞাত নয়।

না মিঃ রায়, আপনি হয়ত জানেন না। মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর আমি মাইনে-করা ভৃত্য হলেও তাঁর সংগে কোনদিন আমার প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক ছিল না। বন্ধু এবং ভায়ের মতই আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছে ছিলাম। তাঁর জীবনের কোন ঘটনাই আমার অজ্ঞাত ছিল না কোন দিন। সেক্ষেত্রে এতবড় একটা ঘটনা তিনি আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছেন এ কথা আমি বিশ্বাসই করতে পারি না। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

হয়ত এমনও হ'তে পারে সর্বদা তিনি সব কথা আপনার কাছে বললেও ঐ ব্যাপারটা কোন বিশেষ কারণেই আপনার কাছ থেকে গোপন করেছিলেন—

কারণ বলছেন, কি তার এমন কারণ থাকতে পারে! আর সত্যিই যদি আপনি যা বলছেন তাই হয়ে থাকে, তাহ'লে তো এত বড় একটা ঘটনা তিনি নিঃশব্দে চাপা দিয়ে যাবেন, তাই বা কেমন করে সম্ভব বা বিশ্বাসযোগ্য বলুন? তারপর একটু থেমে বললেন, আপনি জানেন না মিঃ রায়, কিন্তু আমি জানি, হেমপ্রভাকে তিনি জীবনাধিক ভালবাসতেন। তাঁর পায়ে কাঁটাটি ফুটলেও তিনি বুক পেতে দিতে পারতেন। আর অমনি একটা ব্যাপারকে তিনি নীরবে সহ্য করে যাবেন!

নায়েব মশাই, আপনি অবিবাহিত। বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর প্রেম ও ভালবাসার রাস্তাটা এমন জটিল যে তার অনেক সময় হদিসই পাওয়া যায় না। বিশেষ করে আমাদের এই বাংলাদেশে কোন কোন স্বামী-স্ত্রী জীবনব্যাপী গরমিল অসামঞ্জস্যকে এমনভাবে সহিষ্ণুতা ও সামাজিক নিয়মকানুনের চাপে পড়ে কাটিয়ে দিয়ে যায় যে, জীবিতকালে তো নয়ই—মৃত্যুর পরেও সেটার কোন আভাসমাত্রও হয়ত পাওয়া যায় না। অবশ্য আপনি মনে করবেন না যে আমি এমন কিছু বলতে চাইছি স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী হেমপ্রভা দেবী সম্পর্কে। এবং এক্ষেত্রে সেটা খুব বড় কথাও আপাততঃ নয়। আমি যেটা সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত হতে চাই সেটা হচ্ছে, সত্যি সত্যি হেমপ্রভা দেবীরও এইখানেই মৃত্যু হয়েছিল কিনা এবং তাঁর মৃতদেহ নন্দনকাননের বকুলবৃক্ষের তলেই মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর কলকাতা হতে প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন বাদে তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন কিনা।

এসব আপনি কি বলছেন মিঃ রায়? হেমপ্রভার মৃতদেহও সেই বকুল বৃক্ষতলেই কর্তা কলকাতা হতে ফিরে এসে আবিষ্কার করেছিলেন?

হ্যাঁ, তাই। অন্ততঃ কানাইয়ের মার বর্ণিত কাহিনী সেই কথাই বলে।

না মিঃ রায়, কানাইয়ের মাকে এ সম্পর্কে ভাল করে জিজ্ঞাসাবাদ করা আমার একান্তই প্রয়োজন।

সে বললাম তো, পরে করলেও আপনার চলবে। তবে আমাকে যদি আপনি বিশ্বাস করেন তবে এইটুকু আপনাকে আমি বলতে পারি, ও সম্পর্কে আমি নিজেও তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম এবং আমার ধারণা সে মিথ্যা কিছুই বলেনি। উনিশ বৎসর পূর্বে ঠিক যেমনটি ঘটেছিল এবং যেমনটি সে দেখেছিল ঠিক তেমনটিই সে বলেছে, তার মধ্যে কোন কিছু অত্যুক্তি বা অবোধ্য কিছুই নেই।

কিন্তু তাই যদি হবে—কানাইয়ের মার কথা যদি সত্যিই ধরে নেওয়া যায়, তাহলে একটা ব্যাপার আমি আপদেই বুঝে উঠতে পারছি না যে, হেমপ্রভার মৃত্যুর ব্যাপারটা এভাবে গোপন করবার মৃত্যুঞ্জয়ের কি উদ্দেশ্য থাকতে

পারে ?

আমার জিজ্ঞাস্যও তাই সেন মশাই। তিনি তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর ব্যাপারটা ঐভাবে আগাগোড়া গোপন করে গেলেন কেন সকলের কাছ থেকে, এমন কি আপনার মত সুহৃদের কাছেও কেন গোপন করে গেলেন ? অবশ্য ঘটনা হতে যতটুকু জানা যায়, কানাইয়ের মা একান্তভাবেই দৈবক্রমে ব্যাপারটা দেখে ফেলেছিল বলেই আজ আমরা এতদিন পরে সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পেরেছি, নচেৎ সেটা হয়ত কেউ জানতে পারত না। আমি যতদূর শুনেছি এবং এইমাত্র আপনার মুখ থেকেও যতটা জানতে পারলাম, আপনার সঙ্গে স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর একটা নিকট যোগাযোগ ছিল মনের দিক দিয়ে ; তাই জিজ্ঞাসা করছি এমন কোন অতীত কাহিনী বা ঘটনার কথা তাঁর জীবনের আপনি জানেন কি, যার দ্বারা আমরা তাঁর স্ত্রীর রহস্যময় মৃত্যুর উপরে কোন আলোক-সম্পাত করতে পারি।

কিরীটীর সোজা সরল প্রশ্নে নায়েব বসন্ত সেন কিছুক্ষণের জন্য যেন মাথা নিচু করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

কিরীটী তীক্ষ্মদৃষ্টিতে নায়েব বসন্ত সেনের দিকে তাকিয়ে বললে, শুনুন নায়েবমশাই, এক বিষয়ে আমি অন্ততঃ স্থিরনিশ্চিত যে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করাই হয়েছে। অবশ্য ঘটনার অনেক পরে আমি অকুস্থানে এসেছি, তাহলেও এ মৃত্যু-রহস্যের মীমাংসা করাটা খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার হবে না ; কেবল কিছু সময় নেবে। কিন্তু আপনাদের সকলের সাহায্য যদি পাই তাহলে মীমাংসার ব্যাপারটা সহজ হয়ে আসে।

আমি তো আপনাকে প্রথম দিনই বলেছি কিরীটীবাবু, আমার যতটুকু সম্ভব সাহায্য আপনাকে আমি করতে প্রস্তুত। এবং একথাও আপনাকে আমি প্রথম দিনই বলেছি, মৃত্যুঞ্জয়ের মত নির্মল ও সৎ চরিত্রের লোক আমি জীবনে বড় একটা দেখিনি। কোন কলংকই তাঁকে স্পর্শ করেনি। অত্যন্ত দৃঢ় নায়েব বসন্ত সেনের কণ্ঠস্বর।

কিরীটী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চুপ করে বসে রইল এবং মধ্যে মধ্যে হস্ত-ধৃত চুরুটটায় মৃদু মৃদু টান দিয়ে ধূমোদ্‌গীরণ করতে লাগল।

ইতিমধ্যে বাইরে বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। কেবল বর্ষণ-ক্লান্ত রাত্রির কালো আকাশটার গায়ে বিদ্যুতের চমকানি থেকে থেকে নীল আলোর সংকেত জানিয়ে যাচ্ছে।

কিরীটী আবার নিস্তব্ধতা ভংগ করে কথা বললে, যে রাত্রে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী মারা যান সেই বিকালে বা সন্ধ্যায় শেষ আপনার সংগে কখন দেখা হয়েছিল সেন মশাই ?

রাত দশটায় তিনি আহার করেন, তার আগে পর্যন্ত তাঁর শোবার ঘরেই আমরা দুজনে বসে কথাবার্তা বলছিলাম—

কি ধরনের কথাবার্তা সে-রাত্রে আপনাদের মধ্যে হয়েছিল ?

সবিতা সম্পর্কেই বিশেষ যা কথাবার্তা হয়েছিল। সত্যজিৎকে তিনি রেংগুন থেকে আসতে লিখেছেন এবং সে এলে উভয়ের যদি উভয়কে পছন্দ হয় তাহলে এই সামনের আষাঢ়েই ওদের বিবাহ দেবেন—এই সবই বলছিলেন।

আর কোন কথা হয়নি আপনাদের মধ্যে, যাতে করে তাঁর অত্যাসন্ন মৃত্যুর ব্যাপারটা সম্পর্কে কোনরূপ ধারণা করা যেতে পারে ?

না।

হুঃ। আচ্ছা ইদানীং তাঁর মনের অবস্থা ঠিক কেমন ছিল বলতে পারেন? কোন প্রকার দুশ্চিন্তা বা দুর্ভাবনা—

না।

জমিদারীর অবস্থা ও আর্থিক অবস্থা ইদানীং তাঁর ভালই ছিল নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ। ব্যাঙ্কে প্রায় লাখ তিনেক টাকা মজুত আছে, কলকাতায় একখানা বাড়ি এবং এখানকার জমিদারী ও কারবারের অবস্থা আশাতীত ভালই বলতে হবে।

তিনি কোন উইল লিখে রেখে গিয়েছেন বলে জানেন কিছু?

বছর পাঁচেক আগে একটা উইল করেছিলেন। ইদানীং অবশ্য একবার কিছুদিন আগে বলেছিলেন, পূর্বের সেই উইলটার একটু সামান্য অদলবদল করবেন, কিন্তু সেটা আর করা হয়ে ওঠেনি।

সে উইলে কি লেখা আছে জানেন?

তাঁর যাবতীয় সম্পত্তিই তাঁর একমাত্র মেয়ে সবিতাই পাবে, কেবল—

কেবল?

কেবল হাজার পঞ্চাশ টাকা তিনি আমার নামে দিয়ে গিয়েছেন, প্রয়োজনমত সেটা আমি এবং আমার একান্ত ইচ্ছামত যে কোন কাজে ব্যবহার করতে পারবো।

আর তাঁর কোন নিকট বা দূর-আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবকে কিছুই দিয়ে যাননি?

না। তবে—, বসন্তবাবু একটু ইতস্ততঃ করতে থাকেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভেবে বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র সন্তোষ চৌধুরীর নামে উইলের মধ্যে একটা নির্দেশ আছে—

কিরীটী বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল বসন্ত সেনের মুখের দিকে, যিনি আজ সন্ধ্যাবেলা এডেন না কোথা থেকে এলেন, উনিই কি সেই দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সন্তোষ চৌধুরী?

বলতে পারি না উনিই সেই মৃত্যুঞ্জয়ের বর্ণিত সন্তোষ চৌধুরী কিনা, যদিও সেই পরিচয় নিয়েই উনি এসে আজ হাজির হয়েছেন—

ভদ্রলোককে তাহলে ইতিপূর্বে কখনো আপনি দেখেননি এবং চেনেনও না?

না।

উইলে ওঁর সম্পর্কে কি নির্দেশ আছে বলছিলেন?

ভ্রাতুষ্পুত্র সন্তোষ চৌধুরী যদি কোন দিন ফিরে এসে তাঁর পিতৃ-সম্পত্তির দাবী জানান, তাহলে সমস্ত সম্পত্তির ১।৪ অংশ সে পাবে। বাকী ৩।৪ অংশ পাবে কন্যা সবিতা। সবিতা যদি বিবাহ না করে তাহলে অর্ধেক সম্পত্তি ঐ সন্তোষ চৌধুরী পাবেন অথবা সবিতার মৃত্যুর পর যদি তার কোন সন্তান-সন্ততি না থাকে তাহলে ঐ সন্তোষ চৌধুরী বা তাঁর বংশধরেরা যদি জীবিত থাকে তাহলে সমস্ত সম্পত্তির ৩।৪ অংশ তারা পাবে এবং বাকী অংশ সবিতার স্বামী পাবে।

সবিতা দেবী তো ঐ সন্তোষ চৌধুরী সম্পর্কে পূর্বে কিছুই জানতেন

না, অন্ততঃ গতকালও তাই বলেছেন।

না, সে জানত না। একমাত্র আমিই জানতাম। মৃত্যুঞ্জয় আমাকে উইল করবার সময় একবার মাত্র বলেছিলেন।

ঐ সন্তোষ চৌধুরী কোথায় থাকেন ইত্যাদি বা সে সম্পর্কে কিছুই কি মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী আপনাকে বলেননি?

হ্যাঁ বলেছিলেন, এডেন না কি কোথায় থাকেন—

এডেনের ঠিকানাটা বলেননি?

না।

আজ যে ভদ্রলোক সন্ধ্যাবেলা সন্তোষ চৌধুরীর পরিচয়ে এলেন, এঁকে কি আপনার আসল লোক নয় বলে কোনরূপ সন্দেহ হচ্ছে?

যতক্ষণ না সঠিকভাবে জানতে পারছি ততক্ষণ মেনে নিই বা কেমন করে? যার কেবলমাত্র নামই শুনেছি, অথচ পূর্বে কখনো যাকে চাক্ষুষ দেখিনি তাকে এত সহজে স্বীকার করে নিতে তো পারি না।

উনিই যে আসল সন্তোষ চৌধুরী তার কোন প্রমাণ এখনও দেখেন নি?

না।

আপনি জানতে চাননি?

চেয়েছিলাম, বলেছেন প্রয়োজন হলে সে-সব প্রমাণ নাকি আদালতেই পেশ করবেন। আমাকে কোন প্রমাণ দিতে রাজী নন তিনি।

দেওয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি দশটা ঘোষণা করল।

আহারের সময় উপস্থিত—ভৃত্য এসে সংবাদ দিল। কিরীটী উঠে দাঁড়াল।

॥ ১১ ॥

ভাল করে আকাশের বুকে ভোরের আলো তখনও ফুটে ওঠেনি। অত্যাসন্ন প্রত্যূষের চাপা রক্তাভায় পূবের আকাশটা কেমন রহস্যময় হয়ে উঠেছে, খোলা জানলা-পথে জলো হাওয়া কেমন শীত-শীত বোধ হওয়ায় কিরীটীর ঘুমটা ভেঙে গেল। কিরীটী শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়ল। আলনা থেকে জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে চাপিয়ে কিরীটী ঘরের দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় বের হয়ে এল। এ বাড়ির কারোরই এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয়নি। সিঁড়ি-পথ অতিক্রম করে কিরীটী সোজা বাইরে চলে এল সদর দরজা খোলা দেখে। প্রমোদভবন থেকে সোজা যে রাস্তাটা দুপাশের ঝাউবিথীর মধ্যখান দিয়ে সামনের সড়কে গিয়ে মিশেছে কিরীটী সেই রাস্তাটা ধরেই এগিয়ে চলল। হাওয়ায় ঝাউগাছের চিকন পাতাগুলি এক প্রকার সোঁ সোঁ শব্দ তুলেছে। এত সকালে প্রমোদ-ভবনের সদর দরজাটা খোলা দেখে কিরীটী ভেবেছিল হয়ত চাকরবাকরদের মধ্যেই কেউ ইতিমধ্যে উঠেছে, কিন্তু ঝাউবীথির মাঝখান দিয়ে পথটা ধরে খানিকটা এগিয়ে যেতেই তার সে ভুলটা ভেঙে গেল। অল্পদূরে একটি নারী-মূর্তি ধীরপদে এগিয়ে চলেছে। এত সকালে এই পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে কে! সবিতা দেবী নাকি? কিন্তু নারীমূর্তিটির চলবার ভঙ্গী দেখে কিরীটী বুঝতে পারে সে সবিতা নয়। তবে কে? কিরীটী একটু দ্রুতই পা চালিয়ে চলে। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় অগ্রগামী নারীমূর্তিকে কিরীটী অনুসরণ

করতে করতেই দেখে পরিধানে তার আকাশ-নীল রংয়ের একটা শাড়ি এবং মাথার চুল লম্বা বেণীর আকারে পৃষ্ঠোপরি দোদুল্যমান। পায়ে বোধ হয় চপ্পল সু, চলার ভংগী ও চাল-চলন দেখে মনে হয় সেও তারই মত প্রাতঃভ্রমণে বের হয়েছে হয়ত।

অনেকটা কাছাকাছি হতে এবং দুজনের মধ্যে ব্যবধান কমে আসতেই তাকাল। এবং সংগে সংগে উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হলো।

কিরীটী এতক্ষণে চিনতে পারে, অগ্রগামিনী আর কেউ নয়, সবিতার গত সন্ধ্যায় বিদেশাগত মামার মেয়ে কল্যাণী।

কল্যাণী একটু বিস্মিত দৃষ্টিতেই কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

কিরীটীও তাকিয়ে ছিল কল্যাণীর মুখের দিকেই।

পরস্পরের সংগে আলাপ-পরিচয় হয়নি এখনো এবং কল্যাণী ইতিপূর্বে কিরীটীকে না দেখলেও কিরীটী গত সন্ধ্যাতেই দরজার ফাঁক দিয়ে কল্যাণীকে দেখেছিল, তাতেই তার কল্যাণীকে চিনতে কষ্ট হয়নি।

কিরীটীই প্রথমে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বলে, সুপ্রভাত, আপনিই বোধ হয় কল্যাণী দেবী!

কল্যাণী তার সম্পূর্ণ অপরিচিত কিরীটীর মুখে তার নিজের নামোচ্চারণ শুনে কতকটা বিস্ময়ের সংগেই যেন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না ঠিক!

আমার নাম কিরীটী রায়। কিরীটী স্মিতকণ্ঠে জবাব দেয়।

ও, আপনিই কিরীটীবাবু! সবিতাদি কাল রাত্রে আপনার কথা বলছিল বটে। নমস্কার।

বেড়াতে বের হয়েছেন বুঝি?

হ্যাঁ। নতুন জায়গায় আমার তেমন ঘুম হয় না। সারাটা রাত বিছানার উপরে ছট্‌ফট্ করে ভোরের দিকে আর শুয়ে থাকতে ভাল লাগলো না। তাই বের হয়ে পড়লাম। পাঞ্জাবের রুক্ষ প্রকৃতির সংগে আমরা পরিচিত, বাংলা-দেশের এই শ্যামল রূপটি ভারী ভাল লাগছে।

দুজনেই আবার তখন পাশাপাশি চলতে শুরু করেছে সামনের দিকে। চলতে চলতেই কিরীটী কল্যাণীর কথার প্রত্যুত্তর দেয়, হ্যাঁ, এমন দেশটি আর কোথাও গেলে পাবেন না। বলতে গেলে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম ভারতের সর্বত্রই আমি পর্যটন করেছি, কিন্তু বাংলার মাটিতে ও আকাশে যে মিষ্ট—শ্যামল একটি অখণ্ড পরিপূর্ণতার সন্ধান পাই এমনটি আর কই চোখে তো আমার পড়ল না।

হয়ত আপনার কথাই সত্যি মিঃ রায়। বাংলাদেশের মেয়ে হলেও জন্ম আমার পাঞ্জাবে এবং বলতে গেলে এই আমার বাংলার সংগে প্রথম পরিচয়।

যত দিন যাবে দেখবেন এ দেশকে আপনার আরো বেশী করে ভাল লাগবে। ঋতুতে ঋতুতে আকাশে ও মাটিতে এর পরিবর্তন—রংয়ের খেলা যেমন অপূর্ব তেমনি সুন্দর। এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় যেন সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে। যাকে নিত্য দেখেও আশ মেটে না।

পূব আকাশে একটু করে দিনের আলো যেন পাপড়ির মত দল মেলেছে।

রাস্তাটা নির্জন। ছোট ছোট লাল কাঁকর ছড়ানো রাস্তাটায়। জমিদারেরই তৈরী রাস্তাটা। গতরাত্রের বৃষ্টিতে রাস্তাটা এখনো ভিজে আছে।

রাস্তার দু'পাশে খোলা মাঠ—যেন সবুজ দু'খানা চাদর দু'দিকে বিছানো। ক্রমে একথা সেকথার মধ্যে দিয়ে দু'জনার মধ্যে আলাপটা আরো বেশ জমে ওঠে। কিরীটীর কল্যাণীকে বেশ লাগে। মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। বাংলার বাইরে পাঞ্জাবে মানুষ বলেই হয়ত কল্যাণীর স্বভাবে, কথাবার্তায় ও চালচলনে একটা সাবলীল গতি রয়েছে। বাংলাদেশের ঐ বয়েসী মেয়েদের মত লজ্জা বা আড়ষ্টতা এর চরিত্রের মধ্যে কোথাও নেই। কল্যাণীর চরিত্রে ও কথায়বার্তায় যে একটা সহজ সরলতা তাই নয়, তার দৈহিক গঠন ও স্বাস্থ্যের মধ্যেও একটা সুস্থ ও সহজ সৌন্দর্য আছে। রূপ বলতে যা বোঝায় কল্যাণীর তা না থাকলেও চেহারায় একটা সৌন্দর্য আছে—গায়ের রং কালোই কিন্তু তথাপি সেই কালোর মধ্যে এমন একটা স্নিগ্ধকর শ্যামল লাবণ্য আছে যেটা অতি সহজেই যেন অন্যের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।

চোখমুখের গঠনটিও কল্যাণীর ভারী চমৎকার। বাঁকানো ধনুকের মত ভ্রূ, ঘন আঁখিপল্লব, সজল স্নিগ্ধ দু'টি চোখের তারা। পাতলা দু'টি ওষ্ঠ। বাম গালের উপরে একটি তিল মুখের সৌন্দর্যকে যেন অনেকখানি বৃদ্ধি করেছে। কথায় কথায় চমৎকার হাসে কল্যাণী। এবং সেই হাসিটি যেন সমস্ত চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

মেয়েটির কথাবার্তার মধ্যেও যেন একটা কৌতুকপ্রিয়তা বিদ্যমান।

সবিদি ও সত্যজিৎবাবুর মুখেই শুনেছিলাম আপনি নাকি একজন সাংঘাতিক বাঘা ডিটেক্‌টিভ্‌ মিঃ রায়!

বাঘা ডিটেক্‌টিভ্‌! আর কি শুনেছেন বলুন তো মিস্‌ সান্যাল? হাসতে হাসতেই কিরীটী কল্যাণীকে প্রশ্ন করে।

আরো কত কি! সব কি ছাই মনে আছে? বলতে বলতে হঠাৎ কল্যাণী প্রশ্ন করে, আচ্ছা মিঃ রায়, সত্যিই কি আপনার মনে হয় আপনি পিসেমশাইয়ের হত্যাকারীকে ধরতে পারবেন?

রাস্তার একপাশে একটা বড় আকারের পাথর পড়েছিল। কিরীটী পাথরটার দিকে এগুতে এগুতে কল্যাণীকে সম্বোধন করে বলে, আসুন মিস্‌ সান্যাল, ঐ পাথরটার উপরে কিছুক্ষণ বসা যাক।

বেশ তো!

দুজনে পাথরটার উপরে গিয়ে বসল।

পকেট থেকে চামড়ার সিগার কেসটা বের করে একটা সিগার সেটা থেকে টেনে নিতে নিতে কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে স্মিতভাবে প্রশ্ন করে, ধূমপান করতে পারি? আপত্তি নেই আপনার?

Oh Surely, not at all!—মৃদু হাস্য-তরল কণ্ঠে কল্যাণী জবাব দিল।

সিগারটার দেয়াশলাই জ্বালিয়ে অগ্নিসংযোগ করে নিঃশব্দে গোটা দুই-তিন টান দিল কিরীটী। কল্যাণী পাথরটার সামনে থেকে একটা ঘাসের শীষ টেনে ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে কাটতে লাগল অন্যমনস্ক ভাবে।

হঠাৎ কিরীটী আবার কথা শুরু করে, হ্যাঁ, কি যেন বলছিলেন আপনি মিস্‌ সান্যাল! হত্যাকারীকে ধরতে পারবো কিনা, তাই না?

হ্যাঁ, জানেন আমি একজন ডিটেক্‌টিভ্‌ বইয়ের খুব ভক্ত! ঐসব তদন্তের ব্যাপারে আমার ভারী interest লাগে, ছোটখাটো সব অদ্ভুত সূত্র ধরে হত্যা-

কারীকে খুঁজে বের করা ভারী শক্ত কাজ, না?

তা একটু শক্ত বইকি। চোখ থাকলে এবং ইংরাজীতে যাকে আমরা সাধারণতঃ common sense বলি একটু প্রখর থাকলেই যে কোন রহস্যের solution-এ আসতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

তবে সকলে পারে না কেন?

কিরীটী কল্যাণীর কথায় এবারে হেসে ফেলল এবং হাসতে হাসতে বলে, আসল ব্যাপারটা কি জানেন? ধরুন আপনাকে একটা সাধারণ উদাহরণ দিই। বলুন তো সবিতা দেবীর বাড়িতে একতলা থেকে দোতলায় উঠতে কটা সিঁড়ি আছে?

কটা সিঁড়ি! বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল কল্যাণী কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, বলুন না। আপনি কতবার ঐ সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করেছেন কাল থেকে?

তা কাল রাত্রে বারচারেক এবং আজ সকালে একবার।

পাঁচবার। তাহ'লে বলুন ঐ সিঁড়ি দিয়ে আপনি ওঠা-নামা করেছেন এবং দেখেছেনও সিঁড়িগুলো কেমন, না?

হ্যাঁ।

তাহ'লে বলুন ক'টা সিঁড়ি আছে?

এই পঁচিশ-ত্রিশটা হবে বোধ হয়।

উঁহু, একত্রিশটা সিঁড়ি আছে। তবেই দেখুন একই সিঁড়ির পথে আপনি ও আমি দুজনাই ওঠা-নামা করেছি। আমি সিঁড়ি-পথ দিয়ে আপনার মত কেবল ওঠা-নামাই করিনি, প্রথমবারেই ওঠবার সময় চারিদিকে ভাল করে সিঁড়িগুলোর অবস্থা দেখে মোট কতগুলো সিঁড়ির ধাপ আছে তাও গুনে নিয়েছি! এই হয়। আপনারা, কেবল সাধারণ লোকেরা দেখেনই, you only see but I observe! এইখানেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে তফাৎ। আমি বাড়িটার উপরতলার যাবতীয় খুঁটিনাটি সব বলতে পারি। চলুন রোদ চড়ে উঠেছে। এবারে ফেরা যাক।

চলুন।

দুজনে উঠে আবার প্রমোদভবনের দিকে চলতে শুরু করে।

কিরীটী এক সময় আবার পথ চলতে চলতেই কল্যাণীকে সম্বোধন করে বলে, কথা হচ্ছিল আমাদের হত্যাকারীকে ধরতে পারবো কিনা? ধরতে পারবোই তবে বর্তমানে এখন আমার কেবল চারিদিক দেখবার ও কান পেতে শোনবার পালাই চলেছে। এরপর যা দেখবো শুনবো সব কিছু তার ভাবতে হবে এবং ভাবতে ভাবতেই আমার চোখের সামনে ক্রমে সব রহস্যের কুয়াশা ভেদ করে আলো ফুটে উঠবে যখন, তখনই আপনাকে আমি বলতে পারবো কবে ঠিক হত্যাকারীর কিনারা আমি করতে পারবো। তার আগে নয়।

আমাকে আপনার এই রহস্যের অনুসন্ধানের ব্যাপারে সহকারিণী করে নেবেন মিঃ রায়?

বেশ তো। সহকারী যদি সত্যিকারের সহকারী হয় তাহ'লে কাজ করবার মধ্যেও যে একটা আনন্দ আছে।

কিরীটী হাসতে হাসতেই জবাব দেয়।

কিন্তু আমার সাহচর্য যদি আপনার কাজে বিঘ্ন ঘটায়?

বিঘ্ন ঘটাবে কেন? আপনার মনে যদি আমাকে আমার কাজে সত্যিকারের সাহায্য করবার ইচ্ছা থাকে তাহ'লে কি আর আপনি বিঘ্ন ঘটাবেন?

চলতে চলতে দু'জনে প্রায় তখন প্রমোদভবনের মধ্যে এসে গিয়েছে। দূর থেকে দেখা গেল নায়েব গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁর পাশে লক্ষ্মীকান্ত দারোগা।

দু'জনেরই দৃষ্টি একই সঙ্গে অদূরে গেটের সামনে দণ্ডায়মান লক্ষ্মীকান্ত সাহা ও নায়েবের উপরে পতিত হল।

নায়েবের পাশে ঐ ভদ্রলোকটি কে মিঃ রায়? কল্যাণী কিরীটীকে প্রশ্ন করে।

চিনতে পারা তো কষ্ট নয় ভদ্রলোকটিকে মিস্ সান্যাল! কিরীটী প্রত্যুত্তর দেয়। আপনি চেনেন না নাকি ওঁকে?

না, তবে ভদ্রলোকের বেশভূষা দেখে অনায়াসেই একটা অনুমান করে নিতে পারা যায়—চেয়ে দেখুন। ভদ্রলোকের পরিধানে খাকি প্যাণ্ট ও খাকি হাফ-সার্ট।

তার থেকে কি প্রমাণ হলো?

প্রমাণ হচ্ছে এই যে, ভদ্রলোক বোধ হয় এখানকার থানা অফিসার, পুলিসের লোক।

বেশ তো আপনার যুক্তি! খাকি জামাকাপড় পরলেই পুলিসের লোক হবে নাকি? মিলিটারীর কোন লোকও তো হতে পারে?

এক্ষেত্রে তা নয় তার কারণ দুটো, এক নম্বর হচ্ছে মিলিটারী ড্রেস্ ঠিক অমনটি হয় না, দ্বিতীয়তঃ এই রকম জামায় ঐ পোশাক কেউ পরলে সে পুলিসের লোক হওয়ারই বেশী সম্ভাবনা—

কথা বলতে বলতে ওরা দু'জনে প্রায় লক্ষ্মীকান্ত সাহা ও নায়েবের একেবারে কাছাকাছি ততক্ষণে এসে পড়েছে। নায়েব কথা বললেন কিরীটীকে সম্বোধন ক'রে, এই যে মিঃ রায়, আসুন। বেড়াতে বের হয়েছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ।

আপনার জন্যেই ইনি অপেক্ষা করছেন। আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি এখানকার থানা-ইনচার্জ লক্ষ্মীকান্ত সাহা। আর এ'র কথা আপনাকে গতকাল আমি জানিয়েছিলাম চিঠি দিয়ে, ইনিই শ্রীযুক্ত কিরীটী রায়।

নমস্কার। লক্ষ্মীকান্ত কিরীটীকে নমস্কার জানায়।

নমস্কার। কিরীটী প্রতিনমস্কার জানাতে জানাতে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তেরচাভাবে কল্যাণীর দিকে সকৌতুকে তাকায়।

কাল বসন্তবাবুর চিঠিতে আপনার এখানে আসবার সংবাদ পেয়েই আপনার সঙ্গে আলাপ করার লোভটা সম্বরণ করতে পারলাম না, মিঃ রায়। ছুটে এসেছি।

ধন্যবাদ। মৃদু নম্র কণ্ঠে কিরীটী জবাব দেয়।

ওঁর মুখেই শুনলাম চৌধুরী মশাইয়ের মেয়ে নাকি তাঁর বাপের হত্যা-রহস্যের কিনারা করতে আপনাকে এখানে ডেকে এনেছেন। ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলেন?

না, এই তো সরে দিন দুই মাত্র এখানে এসেছি, এখনও তো সব চারিদিক ভাল করে দেখাশোনা করবার সুযোগ পাইনি।

দেখাশোনা আর কি করবেন! লাশও তো সৎকার করে ফেলা হয়েছে।—লক্ষ্মীকান্ত জবাব দেন।

তা তো ফেলতেই হবে, বাসি মড়া ঘরের মধ্যে রেখে আর লাভ কি বলুন? মিথ্যে কেবল দুর্গন্ধ ছড়াবে বই তো নয়! কিরীটী হাসতে হাসতে বললে।

তাহলে আর দেখবেন কি?

যে কোন হত্যার ব্যাপারেই মৃতদেহটা তো শেষ পরিচ্ছেদ মাত্র লক্ষ্মীকান্ত-বাবু। প্রশ্নের অঙ্কের উত্তরমালা ছাপার অক্ষরে একটা সংখ্যান্তর মাত্র। কিন্তু উত্তরটা জানলেই তো আর অংকটা কষা যায় না। কি বলেন? হাসতে হাসতে কিরীটী কথাটা বলে।

কিরীটীর হেঁয়ালি ভরা কথাগুলোর সঠিক অর্থ একেবারেই লক্ষ্মীকান্তর হৃদয়ঙ্গম হয় না। তথাপি সে জবাব দিতে পশ্চাৎপদ হয় না।

তা যা বলছেন, তবে কি জানেন মিঃ রায়, ব্যাপারটা যা বোঝা যাচ্ছে বেশ একটু জটিলই।

কেন বলুন তো?

কারণ এখানকার কোন স্থানীয় লোকই চৌধুরী মশাইকে হত্যা করেনি—

তাই বুঝি!

নিশ্চয়ই, সে সম্পর্কে কোন ভুলই নেই। Some outsiders—আর আপনি কি মনে করেন খুন করার পর আর সে বেটা এ সহরের চতুঃসীমানায় আছে? সঙ্গে সঙ্গেই পগারপার হয়েছে।

হুঁ।

তা হলেই বুঝুন। নচেৎ আমিই কি এত সহজে হাত গুটিয়ে বসে থাকতাম নাকি! এতক্ষণে বেটাকে নিয়ে হাজতে পুরতাম না!

চলুন না, ভিতরের ঘরে বসেই কথাবার্তা হবেখন। কথাটা বললেন নায়েব।

তাই চলুন। লক্ষ্মীকান্ত জবাব দেন।

নায়েব বসন্ত সেনেরই আহ্বানে অতঃপর সকলে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে নায়েবের কক্ষমধ্যেই এসে ঢুকলেন।

বসুন দারোগা সাহেব, কিরীটীবাবু বসুন। মা-লক্ষ্মী, তুমিও বোস। সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে বসন্ত সেন সকলকেই বসবার জন্য আহ্বান জানালেন।

সকলে উপবেশন করে।

একটু চা হবে তো দারোগা সাহেব? লক্ষ্মীকান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বসন্ত সেন প্রশ্ন করলেন।

চা! তা না হয় আনান!

বসন্ত সেন বোধ হয় চায়ের যোগাড় দেখতেই অন্দরের দিকে চলে গেলেন।

কল্যাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে এবার লক্ষ্মীকান্তই জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না? আপনি?

কল্যাণী বোধ করি নিজের পরিচয়টা নিজেই দিতে যাচ্ছিল, কিরীটী বাধা দিয়ে বললে, উনিও এখানে নবাগতা, মাত্র গতকাল সন্ধ্যায় এসে পৌঁচেছেন।

সবিতা দেবীর মামাতো বোন। কল্যাণী সান্যাল।

মামাতো বোন! কই মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর কোন শ্যালক আছেন বলে তো সেদিন সবিতা দেবী কিছু বললেন না?

এবার জবাব দিল কল্যাণী নিজেই, মামাতো বোনই বটে, তবে তাঁর সঙ্গে ঠিক রক্তের কোন জোরাল সম্পর্ক নেই। আমার বাবা নিত্যানন্দ সান্যাল পিসিমার দূরসম্পর্কীয় পিসতুত ভাই। এবং শুনেছি আমাদের বাড়িতে আমার ঠাকুরমার কাছেই নাকি তিনি মানুষ। আমাদের বাড়ি থেকেই পিসিমার বিবাহ হয়েছিল।

বেশ সহজ পরিষ্কার কণ্ঠে কল্যাণী লক্ষ্মীকান্তকে কথাগুলো বলে গেল। কল্যাণীর জবাব দেবার ভঙ্গী ও কথার চমৎকার বাঁধুনি কিরীটীকে কল্যাণীর প্রতি শ্রদ্ধান্বিতই করে তোলে। সংক্ষেপে সে লক্ষ্মীকান্তর যাবতীয় প্রশ্নেরই তখন উত্তর দিল।

লক্ষ্মীকান্ত দারোগাও কল্যাণীর জবাবে তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না।

এমন সময় দেওয়ান বসন্তবাবু আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এলেন।

নায়েবকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে লক্ষ্মীকান্ত তাঁকেই এবারে প্রশ্ন করলেন, সেই ছোকরাটি, সত্যজিৎ না কি নাম, চৌধুরী মশাইয়ের বন্ধুপুত্র—চলে গিয়েছেন নাকি?

না, তিনি এখনো এখানেই আছেন। তাঁকে ডাকবো নাকি?

না, ডাকতে হবে না। হ্যাঁ ভাল কথা কিরীটীবাবু, আপনার পরিচয় হয়নি সেই ছেলেটির সঙ্গে?

কিরীটী মৃদু হেসে জবাব দেয়, হ্যাঁ, তা হয়েছে বৈকি। কেন বলুন তো!

না, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম, ছেলেটিকে আপনার কেমন বলে মনে হয়?

চমৎকার! A perfect gentleman!

ভৃত্য একটা ট্রেতে করে চার পেয়ালা চা নিয়ে কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল।

তিনিই বোধ হয় সবিতা দেবীকে পরামর্শ দিয়ে আপনাকে এখানে আনিয়েছেন!

কিরীটী এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারে, হঠাৎ তার সত্যজিৎ সম্পর্কে ঐ ধরনের প্রশ্নটা করবার উদ্দেশ্য কি। লক্ষ্মীকান্তর সঙ্গে দু'একটি কথা বলবার পরই কিরীটী লক্ষ্মীকান্ত-চরিত্র সম্পর্কে কতকটা আন্দাজ করে নিতে পেরেছিল এবং এটাও সে বুঝতে পারছিল, স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবে না জানালেও লক্ষ্মীকান্ত তার এখানে আগমনটা বিশেষ সুনজরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি। এ জগতে একশ্রেণীর লোক আছে যারা নিজেদের অধিকারের সীমানা বা চৌহদ্দির মধ্যে তৃতীয় কোন ব্যক্তির মাথা গলানোটা আদপেই ভাল দৃষ্টিতে বা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। কিরীটী মনে মনে একটু হাসে এবং অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে লক্ষ্মীকান্তর প্রশ্নের জবাব দেয়।

কতকটা তাই বটে, আবার সম্পূর্ণ সেটা না-ও বটে। কারণ সবিতা দেবীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেই বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই, কারো কথা চট করে

যে মাথা পেতে মেনে নেবেন ঠিক সে শ্রেণীর মেয়ে তিনি নন।

লোকচরিত্র সম্পর্কেও তো দেখছি বেশ আপনার অভিজ্ঞতা আছে কিরীটীবাবু!

হ্যাঁ, লোকচরিত্র নিয়েই যখন কারবার করতে হয়, সে সম্পর্কে একটু-আধটু জ্ঞান না থাকলে কি করে চলে বলুন? কিন্তু সেকথা যাক্ লক্ষ্মীকান্তবাবু। আপনি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন এতে যে কি আনন্দিত হলাম! আপনিই এলেন, নচেৎ গতকালই ভাবছিলাম আপনার সঙ্গেই যে সর্বাগ্রে আমার একবার দেখা করা প্রয়োজন —

কেন বলুন তো?

বলতে গেলে আপনিই তো এই শহরের দণ্ডমুণ্ডের খোদ মালিক। তাছাড়া মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর হত্যার ব্যাপারে যা কিছু investigation তো আপনার দ্বারাই হয়েছে। কাজেই এর রহস্যের তদন্তে নামতে হলে আপনার সাহায্য ও উপদেশটাই তো সর্বপ্রথম কথা।

কিরীটীর কথা বলবার ভঙ্গিতে কল্যাণী এমন কি বসন্ত সেন পর্যন্ত ওর মুখের দিকে না তাকিয়ে পারে না। কিরীটীর গণনায় ভুল হয়নি। সাপের মুখে ধুলো পড়ার মতই কাজ হলো, লক্ষ্মীকান্তর চক্র গুটিয়ে এলো। বিনয় বিগলিত কণ্ঠে লক্ষ্মীকান্ত জবাব দিলেন, হেঁ! হেঁ! কি যে বলেন আপনি কিরীটীবাবু? তবে হ্যাঁ, কেসটা জটিল হলেও আমার দিক থেকে যথাসম্ভব সাহায্য আপনি পাবেন।

পাবো বলেই তো আশা করে আছি। নচেৎ কোন্ দুঃসাহসে এ কেসটা আমি হাতে নিয়েছি বলুন তো?

কিন্তু দারোগা সাহেব, এদিকে চা যে জুড়িয়ে গেল! কথাটা বললে কল্যাণী।

ওঃ, হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক ঠিক। লক্ষ্মীকান্ত হাত বাড়িয়ে ট্রে থেকে একটা কাপ নিতে নিতে বললেন, এ কি, তিন কাপ চা যে!

কথাটার জবাব দেয় কিরীটীই, একটা কাপ ঐ সঙ্গে হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে নিতে, নায়েব মশাইয়ের বোধ হয় চা তেমন চলে না!

এবারে জবাব দিলেন নায়েবই, হ্যাঁ। এ-যুগের লোকদের মত চা-টা তেমন আমার ঠিক সহ্য হয় না। কিরীটীবাবু ঠিকই বলেছেন।

চা খান না! আশ্চর্য তো! কথাটা বললেন লক্ষ্মীকান্ত।

না। সকালে বিকালে চায়ের বদলে আমি এক গ্লাস করে দুধ পান করি।

হ্যাঁ, ওঁর আমাদের মত বোধ হয় অসার বস্তুতে তেমন পক্ষপাতিত্ব নেই। উনি একেবারে খাঁটি ও সার বস্তুরই প্রিয়। হাসতে হাসতেই কিরীটী কথাটা উচ্চারণ করে এবং হাসতে হাসতেই কথাটা বললেও, আড়চোখে বসন্ত সেনের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে কিরীটী ভোলে না। নায়েবের চোখের তারা দুটো যেন বারেকের জন্য একবার ঝিকিয়ে উঠে আবার স্বাভাবিক শান্ত হয়ে গেল, সেটুকুও তার নজর এড়ায় না।

বাইরে এমন সময় চটিজুতোর শব্দ শোনা গেল। এবং সেই সঙ্গে গলাও শোনা গেল, বসন্ত ভায়া, কোথায় হে?

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেরই দৃষ্টি যুগপৎ খোলা-পথের দিকে

পতিত হয়।

এই যে সান্যাল মশাই আসুন। আসুন—আমি এই ঘরেই আছি। উদার কণ্ঠে আহ্বান জানালেন বসন্ত সেন।

॥ ১২ ॥

কল্যাণীর পিতা নিত্যানন্দ সান্যাল এসে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন পরক্ষণেই। পরিধানে একটা সাদা ধুতি, গায়ে একটা মের্জাই। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি।

আসুন সান্যাল মশাই। এ'দের সঙ্গে আপনার পরিচয়টা করিয়ে দিই। ইনি শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত সাহা, এখানকার থানার বড়বাবু। ইনি মিঃ কিরীটী রায় রহস্যভেদী—আর ইনি—

নমস্কার, আসুন। আপনার পরিচয় আগেই আপনার কন্যা দিয়েছেন। লক্ষ্মীকান্ত বসন্ত সেনের বক্তব্যে বাধা দিয়ে কথাটা বললেন।

বটে! বটে! মা কালই বুঝি আগেই আমার পরিচয় দিয়েছে? কিন্তু মেয়ের কাছ থেকে বাপের পরিচয়—সেটা তো ঠিক পরিচয় পাওয়া হলো না দারোগা সাহেব! কৌতুকমিশ্রিত কণ্ঠে জবাব দিলেন সান্যাল।

কেন বলুন তো? প্রশ্ন করলেন লক্ষ্মীকন্ত।

কেন আবার! অতিশয়োক্তিতে সে পরিচয় যে অনিবার্য ভাবেই দুষ্ট হবে। তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, সকালে উঠে কোথায় গিয়েছিলে মা-জননী? আমার এখনো উপাসনা সমাপন হয়নি। প্রভাত-উপাসনার ব্যবস্থাটা করে দাও তো গিয়ে মা—

এখনি যাচ্ছি বাবা। সমস্ত ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। কতকটা যেন লজ্জিত ভাবেই কথা কটি বলে কল্যাণী কক্ষ হতে একটু দ্রুতই নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

আপনি কালই এখানে এসে পৌঁচেছেন শুনলাম! কথাটা বললেন লক্ষ্মীকান্ত নিত্যানন্দ সান্যালের মুখের দিকে তাকিয়ে।

হ্যাঁ। সংবাদপত্রে সব জানা মাত্রই চলে আসতে হলো। আপনার বলতে আজ আমি ছাড়া মেয়েটার আর কেউই তো নেই। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। ছেলেবয়সে মাকে হারাল, ত্রিসংসারে একমাত্র ছিল ঐ বাপ, তাকেও হারাল। খেদপূর্ণ কণ্ঠে কথাগুলো বললেন সান্যাল মশাই।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত তিনজনের একজনও কেউই সান্যাল মশাইয়ের কথার কোন জবাব দিল না।

সকলেই নিঃশব্দে বসে রইল।

নিত্যানন্দই আবার কথা বললেন, কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো দারোগা সাহেব! এ যে একেবারে অসম্ভব, অবিশ্বাস্য! এই অজ শহর, এখানেও এসব ঘটে! কিরীটীবাবু—, কথা বলতে বলতে হঠাৎ কিরীটীর দিকে ঘুরে তাকিয়ে সান্যাল তাঁর বক্তব্যের শেষটুকু কিরীটীর উদ্দেশ্যেই যেন ব্যক্ত করলেন, আপনি তো শুনলাম একজন নামকরা বিচক্ষণ গোয়েন্দা, আপনিই বলুন না?

অসম্ভব হলেও ব্যাপারটা এইখানেই তো ঘটেছে মিঃ সান্যাল! জবাব

দিলেন লক্ষ্মীকান্ত সাহা।

কিন্তু কে হত্যা করলো? আর তাকে হত্যা করেই বা কি লাভ?

দ্বিতীয় প্রশ্নটার আপনার জবাব পেলেই তো আপনার প্রথম প্রশ্নটার জবাবটাও আমরা পেয়ে যাই সান্যাল মশাই! এবারে জবাব দিল কিরীটীই, এবং সেটাই তো এক্ষেত্রে আমাদের তদন্তের মূল ব্যাপার!

কি জানি কিরীটীবাবু, ঘটনাটা সংবাদপত্র মারফৎ পড়া অবধিই যেন আমি একেবারে তাজ্জব বনে গিয়েছি। তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—

আমি চৌধুরীকে তো বেশ ভাল করেই জানতাম, অমন চরিত্রবান সহৃদয় লোক হয় না আজকালকার দিনে বড় একটা। তারপর কতকটা যেন স্বগত ভাবেই বললেন, দয়াময়, সবই তোমার লীলা প্রভু!

আমাদেরও তাই বক্তব্য সান্যাল মশাই। কিরীটী আবার কথা বলে, এ দুর্ঘটনার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে এবং সেটা থাকতেই হবে। বিনা উদ্দেশ্যে বা বিনা কারণে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড কখনো সংঘটিত হয় না। হতে পারে না। আপনি, বসন্তবাবু আপনারা দীর্ঘদিন ধরে নিহত মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীকে জানতেন। তাঁর সম্পর্কে আপনারা আমাদের যত সংবাদ দিতে পারবেন আর কারো পক্ষেই সেটা সম্ভবপর হবে না। এবং এ-ও সত্যি যে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে থেকেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বা মূল্যবান সূত্রের সন্ধান পাই যার সাহায্যে এই ধরনের তদন্ত-ব্যাপারে মীমাংসাটা সহজ ও সরল হয়ে আসে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় কিরীটীবাবু—, সান্যাল বলতে লাগলেন, এমন কোন ঘটনাই কই চৌধুরী সম্পর্কে আমার মনে পড়ছে না যেটা আপনাদের বললে আপনারা এ ব্যাপারে আলোর সন্ধান পাবেন, যে ঘটনাকে তার এইভাবে নিহত হবার সামান্যতম কারণ বলেও বিবেচনা করা যেতে পারে। তাহলেও আপনারা যদি আমাকে বলেন ঠিক কি আপনারা জানতে চান চৌধুরী সম্পর্কে, তাহলে জানা থাকলে বলতে পারি কারণ সে যে আমার কতখানি আপনার ছিল সে একমাত্র আমিই জানি। আমার কোন মার পেটের বোন ছিল না কিরীটীবাবু। হেম আমার দূর-সম্পর্কীয় মামাতো বোন হলেও সহোদরারও অধিক ছিল। একই মায়ের স্নেহের অঞ্চলে সে ও আমি বর্ধিত হয়েছি। সে যে আমার কতখানি ছিল—, বলতে বলতে প্রৌঢ় সান্যালের গলার স্বরটা রুদ্ধ হয়ে আসে—দুই চক্ষুর দৃষ্টি অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে ওঠে।

সান্যালের শেষের কথাগুলোতে কক্ষের আবহাওয়াটা যেন কেমন করুণ হয়ে ওঠে।

সান্যাল তাঁর ধুতির প্রান্ত দিয়ে উদগত অশ্রুকে মুছে নিয়ে আবার বলতে লাগলেন, উনিশ বৎসর পূর্বে হঠাৎ একদিন কলকাতা থেকে চৌধুরীর চিঠিতে যখন জানলাম হেমের মৃত্যু হয়েছে, সে আর ইহজগতে নেই, সেদিনের কথা আমি ভুলবো না কিরীটীবাবু। হেমের অসুখের সংবাদ পূর্বেই চৌধুরীর চিঠিতে পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু সে যে অত শীঘ্র আমাদের মায়া কাটিয়ে তার এত সাধের সাজানো ঘর ফেলে ঐ বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে এ যেন সত্যিই আমার স্বপ্নাতীত ছিল। হেমের মৃত্যুর পর দুবার মাত্র এখানে আমি এসেছি—এ বাড়িতে পা দিলেই যেন হেমের শত সহস্র স্মৃতি আমার কণ্ঠ টিপে

ধরেছে, তাই হাজার ইচ্ছা হলেও এদিকে আর পা বাড়াইনি। আর পা দিয়েই বা কি হবে বলুন! যার সঙ্গে সম্পর্ক সে-ই যখন রইল না! আর চৌধুরীর কথাই বা কি বলবো, কি যে ভালবাসত ও হেমকে! হেমের অসময়ে মৃত্যুতে ও যেন একেবারে হঠাৎ অল্প বয়সেই দেহ ও মনে স্থবির হয়ে পড়েছিল। বাইরে থেকে অবশ্য বুঝবার উপায় ছিল না, ভিতরে ভিতরে একেবারে শুকিয়ে যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

কিরীটী ও বসন্ত সেনের মধ্যে একবার দৃষ্টি-বিনিময় হয় চকিতে, যখন সান্যাল হেমপ্রভার মৃত্যুর কথা বলছিলেন। কিন্তু কিরীটী বা বসন্ত সেন দুজনার কেউই সান্যালের কথার মধ্যে কথা বলে তাঁকে বাধা দিল না। সান্যালের বক্তব্য শেষ হতেই সহসা কিরীটী বলে ওঠে, একটা কথা সান্যাল মশাই, একটু আগে আপনার ভগ্নী হেমপ্রভা দেবীর মৃত্যু সম্পর্কে যে কথাটা বললেন, মানে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছিল, তাই কি?

বিস্মিত সান্যাল কিরীটীর প্রশ্নে ওর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

কিন্তু কানাইয়ের মার মুখে হেমপ্রভা দেবীর মৃত্যু সম্পর্কে যা জানা গিয়েছে সেটা কিন্তু—, কিরীটী শেষটুকু বলতে বোধ হয় ইতস্ততই করে।

সান্যাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন, কি শুনেছেন?

হেমপ্রভা দেবীর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেনি এবং সকলে যা জানে কলকাতায়ও তাঁর মৃত্যু ঘটেনি।

সে কি! একই সঙ্গে বলতে গেলে প্রায় কথাটা উচ্চারণ করলেন সান্যাল ও দারোগা লক্ষ্মীকান্ত সাহা।

নিষ্ঠুর সত্যকে এবার অত্যন্ত খোলাখুলি ভাবেই যাচাই করার প্রয়োজন। এতকাল যা ঘন রহস্যের অন্তরালে সকলের অজ্ঞাত ছিল আর তা থাকবে না। মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর মৃত্যুর রহস্য অতীতের আর এক রহস্যকে লোকচক্ষুর সম্মুখে উন্মোচিত করল যেন অজান্তেই আজ।

কালের বিধান।

কালস্রোতে যা নিশ্চিহ্ন হয়ে ধুয়ে-মুছে একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে বলেই সকলে ভেবেছিল, আজ আবার কানাইয়ের মা তাকে বর্তমানের মধ্যে এনে উপস্থিত করেছে।

ক্ষণপূর্বে উচ্চারিত কিরীটীর কথায় ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলকেই কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চুপ হয়ে থাকে।

কারো কণ্ঠ হতে এতটুকু স্বরও নির্গত হয় না।

বারেকের জন্য চকিত দ্রুত দৃষ্টি সঞ্চালনে কিরীটী ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিল।

হ্যাঁ, গতকাল সেন মশাইয়ের সঙ্গেও ঐ কথারই আলোচনা আমরা করেছিলাম—কিরীটী আবার বলে।

এ কথা কি সত্য বসন্ত? এবারে প্রশ্ন করলেন সান্যাল বসন্ত সেনকে।

না, সত্য নয়। কঠোর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নায়েব প্রত্যুত্তর দিলেন।

নায়েব মশাই, কোন কিছু আপনার অজ্ঞাত বলেই তাকে একমাত্র সেই যুক্তিতেই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না। কালও আপনাকে এটুকুই বলবার চেষ্টা করেছিলাম। বিশ্বাস করুন, কানাইয়ের মা মিথ্যা বলেনি।

ডাক তো বসন্ত ভায়া একবার ঐ ঝি কানাইয়ের মাকে। কথাটা বললেন সান্যালই এবারে।

হ্যাঁ, তাই ডাকুন, সত্যিই যদি মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর স্ত্রী হেমপ্রভা দেবীর মৃত্যুর ব্যাপারে কোন রহস্য থেকেই থাকে সেটাকে অতি অবশ্য যাচাই করা প্রয়োজন। লক্ষ্মীকান্ত যেন অতি উৎসাহের সঙ্গে কথাটা বললেন।

গোবিন্দ এই গোবিন্দ! বসন্তবাবু দরজার বাইরে গিয়ে ভৃত্য গোবিন্দকে ডাকলেন।

একটু পরেই গোবিন্দ ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত হলো, বাবু!

কানাইয়ের মাকে একবার ডেকে দে তো। যা শীগ্‌গির পাঠিয়ে দে এ ঘরে। গোবিন্দ আদেশ পালনের জন্য চলে গেল।

কিন্তু কানাইয়ের মার কথার সত্যতা যাচাই করার চাইতেও ঢের বিস্ময় সকলের জন্য অপেক্ষা করছিল, যখন গোবিন্দ এসে সংবাদ দিল সকাল থেকে কানাইয়ের মাকে বাড়ির মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কানাইয়ের মাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সে আবার কিরে! ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখ্। কোথায় যাবে বুড়ী!

তীক্ষ্ন রাগত কণ্ঠে কথাগুলো বললেন বসন্ত সেন।

আজ্ঞে ভাল করেই দেখেছি। ঠাকুর আর বনমালীও বললে, সকাল থেকে অনেক খুঁজেও তাকে পাওয়া যায়নি—

ঠিক এমনি সময় প্রথমে সবিতা ও তার পশ্চাতে সত্যজিৎ কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করলে।

সবিতার চোখমুখে একটা উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সবিতা সকলকে সেই ঘরের মধ্যে উপস্থিত দেখে, এমন কি দারোগা লক্ষ্মীকান্ত সাহাকেও সেই ঘরের মধ্যে উপবিষ্ট দেখে প্রথমটায় যেন একটু ইতস্ততই করে কিন্তু পরক্ষণেই সে সঙ্কোচটুকু কাটিয়ে উঠে ব্যগ্র কণ্ঠে বসন্ত সেনের দিকে তাকিয়েই বলে, নায়েব কাকা, সকাল থেকে এ বাড়ির মধ্যে কানাইয়ের মাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

একটা জলজ্যান্ত মানুষ রাতারাতি কোথায় উধাও হয়ে যাবে? নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আছে। আর একবার ভাল করে খুঁজে দেখতে বলছি মা গোবিন্দকে। জবাব দিলেন বসন্ত সেন।

এতক্ষণ কিরীটী একটা কথাও বলেনি। একপাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবারে সে কথা বললে, কানাইয়ের মা কোন্ ঘরে শুতো?

নীচের তলায় চাকরদের ঘরের পাশের একটা ঘরে। জবাব দিল সবিতা।

চলুন তো, একবার ঘরটা ঘুরে দেখে আসি। কিরীটী সবিতার দিকে তাকিয়ে চোখের দৃষ্টিতে তাকে অনুসরণ করতে বলে খোলা দরজার দিকে সর্বপ্রথম এগিয়ে গেল। এবং দরজার কাছাকাছি গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীকান্তকে সম্বোধন করে বললে, আসুন লক্ষ্মীকান্তবাবু, চলুন আপনিও একবার দেখবেন না ঘরটা?

হ্যাঁ চলুন। লক্ষ্মীকান্তও অতঃপর তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেলেন।

বসন্ত সেনও অনুসরণ করলেন ওদের।

বারান্দাটা অতিক্রম করে প্রশস্ত একটা বাঁধানো আঙিনা। আঙিনার দক্ষিণ প্রান্তে পর পর তিনটে ঘর। তারই একটা ঘরে কানাইয়ের মা সবিতারা এখানে আসবার পর থেকে রাত্রে শুচ্ছিল। ওদের এখানে আসবার পূর্বে অবশ্য কানাইয়ের মার জিনিসপত্র ঐ ঘরের মধ্যে থাকলেও, উপরের তলার একটা ঘরেই শুতো সে। পাশের দুখানা ঘরের একটায় থাকে বনমালী, অন্যটায় গোবিন্দ ও ঠাকুর!

নাতিপ্রশস্ত ঘরখানি। ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল। সবিতাই ঘরের সামনে এসে ঘরটা দেখিয়ে দিতে সর্বাগ্রে কিরীটীই ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র বিশেষ কিছু তেমন নেই। একধারে একটা টিনের পুরাতন রং-চটা ট্রাঙ্ক, ছোট একটা মিলারের চ্যাপ্টা তালা লাগানো। তারই পাশে একটা মাটির কলসী ও তার উপরে পরিষ্কার কাঁসার গ্লাস উবুড় করা।

দেওয়ালের গায়ে গায়ে পেরেকের সাহায্যে দড়ি টানিয়ে খানকয়েক সাদা-কাপড় পরিষ্কার শাড়ি ঝোলানো আছে।

কিরীটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে একবার চারিদিকে তার অভ্যস্ত তীক্ষ্ম অনুসন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে পর পর যে দুটি বন্ধ জানালা ছিল সে দুটি খুলে দিল।

এক ঝলক হাওয়া ও আলো ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল। জানালা দুটো বিলের দিকে। জানালা খুললেই দিগন্তপ্রসারী বৌরাণীর বিলের জল চোখে পড়ে।

কিরীটী শয্যাটার দিকে এগিয়ে গেল। শয্যার মলিন চাদরটা জায়গায় জায়গায় কুঁচকে আছে এবং মাথার বালিশটা বিছানার একধারে পড়ে আছে।

অতঃপর কিরীটী ঘরের মেঝেটা তীক্ষ্ম অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ হাঁটু গেড়ে এক জায়গায় বসে পকেট থেকে একটা লেন্স্ বের করে সেটার সাহায্যে কি যেন দেখতে লাগল।

অন্যান্য সকলে কৌতূহলী হয়ে কিরীটীর পশ্চাতে এসে দাঁড়ায়।

মিনিট দেড়েক বাদে কিরীটী আবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং সবিতার মুখের দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করল, কানাইয়ের মা তো বিশেষ করে আপনার কাজ-কর্মই দেখাশোনা করত, তাই না?

হ্যাঁ। ইদানীং বয়স হওয়ায় তাকে বিশেষ কাজকর্ম তো করতে দেওয়া হতো না। নিজের খুশিমত যা টুকটাক কাজ একটু-আধটু করত।

কাল রাত্রে শেষবারের মত তাকে কখন আপনি দেখেন?

রাত এগারটার কিছু পরে সে আমার কাছ থেকে চলে আসে।

আজ সকালে কখন সর্বপ্রথম জানতে পারেন যে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না?

এই তো ঘণ্টাখানেক আগে। রোজ সকালে সে আমার জন্য চা নিয়ে যেত, আজ যায়নি দেখে খোঁজ করতেই তো বনমালী এসে আমাকে বললে কানাইয়ের মাকে পাওয়া যাচ্ছে না খুঁজে।

বনমালী কোথায়?

বনমালীকে ডেকে আনা হল ঘরের মধ্যে।

এই সে বনমালী, তুমি কোন্ ঘরে গতকাল রাত্রে শুয়েছিলে? কিরীটী প্রশ্ন করল।

এই ডানদিককার পাশের ঘরটাতে বাবু।

আজ সকালে তোমার দিদিমণি খোঁজ করবার আগে কানাইয়ের মাকে যে পাওয়া যাচ্ছে না, জানতে না?

আজ্ঞে না। খুঁজতে এসেই তো দেখলাম এ ঘরে সে নেই।

কাল রাত্রে শেষ কখন তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল? ,

খাওয়ার সময় রাত্রে, তখন সাড়ে দশটা হবে—

তারপর?

আজ্ঞে তারপর আমি ঘুমোতে চলে আসি ঘরে, আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি কাল রাত্রে।

রাত্রে কোন রকম শব্দ শুনেছিলে এ ঘরে?

না।

খুব ঘুমিয়েছিলে বুঝি?

আজ্ঞে। বৃষ্টি হওয়ায় বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল—

ঠাকুর কোথায়? তাকে একবার ডেকে আন তো!

বনমালী গিয়ে রন্ধনশালা হতে ঠাকুরকে পাঠিয়ে দিল।

বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়সে হবে লোকটার। ঢ্যাঙা রোগা চেহারা। গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। গালের হনু দুটো বিশ্রীভাবে সজাগ হয়ে আছে। পুরু কালো ঠোঁট। উপরের পাটির দাঁত বিকশিত হয়েই আছে। লোকটার স্বভাব বোধ হয় বেশ পরিচ্ছন্ন। পরিষ্কার একটা খাটো ধুতি পরিধানে। গলায় লম্ববান ধবধবে একগুচ্ছ পৈতা।

তুমিই এ বাড়িতে রান্না কর? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

আইজ্ঞা কর্তা।

কি নাম তোমার?

আইজ্ঞা অধীনের নাম যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঢ়ী শ্রেণী।

বাড়ি কোথায়?

আইজ্ঞা সোনারাং।

কত দিন আছ এ বাড়িতে?

তা আপনাগোর আশীর্বাদে ধরেন গিয়া এক বৎসর তো হইবই।

তুমি এই পাশের ঘরেই শোও তো?

আইজ্ঞা।

কানাইয়ের মাকে বাড়ির মধ্যে কাল রাত থেকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, জান?

আইজ্ঞা কি কইলেন? কানাইয়ের মায়েরে খুঁইজা পাওয়া যাইতেছে না। কন কি! যাইবো কনে? এহানেই কোথায় হয়ত হইবো। খুঁইজা দেখুম?

॥ ১৩ ॥

সকলে আবার নায়েবের ঘরে ফিরে এলো।

কানাইয়ের মার অতর্কিত অন্তর্ধানের ব্যাপারটা যেন সকলকেই একেবারে

বিস্ময়ে অভিভূত করে দিয়েছে।

রাতারাতি কোথায় যেতে পারে কানাইয়ের মা?

শহর এখান থেকে প্রায় মাইল পাঁচেক দূরে। সে যদি নিজের ইচ্ছাতেই চলে গিয়ে থাকে, তাহলে এই পাঁচ মাইল পথ রাত এগারটার পর কোন এক সময় এখান থেকে বের হয়ে অতিক্রম করে গিয়েছে।

কালকের সেই বৃষ্টি-বাদলের অন্ধকার রাত্রে যদি সে স্বেচ্ছায় গিয়েও থাকে, তাহলেও খুব বেশী দূরে এখনও যেতে পারেনি নিশ্চয়ই।

আর যদি অন্য কিছু হয়, তাহলে!

অত্যন্ত দ্রুত কিরীটী আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে একবার চিন্তা করে বিশ্লেষণ করে নেয় বোধ হয়।

এ কথা অবশ্য ঠিকই, হয় কানাইয়ের মা স্বেচ্ছায় এ-বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে গিয়েছে, নচেৎ হয়ত যেতে হয়েছে। অথবা এ-বাড়ি থেকে তাকে কোথাও সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

চলে গিয়েই যদি থাকে সে এ-বাড়ি থেকে স্বেচ্ছায়! কিন্তু কেন যাবে? কি এমন কারণ থাকতে পারে তার যাবার?

যদি যেতে বাধ্য হয়ে থাকে! হয়ত সেটা অসম্ভব নয়।

আর যদি তাকে এখান থেকে সরানো হয়ে থাকে! সেটাও অসম্ভব নয়। কারণ এ বাড়ির সে বহুদিনকার পুরাতন দাসী। এ পরিবারের সংগে সে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত। তার পক্ষে অনেক অতীত ঘটনার সাক্ষী হওয়া মোটেই তো অস্বাভাবিক নয়। এবং সেটা সকলের পক্ষে বাঞ্ছনীয় তো নয়ই, অভিপ্রেত বা সুখকরও নয়।

ধরেই যদি নেওয়া যায় তাকে সরিয়েই ফেলা হয়েছে কোন বিশেষ কারণে, তাহলে কত দূরে কোথায় তাকে সরানো হল?

রাতারাতি কত দূরে তাকে সরিয়ে ফেলা সম্ভবপর?

কিরীটী সহসা লক্ষ্মীকান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, আপনার কি মনে হয় দারোগাবাবু, কানাইয়ের মার ব্যাপারটা?

মাগী নিশ্চয়ই কোথাও চলে গিয়েছে।

চলে গিয়েছে কেন? কিরীটী প্রশ্ন করে।

না, খুঁজে আর দেখতে হবে না। অনেক খোঁজা হয়েছে, তাকে পাওয়া যায়নি।

খোঁজেন খোঁজেন—ভাল কইরা খুঁজিয়া দেখেন, পাইবেন'খন। যাইবো কনে! যাওনের জায়গা থাকলি তো যাইবো! পোড়াকপাইল্যা বুড়ীর চাল-চুলো কোথাও কি আছে নাকি! বেবাক গিইলা বইসা আছে না মাগী! ওই যা, ওদিকে ডাল বসাইয়া আইছি! সব বোধ হয় পুইড়া ছাই হইয়া গেল! নির্বিকার যোগেশ বোধ হয় রন্ধনশালার দিকে যাবার জন্যই দরজার দিকে পা বাড়ায়।

এই হারামজাদা, যাচ্ছিস কোথায়, দাঁড়া! সহসা যেন অতর্কিতে বাঘের মতই গর্জিয়ে ওঠেন লক্ষ্মীকান্ত দারোগা।

থমকে দাঁড়িয়ে যায় যোগেশ। এবং ফ্যালফ্যাল করে লক্ষ্মীকান্তর মুখের দিকে তাকায়।

যাচ্ছিস কোথায়? বাবু যা জিজ্ঞাসা করছেন তার জবাব দে!

যোগেশ কিন্তু লক্ষ্মীকান্তর কথার কোন জবাব দেয় না, কেবল তাকিয়ে থাকে নিশ্চুপ হয়ে তাঁর মুখের দিকে।

শালার চোখমুখের চেহারা দেখেছেন কিরীটীবাবু? পাক্কা শয়তান! লক্ষ্মীকান্ত কথাটা কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বলে।

গালিগালাজ দেন ক্যান? কি করছি আমি? যোগেশ দারোগা সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল।

না, গালাগালি দোব না, তোমায় পাদ্যার্ঘ্য দেব।

কি কইলেন? যোগেশ আবার প্রশ্ন করে।

যোগেশ, তুমি তো পাশের ঘরেই কাল রাত্রে শুয়েছিলে? এ ঘরে কাল রাত্রে কোন শব্দ শুনেছ? প্রশ্ন করে এবারে কিরীটী।

আইজ্ঞা শব্দ শুনুম ক্যামনে? ক্ষেন্তীর মায় কয়, আমি একবার নিদ্রা গেলে নাকি ঢাকের বাদ্যিও কানে আমার যায় না! তা আপনাগোর ছিচরণের আশীর্বাদে নিদ্রাটা আমার একটু গাঢ়ই।

হুঁ। আচ্ছা তুমি যাও।

যোগেশকে অতঃপর বিদায় দেওয়া হল।

এখন আমার কি মনে হচ্ছে জানেন কিরীটীবাবু?

কি?

বুড়ী নিশ্চয়ই মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর মৃত্যুর ব্যাপারে জড়িত ছিল। কোন কারণে বেগতিক দেখে পালিয়েছে; কিন্তু আমিও আপনাকে বলে রাখছি কিরীটীবাবু, আমারও নাম লক্ষ্মীকান্ত সাহা, চোদ্দ বছর দারোগাগিরি করছি—ও হাঁ করলেই বুঝতে পারি। থানায় ফিরে গিয়েই চারিদিকে আমি লোক পাঠাবো। বেটী পালাবে কোথায়, হাতে দড়ি দিয়ে হিড় হিড় করে টেনে এনে হাজতে ভরবো না! দেখুন না—

কানাইয়ের মাকে ধরতে পারলে অবশ্য মন্দ হত না, তবে তাকে এত সহজে ধরা যাবে বলে মনে হচ্ছে না মিঃ সাহা!

এটা আমার এলাকা কিরীটীবাবু—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সহসা এমন সময় পাশের ঘর থেকে উগ্র কর্কশ একটা কণ্ঠ শোনা গেল, গোবিন্দ! এই গোবিন্দ—গোবিন্দ! এখনো চা দেবার সময় হল না বেটা তোদের?

লক্ষ্মীকান্ত নায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কে?

সন্তোষ চৌধুরী—গতকাল সন্ধ্যায় এডেন থেকে এসেছে। জবাব দিলেন বসন্ত সেন।

লোকটা কে? আবার জিজ্ঞাসা করেন লক্ষ্মীকান্ত।

পরিচয় দিচ্ছে কর্তার জাঠতুত ভাইয়ের ছেলে—ভাইপো।

ভাইপো! কই, এর সম্পর্কে কোন কথা তো সেদিন আপনার মুখে বা সবিতা দেবীর মুখে শুনিনি।

আপনিও ওর আসবার পূর্বে ওর সম্পর্কে কোন কথাই শোনেননি? এবারে প্রশ্ন করে লক্ষ্মীকান্তই সবিতাকে।

না।

আপনার বাবা কোন দিন যে তাঁর জাঠতুত ভাই এডেনে থাকেন সে সম্পর্কে কোন কথাই আপনাকে বলেননি মিস চৌধুরী? প্রশ্ন করল এবারে কিরীটী

সবিতার দিকে তাকিয়ে।

না। সবিতা এবারেও ঐ একই ছোট্ট সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়।

নায়েব মশাই, আপনি? আপনিও কোনদিন তাঁর মুখে শোনেননি তাঁর কোন জাঠতুত ভাই আছেন এডেনে, এ কথা? কিরীটী বসন্ত সেনের মুখের দিকে তাকিয়েই আবার প্রশ্ন করল।

শুনেছিলাম একবার কয়েক বছর আগে। কথায় কথায় একদিন তিনি বলেছিলেন, তাঁর এক জাঠতুত ভাই বিবাহের পর হঠাৎ বাপের সঙ্গে নাকি কি নিয়ে গোলমাল বাধায় কাউকে কিছু না জানিয়েই রাতারাতি বৌকে নিয়ে বাড়ি থেকে চলে যান।

তারপর?

তারপর নাকি আর তাঁদের কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। চৌধুরীরাও তখন জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিলেন। রামশঙ্কর চৌধুরী ও মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর পিতা পরস্পর সহোদর ভাই ছিলেন। রামশঙ্করও তাঁর পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন এবং মৃত্যুঞ্জয়ও ছিলেন তাঁর পিতার একমাত্র পুত্র। রামশঙ্করের গৃহ-ত্যাগের পর দীর্ঘ এগার বৎসরেও যখন গৃহত্যাগী নিরুদ্দিষ্ট পুত্র আর গৃহে ফিরে এলো না এবং হাজার চেষ্টা করেও বহু অর্থব্যয় করেও তাঁর বা তাঁর স্ত্রীর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না তখন তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ভাগের সম্পত্তি স্বেচ্ছায় তাঁর একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীকেই দান করে যান কেবল একটি শর্তে—যদি কোনদিন তাঁর গৃহত্যাগী পুত্র বা তাঁর বংশের কেউ ফিরে আসে, তাহলে তাঁর ভাগের সম্পত্তি তাকে যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেও আজ দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর আগেকার ঘটনা।

এই ভদ্রলোক বলছেন তিনি মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠভ্রাতার পুত্র? লক্ষ্মীকান্ত প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ।

কিন্তু তার প্রমাণ কিছু দিয়েছেন?

প্রমাণের কথা জিজ্ঞেস করায় বললে, প্রয়োজন হলে সে সব প্রমাণই কোর্টে দাখিল করবে। আমাকে সে কিছুই দেখাতে রাজী নয়। বসন্ত সেন লক্ষ্মী-কান্তর প্রশ্নের জবাব দিলেন।

হুঁ। ডাকুন তো একবার ভদ্রলোকটিকে?

লক্ষ্মীকান্তর নির্দেশে নায়েব বসন্ত সেন কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। এবং সোজা গিয়ে পাশের ঘরে প্রবেশ করলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর সন্তোষ চৌধুরী শয্যার উপরে বসে আপন মনে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে নিঃশব্দে মধ্যে মধ্যে সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে ধূমোদ্গীরণ করছিল; নায়েবের পদশব্দে ভৃত্য বোধ হয় চা এনেছে ভেবে বললে, কই, চা এনেছিস?

কিন্তু কথাটা বলে সামনের দিকে তাকিয়ে ভৃত্যর বদলে স্বয়ং নায়েবকে দেখে ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, এই যে, নায়েব মশাই যে! ব্যাপার কি বলুন তো, সত্যিই আমাকে এ বাড়ি থেকে তাড়াবার মতলব নাকি আপনার? সকালবেলা যে ভদ্রলোককে এক কাপ চা দিতে হয়, তাও কি এ বাড়িতে চাকররা জানে না?

ঠিক এমনি সময় কল্যাণী হাতে এক কাপ ধূমায়িত চা নিয়ে কক্ষের মধ্যে

এসে প্রবেশ করল।

কল্যাণীকে সহসা চায়ের কাপ হাতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতে দেখে উভয়েই কম বিস্মিত হয় না।

এ কি! আপনি চা নিয়ে এলেন কেন? চাকররা কোথায়? প্রশ্নটা করল সন্তোষই।

কল্যাণী মৃদু হেসে জবাব দিল, আপনার মেজাজের ভয়ে গোবিন্দ চা নিয়ে আসতে সাহস পেল না, তাই আমিই নিয়ে এলাম আপনার চা।

কল্যাণীর হাত হতে চায়ের কাপটা নিতে নিতে সন্তোষ যেন একটু লজ্জিতভাবেই বলে, হ্যাঁ, সকালবেলা চা না পেলে মেজাজটা আমার যেন কেমন বিগড়ে যায়।

কল্যাণী কিন্তু সন্তোষের কথায় আর কোন জবাব না দিয়ে অতঃপর ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল।

এইবারে নায়েব বসন্ত সেন বললেন, একটু তাড়াতাড়ি চা-টা শেষ করে নিন সন্তোষবাবু। আপনাকে ওঁরা পাশের ঘরে ডাকছেন।

কে ডাকছেন?

এখানকার থানার বড় দারোগা সাহেব।

দারোগা সাহেব! কিন্তু তাঁর সঙ্গে কি প্রয়োজন?

তা তো জানি না, তবে এখুনি একবার আপনাকে ডেকেছেন।

আমি ডাকাতও নই, খুনীও নই। I have got no business with any দারোগা সাহেব!

আপনার কোন বিজনেস না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে। সহসা খোলা দ্বারপথে লক্ষ্মীকান্তর কণ্ঠস্বর শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই যুগপৎ বসন্ত সেন ও সন্তোষ সামনের দ্বারপথের দিকে তাকাল।

শুধু একা লক্ষ্মীকান্ত সাহাই নয়, কিরীটী সবিতা ও সত্যজিৎও সঙ্গে আছে।

লক্ষ্মীকান্ত কথা বলতে বলতে সোজা একেবারে ঘরের মাঝখানে সন্তোষের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন।

সন্তোষ রুক্ষ বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল আগন্তুক লক্ষ্মীকান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কর্কশকণ্ঠে প্রশ্ন করল, কে আপনি? ভদ্রলোকের ঘরে সাড়া দিয়ে পারমিশান নিয়ে ঢুকতে হয়, এইটুকু জানেন না?

জানি কিনা সে পরে বিবেচনা করা যাবে মশাই। আপাততঃ আপনাকে আমার সঙ্গে এখুনি একবার থানায় যেতে হবে। বেশ সতেজ নির্দেশপূর্ণ কণ্ঠ লক্ষ্মীকান্তর।

থানায় যেতে হবে কেন? বাঁকা দৃষ্টিতে তাকায় সন্তোষ লক্ষ্মীকান্তর মুখের দিকে।

কারণ আপনি আমার এলাকায় বিদেশী, আমাকে না জানিয়ে প্রবেশ করেছেন।

তাই নাকি? বাংলাদেশের মধ্যেও গ্রামে ও ছোটখাটো শহরে পাসপোর্ট সিস্টেমের প্রচলন হয়েছে এ কথা তো কই শুনিনি?

দেখুন সন্তোষবাবু, কার সঙ্গে রসিকতা করছেন একটু ভেবে করবেন। আপনি আমার সঙ্গে এখুনি থানায় যেতে রাজী কিনা বলুন?

যদি না যাই ?

কেমন করে যাওয়াতে হয় আমি তা জানি। থানা থেকে কনেস্টেবল পাঠিয়ে দেব কি ?

সন্তোষ গুম হয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চলুন কোথায় যেতে হবে। কিন্তু মনে রাখবেন দারোগা সাহেব, এ অপমান আমিও এত সহজে হজম করে নেব না।

এখন তো চলুন, তারপর যা করবার করবেন। বলতে বলতে কিরীটীর দিকে ফিরে তাকিয়ে লক্ষ্মীকান্ত বললেন, কিরীটীবাবু, আপনিও আসুন। আপনার সঙ্গে আমার অনেক পরামর্শ আছে।

আমি ভাবছিলাম সন্ধ্যার দিকে আপনার ওখানে যাব। কিরীটী জবাব দেয়।

বেশ, তাই না হয় আসবেন। চলুন সন্তোষবাবু।

সন্তোষকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মীকান্ত ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন।

॥ ১৪ ॥

লক্ষ্মীকান্ত সাহা সহসা সন্তোষ চৌধুরীকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে যেন একটা নাটকীয় সংঘাতের সৃষ্টি করে গেলেন।

ক্রমে দুজনের জুতোর শব্দ ঘরের বাইরের বারান্দায় মিলিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ সকলেই ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কোন কথা বলে না। সকাল থেকে কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে পর পর দুটি ঘটনা যেন অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই ঘটে গেল। প্রথমতঃ কানাইয়ের মার নিরুদ্দিষ্ট হওয়া, দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্মীকান্তর কতকটা জোর করেই সন্তোষ চৌধুরীকে সঙ্গে করে থানায় নিয়ে যাওয়া।

ঘটনার পরিস্থিতিতে সকলেই যেন অল্পবিস্তর হকচকিয়ে গিয়েছে।

সত্যজিৎই প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কিরীটীকে প্রশ্ন করল, লক্ষ্মীকান্তবাবু কি সন্তোষবাবুকে arrest করে নিয়ে গেলেন নাকি মিঃ রায় ?

না, না—তা কেন হবে, বোধ হয় ওঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে চান। সন্তোষবাবুর কাছ থেকে সহজে কোন কথা বের করা যাবে না বলেই বোধ হয় সঙ্গে করে থানায় নিয়ে গেলেন।

নায়েব বসন্ত সেন একবার তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে ঘর হতে বের হয়ে গেলেন অত্যন্ত যেন আকস্মিক ভাবেই। বসন্ত সেনের এভাবে অকস্মাৎ ঘর ছেড়ে চলে যাওয়াটা সকলের কাছেই বেশ যেন একটু রূঢ় ও অপ্রত্যাশিত বলেই মনে হল এবং ঘটনার রূঢ়তাটুকু সবিতাকেই যেন লজ্জিত করে তোলে বিশেষ করে, কারণ বসন্ত সেনের কিরীটীর প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকানোর ব্যাপার সবিতার দৃষ্টিকেও এড়ায়নি।

লজ্জিত ও সংকুচিত সবিতার মনের অবস্থাটা কিরীটী তার মুখের ওপরে পলকমাত্র দৃষ্টিপাত করেই উপলব্ধি করতে পেরে স্মিত কণ্ঠে বলে, চলুন সবিতা দেবী, উপরে আপনার বাবা যে ঘরে শুতেন সে ঘরটা একবার ভাল করে দেখতে চাই। আপনার আপত্তি নেই তো ?

না, না—নিশ্চয়ই না, চলুন না। কিন্তু কানাইয়ের মার ব্যাপারটা যে কিছুই বুঝে উঠতে পরছি না মিঃ রায়। কোথায় গেল সে? সবিতার কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ পায়।

সবিতার প্রশ্নে কিরীটী বারেকের জন্য মুখের দিকে তাকাল, তারপর অত্যন্ত শান্ত মৃদু কণ্ঠে বললে, ভুল আমারই হয়েছে মিস্ চৌধুরী। পূর্বাহ্নেই আমার কানাইয়ের মার সম্পর্কে সাবধান হওয়া উচিত ছিল। সত্যিই আমি দুঃখিত।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী সবিতা কিরীটীর কথার তাৎপর্যটা বোধ হয় অতি সহজেই অনুমান করে উদ্বেগাকুল কণ্ঠে বলে ওঠে, কিরীটীবাবু, তবে কী—

হ্যাঁ, হঠাৎ যদি হতভাগিনী কানাইয়ের মার মৃতদেহটা এই প্রমোদভবনের আশেপাশে কোথাও আবিষ্কৃত হয়ে যায় আশ্চর্য হব না এতটুকুও, তবে—

কিরীটীর অসমাপ্ত কথার কতকটা জের টেনেই সবিতা প্রশ্ন করে, তবে মিঃ রায়?

না, থাক। মানুষের মন কিনা তাই খারাপটাই মনের মধ্যে সর্বাগ্রে এসে উঁকি দেয়। আপনার মা হেমপ্রভা দেবীর মৃত্যুর ব্যাপারেও যে একটা রহস্য জড়িয়ে আছে, কথাটা এত তাড়াতাড়ি বোধ হয় আমাদের প্রকাশ করা উচিত হয়নি।

মিঃ রায়, তবে কি—, কতকটা যেন আর্তকণ্ঠেই সবিতা কিরীটীকে কি একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে সহসা চুপ করে ব্যাকুল দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

সবিতা দেবী, অসংযত রসনা বড় মারাত্মক জিনিস। তাছাড়া আপনার হয়ত জানা নেই ইঁট-সিমেন্ট-সুরকির তৈরী ঘরের দেওয়ালেরও কান আছে। মানুষের মত তারাও শুনতে পায়। শুধু যে শুনতে পায় তাই নয়, কথাও অনেক সময় বলতে পারে। চলুন উপরে যাওয়া যাক। কিরীটী যেন বক্তব্যটা জোর করেই একপ্রকার শেষ করে দিয়েই অর্ধপথে খোলা দরজার দিকে পা বাড়ালে।

দরজার ঠিক মুখেই কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে সান্যালের দিকে তাকিয়ে বললে, বাবা, তোমার প্রভাতী উপাসনার যে সময় চলে গেল। কতক্ষণ তোমার উপাসনার সব ব্যবস্থ করে বসে আছি। উপাসনায় বসবে না?

সান্যাল ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, হ্যাঁ মা, চল যাই। দয়াময় প্রভু! বলতে বলতে সান্যাল অন্যান্য সকলকে অতিক্রম করে বেশ একটু দ্রুত পদবিক্ষেপেই এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন।

কল্যাণীও তার পিতাকে অনুসরণ করল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ কিরীটী সবিতার দিকে তাকিয়ে বললে, একটা শাবল আর একটা কোদালের প্রয়োজন আমার মিস চৌধুরী। পাওয়া যাবে এখানে?

বিস্মিতা সবিতা কিরীটীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কোদাল আর শাবল! কি হবে তা দিয়ে?

কিরীটী হাসতে হাসতে জবাব দেয়, অতীতকে খুঁড়ে দেখবো!

অতীতকে খুঁড়ে দেখবেন?

হ্যাঁ। কে জানে হয়ত তক্ষশিলার মত অত্যাশ্চর্য ধ্বংসাবশেষের সন্ধানও মিলতে পারে। কিন্তু জিনিস দুটো পাওয়া যাবে কি?

কেন যাবে না? গোবিন্দকে বললেই সে দেবে'খন। কখন চাই আপনার ও দুটো।

আমার ঘরে রেখে দিতে বলবেন, সময়মত কাজে লাগাবো। কিরীটী প্রত্যুত্তর দেয়।

ইতিমধ্যে সিঁড়ি অতিক্রম করে সকলে প্রায় দোতলায় এসে পৌঁচেছে। সবিতা সকলের আগে, কিরীটী ও সত্যজিৎ পাশাপাশি অগ্রবর্তিনী সবিতাকে অনুসরণ করে।

চলতে চলতে চাপা নিম্নকণ্ঠে সত্যজিৎকে সম্বোধন করে কিরীটী বলে, কাল দুপুরের দিকে আপনাকে আমার একটু প্রয়োজন সত্যজিৎবাবু। সময় হবে তো?

নিশ্চয়ই হবে।

বেশ।

মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর শয়নকক্ষ।

দরজায় তালা দেওয়া ছিল, সবিতা তার ঘর থেকে চাবিটা এনে তালা খুলে ঘরটা খুলে দিল। সবিতার এবারে এখানে আসা অবধি ঐ ঘরটায় সর্বদা তালা দেওয়াই থাকে, কেবল সন্ধ্যার কিছু আগে একবার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কানাইয়ের মাকে দিয়ে ঘরটা ঝাড়পোঁছ করে বাবার ফটোর নিচে একটা ধূপ-দানিতে ধূপ রেখে আসত।

মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরের মধ্যে যে জিনিসটি যেমন ভাবে সজ্জিত ছিল, এখনো অবিকল ঠিক তেমনটিই আছে। কোন কিছুই নাড়াচাড়া করা হয়নি বা ছোঁয়া হয়নি।

প্রথমে সবিতা কক্ষমধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল, তার পশ্চাতে কিরীটী ও সত্যজিৎ।

কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে বারেকের জন্য কিরীটী তার চিরাচরিত তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে চতুষ্পার্শ্বস্থিত ঘরের যাবতীয় কিছু দেখে নিল নিঃশব্দে।

ঘরে ঢুকতেই সামনে দেওয়ালে যে এনলার্জড্ ছবিটি টাঙানো আছে—মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ও তাঁর শিশু বালিকা কন্যা সবিতা—অনুমানেই বুঝে নেয় কিরীটী।

ঠিক মুখোমুখি না হলেও ঘরের অন্য দিককার দেওয়ালে একটা সেকালের ভারী মেহগনী কাঠের পালিশ-করা দেরাজ। দেরাজ পুরাতন হলেও পালিশ যেন এখনো চক্ চক্ করছে। দেরাজের ঠিক উপরে একখানা এনলার্জ করা ছবি দেওয়ালের গায়ে টাঙানো। ছবিটা বাঁধানো সোনালী রংয়ের সূক্ষ্ম কারু-কার্যমণ্ডিত মোটা চওড়া ফ্রেমে। ছবির মধ্যে দেখা যাচ্ছে বছর ২৪।২৫-এর এক নারীকে। চিনতে কষ্ট হয় না কিরীটীর এবারেও অনুমানে, ঐ হেম-প্রভার প্রতিকৃতি—সবিতার জননী। ঠিক অবিকল যেন সবিতাই ছবির মধ্যে। মায়ের চেহারার, এমন কি চোখ-মুখ-কপালের হুবহু আদলটি পর্যন্ত পেয়েছে সবিতা তার জননীর।

ঘরের দক্ষিণ কোণে একটা ভারী কাঠের চৌকির উপরে বসানো একটা লোহার সিন্দুক।

সবিতা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই চারটে জানালার কবাটই খুলে দিয়েছিল। ঘরটি এমন ভাবে তৈরী যে, প্রচুর আলো-হাওয়ার অবাধ গতিবিধি আছে।

বিলের দিকে দুটো জানালা ঘেঁষে একেবারে একটি উঁচু পালঙ্কের উপরে নিভাঁজ একটি শয্যা সবুজ বর্ণের বেডকভার দিয়ে ঢাকা।

একপাশে আলনায় খানকয়েক ধুতি জামা গোছানো। এবং আলনার নিচে দুই জোড়া জুতো।

ঘরের অন্যদিকে একটা ছোট সেক্রেটারিয়েট্ টেবিল। টেবিলের উপরে কিছু কাগজপত্র ও খানকয়েক পুস্তক।

সামনেই একটা চেয়ার ছাড়াও একটা দেওয়াল-আলমারি, একটা দামী আরাম-কেদারা ও একটা জলচৌকি আছে ঘরে।

ঘরের দুটো দরজা—একটা প্রবেশের ও নির্গমনের, অন্য দরজাটা সামনে দিকে ছাদে যাতায়াতের জন্য।

ঐ দেওয়াল-আলমারি, সিন্দুক ও ড্রয়ারের চাবি আপনাব কাছেই তো সবিতা দেবী? কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। সবিতা একটা চাবির রিং কিরীটীর হাতে তুলে দিল, এই চাবির রিংয়েই সব চাবি পাবেন।

আচ্ছা মিস চৌধুরী, আপনার পিতা রাত্রে যখন নিদ্রা যেতেন, জানালা-দরজা শুনেছি খোলাই থাকত! ছাদের ঐ দরজাটা, ওটাও কি খোলাই থাকত, জানেন? কিরীটী সহসা প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। যতদূর জানি, ঐ দরজাটাও রাত্রে তিনি খুলেই শুতেন। সবিতা জবাব দেয়।

সাধারণতঃ রাত কটা পর্যন্ত জেগে তিনি পড়াশুনা ও জমিদারী সংক্রান্ত কাজকর্ম করতেন?

শুতে প্রায়ই তাঁর বারোটা সাড়ে-বারোটা হয়ে যেত। সকালের দিকে তাই বোধ হয় তিনি একটু দেরিতেই উঠতেন।

কিরীটী প্রথমেই কথা বলতে বলতে সেক্রেটারিয়েট্ টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল, সাধারণতঃ এই টেবিলে বসেই তো তিনি কাজকর্ম করতেন?

হ্যাঁ।

কিরীটী লক্ষ্য করে দেখে, টেবিলটার উপরে সূক্ষ্ম একটা ধুলোর পর্দা পড়ে আছে।

টেবিলটা ইদানীং কতদিন ঝাড়-পোঁছ করা হয়নি?

কানাইয়ের মাকে ও টেবিলটা ছুঁতে বারণ করে দিয়েছিলাম। এখানে আসবার পর আমি একদিন মাত্র টেবিলটা পরিষ্কার করেছিলাম।

কিরীটী নিঃশব্দে তাকিয়ে টেবিলটার উপরে যাবতীয় কিছু খুঁটিয়ে দেখছিল, সহসা তার নজরে পড়ল একটা লম্বা চুল টেবিলের কাঠের জোড়ের মুখে আটকে আছে।

চুলটা কৌতূহলভরে টেনে বের করল কিরীটী। লম্বা কোঁকড়ানো চুল। কোন নারীর কেশ একগাছি।

কিরীটী লম্বা কোঁকড়ানো কেশগাছি দুই হাতের আঙুলে ধরে টেনে টেনে দেখতে লাগল এবং মধ্যে মধ্যে সবিতার দিকে তাকাতে লাগল। কৌতূহলী সবিতা ও সত্যজিৎ একই সঙ্গে প্রশ্ন করে, কি কিরীটীবাবু?

একগাছি কেশ! বলতে বলতে পকেট হতে একটা কাগজ বের করে কেশগাছি সেই কাগজের মধ্যে রেখে সযতনে কাগজটা ভাঁজ করে পকেটের মধ্যে রাখতে রাখতে বললে, কই, এর মধ্যে বলুন তো কোন্ চাবিটা ড্রয়ারগুলোর?

চাবির রিংটা সবিতার হাতে দিতে দিতে সবিতা একটা লম্বা মোটা চাবি ড্রয়ারের গায়ে ঢুকিয়ে ড্রয়ারটা খুলে দিল।

এক এক করে সবিতার সাহায্যে কিরীটী দুই দিককার ছটা ড্রয়ারই খুলে তার ভিতরকার কাগজপত্র সব পরীক্ষা করতে লাগল। এবং কাগজপত্রগুলো দেখতে দেখতে একসময় একটা মোটা বোর্ডে বাঁধাই সুদৃশ্য অ্যালবাম টেনে বের করল। অ্যালবামটার মধ্যে অনেক ফটো আঁটা রয়েছে।

কিরীটী বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গেই অ্যালবামের পাতাগুলো উল্টে উল্টে দেখে যেতে লাগল।

ফটোগুলো তোলা বোধ হয় অনেকদিন আগেকার। একটু লালচে রং ধরেছে প্রায় প্রত্যেক ফটোতেই এবং ফটোগুলোর মধ্যে বেশীর ভাগই নানা জায়গার ফটো। ঘরবাড়ি, পুরাতন মন্দির, ফোর্ট, জলাশয়, রাস্তাঘাট, বাগানবাগিচা, কবর ইত্যাদির।

বেশীর ভাগই রাজপুতানার ফটো দেখছি! অ্যালবামটা কার সবিতা দেবী?

অ্যালবামটা এর আগে কখনও আমি দেখিনি ; বোধ হয় বাবারই—

আপনার বাবার ফটো তুলবার শখ ছিল বুঝি একসময়?

বলতে পারি না ঠিক। কখনও বাবাকে ফটো তুলতে আমি দেখিনি।

এককালে হয়ত তিনি খুব দেশভ্রমণ করেছেন! আপনার বাবার মুখে কখনও দেশ ভ্রমণের গল্প শোনেননি মিস চৌধুরী?

না।

সাধারণতঃ আপনার বাবার সঙ্গে আপনার কি ধরনের কথাবার্তা হত?

এই আমার লেখাপড়া, আমার কলেজের কথা এই সবই আলোচনা করতাম আমরা। সবিতা জবাব দেয়।

হুঁ। অ্যালবামটা আমার কাছে আমি রাখতে পারি আপাততঃ?

বেশ তো, রাখুন না।

কিরীটী অতঃপর কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। কাগজগুলো দেখতে দেখতে একটা খামের মধ্যে খানকতক পুরাতন চিঠি যত্নের সঙ্গে লাল সুতো দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পেল।

চিঠিগুলো খুলে পরীক্ষা করতে গিয়ে কিরীটী একটু আশ্চর্যই হয়, চিঠিগুলো অনেকদিন আগেকার এবং হিন্দী ভাষায় লেখা।

হিন্দী ভাষায় দেবনাগরী অক্ষরে লেখা চিঠি!

খান-চার-পাঁচ চিঠি। চিঠিগুলো কিরীটী অ্যালবামটার মধ্যেই খাম সমেত রেখে দিল। সহসা একসময়ে কিরীটী শূন্য শয্যাটির দিকে তাকিয়ে সবিতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললে, যে রাত্রে আপনার বাবা নিহত হন, সে রাত্রে শয্যার উপর যে চাদর ও বেডকভার বিছানো ছিল সেগুলো কি বদল করা

হয়েছে মিস চৌধুরী ?

না। কেবল ঐ বেডকভারটা বিছানার উপর ছিল না, ওটা পরে আমি পেতে বিছানাটা ঢেকে রেখেছি।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে বিছানার উপর থেকে বেডকভারটা টেনে তুলে ফেলে বিছানার চাদরটা একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল।

একটা কথা সবিতা দেবী, যে রাত্রে আপনার বাবা নিহত হন, পরের দিন সকালে ঐ ছাদের দিকের দরজাটা কি খোলা দেখা গিয়েছিল ?

তা তো বলতে পারি না! বনমালী হয়ত বলতে পারবে।

ঐদিন দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর কিরীটী একাকী তার ঘরের মধ্যে বসে একটা চেয়ারের উপরে সকালবেলা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর টেবিলের ড্রয়ার থেকে আনা ফটোর অ্যালবামটা আবার একবার উল্টেপাল্টে দেখছিল।

একটা পাতায় এসে দৃষ্টি যেন মুগ্ধ বিস্ময়ে স্থির হয়ে থাকে।

একটি মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে পূজারিণীর বেশে একটি অপরূপ সুন্দরী ১৯।২০ বৎসর বয়স্কা রাজপুতানী মেয়ে। ফটোটা অনেকদিনের পুরাতন হলেও এবং ফটোর বর্ণ অনেকটা ফিকে হয়ে এলেও মেয়েটির অপরূপ দেহশ্রী ও সৌন্দর্য এখনও একেবারে চাপা পড়ে যায়নি।

মেয়েটি হাসছে। পরিধানে ঘাগরা ও গায়ে ওড়না। বুকের দুপাশ দিয়ে ঝুলছে দু'টি বেণী।

সহসা বাইরে পদশব্দ শোনা গেল।

চমকে উঠে তাড়াতাড়ি হাতের অ্যালবামটা বন্ধ করে বিছানার তলায় রেখে দিয়ে দরজার দিকে তাকাল। দরজাটা অবশ্য ভেজানোই ছিল।

দরজার গায়ে মৃদু করাঘাত শোনা গেল, আসতে পারি ?

কে, কল্যাণী দেবী! আসুন, আসুন। কিরীটী মৃদু আহ্বান জানাল।

কল্যাণী এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

অপূর্ব সাজ পরেছে সে। পাঞ্জাবী মেয়েদের মত ঢিলা পায়জামা, পাঞ্জাবি ও রেশমী একটা উড়নী গলায় ভাঁজ করা।

বাঃ! চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু আপনাকে এই বেশে মিস্ সান্যাল! কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বলে।

নিজেকে অত্যন্ত free মনে হয় এই পোশাকে।

তা তো হবেই। ওই বেশেই যে আপনি অভ্যস্ত। কিরীটী জবাব দেয়।

বোধ হয় তাই। কিন্তু একা একা ঘরের মধ্যে বসে আপনি করছিলেন কি ?

বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? কিরীটী কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে স্মিতভাবে বললে।

॥ ১৫ ॥

তাহলে বসেই পড়া যাক, কি বলেন? সম্মুখের চেয়ারটা টেনে বসতে বসতে হাস্যদীপ্ত কণ্ঠে কল্যাণী বললে।

হ্যাঁ বসুন।

ঘরের কোণে একটা শাবল ও ছোট কোদালের উপরে হঠাৎ নজর পড়ে কল্যাণীর। বিস্মিত দৃষ্টিতে বস্তু দুটির দিকে তাকিয়ে কল্যাণী প্রশ্ন করলে, ব্যাপার কি? কোদাল আর শাবল দিয়ে কি হবে মিঃ রায়?

মাটি খুঁড়বো। হাসতে হাসতেই জবাব দেয় কিরীটী।

মাটি খুঁড়বেন! হঠাৎ মাটি খুঁড়বার কি প্রয়োজন হলো আবার?

জানেন না, মাটি খুঁড়তে খুঁড়তেই কত বিরাট বিস্ময়ের আমরা সন্ধান পেয়েছি! কত শত বৎসরের ঘুমন্ত অতীতকে মাটির কবর-শয্যা হতে চোখের সামনে খুঁজে পেয়েছি! তক্ষশীলা, মহেঞ্জোদড়ো, হরোপ্পা।

তা যেন হল, কিন্তু এখানেও সে সব আছে নাকি?

নেই যে তাই বা কে বলতে পারে? কবির বচন জানেন না—যতন করহ লাভ হইবে রতন!

সত্যি মিঃ রায়, আপনি হেঁয়ালি করেও কথা বলতে পারেন!

সে কথা যাক। আপনাকে একটা কাজের ভার দিতে চাই, পারবেন?

নিশ্চয়ই। বলুন কি কাজ? উৎসাহিত হয়ে ওঠে কল্যাণী।

সন্তোষবাবুর উপরে আপনাকে একটু নজর রাখতে হবে।

সন্তোষবাবু! তাকে তো সকালবেলা থানার দারোগা arrest করে নিয়ে গেল—কিন্তু কেন বলুন তো, হঠাৎ ভদ্রলোককে arrest করল কেন?

আমার যতদূর মনে হয়, সন্তোষবাবুকে arrest করবার মত উপযুক্ত evidence লক্ষ্মীকান্ত সাহার ঝুলিতে নেই। হয়ত কয়েকটা জিজ্ঞাসাবাদ করেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

কিন্তু এও তো ভারী অন্যায়। এমনি করে হুট্ করে একজন ভদ্রলোককে arrest করে নিয়ে যাওয়া!

অন্যায় বৈকি। কিন্তু ঘটনাচক্রে এমন বিশ্রী সময়ে ও এমন বিশ্রী পরিস্থিতির মধ্যে তিনি এসে পড়েছেন যে, এ রকমটা হওয়া বিশেষ কিছুই আশ্চর্য নয়। দশচক্রে ভগবান ভূত বলে একটা প্রবাদ আছে না আমাদের দেশে, এক্ষেত্রেও অনেকটা তাই হয়েছে মিস্ সান্যাল।

কিরীটীবাবু?

কল্যাণীর গলার স্বরে কিরীটী যেন বেশ একটু বিস্মিত হয়েই ওর মুখের দিকে তাকাল, বলুন?

একটা অনুরোধ আমার—দাবীও বলতে পারেন। আপনি অবশ্য কথাটা মানবেন কিনা জানি না, তবে আমার কি মনে হয় জানেন, কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য কয়েক ঘণ্টার আলাপ-পরিচয়েই কেউ কেউ পরস্পরের কাছে এত ঘনিষ্ঠ ও এত সহজ হয়ে আসে যে ভাবতেও অনেক সময় বিস্ময় লাগে। এই ধরুন আপনার কথাই। কতক্ষণেরই বা আলাপ আপনার সঙ্গে, অথচ মনে হচ্ছে যেন আপনার সঙ্গে বুঝি কতদিনেরই না পরিচয়! হয়ত আপনি মনে মনে হাসছেন, কিন্তু—

কেন, হাসবো কেন? কিরীটী হাস্যোদীপ্ত কণ্ঠেই বাধা দিয়ে বলে ওঠে।

সে যাই হোক, সেই দাবীতেই অনুরোধটা জানাচ্ছি, আপনি আমাকে আপনি বা মিস্ সান্যাল না বলে শুধু কল্যাণী বলে ডাকলে কিন্তু ভারী খুশী হবো এবং সেই সঙ্গে যদি 'আপনি'র দূরত্বটা তুলে দিয়ে 'তুমি বলে সম্বোধন

করেন, তাহলে খুশীর সত্যিই বলছি অন্ত থাকবে না। তাছাড়া বয়সেও তো আমি আপনার চাইতে অনেক ছোটই হব, সেদিক দিয়েও তো অনায়াসেই আমাকে আপনি তুমি বলে ডাকতে পারেন।

বেশ তো। তুমি বলেই ডাকলেই যদি তুমি খুশী হও কল্যাণী তাই হবে। কিরীটী স্নিগ্ধ কণ্ঠে জবাব দেয়।

আঃ, বাঁচলাম। এবারে নিশ্চিন্ত মনে বলি, খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে পিসেমশাইয়ের হত্যার ব্যাপারটাই ভাবছিলাম। একটা ব্যাপারে কেমন যেন খট্‌কা লাগছে।

কি বলুন তো?

আবার বলুন?

ও ভুল হয়ে গিয়েছে, বল!

আচ্ছা এই পিসিমার হত্যার ব্যাপারটা—নায়েব বলেছেন তিনি ও সম্পর্কে কিছুই জানেন না, এও কখনো হতে পারে?

কৌতুকে কিরীটী প্রশ্ন করে, কেন?

না, অনেক দিনকার পুরাতন লোক উনি এ বাড়ির, শুধু তাই নয় পিসেমশাইয়ের একদিক থেকে যতদূর শুনলাম নাকি বন্ধুর মতই ছিলেন উনি। আমার তো মনে হয়, বিশেষ কারণেই কথাটা তিনি অস্বীকার করছেন এখন।

তুমি হয়ত ঠিকই ধরেছ কল্যাণী, তাহলেও এত তাড়াতাড়ি কোন বিষয়েই চট্‌ করে মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়।

তারপর কানাইয়ের মার অন্তর্ধানের ব্যাপারটা!

কি মনে হয় তোমার?

এর পিছনেও কোন রহস্য আছে।

কি রকম?

পাছে কানাইয়ের মা উপস্থিত থাকলে পিসিমার ব্যাপারটা প্রমাণিত হয়, তাই হয়ত তাকে সরানো হয়েছে কৌশলে।

স্বাভাবিক।

কিন্তু বেচারীকে খুন করে কেউ ঐ বৌরাণীর বিলের জলে ডুবিয়ে দেয়নি তো?

তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই কল্যাণী।

বলেন কি?

ঠিক তাই। একটা মিথ্যাকে ঢাকতে গিয়ে যেমন সেই সঙ্গে দশটা মিথ্যার আমদানি করতে হয়, তেমনি বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে একটা হত্যার ব্যাপারকে চাপা দেওয়ার জন্য আরো দু'একটা আনুষঙ্গিক হত্যা এসে পড়ে। অথচ হত্যাকারী বোঝে না যে সে নিজে যত ধূর্ত ও ক্ষিপ্রই হোক না কেন, হত্যা তার পথ-রেখা বা চিহ্ন সর্ব ক্ষেত্রেই রেখে যাবেই পশ্চাতে। এবং সেই পথরেখা ধরে এগিয়ে চললে তাকে ধরা দিতে হবেই, সুব্রতকেও আমি বহুবার বলেছি এ কথা। কেবল একটা ছকে ফেলা—

কিন্তু সেই ছকে ফেলা—

হ্যাঁ, সেজন্য কিছু সূত্রের (clue) আবশ্যক। Detection-এর মূল কথাটাই তো তাই। সূত্রকে খুঁজে বের করতে হবে—

How interesting!

Interesting সন্দেহ নেই, তবে সমগ্র ব্যাপারটাকে interesting করে তুলবার জন্য স্থির বিচার-বুদ্ধি, বিবেচনা-শক্তি ও সতর্ক তীক্ষ্ম সজাগ দৃষ্টির প্রয়োজন প্রতি মুহূর্তে। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা বুদ্ধির অঙ্ক।

বুদ্ধির অঙ্ক?

হ্যাঁ। তোমাকে যখন বর্তমান এই detection ব্যাপারে সহকর্মী হিসাবেই নিয়েছি, কয়েকটা প্রশ্ন তোমাকে ভাববার জন্য দিচ্ছি। ভেবে জবাব দিও।

প্রশ্ন? বলুন?

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে—মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী হেমপ্রভার মৃত্যুর মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে কিনা? ২নং প্রশ্ন হচ্ছে—যদি থেকেই থাকে তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় মৃত্যুর মধ্যে দীর্ঘ এই উনিশ বৎসরের ব্যবধান কেন হলো? ৩নং প্রশ্ন—ঐ উনিশ বৎসরের ব্যবধানে একই হত্যাকারীর পক্ষে একই কারণে দুজনকেই হত্যা করা সম্ভবপর কিনা? বুঝতে পারছো বোধ হয়, তৃতীয় প্রশ্নের যদি জবাবটা খুঁজে পাও, ঐ সংগেই প্রথম প্রশ্নের জবাবটাও সহজ হয়ে আসবে।

হুঁ।

৪নং প্রশ্ন—দুটি মৃতদেহই ঐ একই জায়গায় বকুলবৃক্ষতলে পাওয়া গেল কেন? দুদুবারই হত্যার স্থান ঐ বকুলবৃক্ষতলই বেছে নেওয়া হয়েছিল, না দ্বিতীয় হত্যার পর মৃতদেহ ঐ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? নিয়ে যাওয়াই যদি হয়ে থাকে, কি তার উদ্দেশ্য ছিল? শুধু তাই নয়, যদি ধরে নেওয়া যায় ঐখানেই মৃতদেহ বহন করেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, স্বভাবতই একটা প্রশ্ন জাগবে মনে, হত্যাকারী দেহে প্রচুর শক্তি ধরে। ঐ সংগে একথাও মনে হবে, তাহলে কোথায় হত্যা করা হয়েছিল?

আচ্ছা একটা কথা মিঃ রায়, আপনি কি তাহলে ধরেই নিচ্ছেন কানাইয়ের মা পিসিমার মৃত্যু সম্পর্কে যে কাহিনী বলেছে তা সত্য?

নিশ্চয়ই।

কিন্তু তার প্রমাণ কি?

Yes, it is an intelligent question! প্রমাণ? এক্ষেত্রে প্রমাণের চাইতে probability উপরেই আমি বেশী জোর দিয়েছি, কিন্তু কেন? প্রথমত কানাইয়ের মার মত একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে এ ধরনের একটা চমৎকার কাহিনী গড়ে তুলে বলবার যেমন কোন উদ্দেশ্যও থাকতে পারে না, তেমনি তার মত একজন অশিক্ষিত দাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ পারম্পর্য ও যুক্তি বজায় রেখে এমন একটা সুষ্ঠু কাহিনী রচনা করে তুলবার ক্ষমতা থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ অনেকদিনকার পুরানো দাসী এ বাড়ির সে এবং হেমপ্রভা দেবীর বাপের বাড়ি থেকেই সে এসেছে। খাস দাসী ছিল সে হেমপ্রভা দেবীর। এবং তার প্রতি একটা প্রগাঢ় স্নেহ ও ভালবাসা গড়ে ওঠা কানাইয়ের মার পক্ষে অসম্ভব তো নয়ই—অস্বাভাবিকও নয়। সেদিক দিয়েও যদি বিচার করে দেখি তাহলে দেখা যাবে হেমপ্রভা দেবীর কোনরূপ কলঙ্ক রটে বা তাঁর চরিত্রের প্রতি কোনরূপ বাঁকা ইঙ্গিত আসতে পারে, কানাইয়ের মার দ্বারা সেটাও খুব স্বাভাবিক নয়। তৃতীয়তঃ কনাইয়ের মার মত একজন স্ত্রীলোকের ঐভাবে তারই মনিব-পত্নীর সম্পর্কে একটা কল্পিত কাহিনী গড়ে তুলে বলবারই বা কি স্বার্থ থাকতে

পারে! চতুর্থতঃ ঘটনাটা আপনি প্রকাশ না করবার যে হেতু কানাইয়ের মা দর্শিয়েছে, সেটাও আমার চোখে খুবই স্বাভাবিক লেগেছে। এবং শেষ ও পঞ্চম, আচমকা এইভাবে কানাইয়ের মা নিরুদ্দিষ্টা হওয়ায় তার বর্ণিত কাহিনী যে মিথ্যা নয়—কথাটা আরো বেশী করেই আমার কাছে সত্য বলে মনে হচ্ছে। আর একমাত্র সেই কারণেই আজ সকাল থেকে কানাইয়ের মার নিরুদ্দিষ্টা হবার পর থেকে বর্তমান রহস্যের চিন্তাধারাটা আমি একটা নির্দিষ্ট পথে চালনা করতে সক্ষম হয়েছি।

মুগ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গেই কল্যাণী কিরীটীর যুক্তিপূর্ণ আলোচনা শুনছিল। সামান্য একটা ব্যাপারকে সে কত তীক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসা ও যুক্তি দিয়ে বিচার করে ভাবলেও চমৎকৃত হতে হয়।

কিরীটীর কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, রাজহাঁস যেমন দুধ ও জলের মধ্যে থেকে কেবল দুধটাকেই ছেঁকে টেনে বের করে নেয়, রহস্যের তদন্তের ব্যাপারেও আমাদের তেমনি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্য হতে নির্জলা প্রয়োজনীয় সত্যটুকু ছেঁকে নিতে হবে। তবেই না সমস্ত রহস্যটা সহজ হয়ে আসবে! তারপর সহসা কিরীটী নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, কিন্তু এবারে আমাকে একবার থানার দিকে যেতে হবে যে কল্যাণী!

এখন থানায় যাবেন?

হ্যাঁ, বেলা প্রায় আড়াইটে হল, দেখে আসি সন্তোষ-পর্ব কতদূর গড়াল! মৃদু হাস্য সহকারে কথাটা বলতে বলতে কিরীটী চেয়ারটা হতে গাত্রোত্থান করল।

কখন ফিরবেন মিঃ রায়?

বেশী দেরি হবে না। সন্ধ্যার আগেই হয়ত ফিরতে পারবো।

কল্যাণী কক্ষ হতে বের হয়ে যাবার পর কিরীটী সর্বপ্রথমে ঘরের দরজাটায় খিল তুলে দিল। সত্যজিৎ এখন সবিতার ঘরেই আছে, চট্ করে এ ঘরে আসবে না। মাত্র কয়েক দিন আগেকার তার ভবিষ্যৎ বাণীটা মনে পড়ে যায়, বর্তমান এই কেসেরই কথাপ্রসঙ্গে তার কলকাতার বাড়িতে বসে সত্যজিৎকে যে আশঙ্কাটুকু সে দিয়েছিল সবিতা সম্পর্কে, মনের দিক দিয়ে তাদের যে অপূর্ব একটা মিল গড়ে উঠেছে এই কদিনের সান্নিধ্যেই—সেটা আর কারো চোখে না পড়লেও কিরীটীর প্রখর ও সজাগ দৃষ্টিকে এড়াতে পারেনি। দুজনের মিলেছে ভাল। এবং সামান্য এই কদিনের আলাপ-পরিচয়ে কিরীটী বুঝতে পেরেছিল বেশ বলিষ্ঠ চরিত্রের ছেলেটি। বেশীর ভাগ সময়ে সবিতা ও সত্যজিৎ প্রায় একই সঙ্গে থাকে। সত্যজিতের নিরবসর সাহচর্যে পিতার আকস্মিক মৃত্যু-শোকটাও সবিতার কাছে অনেকটা সহনীয় হয়ে এসেছে। একটিবার নন্দনকাননটা ঘুরে দেখে আসতে হবে, সেই কারণেই কিরীটী কাজের দোহাই দিয়েই আপাততঃ কল্যাণীকে বিদায় দিয়েছে ঘর থকে। থানায় যাবার জন্য লক্ষ্মীকান্ত আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেও আপাততঃ তার যাবার ইচ্ছা নেই। অতএব এই হচ্ছে উপযুক্ত অবসর। নায়েব বসন্তবাবু কাছারি-বাড়িতে গিয়েছেন টম্‌টম্ নিয়ে। সবিতা ও সত্যজিৎ উপরে সবিতার ঘরে বিশ্রম্ভালাপে রত। নিত্যানন্দ সান্যাল এখন দিবানিদ্রা দিচ্ছেন। বাড়ির দাসদাসীরাও এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। কিরীটী একটা জামা গায়ে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর হতে বের হয়ে দোতলার শূন্য বারান্দাটার উপরে

এসে দাঁড়াল। দ্বিপ্রহরের নির্জনতায় সমস্ত প্রমোদভবন যেন নিস্তব্ধ হয়ে আছে। কোথায়ও এতটুকু সাড়াশব্দ পর্যন্ত যেন নেই। কার্নিশের ওপরে কবুতরগুলিও নিস্তব্ধ। তথাপি তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে কিরীটী সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো জামার পকেটে খুরপীর মত একটা ছোট্ট অস্ত্র নিয়ে। নিচের অনুরূপ বারান্দাটা অতিক্রম করে কিরীটী বাঁধানো আঙিনাটার উপরে এসে দাঁড়াল। মাথার উপরে সূর্য অনেকটা হেলে পড়েছে, তথাপি আষাঢ়ের তীব্র রৌদ্রদাহ চারিদিক যেন ঝলসে দিচ্ছে। আঙিনা অতিক্রম করে শেষপ্রান্তের একটা খালি অব্যবহার্য ঘরের মধ্যে এসে সে ঢুকল। গতকালই দ্বিপ্রহরের দিকে কিরীটী গোটা বাড়িটাই একবার ঘুরে ঘুরে দেখছিল। ঐ ঘরের মধ্যে একটা দরজা আছে। আঙিনার দরজাটি ছাড়াও যে দরজাপথে প্রমোদভবনের বাইরে নন্দনকাননে যাবার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বাঁধানো পথটার উপরে গিয়ে পড়া যায়। দরজাটা খুলে কিরীটী সেই পথের উপরে এসে দাঁড়াল। ঐ পথ দিয়ে নন্দনকানন যেতে মিনিট পাঁচেকের বেশী লাগে না। নন্দনকাননে পৌঁছে কিরীটী জঙ্গলাকীর্ণ বাগানটার মধ্যে অন্যমনস্ক ভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এবং ঘুরতে ঘুরতেই একসময় কিরীটী পূর্ববর্ণিত সেই পুরাতন পত্রবহুল বকুল বৃক্ষটির নিচে ছায়ায় এসে দাঁড়াল।

এই বকুলবৃক্ষতলই হচ্ছে অকুস্থান।

একটি মৃতদেহ এই বৃক্ষতলে দীর্ঘ উনিশ বৎসর আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল, দ্বিতীয় মৃতদেহটি মাত্র কয়দিন আগে আবিষ্কৃত হয়েছে। সহসা একটা কথা কিরীটীর মনে হয়। এই নন্দনকানন দীর্ঘকাল অব্যবহার্যই পড়ে ছিল। বহুদিন মানুষের পদচিহ্ন এখানে পড়েনি। প্রমোদভবন হতে নন্দনকাননে আসবার যে দুটি দ্বারপথ—তার চেহারা ও অবস্থা দেখলেই বোঝা যায় বহুদিন সে দ্বার দুটি ব্যবহার করা হয় নি। খোলা হয় নি ঐ দ্বার দুটি। মানুষের বর্জন ও অবহেলায় ক্রমে এই নন্দনকানন আগাছা ও জঙ্গলে পরিকীর্ণ হয়ে উঠেছিল। এসব সত্ত্বেও নায়েব বসন্ত সেন এইখানেই বা কেন তার প্রভুর অন্বেষণে এসেছিল? তবে কি এখানে মধ্যে মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী আসতেন? এবং সে সংবাদ কি বসন্ত সেনের অগোচর ছিল না? যদি ধরে নেওয়া যায় আসতেনই, তাহলে সে কথাটা জানা বসন্ত সেনের পক্ষে অন্ততঃ অসম্ভব ছিল না। কিন্তু কেনই বা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী এই নন্দনকাননে আসতেন? তাঁর মৃতা স্ত্রীর কথা স্মরণ করেই কি? দীর্ঘ উনিশ বৎসর ধরে কারো স্মৃতি এমনি করে বহন করা সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হলেও মৃত্যুঞ্জয়-চরিত্রে সেটা সম্ভব ছিল কিনা? মৃত্যুঞ্জয় স্ত্রীকে অবশ্যই ভালবাসতেন, নচেৎ আর দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহই বা করলেন না কেন? সংযমী ও মিতবাক পুরুষ ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় এবং চরিত্রের তাঁর ঐ দিকটা অবশ্য সবিতার কথা হতেই জানা গিয়েছে। স্ত্রীকে ভালবাসলেও তিনি কদাপি ভুলেও একমাত্র কন্যা সবিতার সঙ্গেও মৃতা স্ত্রীর সম্পর্কে আলোচনা করতেন না। কিন্তু কেন? এও কি স্ত্রীর প্রতি গভীর প্রেমেরই একটা লক্ষণ? না তার কোন নিগূঢ় কারণ ছিল? কোন কারণেই তিনি স্ত্রীর সম্পর্কে যাবতীয় আলোচনা সযত্নে ইচ্ছাপূর্বকই এড়িয়ে চলতেন, এমন কি একমাত্র কন্যার নিকটে পর্যন্ত। সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর আরো একটা কথা মনে হয়, উনিশ বৎসর পরে একদা প্রভাতে অসুস্থা স্ত্রীকে সহসা তাঁর

ঘরে শয্যায় না দেখতে পেয়ে কি কারণেই বা স্ত্রী সম্পর্কে তিনি অমন সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন? স্ত্রীকে ঘরে পাওয়া যাচ্ছে না, সেজন্য তাঁর অমন লুকোচুরির করারই বা কি এমন প্রয়োজন ছিল? খোলাখুলি ভাবে ব্যাপারটা সকলের সঙ্গে আলোচনা না করে অমন রহস্যজনক ভাবে রাতারাতি অসুস্থা স্ত্রীকে চিকিৎসার দোহাই দিয়ে কলকাতায় নিয়ে চলে যাবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? কেন সমগ্র ঘটনাকে অমনভাবে সাজানো হলো? লোকে যদি জানতই যে তাঁর স্ত্রীকে বাড়ির মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না, তাতে একটা দুর্নামের বা কলঙ্কের কথা ওঠা হয়ত স্বাভাবিকই ছিল কিন্তু তার চাইতেও কি বেশী কিছু সন্দেহ মৃত্যুঞ্জয়ের মনের মধ্যে ছিল?

অতীত!

অতীতকেই সর্বাগ্রে জানতে হবে এ রহস্যের মীমাংসা করতে হলে। চিন্তিত কিরীটী নন্দনকাননের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এবং ঘুরতে ঘুরতেই একসময় কিরীটী একেবারে জলের ধার ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়।

সহসা পাড়ের একটা জায়গা ওর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। সেখানকার মাটিতে যে লম্বা লম্বা ঘাসগুলো আছে সেগুলো যেন মাটির বুকে একেবারে লেপটে আছে। একটু নিস্তেজ ও শুকনোও যেন। নিঃশব্দে কৌতূহলে এগিয়ে গিয়ে কিরীটী সেখানকার মাটির ঘাসগুলো পরীক্ষা করতে থাকে। নিয়মিত ভাবেই দীর্ঘদিন ধরে কোন ভারী বস্তুবিশেষের চাপে যেন সেখানকার মাটি আর ঘাস থেঁতলে গিয়েছে। কোন ভারী বস্তুর ধাক্কা খেয়ে খেয়ে জায়গাটা যেন চিহ্নিত হয়ে আছে আশপাশের পাড়ের অন্যান্য অংশ হতে।

কিরীটী তার তীক্ষ্ন দৃষ্টি দিয়ে চারিদিক পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। পাড়ের অন্যান্য অংশের চাইতে গাছপালাগুলোও এখানে যেন একটু ঘন সন্নিবেশিত, একটু ছায়াবহুল, একটু অন্ধকার, একটু নির্জন। বড় বড় শাখা-প্রশাখা ও পত্রবহুল দুটো পলাশবৃক্ষ। একটি পলাশবৃক্ষের তলে মস্ত বড় একটা পাথরের মত আছে। আরো একটু এগিয়ে কিরীটী পাথরটার সামনে এসে দাঁড়াল। আশ্চর্যই লাগে কিরীটীর। পাথরটা বেশ পরিচ্ছন্ন। এই জঙ্গলাকীর্ণ মানুষের অগম্য স্থানে অমনি একটি পরিষ্কার পাথর কিরীটীর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। চিন্তিত মনেই কিরীটী পাথরটার উপর এগিয়ে গিয়ে উপবেশন করল।

সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে। প্রখর রৌদ্রের তেজ অত্যন্ত স্তিমিত অবসন্ন। চারিদিকে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে একটা স্নিগ্ধ ছায়া। নিস্তরঙ্গ বিলের জল। সামনের দিকে তাকাল কিরীটী। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে এক দিকে তার পশ্চাতে নন্দনকানন, অন্য দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল জল আর জল। দক্ষিণদিকে অস্পষ্ট পাড়ের রেখা দেখা যায়। বৈকালের ম্রিয়মাণ আলোয় দেখা যায় কেবল একটা ধূসর রেখা। বোঝা যায় ঐদিকটার পাড়ে গাছপালা আছে। এই দ্বীপ থেকে দক্ষিণের ঐ পাড়ের দূরত্ব কতটা হবে? খুব বড়জোর আধ-মাইলটাক হবে হয়ত।

আরো কিছুক্ষণ বাদে কিরীটী উঠে দাঁড়াতে যাবে, সহসা ওর নজরে পড়ল দিনশেষের ম্লান আলোয় ঠিক ওর পায়ের নিচেই ঘাসের উপরে কি যেন একটা চিক্‌ঠিক্ করছে। কৌতূহলভরে কিরীটী ঝুঁকে নিচু হয়ে ঘাসের উপর থেকে হাত বাড়িয়ে বস্তুটা তুলে নিল।

স্বর্ণ-অঙ্গুরীয় একটি।

হাতের পাতার উপরে স্বর্ণ-অঙ্গুরীয়টি রেখে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে লাগল কিরীটী। ওর নজর পড়ল অঙ্গুরীয়ের উপরে একটি নামের আদ্যাক্ষর লেখা, দেবনাগরী অক্ষরে অক্ষরটা হচ্ছে 'ল'। কিরীটী অঙ্গুরীয়টা বুকপকেটের মধ্যে রেখে দিল।

স্থানত্যাগ করে এবারে কিরীটী নন্দনকাননের মধ্যস্থিত বিরাম-কুটীরের দিকে অগ্রসর হলো।

আকাশের আলো যেন আরো ম্লান হয়ে এসেছে। একটা বিষণ্ণ করুণ স্তব্ধতা চারিদিকে যেন জমাট বেঁধে উঠছে ক্রমে ক্রমে। অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা, কেবল মধ্যে মধ্যে চারিপার্শ্বের বৃক্ষাদি হতে এক-আধটা পাতা খসে খসে পড়ছে নিঃশব্দে। সহসা কতকগুলো বিচিত্র পাখীর শব্দে চারিদিক মর্মায়িত হয়ে উঠলো। সন্ধ্যায় নীড়াগতা পাখীর দল।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে বিরাম-কুটীরের বারান্দায় উঠলো এবং কয়েক পা অগ্রসর হতেই অস্পষ্ট আলোয় ওর নজরে পড়ল বারান্দার ধুলোয় অস্পষ্ট কতকগুলো ছোট ছোট পদচিহ্ন।

ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য কিরীটী পকেট হতে শক্তিশালী টর্চ-বাতিটা বের করে বোতাম টিপে টর্চের আলোয় সেই পদচিহ্নগুলি দেখতে লাগল।

ক্ষীণ অস্পষ্ট পদচিহ্ন! স্বভাবতঃ চট করে কারো দৃষ্টিতে পড়বে না। ভিজে কাদামাখা পায়ে কেউ কোনদিন হেঁটে গিয়েছিল। হয়ত তারই অস্পষ্ট চিহ্ন—আজও সামান্য যা বোঝা যাচ্ছে। এবং আরো নজরে পড়ল সেই পদ-চিহ্নগুলোর আশেপাশেই ধুলোর ওপর জুতোর সোলের কতকগুলো ছাপ। ছাপগুলো প্রথম পায়ের ছাপ হতে অনেক স্পষ্ট। বোধ হয় অল্প কিছুদিন আগে মাত্র জুতো পায়ে কেউ এখানে এসেছিল। ক্রেপ সোল দেওয়া জুতোর ছাপ। প্রমোদভবনে কে কি রকম জুতো পায়ে দেয়? কিরীটীর মনে পড়ল, লক্ষ্য করেছে সে একমাত্র সত্যজিৎই ভারী ক্রেপ সোলের জুতো পায়ে দেয়। সত্যজিৎই এসেছিল হয়ত এখানে। মনে মনে হাসে কিরীটী। অনুসন্ধিৎসা আছে ছেলেটির, দেখেশুনে শেষ পর্যন্ত হালে পানি না পেয়েই তার দ্বারস্থ হয়েছে। কিন্তু পাশের ঐ অস্পষ্ট পদচিহ্নগুলো কার? পদচিহ্নের গঠন ও আকার দেখে মনে হয় কোন স্ত্রীলোকেরই পদচিহ্ন ওগুলো। তবে কি সবিতাও এসেছিল সত্যজিতের সঙ্গে এখানে? কিন্তু তাই বা কি করে হবে? যতদূর মনে পড়ে ও লক্ষ্য করেছে, সবিতা তো কদাপি খালি পায়ে চলাফেরা করে না। এমন কি বাড়ির মধ্যে কক্ষেও না। এতদূর সে খালি পায়ে নিশ্চয়ই আসেনি? তবে কার পদচিহ্ন?

ক্রমে এক এক করে কিরীটী বিরাম-কুটীরের সমস্ত কক্ষগুলোই পরীক্ষা করে দেখল। অনুরূপ পদচিহ্ন আর কোথাও সে দেখতে পেল না।

দিনের বেলা আর একবার এসে বিরাম-কুটীরটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

বাইরে সন্ধ্যার কালো ছায়া একটু একটু করে ক্রমে যেন চারিদিক ছেয়ে ফেলছে। ধূসর আলোয় আশেপাশের গাছপালাগুলো অস্পষ্ট ছায়ার মত মনে হয়।

নির্দিষ্ট নিজের কক্ষের দ্বার ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করতেই কিরীটী চমকে উঠল। ইতিমধ্যে এক সময় ভৃত্য এসে কক্ষের আলোটা জেবলে দিয়ে গেলেও আলোর শিখাটা কমানো। মৃদু আলোয় কিরীটীর চোখ পড়ল কক্ষের মধ্যে একটা চেয়ার অধিকার করে বসে আছে সন্তোষ চৌধুরী।

কিরীটীর পদশব্দে সন্তোষ ততক্ষণে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

সন্তোষবাবু?

হ্যাঁ আমি—আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি মিঃ রায়। মৃদু কণ্ঠে সন্তোষ চৌধুরী প্রত্যুত্তর দিল।

কি ব্যাপার? থানা থেকে কখন ফিরলেন? বসুন। বসুন।

সন্তোষ আবার চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল। কিরীটীও অন্য একটা চেয়ার টেনে মুখোমুখি হয়ে বসল।

এই মিনিট কুড়ি হবে—

তারপর কি খবর বলুন? হঠাৎ আপনাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন কেন দারোগা সাহেব?

॥ ১৬ ॥

আর বলেন কেন? মিথ্যে খানিকটা হয়রান করলে কেবল। আমার নামও সান্টা চৌধুরী—কেমন দারোগা বুঝিয়ে দেবো!

প্রমাণটা যখন আপনার কাছেই আছে, সেটা সকালে এখানে দেখিয়ে দিলেই তো পারতেন, সকলের সন্দেহভঞ্জন হয়ে যেত। মিথ্যে তাহলে আর এমনি করে হয়রান হতে হতো না আপনার!

প্রমাণ আর প্রমাণ! এ কি জুলুম মিঃ রায়? এই বাড়িরই ছেলে আমি? সবিতা আর আমার দেহে একই রক্তের ধারা বইছে। আমার কথাই কি প্রমাণ নয়? সবিতার বাবা ও আমার বাবা আপন জাঠতুত খুড়তুত ভাই ছিলেন।

নিশ্চয়ই সেটাই প্রমাণ বৈকি। তবে কি জানেন সন্তোষবাবু, বলতে গেলে একটা যুগ এ বাড়ির সঙ্গে আপনাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। আপনার পিতা-ঠাকুর আপনার জন্মের পূর্বেই এ গৃহ ছেড়ে চলে যান। তারপর দীর্ঘকাল ধরে যতদূর শুনেছি কোন পত্র দেওয়া-নেওয়াও হতো না। এক্ষেত্রে যদি এদের মনে সন্দেহ জেগেই থাকে তাতে করে এদের খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় কি আপনিই বলুন না? কিরীটী মৃদুকণ্ঠে প্রশ্নটা করে সন্তোষ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ও বুড়ো শয়তানটার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু সবিতা? সেও আমাকে কি বিশ্বাস করতে পারছে না?

আপনি তো বুঝতেই পারছেন সন্তোষবাবু, বসন্তবাবুই এখন একদিক দিয়ে সবিতা দেবীর গার্জেন।

গার্জেন! I can tell you Mr. Roy that old শকুনি—ঐ যত অনর্থের মূল। কাকামণির হত্যার আসল ব্যাপারটা আমি কিছুই জানতাম না। আজই থানায় গিয়ে সব শুনলাম—

বিস্মিত প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে কিরীটী তাকাল সন্তোষ চৌধুরীর দিকে,

আপনি জানতেন না? কি জানতেন না? মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী যে নিহত হয়েছেন, জানতেন না?

না তা নয়, তবে কাকার মৃত্যুর আগাগোড়া ব্যাপারটা জানতাম না। জানতাম না যে সত্যসত্যই তাঁকে হত্যা করেছে কেউ।

কিরীটী কিছুক্ষণ সম্মুখে উপবিষ্ট সন্তোষ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কপালে ঈষৎ কুঞ্চন দেখা দেয়।

সন্তোষ চৌধুরী ইতিমধ্যে যেন তার পূর্বোক্ত কথার জের টেনেই বলতে থাকে, আপনাকে আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না মিঃ রায়, সংবাদটা যে কত বড় একটা শক্ দিয়েছে আমাকে! মাত্র বছর দুই আগে বাবা মারা গিয়েছেন। মা মারা গেছেন বছর বারো আগে। লেখাপড়াও বিশেষ কিছু করিনি। বাবার এডেনের স্টীমার পয়েণ্টের কাছে মস্ত বড় একটা স্টেশনারী দোকান ছিল ওখানকারই একজন আফ্রিকান মুসলমান পার্টনারের সঙ্গে। প্রচুর লাভ হতো দোকানটা থেকে। আমিও ঐ দোকানটাতেই কাজ করতাম। হঠাৎ মাস চারেক আগে ঐ পার্টনার আমাকে জানাল দোকানে নাকি আমার কোন শেয়ার নেই। আমি ওখানকার একজন মাইনে-করা কর্মচারী মাত্র। বাবা নাকি মৃত্যুর কিছুদিন আগেই তাঁর দোকানের অর্ধেক শেয়ার ওকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

তা আপনি তো বললেন আপনার বাবা বছর দুই হলো মারা গেছেন—এত দিন সে কথা সে জানায়নি কেন?

বললে পাছে আমি মনে আঘাত পাই সে-কারণেই কোন কথা আমাকে নাকি জানায়নি।

তাহলে এতদিন পরেই বা হঠাৎ জানাল কেন?

দোকানের একটা ব্যাপারে গোলমাল হওয়ায় আমার সঙ্গে তখন সব কথা খুলে আমায় সে বলে।

তারপর?

অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু কোন ফলই হলো না। দীর্ঘ উনিশ-কুড়ি বছরের ব্যাপার। কোন দলিলপত্রও খুঁজে পেলাম না। অবশেষে বাধ্য হয়েই একপ্রকার বিরক্ত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম ভারতবর্ষে।

যদি কিছু মনে না করেন মিঃ চৌধুরী, একটা প্রশ্ন আপনাকে আমি করতে চাই।

নিশ্চয়ই। বলুন না শুনি?

আপনার কাকা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী যে মারা গিয়েছেন এ সংবাদটা আপনি কোথেকে পেলেন?

কিরীটী তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সন্তোষ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিরীটীর প্রশ্নটা সে সন্তোষ চৌধুরীকে বেশ একটু বিব্রত করে তুলেছে তার চোখে-মুখেই সেটা যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাংলা সংবাদপত্রে সংবাদটা বের হয়েছিল। তাতেই আমি জানতে পারি। একটু যেন ইতস্তত করেই কথাগুলো বলে সন্তোষ চৌধুরী।

বাংলা সংবাদপত্রে! এডেনে কি বাংলা সংবাদপত্র যায় নাকি?

হ্যাঁ। মর্মবাণী, বাংলার অর্ধ-সাপ্তাহিক কাগজটা আমাদের বাসায় নিয়মিত যেত। তাতেই সংবাদটা পাই, এখানে রওনা হবার দিন দুই আগে।

সংবাদটায় কি লেখা ছিল?

এই যে দেখুন না কাগজের কাটিংটা, এখনো আমার ব্যাগেই আছে। I kept it. বলতে বলতে সন্তোষ চৌধুরী তার জামার পকেট হতে সুদৃশ্য একটা চামড়ার পার্স বের করে পার্স থেকে সংবাদপত্রের ছোট একটা কাটিং কিরীটীর হাতে তুলে দিল।

কিরীটী ঘরের আলোয় কাটিংটা পড়তে লাগল। স্থানীয় সংবাদদাতা প্রেরিত সংবাদ!—স্থানীয় জমিদার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর প্রাণহীন দেহ গতকল্য বৌরাণীর বিলের মধ্যস্থিত যে দ্বীপটি—যাহাকে স্থানীয় লোকেরা নন্দনকানন বলিয়া জানে সেখানেই পাওয়া গিয়াছে। জমিদারের মৃত্যুর কারণ জানা যায় নাই। রহস্যজনক বলিয়াই মনে হয়। মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী অত্যন্ত অমায়িক ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার জমিদারীর উন্নয়নকল্পে এযাবৎকাল তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ইত্যাদি।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে লেখাটা পড়ে কিরীটী কাগজটা সন্তোষ চৌধুরীকে ফেরত দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, চৌধুরী মশাইয়ের যে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে সে তো এই সংবাদেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি সন্তোষবাবু!

কথাগুলো বলতে বলতেই কিরীটী সন্তোষ চৌধুরীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

এবার প্রত্যুত্তরে কতকটা যেন ইতস্তত করেই সন্তোষ চৌধুরী জবাব দেয়, হ্যাঁ। তবে তাঁর মৃত্যুটা রহস্যজনক বলতে যে ব্যাপারটা এতটা ঘোরাল হত্যা এটাই বুঝে উঠতে পারিনি দারোগাবাবুর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে সব জানতে পারবার পূর্ব পর্যন্ত।

অতঃপর কিরীটী ক্ষণকাল চুপ করেই থাকে। তারপর একসময় মুখ তুলে মৃদুকণ্ঠে বলে, দারোগাবাবুর সঙ্গে আপনার কি কথা হলো?

ভদ্রলোকটিকে বিশেষ সুবিধাজনক বলে মনে হল না মিঃ রায়। কথাবার্তা আমাদের মধ্যে যা কিছু হয়েছে কাকার হত্যা সম্পর্কেই। তাঁর ধারণা হত্যাকারী বাইরেরই কোন লোক। কিন্তু আমিও তাকে বুঝিয়ে দিয়েছি—

কি বুঝিয়ে দিয়েছেন?

আদপেই সেটা সম্ভবপর নয়!

সম্ভবপর নয় কেন?

কেন আবার কি! এ বাড়িরই কেউ না কেউ তাঁকে হত্যা করেছে।

আপনার কি তাই মনে হয় মিঃ চৌধুরী?

নিশ্চয়ই। এ বিষয়ে কোন ভুল নেই। এই গোবিন্দপুরে কে তাঁকে বাইরে থেকে হত্যা করতে আসবে? আর কেনই বা আসবে?

সন্তোষ চৌধুরীর কথায় কিরীটী মৃদু হাস্য করে, কোন জবাব দেয় না।

হাসছেন যে? আপনিই বলুন না, তাঁর সঙ্গে বাইরের লোকের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

ভুলে যাচ্ছেন কেন মিঃ চৌধুরী, তিনি এখানকার জমিদার ছিলেন এবং শুধু তাই নয় তাঁর ব্যবসা ছিল ও বন্ধকী কারবারও কিছু কিছু করতেন। তাঁর পক্ষে বাইরের শত্রু থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। বরং স্বাভাবিকই বলতে পারেন।

কিন্তু আপনি যাই বলুন মিঃ রায়, আমার স্থির বিশ্বাস বাইরের কেউ নয়। এ বাড়ির মধ্যে যারা উপস্থিত ছিল সেরাত্রে তাদের মধ্যেই কেউ না কেউ কাকাকে হত্যা করেছে। তাছাড়া এ বাড়ির পুরাতন ঝি কানাইয়ের মা, নিশ্চয়ই সে মারাত্মক কিছু জানত যার জন্য তাকেও রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হতে হয়েছে এ বাড়ি থেকে গতরাত্রে। আমাদের প্রত্যেকেরই কি এখন কর্তব্য জানেন?

কি? কৌতুকভরা দৃষ্টিতে কিরীটী সন্তোষ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকাল।

নিরুদ্দিষ্টা কানাইয়ের মাকে যেমন করে যে উপায়ে হোক এখন সর্বাগ্রে খুঁজে বের করা।

সন্তোষ চৌধুরীর কথার কোনো জবাব দেয় না কিরীটী। নিঃশব্দে ঠোঁটের মধ্যে পাইপটা চেপে ধরে ধূমপান করতে থাকে। কিছুক্ষণ একটা স্তব্ধতার মধ্যেই অতিবাহিত হয়ে যায়।

একসময় কিরীটী পীড়াদায়ক স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে সন্তোষ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কিন্তু আমাকে আপনার কি বলবার ছিল বলুন তো? যেজন্য এখানে আমার অপেক্ষায় বসেছিলেন?

হ্যাঁ, থানা থেকে আসতে আসতে আমার কি মনে হচ্ছিল জানেন?

কি?

এ হত্যা-রহস্যের একটা মীমাংসা করা প্রয়োজন। এবং আপনি যখন এ কাজে হাত দিয়েছেন তখন আমাদের প্রত্যেকেরই আপনাকে আমাদের সাধ্যমত সাহায্য করা কর্তব্য। আমি তা করবো—সেই কথাটা বলবার জন্য আপনার অপেক্ষায় ছিলাম।

ধন্যবাদ। আপনাদের সকলেরই সাহায্যের আমার প্রয়োজন। মৃদুভাবে কিরীটী জবাব দেয়।

* * *

ঐ রাত্রেই। রাত তখন গোটা এগার হবে। অল্পক্ষণ আগে মাত্র সকলের আহারাদি শেষ হয়েছে। অনুজ্জ্বল টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় দ্বিপ্রহরে কিরীটী যে এ্যালবামটা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর ঘরের ড্রয়ার থেকে এনেছিল তারই পাতাগুলো পুনরায় অন্যমনস্ক ভাবে ওল্টাচ্ছিল। সহসা এমন সময় অতর্কিতে দরজার বাইরে একটা দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। কিরীটী ক্ষিপ্র-হস্তে অ্যালবামটা বুজিয়ে তার শয্যার নিচে একেবারে চালান করে দিল। এবং বিস্মিত দৃষ্টি ভেজানো দরজার দিকে তুলে ধরল।

পরমুহূর্তেই ভেজানো দরজা ঠেলে কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল কল্যাণী।

কল্যাণী দেবী! কি সংবাদ? এত রাত্রে?

কল্যাণীর চোখেমুখে একটা সুস্পষ্ট উত্তেজনার আভাস।

লক্ষ্মীকান্ত সাহা! অস্ফুট কণ্ঠে কল্যাণী উচ্চারণ করল।

বসো। বসো। ঐ চেয়ারটায় বোস। কিরীটী পাশেরই শূন্য চেয়ারটা দেখিয়ে কল্যাণীকে শান্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাল।

কল্যাণী কিন্তু বসে না। চেয়ারের একটা হাতলের উপরে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে মনের উত্তেজনাটা সামলে নেবার চেষ্টা করে মুহূর্তের জন্য। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে, নায়েব মশাইয়ের ঘরে লক্ষ্মীকান্ত সাহা গোপনে বোধ হয় কোন পরামর্শ করছে আর সেই ঘরের বন্ধ দরজার গায়ে আড়ি পেতে

দাঁড়িয়ে শুনছেন সন্তোষবাবু।

কিরীটী কল্যাণী-প্রদত্ত সংবাদটায় কোন গুরুত্বই আরোপ না করে মৃদু হাস্য তরল কণ্ঠে বলে, তাতে হয়েছে কি?

বিস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় কল্যাণী কিরীটীর মুখের দিকে।

কিন্তু আমাদের ব্যাপারটা কি জানালে হতো না মিঃ রায়? কল্যাণীর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগটা অস্পষ্ট থাকে না।

বসো। আজকের রাতে যে সভা বসেছে তার সমস্ত রহস্যই হয়ত আর দু'চার দিনের মধ্যেই সর্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে। এখন তাড়াহুড়ো করতে গেলে হয়ত সব কেঁচে যাবে।

কিরীটীর কথাগুলো কল্যাণী যে ঠিক স্পষ্টভাবে বুঝে উঠতে পারেনি সেটা কিন্তু কিরীটীর আদপেই বুঝতে কষ্ট হয় না কল্যাণীর চোখমুখের দিকে তাকিয়ে।

আমার কথাটা হয়ত ঠিক বুঝতে পারনি কল্যাণী। খুব সম্ভবত ঘটনা-চক্রে নিজের ব্যর্থতায় লক্ষ্মীকান্ত সাহা সাদা কথায় যাকে বলে একেবারে মরীয়া হয়ে উঠেছে। কাজেই যে কোন একটা কাজের দ্বারা নিজের ক্ষমতা জাহির করবে হয়ত সে দু'চার দিনের মধ্যেই। এ হয়ত তারই প্রস্তুতি চলেছে।

বারান্দার দামী ওয়াল-ক্লকটা এমন সময় ঢং করে রাত্রি সাড়ে এগারটা ঘোষণা করল। রাত অনেক হলো কল্যাণী, এবারে তুমি শুতে যাও। আমারও ঘুম পেয়েছে। বলতে বলতে নিদ্রাকাতর হয়েই যেন সে একটা হাই তুলল। এবং কথাটা শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

কল্যাণীকে ঘর ত্যাগ করবার জন্য সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। কল্যাণীও আর দ্বিরুক্তি না করে ঘর হতে বের হয়ে গেল। কিন্তু তার কৌতূহলী মন কিরীটীর কথায় নিবৃত্ত হয় না। পায়ে পায়ে সে নিচের সিঁড়ি বেয়ে এক-তলার দিকে অগ্রসর হয়।

আহারাদির পর নিদ্রা আসছিল না দেখে কল্যাণী প্রমোদভবনের সামনে দক্ষিণাংশে যে ফুলের ছোটখাটো একটা বাগান আছে সেখানে আপন মনে অন্ধকারেই একটা পাথরের বেদীর উপরে বসেছিল। দুপুর থেকেই একটা অসহ্য গুমোট গরমে প্রকৃতি যেন থমথম করছে। বাতাসের লেশমাত্রও নেই। বিকালের দিকে আকাশের এক প্রান্তে একটু মেঘ উঠেছিল কিন্তু সেটাও ঘন চাপ বেঁধে উঠতে পারেনি, অন্ধকার রাত্রির আকাশপটে তারাগুলো কেবল মিটমিট জ্বলছে। কল্যাণী আপন মনে বসে বসে কিরীটীর সঙ্গে দ্বিপ্রহরে যে আলোচনা হয়েছিল তাই ভাবছিল। কে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীকে হত্যা করেছে? আর কেনই বা করেছে? কিরীটীর কথায় মনে হয় স্বার্থটা অর্থ-সম্পর্কিত। অর্থই এ অনর্থের মূল। মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর বিরাট সম্পত্তির প্রকৃতপক্ষে মালিক এখন ঐ সবিতাই। তবে সন্তোষ চৌধুরী তার যে পরিচয় দিয়েছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে এ সম্পত্তির একটা অংশ তারও প্রাপ্য। নায়েব বসন্ত সেন সন্তোষ চৌধুরী তার পরিচয়ের উপযুক্ত প্রমাণ না দেওয়া পর্যন্ত তাকে স্বীকার করে নিতে রাজী নন। স্পষ্টই সেকথা তাকে জানিয়ে দিয়েছেন এখানে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। সন্তোষ চৌধুরীও জোর গলায় জানিয়ে দিয়েছে উপযুক্ত প্রমাণ তার কাছে আছে এবং প্রয়োজন হলে সে প্রমাণ করবেও যে সে

এই বংশেরই সন্তান। সত্য হোক মিথ্যা হোক প্রমাণ তার হাতে নিশ্চয়ই আছে, নচেৎ এভাবে জোর গলায় সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করত না। তা ছাড়া সে কি বোঝে না প্রতারক প্রমাণিত হলে আইনের হাতে কিভাবে লাঞ্ছিত হতে হবে! শুধু তাই নয়, শাস্তিও তাকে পেতে হবে এবং নায়েব বসন্ত সেন সহজে তাকে নিষ্কৃতি দেবে না। সহসা এমন সময় সাইকেলের ঘণ্টি শুনে সচকিত হয়ে কল্যাণী অদূরে গেটের দিকে তাকাল, গেটের আলোয় সাইকেল-আরোহীকে দেখে চিনতে ওর কষ্ট হলো না। দারোগা লক্ষ্মীকান্ত সাহা। লক্ষ্মীকান্ত দারোগা এত রাত্রে এখানে! সকালেই তো ভদ্রলোক এখানে এসে-ছিলেন এবং যাবার সময় সঙ্গে করে সন্তোষ চৌধুরীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যার কিছু আগে সন্তোষ চৌধুরী ফিরে এসেছে ও দেখেছে। এও জানে কল্যাণী, রাত্রের আহার্য সবিতাই বনমালীকে বলে সন্তোষের ঘরে প্রেরণ করে-ছিল। কৌতূহলী হয়ে কল্যাণী দূর থেকেই লক্ষ্মীকান্ত দারোগাকে অনুসরণ করে। লক্ষ্মীকান্ত সাইকেলটা গেটের একপাশে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে সোজা ভিতরে প্রবেশ করে নায়েব বসন্ত সেনের ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন। একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করে কল্যাণী লক্ষ্মীকান্তকে লক্ষ্য করতে লাগল। নায়েবের ঘরের বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতেই অল্প পরে দরজা খুলে খোলা দরজার সামনে দাঁড়ালেন বসন্ত সেন।

কি দারোগা সাহেব! এত রাত্রে?

বসন্ত সেনের প্রশ্নে বন্ধ ওষ্ঠের উপরে ডান হাতের তর্জনী তুলে চাপা গলায় লক্ষ্মীকান্ত বললেন, আস্তে। কথা আছে, উপরে চলুন।

উভয়ের ঘরের মধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর হতে পুনরায় দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

কল্যাণী একটু অবাকই হয়েছিল। প্রথমতঃ এত রাত্রে লক্ষ্মীকান্তের আবির্ভাব এবং তাঁর আগমনের ব্যাপারে ঐভাবে সতর্কতা অবলম্বন। কল্যাণী চিন্তা করবারও অবকাশ পেল না, অতর্কিতে একটা অস্পষ্ট শব্দ ওর শ্রবণে-ন্দ্রিয়ে প্রবেশ করতেই ও ফিরে তাকাল। পাশের ঘরের দরজা খুলে সন্তোষ চৌধুরী পা টিপে টিপে বের হয়ে এলো। কল্যাণী থামের আড়ালে আত্মগোপন করেই লক্ষ্য করতে লাগল সন্তোষ চৌধুরীর গতিবিধি।

সন্তর্পণে পা ফেলে সন্তোষ এগিয়ে এসে দাঁড়াল বসন্ত সেনের ঘরের বন্ধ দরজার গায়ে একেবারে যেন ঘেঁষে। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ সন্তোষ দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। বারান্দার ঝোলানো বাতির আলো সন্তোষের চোখে-মুখে এসে পড়েছে। কপালের রেখাগুলো কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

কল্যাণী বুঝতে পারে সন্তোষ আড়ি পেতে ঘরের ভিতরকার বসন্ত সেন ও লক্ষ্মীকান্তর কথাবার্তা শোনবার চেষ্টা করছে। সহসা কল্যাণীর মনে হয় এ সংবাদটা কিরীটীকে এক্ষুনি দেওয়া প্রয়োজন।

এত রাত্রে লক্ষ্মীকান্তর আবির্ভাব ও সন্তোষ চৌধুরীর আড়ি পেতে ওদের কথা শোনবার চেষ্টা—ব্যাপার দুটোই যেন কেমন একটা সন্দেহের উদ্রেক করে। আজ সকাল হতেই পরের পর ঘটনাগুলো—কানাইয়ের মা গত রাত থেকে সহসা নিরুদ্দিষ্টা হয়ে গেল। লক্ষ্মীকান্ত সাহা এসে সন্তোষ চৌধুরীকে থানায় ধরে নিয়ে গেলেন। ফিরে এলো সে সন্ধ্যার মুখে। তার-পর রাত প্রায় এই এগারোটায় সহসা লক্ষ্মীকান্তর এখানে আবির্ভাব। সন্তোষ

চৌধুরীর ঐ ধরনের সন্দেহজনক গতিবিধি। কল্যাণী আর দেরি করে না। থামের আড়াল থেকে সরে গিয়ে পা টিপে টিপে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

সমস্ত বাড়িটা জুড়ে একটা স্তব্ধতা।

কল্যাণী পা টিপে টিপে সিঁড়ি অতিক্রম করে নিচে নামছে। সিঁড়ির আলোটা অপর্যাপ্ত হওয়ায় সমগ্র সিঁড়ি-পথটা তেমন স্পষ্টভাবে আলোকিত করতে পারছে না। আধো-আলো আধো-ছায়ায় যেন একটা আলোছায়ার রহস্য ঘন হয়ে উঠেছে। নিচে নেমে এসে সোজা কল্যাণী থামের আড়ালে আড়ালে বারান্দা দিয়ে বসন্ত সেনের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু সেখানেও সন্তোষকে দেখতে পেল না। বসন্ত সেনের ঘরের দরজা পূর্বের মতই এখনো বন্ধ।

কে?

মুহূর্তে অন্ধকারেও গলাটা চিনতে কল্যাণীর কষ্ট হয় না। সন্তোষ চৌধুরী।

কে?

আমি কল্যাণী। মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় কল্যাণী।

কল্যাণী দেবী! লাগেনি তো?

না।

এত রাত্রে নিচে যে আপনি? শুতে যাননি এখনো? সন্তোষ প্রশ্ন করে।

না। শুইনি যে এখনো দেখতেই তো পাচ্ছেন। আপনিও তো শোননি এখনো দেখছি? পাল্টা প্রশ্ন করে কল্যাণী।

না। ঘুম আসছিল না তাই অন্ধকার বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

আমিও তাই। মৃদু হাস্য-তরল কণ্ঠে কল্যাণী প্রত্যুত্তর দিল।

কল্যাণীর কণ্ঠস্বরের মধ্যে যে একটা হাসির চাপা আভাস আছে সন্তোষের কিন্তু বুঝতে সেটা কষ্ট হয় না। অজ্ঞাতেই বোধ হয় ভ্রূ দুটো তার একটু কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

অতর্কিতেই সন্তোষ বলে ওঠে, হাসছেন যে?

হাসছি! কই না তো!

সন্তোষ কোন জবাব দেয় না কল্যাণীর কথায়। চুপ করেই থাকে।

ক্ষণপরে সন্তোষ আবার প্রশ্ন করে, আপনি তো সবিতার মামাতো বোন, তাই না?

হ্যাঁ। রক্তের সম্পর্ক না হলেও আত্মীয়তার সম্পর্কে।

তার মানে?

তার মানে আর কি! রক্তের কোন সম্পর্ক নেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে। সবিদির মা আমার বাবার পাতানো বোন ছিলেন, এই আর কি!

ওঃ। একটা স্বস্তির সঙ্গে যেন 'ও' শব্দটি সন্তোষের কণ্ঠে উচ্চারিত হলো।

নিশ্চিন্ত হয়েছেন বোধ হয় মিঃ চৌধুরী, আমি সম্পত্তির একজন দাবীদার নই বলে? ক্ষণপূর্বের সেই হাস্য-তরল কণ্ঠস্বর অন্ধকারে ধ্বনিত হয়ে উঠলো।

আপনি একজন ভাগীদার হলেই বা অসন্তোষের আমার কি কারণ থাকতে পারতো বলুন? সবিতার সম্পত্তির দাবী নিয়ে তো এখানে আমি

আসিনি!

কিন্তু সকলের ধারণা তো তাই।

সকলের ধারণাই যে তাহলে ভুল, এইটুকুই আমি বলতে পারি। আমি এসেছি আমার নিজের দেশের বাড়িতে ফিরে, আমার সাত পুরুষের ভিটাতে। সম্পত্তির ওপরে বা কোন টাকা-পয়সার ওপরে আমার কোন লোভই নেই। এদের কারো সঙ্গে আমার কোন বিবাদও নেই, কেবল আমি আমার ন্যায্য অধিকারে এখানে থাকতে চাই। কিন্তু আশ্চর্য, দেখুন তাও এরা দিতে রাজী নয়!

কল্যাণী সন্তোষের কথার কোন জবাবই দেয় না। জবাব দেবার মত তার কি-ই বা আছে।

সন্তোষ আবার বলতে শুরু করে, এ বাড়ির উপরের তলয় পর্যন্ত নায়েব বসন্ত সেন আমাকে প্রবেশাধিকার দেয়নি। অথচ শুনলেন তো আজ সকালে, বসন্ত সেন নিজের মুখেই স্বীকার করল কাকার উইলে স্পষ্ট লেখা আছে আমি ফিরে এলে আমি আমার ভাগের সম্পত্তি পাবো।

আমাকে এসব কথা বলছেন কেন? এতক্ষণে কোনমতে কল্যাণী কথা কয়টি বলে।

না, না—রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও সবিতার তো আপনি আত্মীয়ের মতই। অতঃপর সহসা যেন আলোচনার মধ্যে একটা পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে সন্তোষ বলে ওঠে, আচ্ছা চলি। রাত অনেক হলো। বলতে বলতে সন্তোষ তার ঘরের দিকে পা বাড়াল।

শয়নকক্ষে প্রবেশ করতে গিয়ে কল্যাণী থমকে দাঁড়াল। পিতা নিত্যানন্দ সান্যাল হাত দুটি পশ্চাতের দিকে নিবন্ধ করে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে নিঃশব্দে কক্ষমধ্যে পায়চারি করছেন।

কল্যাণীর পদশব্দে নিত্যানন্দ কন্যার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে তাকালেন।

মুখখানা থমথম্ করছে—চোখের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট অসন্তোষ।

গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন নিত্যানন্দ, এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে?

নিচে বাগানে বেড়াচ্ছিলাম।

এই মাঝরাত্রে নিচের অন্ধকার বাগানে বেড়াচ্ছিলে! বেড়াবার চমৎকার সময়! কণ্ঠে শ্লেষ।

কল্যাণী পিতার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল।

এ সেই নিত্যানন্দ সান্যাল নন, যিনি সর্ব ব্যাপারেই নির্লিপ্ত নির্বিকার। যিনি শান্ত সহিষ্ণু, অমায়িক।

দুই চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশ ঝক্‌ঝক্ করছে। ক্ষণকাল সেই আক্রোশ-ঝরা দৃষ্টিতে কন্যার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সহসা যেন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বিষোদ্গার করলেন, মিথ্যুক! লজ্জা করলো না তোমার মিথ্যা কথা বলতে! নিচের বারান্দায় থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ঐ বখাটে ছোকরার সঙ্গে গল্প করছিলে না?

কল্যাণী নিশ্চুপ। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। কথার জবাব দিতেও তার ঘৃণা হয়। সমস্ত মন সংকুচিত হয়ে ওঠে।

এত রাত্রে ঐ ছোকরাটার সঙ্গে কি তোমার এমন কথা হচ্ছিল শুনি?

তথাপি কল্যাণী নিরুত্তর। এতটুকু স্বরও ওর কণ্ঠ হতে বের হয় না।

আক্রোশে ও জ্বালায় নিত্যানন্দ চাপা কণ্ঠে আবার তর্জন করে ওঠেন,

কি? চুপ কেন? জবাব দাও?

নিরুত্তর। কল্যাণী এখনো নিরুত্তর।

কল্যাণী! কটু তিক্ত কণ্ঠে আবার তর্জন করে উঠলেন নিত্যানন্দ।

কিছুই আমার বলবার নেই। এতক্ষণে ধীরে সংযত কণ্ঠে কল্যাণী জবাব দেয়।

কিছুই তোমার বলবার নেই?

না।

বেশ। কালই তোমাকে আমি লুধিয়ানায় পাঠিয়ে দেবো। গ্রীষ্মের ছুটিটা তুমি হস্টেলেই থাকবে।

বলতে বলতে নিত্যানন্দ কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

আর নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার মত কল্যাণী দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মধ্যে। প্রচণ্ড একটা অগ্ন্যুৎপাতের মত তখন তার সমস্ত অন্তরটা জ্বলে পুড়ে যেন একেবারে খাক হয়ে যাচ্ছে।

॥ ১৭ ॥

সবিতার ডাকে কিরীটীর নিদ্রাভঙ্গ হলো।

কিরীটী চোখ মেলে দেখল শয্যার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে সবিতা। তার চোখেমুখে সুস্পষ্ট উদ্বেগ।

কি হয়েছে সবিতা দেবী?

আপনি শীগগির একবার নিচে চলুন। লক্ষ্মীকান্তবাবু এসেছেন। নায়েব কাকাকে arrest করে নিয়ে যাচ্ছেন—এ সব কি মিঃ রায়! নায়েব কাকাকে arrest করছেন কেন?

কিরীটী শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে জামাটা গায়ে দিতে দিতে বলে, কেন লক্ষ্মীকান্ত সাহা নায়েব মশাইকে arrest করেছেন আমি কেমন করে তা বলবো বলুন? তা তিনি কিছু বলেননি কেন ওঁকে তিনি arrest করছেন?

না। কেবল বললেন—এ সব পুলিসের সিক্রেট ব্যাপার, সকলের কাছে বলতে তিনি রাজী নন।

এক্ষেত্রে আমিই বা তাহলে কি করতে পারি বলুন? নির্লিপ্তভাবে কিরীটী জবাব দেয়।

কিন্তু আমাদের তো একটা প্রতিবাদ করা উচিত।

পূর্বের মতই পরম নির্বিকার ও শান্তভাবে জামার বোতামগুলো লাগাতে লাগাতে কিরীটী বলল, পুলিসের কোন কাজে প্রতিবাদ করলে তো তারা আপনাকে সমর্থন করবে না সবিতা দেবী!

তাই বলে অন্যায় জুলুম! সবিতার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।

অন্যায় জুলুমই যে তাই বা কি করে আপনি বুঝলেন? চলুন দেখি!

কিরীটী প্রস্তুত হয়ে নিতে নিতে বললে। উভয়ে নিচে বসন্ত সেনের ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

ঘরের মধ্যে দুখানা চেয়ারে মুখোমুখি নিঃশব্দে বসে আছেন বসন্ত সেন, থানার দারোগা লক্ষ্মীকান্ত সাহা আর একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে সত্যজিৎ।

ওদের পদশব্দে বসন্ত সেন ও লক্ষ্মীকান্ত দু'জনেই মুখ তুলে তাকালেন।

নমস্কার লক্ষ্মীকান্তবাবু। ব্যাপার কি! এত সক্কালেই? প্রশ্ন করে হাসি-মুখে কিরীটী আর একটু এগিয়ে যায় ঘরের মধ্যে।

লক্ষ্মীকান্তর মুখখনানা অত্যন্ত গম্ভীর।

গম্ভীর কণ্ঠেই প্রতিনমস্কার জানিয়ে লক্ষ্মীকান্ত বললেন, মিঃ রায় এসেছেন ভালই হলো। সবিতা দেবী, সত্যজিৎবাবু আপনারা অনুগ্রহ করে একটু যদি পাশের ঘরে যান! মিঃ রায়ের সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা ছিল।

কিরীটীই নিঃশব্দে চোখের ইঙ্গিতে সত্যজিৎ ও সবিতাকে কক্ষ ত্যাগ করে যেতে ক্ষণেকের জন্য অনুরোধ জানায়।

দু'জনেই নিঃশব্দে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল কিরীটীর চোখের ইঙ্গিতে।

দরজাটা এবারে ভেজিয়ে দিন মিঃ রায়। পূর্ববৎ গম্ভীর কণ্ঠেই লক্ষ্মী-কান্ত বললেন।

মৃদু হেসে কিরীটী এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল।

বসন্তবাবুকে গতরাত্রেই এসে কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলাম মিঃ রায়। কিন্তু উনি বলছেন আমার সে-সব প্রশ্নের কোন জবাব দিতেই উনি নাকি বাধ্য নন। তাই এক্ষেত্রে একপ্রকার বাধ্য হয়েই আমাকে আইনের প্রয়োগ করতে হচ্ছে।

মিথ্যে কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই লক্ষ্মীকান্তবাবু। আমি প্রস্তুত, আপনি চলুন। শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে সহসা কথা বললেন বসন্ত সেন।

কাল আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে থানায় গিয়ে দেখা করতে বলেছিলেন, কিন্তু দুপুরের দিক থেকেই শরীরটা কেমন ভাল লাগছিল না তাই—

গেলে ভালই করতেন মিঃ রায়। অনেক interesting কথা শুনতে পারতেন।

তাই নাকি? কি রকম? কাল রাত্রে যখন আপনি এসেছিলেন টের পেয়েছিলাম কিন্তু ভাবলাম বসন্তবাবুর সঙ্গে হয়ত কোন গোপনীয় জরুরী কথা আছে তাই আর বিরক্ত করিনি আপনাকে।

হ্যাঁ, আপনি হয়ত শুনে সুখীই হবেন, কাল সন্তোষবাবুকে থানায় নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অনেক রহস্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে যার ফলে সম্পূর্ণ কেসটাই একটা definite shape নিয়েছে। প্রথমে অবশ্য ভদ্রলোক মুখ খুলতে চাননি কিন্তু জানেন তো মুখ খুলবার দাওয়াই আমাদের জানা আছে—চাপে পড়ে সব প্রশ্নের জবাব শেষ পর্যন্ত দিয়েছেন।

বটে! কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায় কিরীটী লক্ষ্মীকান্তর সাফল্যে গদগদ মুখের দিকে।

সহসা এমন সময় বসন্ত সেন তাঁর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কথা বললেন, কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, সন্তোষবাবু যে সব চিঠি আপনাকে দেখিয়েছেন একটাও তার সত্য নয়; কারণ গত চব্বিশ বৎসর একখানা চিঠিও মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী কাউকে লেখেননি। এমন কি তাঁর মেয়েকেও তিনি নিজহাতে চিঠি কোনদিন লেখেননি। চিঠি যা লেখা হতো তাঁরই জবানীতে আমার হাত দিয়েই।

প্রশ্ন করল এবারে কিরীটীই, কেন তিনি নিজহাতে চিঠি লিখতেন না তার কোন কারণ ছিল কি?

হ্যাঁ ছিল।

সেই কারণটাই তো আপনার কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম। লক্ষ্মীকান্ত বলে ওঠেন, কিন্তু উনি বলতে রাজী নন।

রাজী নন কেন? প্রশ্নটা কিরীটীই করে।

না, রাজী নই। আপনাদের বর্তমান তদন্তের ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের ও প্রশ্নের জবাবের কোন সংস্পর্শ আছে বলেই আমি মনে করি না। তাছাড়া মৃত্যুঞ্জয়ের হাতের লেখা আমার যথেষ্ট পরিচিত, চিঠিগুলো আমাকে দেখালেই আমি দপ্তরের খাতাপত্রে তাঁর হাতের যে সব লেখা আছে তার সঙ্গে মিলিয়ে সত্য মিথ্যা প্রমাণ করে দিতে পারবো, কিন্তু দারোগা সাহেব চিঠিগুলো আমাকে দেখাতেই রাজী নন!

কিরীটী বসন্ত সেনের কথায় লক্ষ্মীকান্ত সাহার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল এবং বললে, সে চিঠিগুলো আপনার কাছেই আছে বুঝি মিঃ সাহা?

হ্যাঁ। আসবেন আপনি থানায়, দেখাবো'খন।

চিঠিগুলো সেন মশাইকে দেখাতে আপনার সত্যিই আপত্তি আছে নাকি?

বর্তমানে আছে, কারণ আপনি চিঠিগুলো পড়লেই জানতে পারবেন।

হুঁ। শুধু এই জন্যই কি আপনি ওঁকে arrest করেছেন?

না, আরো দুটো কারণ আছে।

আরো দুটো কারণ আছে?

হুঁ, যে রাত্রে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী নিহত হন সে রাত্রে উনি এখানে উপস্থিত ছিলেন না, ওঁর জবানবন্দীতে বলেছিলেন উনি—

না, ছিলাম না তাই বলেছি। মহাল দেখতে গিয়েছিলাম, রাত প্রায় গোটা তিনেকের সময় ফিরি। জবাবটা দিলেন বসন্ত সেন।

কিন্তু সত্যি কথা তো তা নয়। আপনি সেদিন আদপেই এ বাড়ি হতে বের হননি। নিজের ঘরের মধ্যেই ছিলেন।

কথাটা এবারে বলেছিল কিরীটী।

কিরীটীর কথায় যুগপৎ চমকে দুজনেই বসন্ত সেন ও লক্ষ্মীকান্ত সাহা ওর মুখের দিকে বিস্মিত প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকায়।

সে কি! তবে যে আপনি গতরাত্রে বলছিলেন জমিদারী সংক্রান্ত কোন একটা বিশেষ গোপনীয় ব্যাপারেই কোন একটা মহালে আপনাকে যেতে হয়েছিল এবং গোপনীয় বলেই মহালের নামটা আপনি বলবেন না? তীক্ষ্নকণ্ঠে এবারে বসন্ত সেনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা শেষ করলেন সাহা, হুঁ! আসলে আপনি তাহলে এ বাড়ী ছেড়ে সেদিন কোথায়ও যাননি!

কিরীটীর কথায় ও লক্ষ্মীকান্ত সাহার চ্যালেঞ্জে নায়েব বসন্ত সেন যেন একেবারে পাথরের মতই স্তব্ধ অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

মুখখানাও যেন ঐ মুহূর্তে তাঁর মনে হচ্ছিল একেবারে পাথরেই গড়া ভাবলেশহীন। ক্রোধ, বিরক্তি, হতাশা, ব্যথা, লজ্জা, অপমান কোন কিছুই যেন প্রকাশ পাচ্ছে না মুখের স্থির অচঞ্চল রেখাগুলোতে।

নায়েব মশাই, এ কথা তাহলে সত্যি? পুনরায় প্রশ্ন করলেন লক্ষ্মীকান্ত সাহা।

জানি না। আপনাদের কোন প্রশ্নেরই জবাব দিতে রাজী নই লক্ষ্মীকান্তবাবু। আপনি আমাকে arrest করতে এসেছেন করুন। কোথায় আমাকে নিয়ে যেতে চান, চলুন আমি প্রস্তুত। নিরতিশয় একটা তাচ্ছিল্যের সুরই যেন

নায়েব বসন্ত সেনের কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ল।

আপনি তাহলে জবাব দেবেন না? আবার প্রশ্ন করলেন লক্ষ্মীকান্ত।

না।

এখন মনে হচ্ছে কানাইয়ের মার অন্তর্ধানের ব্যাপারেও আপনি লিপ্ত আছেন। লক্ষ্মীকান্ত বললেন।

যেমন আপনার অভিরুচি ভাবতে পারেন। মিথ্যে আপনি সময় নষ্ট করছেন দারোগা সাহেব। আমার মুখ থেকে আপনি একটি প্রশ্নেরও জবাব পাবেন না।

লগুড়াহত জানোয়ারের মতই এবারে যেন লক্ষ্মীকান্ত সাহা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং তীক্ষ্ম কর্কশ কণ্ঠে বলেন, কিন্তু আমিও লক্ষ্মীকান্ত সাহা। আপনাদের মত বহু নায়েবকেই আমার দেখা আছে। চলুন আগে থানায়, তারপর দেখা যাবে আপনাদের মত ঘুঘু চরিত্রের লোককে—

দারোগা লক্ষ্মীকান্তর কথাটা শেষ হল না, মুহূর্তে বাঘের মতই থাবা মেরে রুদ্রার্জুন বসন্ত কেন লক্ষ্মীকান্তর বক্তব্যটা অর্ধপথে থামিয়ে দিলেন লক্ষ্মীকান্ত! ভুলো না এটা বসন্ত সেনের এলাকা। এখুনি যদি তোমাকে জ্যান্ত হাত পা বেঁধে সামনের ঐ বৌরাণীর বিলের জলের ঠাণ্ডা পাঁকের নিচে পুঁতে ফেলি তোমার ফিরিঙ্গি বাপঠাকুদ্দার সাধ্যও হবে না তোমার লাশ খুঁজে বের করে! এ তোমার থানার চৌহদ্দী নয়—ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখনি এখনো।

ঠাণ্ডা বারুদ-স্তূপ যেন সহসা একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে ফেটে দাবানলের মতই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে।

শান্ত ভদ্র বসন্ত সেনের মধ্যে যে এমন একটি রুদ্র ভয়ঙ্কর রূপ ভস্মাচ্ছাদিত হয়ে চাপা পড়েছিল ভাবতেও যেন বিস্ময় লাগে।

বসন্ত সেনের এ যেন এক অভিনব রূপ।

বৃদ্ধের সমস্ত শরীরটা যেন একটা নিষ্কাশিত তীক্ষ্ম ধারালো অসির মত ঋজু হয়ে উঠেছে। ক্ষণপূর্বের পাথরের মতই স্থির অচঞ্চল মুখখানি যেন মুহূর্তে রুদ্রাগ্নির মতই ধক্‌ধক্ করে জ্বলে উঠেছে।

এককালে জমিদারের নায়েবদের যে দোর্দণ্ডপ্রতাপের কথা শোনা যেত এ যেন সেই পুরাতন দিনেরই নায়েব। সরকারী কোন আইন বা নীতির এরা ধার ধারে না, এদের আইন এদের কাছে। অশিষ্ট অবাধ্য প্রজাকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে এদেরই পূর্ব-পুরুষেরা হয়ত একদা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে গুপ্তকক্ষে জীবন্ত কবর দিত। রাতারাতি খুন করে লাশ মাটির নীচে পুঁতে ফেলত, নয়তো পুষ্করিণীর তলায় গলায় পাথর বেঁধে ডুবিয়ে দিত। অথবা জ্যান্ত দেওয়ালের সঙ্গে ইট দিয়ে রাতারাতি গেঁথে ফেলত।

লক্ষ্মীকান্ত নিজেও বোধ হয় এতটা আশা করেননি। মুহূর্তের জন্য তাই বোধ হয় তিনিও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পাথরের মতই নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকেন এবং হিংস্র জানোয়ারকে নিয়ে ঘাঁটানো আর বিবেচনার কাজ হবে না ভেবেই নিজের রূপ এবারে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, জমিদার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর হত্যাপরাধের সন্দেহে আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করছি বসন্তবাবু—

লক্ষ্মীকান্তর মুখের কথা শেষ হতেই সহসা যেন বাজের মত তীক্ষ্ম উচ্চ

কণ্ঠে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন বসন্ত সেন।

কিরীটী লক্ষ্মীকান্ত দুজনেই চমকে ওঁর প্রচণ্ড হাসির শব্দে ওঁর মুখের দিকে তাকায়। বসন্ত সেন হাসছেন, হাঃ! হাঃ! হাঃ!

কেউই ওঁর হাসিতে বাধা দেয় না।

হাসি থামিয়ে বসন্ত সেন ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে বলেন, এই বিদ্যা আর বুদ্ধিরই এত দম্ভ! তুমি বের করবে মৃত্যুঞ্জয়ের হত্যাকারীকে! এর চাইতে সে আত্মহত্যা করে মরেছে বা অদৃশ্য কোন আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছে, যে রিপোর্ট দিয়েছিলে সেই যে ছিল ভাল। মিথ্যা তোমার কাদা ঘেঁটে নোংরা হওয়াই সার হবে লক্ষ্মীকান্তবাবু। কিন্তু বড় গলায় তো আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলেছ, শেষ পর্যন্ত তোমার আইন দিয়ে আমাকে বেঁধে রাখতে পারবে তো দারোগাবাবু! যাগ গে। মরুক গে। চল কোথায় যেতে হবে—

বসন্ত সেনের উচ্চারিত প্রতিটি কথা যেন নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের ছুঁচ বিঁধিয়ে দেয় দারোগা লক্ষ্মীকান্তর সর্বদেহে।

লজ্জায় অপমানে আক্রোশে তিনি যেন ফুলতে লাগলেন। রোষকষায়িত লোচনে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল বসন্ত সেনের মুখের দিকে। মুখ দিয়ে তাঁর কোন বাক্যও সরে না।

হাতকড়াও দেবে নাকি! না এমনিই গেলে চলবে দারোগাবাবু? আবার প্রশ্ন করলেন বসন্ত সেন।

না, এমনি চলুন আমার সঙ্গে—

কিন্তু যদি রাস্তায় তোমাকে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাই, ধরে থাকতে পারবে তো? ঐ তো তোমার চেহারা! আমার শক্তির খবর জান তো! বৃদ্ধ হলেও এখনও লাঠি হাতে নিয়ে যদি দাঁড়াই, তুমি তোমার থানার সমস্ত চেলা-চামুণ্ডাদের নিয়েও সামনে আমার দাঁড়াতে পারবে না।

লক্ষ্মীকান্ত বসন্ত সেনের কথার কোন জবাবই দেন না।

এবারে মৃদু হেসে বসন্ত সেন বললেন, না, ভয় নেই চল। দেখেই আসা যাক তোমার আইনের দৌড়টা কত দূর!

অগ্রে অগ্রে বসন্ত সেন ও পশ্চাতে লক্ষ্মীকান্ত সাহা কক্ষের বন্ধ দরজাটার দিকে অগ্রসর হলেন। দরজার কাছবরাবর গিয়ে হঠাৎ বসন্ত সেন ঘুরে দাঁড়িয়ে কিরীটীকে সম্বোধন করে বললেন, চললাম কিরীটীবাবু, মৃত্যুঞ্জয়ের সলিসিটার রায় অ্যান্ড বোসের অতীনলাল কাল-পরশুর মধ্যে হয়ত এসে পড়বেন। তাঁকে আসতে লিখেছিলাম। মৃত্যুঞ্জয়ের উইলের ব্যাপারে মিঃ বোস আসছেন, সান্যাল মশাই রইলেন, সত্যজিৎ রইলো, সকলের সামনে যেন উইলটা পড়া হয়। সম্পত্তির প্রবেট নিতে হবে, মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরে সিন্দুকে নগদ টাকা আছে। চাবিটা আমি সবি মার হাতে গতকালই দিয়ে দিয়েছি।

কিরীটী এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। নির্বাক শ্রোতা হয়েই সমগ্র দৃশ্যটা আগাগোড়া উপভোগ করছিল। এখনও চুপ করেই রইল।

হঠাৎ অতঃপর লক্ষ্মীকান্তের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বসন্ত সেন বললেন, এক মিনিট দারোগা সাহেব। তুমি একটু বাইরে যাও, আমি কিরীটীবাবুর সঙ্গে কথা বলে এক্ষুনি আসছি।

নিঃশব্দে লক্ষ্মীকান্ত দ্বিতীয় আর বাক্যব্যয় না করে দরজাটা খুলে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

নিঃশব্দে বসন্ত সেন দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন সম্মুখে দণ্ডায়মান কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

কিরীটীবাবু!

বলুন।

আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

বলুন!

এ ব্যাপারে আর আপনি থাকবেন না। এখান থেকে চলে যান। আপনার পুরো ফিসই আমি দেবো। সবিতা আর সত্যজিৎ ওরা বুঝতে পারবে না—

কিন্তু—

তাছাড়া ভেবে দেখুন, কি হবে আর মিথ্যা কাদা ঘাঁটাঘাঁটি করে—

আপনি কি তাই মনে করেন? তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে কথা কয়টি বলে কিরীটী তাকাল বসন্ত সেনের মুখের দিকে।

হ্যাঁ, তাই মনে করি। এটুকু অন্ততঃ বুঝবার আমার শক্তি আছে কিরীটী-বাবু এবং পেরেছিও। আপনি লক্ষ্মীকান্ত নন, তাই আবার অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনি ফিরে যান। বরং আপনার প্রাপ্যের চাইতে বেশীই কিছু—

ভুল করছেন আপনি সেন মশাই। বুঝতেই যখন কিছুটা আপনি আমাকে পেরেছেন, এটুকুও আপনার বোঝা উচিত ছিল, টাকার লোভ দেখিয়ে আমাকে আপনি নিরস্ত করতে পারবেন না। তাছাড়া আরো একটা কথা, আমাকে এ কেসে নিযুক্ত করেছেন আপনি নন—সবিতা দেবী। তিনি যদি এখন আমাকে যেতে বলেন আমি সানন্দে এই মুহূর্তে চলে যাবো, অন্যথায়—

তাহলে আপনি স্থিরপ্রতিজ্ঞই?

কথা যখন দিয়েছি, একটা মীমাংসা না করা পর্যন্ত আমার যাবার উপায় নেই সেন মশাই। আমাকে ভুল বুঝবেন না। সত্য-সন্ধানী আমি—সত্য-বন্ধ!

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বসন্ত সেন কিরীটীর চোখের প্রতি চোখ রেখে।

শাণিত তরবারির মতই দুজোড়া চোখের দৃষ্টি পরস্পর যেন পরস্পরের প্রতি নিবদ্ধ হয়ে আছে।

বেশ তবে তাই হোক। নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বসন্ত সেন জবাব দিলেন।

একটা কথার জবাব আপনার কাছে পেতে পারি কি সেন মশাই? হঠাৎ কিরীটী প্রশ্ন করে।

কি?

এমন কোন স্ত্রীলোককে আপনি কি জানেন, যিনি মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর বিশেষ পরিচিতাই হয়ত ছিলেন, যার নামের আদ্যাক্ষর হয়ত ছিল 'ল'—

কিরীটীর কথা শুনে চকিতের জন্যই যেন বসন্ত সেনের চোখের তারা দুটো জ্বলে উঠে আবার স্বাভাবিক হয়ে এল! শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন বসন্ত সেন, না—

হুঁ। আর একটি কথা—

বলুন!

বোরাণীর বিলে নৌবিহারের জন্য এদের কোন নৌকা বা বোট ছিল কি?

না। জবাবটা বসন্ত সেন এবারে যেন একটু ইতস্তত করে দেন।

আপনার ঠিক স্মরণ আছে?

আছে বৈকি।

হ্যাঁ, একটা কথা গতকাল আপনাকে বলা হয়নি, কানাইয়ের মার ঘরের মেঝেতে কতকগুলো অস্পষ্ট ক্রেপ-সোলের জুতোর ছাপ দেখেছিলাম। এবং ঠিক অনুরূপ জুতোর ছাপ নন্দনকাননের মধ্যস্থিত বিরাম-কুটীরের ঘরের মেঝেতেও দেখেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম জুতোর ছাপগুলো বুঝি সত্যজিৎ-বাবুরই, পরে বুঝেছি তা নয়—

আমি তো ক্রেপ-সোল দেওয়া জুতো পরি না রায় মশাই! শান্তকণ্ঠে জবাব দেন বসন্ত সেন।

জানি। কিরীটীর ওষ্ঠপ্রান্তে বঙ্কিম হাসির একটা রেখা জেগে ওঠে এবং ধীরকণ্ঠে বলে, আচ্ছা নমস্কার। প্রয়োজন হলে আমাকে সংবাদ দিতে পারেন সেন মশাই। কারণ—

কিরীটীর কথাটা নায়েব বসন্ত সেন শেষ করতে দিলেন না, প্রশান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, তার প্রয়োজন হবে না। ধন্যবাদ। নমস্কার।

অদ্ভুত দৃঢ়তার সঙ্গে অতঃপর ঘাড় উঁচু করে দরজাটা খুলে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বসন্ত সেন কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

কিরীটী নির্নিমেষে বসন্ত সেনের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল।

ওষ্ঠপ্রান্তে আবার তার সেই ক্ষণপূর্বের বঙ্কিম হাসি জেগে ওঠে।

॥ ১৮ ॥

পর পর দুটি প্রভাত দুটি আকস্মিক ঘটনা-বিপর্যয়ে প্রমোদভবনের উপরে যেন প্রচণ্ড আঘাত হেনে গেল।

কানাইয়ের মার অকস্মাৎ নিরুদ্দিষ্টা হওয়া, নায়েব বসন্ত সেনের লক্ষ্মীকান্ত কর্তৃক গ্রেপ্তার হওয়া।

বসন্ত সেন কিন্তু তাঁকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারটা আদৌ একটা গুরুতর ঘটনা বলে ধরেননি। ঘর হতে বের হয়ে বারান্দায় দণ্ডায়মান সত্যজিৎ ও সবিতার ব্যাকুল সপ্রশ্ন দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হলো।

সত্যজিৎ সবিতা দুজনেই যেন একটু বিস্মিত হয়। বসন্ত সেনের মুখের কোথাও উদ্বেগের বা চাঞ্চল্যের বিন্দুমাত্র চিহ্নও নেই যেন। প্রশান্ত মুখ এবং ওষ্ঠপ্রান্তে নিশ্চিন্ত একটি হাসির স্পষ্ট আভাস। কোন বাক্যবিনিময়ই হলো না পরস্পরের মধ্যে, কেবল নির্বাক দৃষ্টির মধ্যে দিয়েই যেন বসন্ত সেন বুঝিয়ে দিলেন চিন্তার উদ্বেগের কোন কারণ নেই।

অন্দর অতিক্রম করে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই বসন্ত সেন হাঁক দিয়ে দারোয়ানকে ডাকলেন।

ভোজপুরী দারোয়ান সেলাম ঠুকে এসে দাঁড়াল, জি!

লছমনকে বোলনা টমটম তৈয়ার করকে তুরন্ত ইধার আনেকে লিয়ে!

নায়েবের হুকুমে দারোয়ান সহিস লছমনকে সংবাদ দিতে চলে গেল।

অদূরে গেটের পাশে দারোগার ঘোড়াটা বাঁধা ছিল, সেদিকে তাকিয়ে বসন্ত সেন বললেন, আপনার সঙ্গে ঘোড়া আছে দেখছি দারোগাবাবু—আপনি বরং তাহলে এগোন, আমি টম্‌টমে থানায় আসছি।

আমিও আপনার সঙ্গেই টম্‌টমে যাবো'খন—

কিন্তু আপনার ঘোড়া?

সে থানায় গিয়ে একজন সেপাইকে পাঠিয়ে দিলেই হবে।

দারোগার কথায় বসন্ত সেন মৃদু একটু হাসলেন। বুঝতে পারছিলেন, অতঃপর লক্ষ্মীকান্ত সাহার আর সাহসে কুলোচ্ছে না তাঁকে একলা ছেড়ে যেতে।

বস্তুতঃ কতকটা তাই বটে। বসন্ত সেনকে ঘাঁটাবারও এখানে এই বাড়িতে দাঁড়িয়ে যেমন আর তাঁর সাহস ছিল না তেমনি তাঁকে এখানে একা ছেড়ে থানায় ফিরে যেতেও ভরসা পাচ্ছিলেন না। যেমন করে হোক যত শীঘ্র সম্ভব এখন বসন্ত সেনকে নিয়ে থানায় নিজের এলাকার মধ্যে গিয়ে তুলবার জন্য মনে মনে সত্যিই তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন।

ক্ষণপূর্বে কক্ষের মধ্যে বসন্ত সেনের উচ্চারিত তাঁর সদম্ভোক্তিগুলো লজ্জায় অপমানে আক্রোশে যেন তাঁর ভিতরটা পুড়িয়ে খাক্ করে দিচ্ছিল, কিন্তু এখানে একাকী অসহায়ভাবে তাঁরই চৌহদ্দির মধ্যে দাঁড়িয়ে হুমকি ছাড়বার মত দুঃসাহস আর তাঁর ছিল না।

কিন্তু তার কোন প্রয়োজন নেই দারোগাবাবু! স্বেচ্ছায় যখন আপনার হাতে নিজেকে ধরা দিতে চলেছিই, আর যাই হোক বসন্ত সেন কথার খেলাপ করবে না। বেশ, তাহলে না হয় একটু অপেক্ষাই করুন—টম্‌টম্‌টা আসুক।

বারান্দার উপরেই দুজনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে লছমন টম্‌টম জুতে নিয়ে এল।

বসন্ত সেন এগিয়ে যেতেই লছমন নায়েবের হাতে লাগামটা তুলে দিল সসম্ভ্রমে।

বসন্ত সেন বরাবরই টম্‌টম্ নিজেই চালান।

পাদানীর উপরে পা দিয়ে টম্‌টমে উঠে বসে লাগামটা জুত করে ধরে চাবুকটা হাতে নিচ্ছেন বসন্ত সেন, লক্ষ্মীকান্ত এগিয়ে এলেন পাদানীর দিকে টম্‌টমে উঠে বসবার জন্য। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে যেন একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল। চকিতে ঘোড়াটার লাগামটা টেনে উদ্ধত ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে লক্ষ্মীকান্তকে সম্বোধন করে বসন্ত সেন বললেন, উহুঁ! এ টম্‌টমে নয়, এ ঘোড়াটা নতুন, বড় তেজী। কখন কি বিপদ ঘটায় বলা যায় না, আপনি আপনার ঘোড়ায় চেপেই বরং আমার পিছনে পিছনে আসুন—বলতে বলতে হাতের মুঠোয় ধরা চাবুকটা শূন্যে আন্দোলিত হয়ে হুস্ করে একটা শব্দ তুলতেই শিক্ষিত তেজী ঘোড়া নক্ষত্রবেগে ছুটে যেন টম্‌টমটাকে টেনে নিয়ে সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হতভম্ব লক্ষ্মীকান্ত স্তব্ধ হয়ে গেটের সামনে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সমস্ত অন্তরটা তখন যেন একটা ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতের মত জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল তাঁর।

দাঁতে দাঁত চেপে অদূরে গাছের সঙ্গে বাঁধা রোগ-জীর্ণ ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রচণ্ড আক্রোশে সমস্ত শরীর যেন তাঁর কাঁপছে, পা টলছে।

ঘোড়াটার উপরে উঠতে গিয়ে দুদুবার উঠতে পারলেন না লক্ষ্মীকান্ত। এখনো অশ্ব ব্যাপারে লক্ষ্মীকান্ত খুব বেশী রপ্ত হননি।

তিনবারের বার উঠে বসলেন তিনি ঘোড়ার পিঠে।

ধীরে ধীরে দুলকি চালে ঘোড়া চলতে লাগল। রাস্তায় পড়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কেবল একটা ধুলোর চক্র সম্মুখের পথটাকে ধূম্রজালের মত আচ্ছন্ন করে আছে—টমটমের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

* * *

কক্ষের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিরীটী। ক্ষণপূর্বের হাসির যে বঙ্কিম রেখাটি ওষ্ঠপ্রান্তে তার দেখা দিয়েছিল সেটা একসময় মিলিয়ে গিয়েছে, কপালের রেখাগুলো কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ পদশব্দে চোখ তুলে তাকাতেই নজরে পড়ল কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করছে সত্যজিৎ ও সবিতা।

আসুন সত্যজিৎবাবু, সবিতা দেবী! ওরা চলে গেলেন?

হ্যাঁ, নায়েব টম্‌টমে গেলেন আগে—পিছনে গেলেন দারোগাবাবু। জবাব দিল সত্যজিৎ।

তাই নাকি! কিরীটীর ওষ্ঠপ্রান্তে আবার সেই বিচিত্র হাসি জেগে ওঠে, বেশ শক্ত পাল্লায় পড়েছেন এবারে আমাদের সাহা মশাই!

কিন্তু এ অত্যন্ত অন্যায় জুলুম আপনাকে আমি বলতে পারি কিরীটী-বাবু! কখনই হতে পারে না, নায়েব কাকা বাবার কোনপ্রকার অনিষ্ট চিন্তা করতেই পারেন না। কেউ বললেও আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আবেগে উত্তেজনায় সবিতার কণ্ঠস্বরটা কাঁপছিল।

আপনি ব্যস্ত হবেন না সবিতা দেবী। স্নিগ্ধ আশ্বাস-ভরা কণ্ঠে কিরীটী বলে, বসন্তবাবু দোষী কি নির্দোষী সে বিচার করতে যাওয়া এখন হয়ত আমাদের কারো পক্ষেই বিবেচনার কাজ হবে না, আইনের জোর দেখিয়ে যে লক্ষ্মীকান্ত ওঁকে ধরে নিয়ে গেলেন সেটার মীমাংসার অবশ্য অন্য পথও ছিল। একেবারে সটান হাজতে নিয়ে গিয়ে না পুরলেও চলতো।

কিন্তু কারণটা কি মিঃ রায়? প্রশ্ন করলো এবারে সত্যজিৎ।

বসন্তবাবু তাঁর জবানবন্দীতে বলেছিলেন যে রাত্রে মৃত্যুঞ্জয়বাবু নিহত হন সেদিন সকালের দিকেই নাকি একটা মহাল পরিদর্শনে গিয়ে ফিরেছিলেন তিনি ঐদিন রাত দুটোর পরে। কিন্তু—

কিন্তু—

কিন্তু আদপেই তিনি ঐদিন কোন মহালে যাননি। নিজের ঘরেই ছিলেন। কথাটা বললে কিরীটী।

সে কি!

হ্যাঁ, তবে দারোগাবাবুও সে-কথা জানতেন না এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত। তিনি মানে আমাদের দরোগাবাবু ওঁকে পীড়াপীড়ি করছিলেন জানবার জন্য কোন্ মহাল পরিদর্শনে উনি গিয়েছিলেন, কিন্তু বসন্তবাবু সেকথা বলতে রাজী নন। পরে অবশ্য আমার কথায় ব্যাপারটা যেন আরো ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু আপনার কথাই কি সত্যি মিঃ রায়? কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলে এবারে সবিতা।

হ্যাঁ সবিতা দেবী।

সে কথা আপনি জানলেন কি করে মিঃ রায়?

কানাইয়ের মার মুখে—

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হলো।

কানাইয়ের মার মুখে? প্রশ্ন করলে সত্যজিৎ।

হ্যাঁ।

কিন্তু আপনার সঙ্গে তার কথা হলো কখন? আবার সত্যজিৎ প্রশ্ন করে।

যে রাত্রে সে নিরুদ্দিষ্টা হয়, মানে পরশু রাত্রে শুতে যাবার আগে সিঁড়িতে কানাইয়ের মার সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাকে আমার ঘরে ডেকে এনে কয়েকটা প্রশ্ন করি। তখনই ওই কথাটা নায়েব সম্পর্কে জানতে পারি। প্রথমটায় সে বলতে রাজী হয়নি, পরে চাপ দিয়ে কথার মারপ্যাঁচে ফেলে সত্য কথাটা বের করে নিয়েছিলাম।

তবে কি সত্যিই কানাইয়ের মা ওঁর—, সবিতার দিকে তাকিয়ে বললে, বাবার মৃত্যুর আসল ঘটনাটা জানত নাকি?

না।

ক্ষমা করবেন মিঃ রায়, কানাইয়ের মার অতর্কিতে পরশু রাত্রে নিরুদ্দিষ্টা হবার ব্যাপারটা আপনাকে যেন নাড়া দিতে পারেনি বলে মনে হচ্ছে। অথচ এ ব্যাপারে তার evidenceগুলোও অন্ততঃ বিশেষ ভাববার ছিল না কি?

নিশ্চয়ই। তাতে কোন ভুল নেই সত্যজিৎবাবু। তবে এই ব্যাপারে কানাইয়ের মা যতটুকু part play করতে পারতো, she already played it এবং তার নিকট হতে যতটুকু information আমাদের পাওয়ার ছিল আমরা পেয়েও গিয়েছি, তাই বর্তমানে সে অবান্তর। হত্যাকারী তাকে spot থেকে সরিয়ে ফেলে খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছে বলে তো আমার মনে হয় না! বরং সে একটু দেরিই করে ফেলেছে আমার মতে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভুল সে কি করেছে জানেন? শেষ পর্যন্ত ঐ কানাইয়ের মার ব্যাপারে তৎপর হতে গিয়েই। বেচারা বুঝতে পারেনি, হঠাৎ আচমকা এই case-এর evidence কতকগুলো নষ্ট করবার ইচ্ছায় কানাইয়ের মাকে না সরালে তার কাছে পেঁছিবার একটা নির্দিষ্ট পথ আমরা পেয়ে যাবো। তবে এইটুকুই বলতে পারি সত্যজিৎবাবু, কানাইয়ের মাকে হত্যা সে করেনি আর সেই কারণেই আমি কানাইয়ের মার নিরুদ্দেশ হওয়া সম্পর্কে খুব বেশী আকর্ষিত হইনি।

কিন্তু কি করে আপনার ধারণা হলো যে কানাইয়ের মাকে সত্যি সত্যিই হত্যা করা হয়নি?

যুক্তি দিয়ে এখুনি আপনাকে আমি বলতে পারছি না সত্যজিৎবাবু, তবে বলতে পারেন এটা আমার মনের একটা intuition, আমার মনের অনুভূতিই আমাকে তাই বলছে।

কিন্তু নায়েব কাকা সম্পর্কে কি করা যায় কিরীটীবাবু? এতক্ষণে সবিতা কথা বললে।

একটু আগেই তো আপনাকে আমি বললাম সবিতা দেবী, লক্ষ্মীকান্তবাবু কতকটা জিদের বশেই বসন্তবাবুকে arrest করে নিয়ে গেলেন। আমি হলে arrest করতাম না। শেষের কথাটা কিরীটী যেন কতকটা অস্পষ্ট কণ্ঠে আত্মগতভাবেই উচ্চারণ করল।

সবিতা বা সত্যজিৎ দুজনের একজনও কিরীটীর কথার শেষটুকু তার উচ্চারণের অস্পষ্টতার দরুন শুনতে পায়নি, তাই সবিতাই প্রশ্ন করে, অ্যাঁ, কি বললেন মিঃ রায়?

না, ও কিছু না।

কিন্তু সে যাই হোক, যেমন করেই পারেন বসন্ত কাকাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আপনাকে আসতেই হবে মিঃ রায়।

দেখি।

না, দেখি নয় মিঃ রায়, মনে হয় একমাত্র হয়ত দারোগাবাবু আপনার কথাই শুনলেও শুনতে পারেন। বলবেন না হয়, ওঁর জন্য জামিন হতে হলে আমিই হব। যা টাকার জামিন চান উনি, প্রস্তুত আছি।

কিরীটী সবিতার মুখের দিকে তাকাল, বুঝলাম, কিন্তু দারোগা সাহেব arrest করেই নিয়ে গেছেন। Arrest একবার কাউকে এইভাবে করবার পর, বিশেষ করে খুনের সন্দেহে, এখন জিলার ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া তো আর কেউই তাঁকে জামিন দেবার অধিকারী নন। তাহলে আপনাকে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেই গিয়ে প্রার্থনা জানাতে হয়।

সত্যজিৎ এতক্ষণ চুপ করেই ছিল, এবারে সে মুখ খুললে, মিথ্যে কেন ব্যস্ত হচ্ছো সবিতা। ওঁর উপরে আমরা যখন সব কিছুতে নির্ভর করছি, যা ভাল বোঝেন উনি করবেন।

কি বলছো তুমি জিত! জান না উনি আমাদের কতখানি! বাবা যে ওঁকে কতখানি স্নেহ ও বিশ্বাস করতেন আর কেউ তা না জানলেও আমি তো জানি। আর উনিও বাবাকে যেমন শ্রদ্ধা করতেন তেমনই ভালবাসতেন।

সবিতার কথাটা শেষ হল না, ঘরের বাইরে চটিজুতোর শব্দ শোনা গেল না অথচ নিত্যানন্দ সান্যাল ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন। তাঁর চোখেমুখে উদ্বেগের একটা কালো ছায়া যেন ঘনিয়ে আছে। ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, এই যে তোমরা সব দেখছি এই ঘরেই আছো, এত সকালে দারোগাবাবুই বা এসে-ছিলেন কেন আর টমটম করে বসন্তই বা অত তাড়াতাড়ি কোথায় গেল?

নিত্যানন্দ সান্যালের প্রশ্নে সবিতার চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, রুদ্ধ-কণ্ঠে সে-ই জবাব দিল, নায়েব কাকাকে দারোগা লক্ষ্মীকান্ত arrest করে নিয়ে গেলেন।

Arrest করে নিয়ে গেলেন? বসন্তকে? মানে—, বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন সান্যাল।

বাবার হত্যার ব্যাপারে—, কথাটা সবিতা শেষ করতে পারল না।

দয়াময়! প্রভু! বসন্ত শেষ পর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয়কে—, উহুঁ, না—না! তা হতে পারে না—নিঃশব্দে আপন মনেই মাথা দোলাতে লাগলেন সান্যাল, বিচিত্র বিচিত্র! বসন্ত কিনা মৃত্যুঞ্জয়কে—

কিরীটী আর দাঁড়ায় না, একসময় নিঃশব্দেই পাশ কাটিয়ে ঘর হতে বের হয়ে আসে।

কিরীটীকে ঘর ত্যাগ করে যেতে দেখে সান্যাল সবিতাকে সম্বোধন করে বলেন, উহুঁ, এ তো ভাল কথা নয় মা সবি! এর একটা বিহিত করা প্রয়োজন।

আমিও তাই কিরীটীবাবুকে একটু আগে বলছিলাম।

কিরীটীবাবু তো চলে গেলেন দেখছি। তা উনি কি বললেন?

এখন ওঁকে জামিনে খালাস করতে হলেও নাকি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আমাদের যেতে হবে।

বেশ তো। সত্যজিৎবাবু, তুমিই না হয় একটিবার তাহলে আজ সদরে চলে যাও—আমি চিঠি দিয়ে দেবো'খন। কিন্তু তা যেন হলো, এদিকে এদিক-কার জমিদারীর ব্যাপারই বা কে সব দেখাশোনা করবে? কাছারীতে গিয়েও তো একজনের বসা দরকার? সাকসেশন সার্টিফিকেট উইলের প্রোবেট এসবও তো কিছু এখনও নেওয়া হয়নি!

কাকাবাবু ফিরে না আসা পর্যন্ত কাছারী বন্ধই থাক মামাবাবু!—সবিতা জবাব দিল।

পাগলী মেয়ে! তাই কি হয় রে! এত বড় জমিদারী, এত বড় ব্যবসা। মাথার উপরে একজন শক্ত হাতে লাগাম না ধরে থাকলে কর্মচারীরা চুরি-ডাকাতি করেই যে সব দু'দিনে ফাঁক করে দেবে।

তাহলে কাকাবাবু যতদিন না ফিরে আসেন আপনিই না হয় সব দেখা-শোনা করুন মামাবাবু।

না, না—মা। এই বৃদ্ধ বয়সে ওসবের মধ্যে আর আমাকে জড়িয়ে ফেলবে কেন মা!

কিন্তু মামাবাবু, আপনি ছাড়া এসব আর তাহলে দেখবেই বা কে? আমি তো ওসবের কিছুই জানি না, বুঝিও না!

তাই তো! তুমি যে আমাকে বড় বিপদে ফেললে মা! অগত্যা—চোখের উপরে আমি বেঁচে থাকতে হেমের একটিমাত্র সন্তানের সব ভেসে যাবে তা তো আর দেখতে পারবো না। যাই তাহলে, আমিই না হয় কাছারীতে যাই। তার-পরই উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিলেন, বনমালী! এই বনমালী!

ডাক শুনে বনমালী এসে হাজির হল। সে বোধ হয় ঘরের আশপাশেই কোথাও ছিল।

আমায় ডাকছিলেন মামাবাবু?

হ্যাঁ, এই যে বাবা বনমালী! যাও তো বাবা, টম্‌টম্‌টাকে জুততে বল তো! কাছারী যেতে হবে।

টম্‌টম্ তো নায়েবজী নিয়ে বাইরে গেছেন, এখনও ফেরেননি।

ও হ্যাঁ। দেখেছো কি ভুলো মন আমার! সত্যিই তো, টম্‌টম্‌টা তো বসন্ত ভায়াই নিয়ে গেছেন—তা ঘোড়া আছে তো?

তা আছে।

তা ঘোড়াতেই জিন করিয়ে আনতে বলগে।

যে আজ্ঞে।

বনমালী চলে গেল। সান্যালও বোধ হয় কাছারিতে যাবার জন্য প্রস্তুত হতেই চলে গেলেন।

ঘরের মধ্যে কেবল সবিতা ও সত্যজিৎ।

সবিতা? সত্যজিৎ ডাকে।

বল? সত্যজিতের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল সবিতা।

মনে হচ্ছে আজকের ব্যাপারে তুমি যেন অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছো?

কালকের ও আজকের ব্যাপারে আমার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা আশঙ্কা জাগছে জিৎ। আমার সত্যি বলছি কেমন যেন ভয়-ভয় করছে।

কিন্তু এখন তো বুঝতে পারছো সবিতা, তোমার বাবার মৃত্যুর ব্যাপারে সত্যিই প্রকাণ্ড একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিল, ক্রমে ক্রমে এখন সব একটু একটু করে

জানা যাচ্ছে অনুসন্ধান করতে গিয়ে।

সবিতা সত্যজিতের যুক্তিকে খণ্ডনও যেমন করতে পারে না তেমন ও সম্পর্কে কোন কথাও যেন বলবার স্পৃহা পর্যন্ত বোধ করে না।

কি শান্তিই ছিল তাদের এই বাপ ও মেয়ের সংসারে। হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ার আবির্ভাব কেন? কেন এ কালো মেঘ?

সত্যিই জিৎ, আমার কি মনে হচ্ছে জান? এই বাড়ি-ঘর দুয়ার সমস্ত সম্পত্তি ফেলে রেখে কলকাতার হস্টেলেই আবার ফিরে যাই।

তাতেই এই সংকটকে কি তুমি এড়াতে পারবে সবি?

কিন্তু এখানকার হাওয়াই যেন কেমন বিষিয়ে উঠেছে। আমার যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে।

আর কটা দিন অপেক্ষা করো, কিরীটীবাবু তোমার বাবার হত্যা-রহস্যের একটা মীমাংসা করতে পারেন ভালো, নচেৎ আমি তো—

সত্যি কথা বলতে কি তোমায় জিৎ, তাতেও যেন আর আমার খুব বেশী উৎসাহ বা রুচি নেই।

সে কি! এ তুমি কি বলছো সবি?

হ্যাঁ। কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, বিশেষ করে মায়ের মৃত্যুর ব্যাপারটা জানবার পর থেকে, বাবার ও মৃত্যুর ব্যাপারে কোথায় যেন একটা পারিবারিক জটিলতাই জড়িয়ে আছে, যেটা এতদিন হয়ত কালের অন্ধকারে চাপা পড়ে গিয়েছিল সকলে ভুলেও গিয়েছিল, এখন আবার এই মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে হয়ত সেই সব অতীতের কাহিনী মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠবে।

ও কথাটা যে আমার মনে হয়নি তা নয় সবিতা কিন্তু অতীতে ধরেই যদি নিই একটা পারিবারিক কলঙ্ক থেকেই থাকে এবং সেই জন্যই শুধু তুমি তোমার জন্মদাতা অমন স্নেহময় পিতার হত্যাকারীকে এমনি করে নিষ্কৃতি দাও তাহলে তুমিই কি মনে শান্তি পাবে? পারবে নিজেকে ক্ষমা করতে কোন দিন?

কিন্তু তুমি—, সবিতা আর নিজেকে রোধ করে রাখতে পারে না। গত কয়েক দিন ধরে যে প্রশ্নের কাঁটাটা নিরন্তর তার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করছিল, তার মা ও বাবার মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চয়ই একটা অতীতের পারিবারিক কলঙ্ক কোথায়ও আছে এবং সেটা একদিন যখন সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়বে দিনের আলোর মত সেদিন তখন সত্যজিৎ কি তাকে ক্ষমা করতে পারবে?

এত বড় শোক ও দুঃখের মধ্যেও যে সদ্যজাত প্রেম তার সমগ্র হৃদয়কে কানায় কানায় ভরিয়ে তুলেছে, শেষ পর্যন্ত যদি তারই পারিবারিক একটা অতীত কলঙ্কের জন্য তাকে আবার ভুলে যেতে হয়, সে ব্যথাকেই বা সে ভুলবে কেমন করে কি সান্ত্বনায়!

সত্যজিৎ! সত্যজিৎ! না, না—তাকে আজ আর সে হারাতে পারে না! কিন্তু পিতার প্রতি কন্যার কর্তব্য—

আজ দু'দিন ধরে ঐ দ্বন্দ্বেই সে অহর্নিশ পীড়িত হচ্ছে।

প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা পরে ঘর্মাক্ত কলেবরে রুদ্ধ আক্রোশে ফুলতে ফুলতে লক্ষ্মীকান্ত থানায় এসে পৌঁছালেন। থানায় দুজন চৌকিদার এসে তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরল।

ঘন ঘন চাবুকের ঘায়ে জর্জরিত করে ও দুই পা দিয়ে পেটে ক্রমাগত লাথি মেরেও অশ্বের গতি তিনি বাড়াতে পারেননি। ঘোড়াটার মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছিল। আশেপাশে চেয়ে দেখলেন লক্ষ্মীকান্ত, কিন্তু টম্‌টম্‌ বা বসন্ত সেন কাউকেই নজরে পড়ল না। ঘোড়া হতে নেমে ঘর্মাক্ত কলেবরে থানার বারান্দায় এসে উঠলেন লক্ষ্মীকান্ত। সেখানেও বসন্ত সেন নেই।

থানার বারান্দায় এ. এস. আই. পাণ্ডে দুজন চাষীর এজাহার নিচ্ছিলেন। চাষী দুটো সানুনাসিক কণ্ঠে পাণ্ডেকে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছিল, সহসা ওদের দিকে নজর পড়ায় যেন বোমার মতই ফেটে পড়লেন লক্ষ্মীকান্ত, হাজত-ঘরে নিয়ে শুয়োরকা বাচ্চাদের বেশ করে ঘাকতক দাও, তবেই সব স্বীকার করতে পথ পাবে। যেমন কুকুর তার তেমনি মুগুর চাই।

অকস্মাৎ বড়বাবুকে আক্রোশে ফেটে পড়তে দেখে বিস্মিত পাণ্ডে মুখ তুলে তাকাল তার দিকে।

চাষী দুজন অপরাধী নয়, একটা চুরির ব্যাপারে থানা থেকেই সাক্ষী হিসাবে ওদের এজাহার নেওয়া হচ্ছিল। অকারণে ওদের হাজতঘরে পুরে ঠ্যাঙাবার তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

নায়েব বসন্ত সেন এসেছিল পাণ্ডে? প্রশ্ন করলেন লক্ষ্মীকান্ত।

কে, নায়েববাবু! হ্যাঁ, তিনি তো প্রায় মিনিট পনেরো আগে এসেছিলেন টম্‌টমে করে। একখানা জরুরী চিঠি আপনার নামে লিখে রেখে গেছেন। বলে গেলেন আপনি এলেই আপনাকে দিতে।

কি বললে? সে চিঠি লিখে রেখে চলে গেছে? কর্কশ কণ্ঠে শুধালেন লক্ষ্মীকান্ত সহকারী পাণ্ডেকে।

হ্যাঁ—এই যে চিঠি স্যার!

বলতে বলতে একটা ভাঁজকরা চিঠি এগিয়ে দিলেন পাণ্ডে বড়বাবুর দিকে।

চিঠি! কে চায় সে বদমায়েশের চিঠি! যেন একেবারে খেঁকিয়ে উঠলেন লক্ষ্মীকান্ত, সে বেটাকে আমি গ্রেপ্তার করেছিলাম। আর সে বেটা কিনা দিব্যি তোমাকে একটা চিঠি গছিয়ে দিয়ে ভেগে গেল! আহাম্মক! গর্দভ কোথাকার! কি করো? ঘাস খাও? যত সব অপদার্থ অকর্মার দল!

ব্যাপারটা যেন এতটুকুও বোধগম্য হয়নি এমনি হাঁ করে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে পাণ্ডে লক্ষ্মীকান্তর দিকে কিছুক্ষণ, তারপর ঢোক গিলে বলে, গ্রেপ্তার! নায়েবজীকে গ্রেপ্তার করেছেন স্যার?

হ্যাঁ। ঐ বেটা ঘুঘুই তো জমিদার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীকে হত্যা করেছে।

বলেন কি!

চিঠিটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে চোখের সামনে ধরলেন লক্ষ্মীকান্ত!

সংক্ষিপ্ত চিঠি।

লক্ষ্মীকান্ত,

ভয় নেই আমি পালাচ্ছি না। দু'চার দিনের মধ্যেই আমি আবার ফিরে আসছি, বিশ্বাস করতে পারো আমার কথায়। কতকগুলো জরুরী কাজ আছে আমার হাতে, সেগুলো শেষ না করা পর্যন্ত কিছুতেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। আমার কথায় যদি বিশ্বাস করো তাহলে আমার জামিন আমি রইলাম। আর একটা কথা, এ নিয়ে আবার সবিতাদের উপর কোন হামলা করো না। কথাটা বলতে হলো এই জন্যে যে তোমার পক্ষে বিচিত্র কিছুই নেই। বুদ্ধিটা আবার তোমার একটু বেশী মাত্রায় প্রখর কিনা। সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে, যেন প্রমোদভবনের কারো উপরে এতটুকুও কোন জুলুম না হয়, তাহলে ফিরে এসে তোমাকে জীবন্ত রাখবো না।

নায়েব বসন্ত সেন

আক্রোশে হতাশায় অপমানে যেন লক্ষ্মীকান্তর সমস্ত অন্তরটা অগ্ন্যুৎপাতের মত দাউ দাউ করে জ্বলছে। পঠিত চিঠিটা আক্রোশে হাতের মুঠোর মধ্যে দুমড়াতে দুমড়াতে রোষকষায়িত লোচনে পান্ডের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ দিকে গেছে সে?

মনে হল স্টেশনের দিকেই যেন গেলেন স্যার!

এই মুহূর্তে সাইকেল নিয়ে বের হয়ে পড়ুন—যেমন করে হোক তাকে গ্রেপ্তার করে আনা চাই বা তার সংবাদ আনা চাই। যান।

যাচ্ছি স্যার।

তাড়াতাড়ি পান্ডে উঠে দাঁড়ালেন।

লক্ষ্মীকান্ত চীৎকার করে উঠলেন, সমশের—ইসমাইল!

থানার দুই জাঁদরেল ষন্ডামার্কা সেপাই। থানার যত অপকর্ম ওদের দিয়েই করানো হয়। হন্তদন্ত হয়ে তারা বড়বাবুর ডাক শুনে ছুটে এলো, হোজুর—

ছোটবাবু স্টেশনে যাচ্ছেন সাইকেল চেপে। তোমরাও যাও। নায়েব বসন্ত সেনকে ধরে আনতে হবে।

সমশের আর ইসমাইল।

লক্ষ্মীকান্তর দুটি যমদূত-সদৃশ সাকরেদ। এ সব ব্যাপারে এক পায়ে তো ওরা দাঁড়িয়েই আছে সর্বদা।

সমশের ও ইসমাইল দুজনের আবার নায়েব বসন্ত সেনের উপরে রাগও ছিল।

জমি সংক্রান্ত একটা ব্যাপারে মাস দুই আগে ওরা একটা চাষী জোতদারকে সায়েস্তা করতে গিয়েছিল, আচমকা পূর্বাহ্নেই সংবাদ পেয়ে তীরের মত ঘোড়া ছুটিয়ে নায়েব বসন্ত সেন অকুস্থানে এসে হাজির হয়।

বসন্ত সেনের হাতে ঘোড়া হাঁকাবার সময় বিনুনী-করা চামড়ার একটা চাবুক ধরা থাকত। চাবুকটা হাতের মুঠোর মধ্যে ধরেই বসন্ত সেন ঘোড়া থেকে ঘর্মাক্ত কলেবরে লাফিয়ে ভূমিতে এসে দাঁড়াল, কি ব্যাপার সেপাই?

চাষী জোতবার পরাণ মণ্ডল নায়েবকে দেখে কেঁদে পড়ল, দেখেন কত্তা, সেপাইদের অত্যাচারটা একবার দেখেন। মিথ্যে মিথ্যে ওরা আমায় থানায় নিয়ে

যেতে চায়।

বসন্ত সেন বললেন, সেপাই, তোমরা থানায় যাও। আমি দারোগা সাহেবের সঙ্গে দেখা করে যাবো'খন। বলো সাহেবকে ওর জামিন আমি রইলাম।

সমশের আর ইসমাইল দুজনেই খিঁচিয়ে উঠেছিল কটুকণ্ঠে, সরে যান নায়েব মশাই! এ সব থানা-পুলিসের ব্যাপারে আপনি মোড়লি করতে এসেছেন কেন?

বাঘের মতই অকস্মাৎ গর্জে উঠেছিলেন বসন্ত সেন, এই শুয়ারকি বাচ্চা! জানিস কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিস? চাবকে একেবারে পিঠের চামড়া তোদের তুলে নেবো।

ইতিমধ্যে গোলমাল ও চেঁচামেচিতে প্রায় শ'খানেক চাষী সেখানে চার-পাশে এসে ভিড় করেছে। লোহার মত কঠিন শক্ত দেহের বাঁধুনি তাদের।

রাগে গর্জাতে গর্জাতে সমশের আর ইসমাইলকে থানায় ফিরে আসতে হয়েছিল।

সেযাত্রায় অবশ্য থানার দারোগাকে বসন্ত সেন শ'পাঁচেক টাকার নোট গুঁজে দিয়ে তার রোষবহ্নি হতে পুরাণ মণ্ডলকে বাঁচিয়েছিল।

সমশের আর ইসমাইলকে দারোগা সাহেব চোখ রাঙিয়েই বলেছিল, জমিদারের এলাকায় বাস করতে হলে একটু সাবধান হয়ে বুঝে-সুঝে কাজ করতে হয়।

কিন্তু রৌপ্য চাকতির একটি ভগ্নাংশও তাদের পকেটে যায়নি, অতএব তাদের রাগটা বসন্ত সেনের উপরে প্রশমিত হবার সুযোগ পায়নি। তারা এতদিন সুযোগের অন্বেষণেই ফিরছে। আজ মিলেছে সুযোগ। মহা উল্লাসে তারা বসন্ত সেনের উদ্দেশ্যে অগ্রগামী সাইকেলবাহী পাণ্ডের পশ্চাতে পশ্চাতেই বের হয়ে পড়তে দেরি করে না এতটুকুও।

আর ঠিক ঐ সময়ে প্রমোদভবনের মধ্যে কোথাও একটা সাইকেল পাওয়া যায় কিনা অনুসন্ধান করে ফিরছিল কিরীটী।

বনমালী বললে, কাছারীর পাইক রামশরণের একটা ভাঙা সাইকেল আছে। বেচারা ঘোড়ায় চড়তে জানে না বলে কর্তাবাবু তাকে একটা সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন, জরুরী সংবাদ কখনো দেওয়া-নেওয়া করতে হলে রামশরণকে দ্রুত যাওয়া-আসার জন্য। মাস দুই হলো রামশরণ ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছে। নিচের যে ঘরে সে থাকত সে ঘরেই সাইকেলটা আছে। আনবো সেটা?

কিরীটীর আদেশে রামশরণের সাইকেলটা এনে দিল বনমালী।

কিরীটী সাইকেলটা চেপে বের হয়ে পড়ল।

বৌরাণীর বিলটার ধার দিয়ে যতদূর বাঁধানো সড়ক ছিল চালিয়ে শেষে কাঁচা রাস্তায় এসে পড়ল কিরীটী। কাঁচা সড়কে গত দু'দিনের বৃষ্টির ফলে কাদা জমে আছে। কোনমতে তার মধ্যে দিয়েই সাইকেল চালিয়ে সন্তর্পণে এগুতে লাগল কিরীটী।

বৌরাণীর বিলের দক্ষিণ দিক ওটা। জনহীন, মানুষের বসতি বড় একটা নেই এদিকে। বেশীর ভাগই জঙ্গল। মধ্যে মধ্যে কেবল দু'একটা চালাঘর এদিকটায় চোখে পড়ে।

এই জঙ্গলই অস্পষ্ট রেখায় গত সন্ধ্যায় নন্দনকানন হতে দেখা গিয়ে-

ছিল। মাথার উপরে বৈশাখের জ্বলন্ত সূর্য। পিপাসায় কণ্ঠতালু কাঠ হয়ে উঠেছে। কোথাও একটু তৃষ্ণার জল পাওয়া যায় কিনা এদিক ওদিক তাকাতে লাগল কিরীটী।

সহসা নজরে পড়ে ছোট একটা বাড়ি। চালাঘর বললে ভুলই হবে। মেঝে ও দেওয়ালের পাকা গাঁথুনির উপরে খড়ের ছাউনি। আশেপাশের খানিকটা স্থানও পরিচ্ছন্ন। তবে সংস্কারের অভাবে ও অযত্নে জঙ্গলাকীর্ণই হয়ে আছে।

এমন নির্জনে একেবারে জঙ্গলের প্রান্তে এমন একটা বাড়ি দেখে একটু আশ্চর্যই হয়ে গিয়েছিল সে।

বাড়িটায় কোন লোকজন আছে বলেও মনে হয় না।

কোথাও কোন পত্রান্তরালে বসে একটা ঘুঘু কূজন করছিল।

কিরীটী সাইকেল হতে নেমে এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগল। সহসা এমন সময় বাড়ির পশ্চাৎ দিক হতে একটি প্রৌঢ় বাড়ির সামনে এসে কিরীটীকে অদূরে সাইকেলটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল।

লোকটার সাজ-পোশাকে ও চেহারায় এ দেশীয় বলে মনে হয় না।

উঁচু লম্বা চেহারা। মুখে সাদা-পাকা চাপদাড়ি, মাথায় পাগড়ি রঙিন কাপড়ের। পরিধানে রাজপুতদের ধরনের পায়জামা, গায়ে একটা রঙিন পাতলা পাঞ্জাবি, পায়ে নাগরা।

মনে হয় লোকটা কোন রাজপুত-বংশীয়ই হবে।

কিরীটী হাতের ইশারায় লোকটিকে ডাকল।

প্রৌঢ় ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করে বোধ হয় কি ভাবলে, তারপর ধীরে মন্থর পায়ে নাগরা জুতোর মচমচ শব্দ তুলে কিরীটীর সামনে এগিয়ে এল এবং অত্যন্ত রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, কেয়া? কেয়া মাংতেছে আপ ইধার?

নমস্তে জী, আপকো দেখনেসে মালুম হোতা হ্যায় কি আপ ইধার বাঙ্গালকা আদমী নেহি হো।

বেশখ বাবুজী, ম্যায় রাজপুত হুঁ। বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর মোলায়েম হয়ে আসে।

রাজপুত! বিস্মিত কিরীটী প্রশ্ন করে, আপ্ রাজপুতনাকে রহনেওয়ালে?

হ্যাঁ। রাজপুতনার এক গাঁয়ে আমার বাড়ি।

এখানে কতদিন আপনি আছেন? আপনার নাম কি?

আমার নাম সুরযমল সিং, জাতিতে আমরা রাজপুত চৌহান। মাস দেড়েক হলো এখানে এসেছি। কিন্তু কেন বলুন তো?

না, এমনি জিজ্ঞাসা করলাম।

সুরযমল অতঃপর চুপ করেই থাকে।

এখানে কোন কাজ ছিল বুঝি আপনার সিংজী? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

কিরীটীর প্রশ্নে সুরযমল একটু যেন থমকে গিয়ে ইতস্ততঃ করে, তারপর মৃদু হাস্যের সঙ্গে মোলায়েম কণ্ঠে জবাব দেয়, কাজ না থাকলে কি সাধ করে নিজের মুলুক ছেড়ে এত দূর দেশে কেউ আসে বাবুজী! তা বাবুজী, আপনাকে তো এদিকে কখনও দেখিনি!

না, আমিও মাত্র কয়েকদিন হল এদিকে এসেছি, এখানকার লোক আমি নই। জায়গাটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। বড় পিপাসা পেয়ে গেল, হঠাৎ এই বাড়িটা চোখে পড়ায়—

পিপাসা লেগেছে বাবুজী আপনার, দাঁড়ান—, পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়িয়ে সুরেষমল চীৎকার করে ডাকল, আরে এ চন্দ্রা, চন্দ্রা বিটিয়া হো?

মিহি মেয়েলী কণ্ঠে জবাব এল, যাই—

লোটামে থোড়া পানি আউর থোড়ি মিঠাই তো লাও বিটিয়া—

না না, মিঠাই নয় সুরেষমলজী, শুধু পানি। কিরীটী প্রতিবাদ জানায়।

এ কি কোন একটা বাত হলো বাবুজী। মেহমান্ আপনি আমার কুটীরে। প্রৌঢ় হাসতে হাসতে জবাব দেয়।

অপূর্ব!

মুহূর্তে যেন কিরীটীর দুটি চোখের তারা বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়।

কিরীটী সম্মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

কোন একটি শান্ত রাগিণী যেন মূর্তিময়ী হয়ে নিঃশব্দে সঙ্গীতের মত চারিদিক মর্মায়িত করে এগিয়ে আসছে। কি অপূর্ব সুঠাম দেহবল্লরী। চপলা চঞ্চলা।

একটু লম্বাটে ধরনের মুখখানি।

হাতের মুঠির মধ্যে যেন ধরা যায় সরু কটিদেশ। পেলব সুকোমল দুটি বাহু।

পরিধানে যদিও রক্তিম পশমের ঘাঘরা ও আঁটসাট কাঁচুলি, তথাপি যেন প্রস্ফুটিত কমলের মতই সৌন্দর্য ঢলঢল করছে কমনীয়তায় মাধুর্যে। এক হাতে লোটা ও আর এক হাতে রেকাবিতে দুটো নাড়ু নিয়ে এগিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল তরুণী।

হরিণের মত সরল দুটি চোখের চাউনি তুলে তাকাল তরুণী।

চোখের নিচে কাজলের সূক্ষ্ম কালো রেখা। মাথার চুলে বেণী সংবদ্ধ।

খালি পা দুটিতে অলক্তরাগ চিহ্ন।

এই আমার নাতনী চন্দ্রলেখা বাবুজী। আমার ভাইয়ের বিটির বিটি।

ওর মা?

ওর মা! আমাদের বিটি প্রৌঢ়ের চোখের কোল দুটি ছলছল করে এল।

অনুমানেই বুঝতে পারে কিরীটী, প্রৌঢ়ের মেয়েটি আর ইহজগতে নেই।

কিরীটী চন্দ্রলেখার প্রসারিত হাত হতে মিষ্টির পাত্র ও লোটাটা নিল। নাড়ু ঠিক নয়, লাড্ডু। এবং ওদের দেশীয় প্রথায়ই তৈরী। কোনমতে একটা লাড্ডু গলাধঃকরণ করে কিরীটী এক লোটা পানিই ঢকঢক করে পান করে নিল।

চন্দ্রলেখা কিরীটীর হাত হতে লোটা আর পাত্রটি নেবার জন্য এবার এগিয়ে আসতেই কিরীটীর স্মৃতির পৃষ্ঠায় একটা বিদ্যুৎচমক খেলে যায় যেন।

অবিকল ঠিক এমনি না হলেও এই মুখখানিরই আদলটা যেন ওর চেনা চেনা।

তীক্ষ্ম অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে একবার তাকাল কিরীটী চন্দ্রলেখার মুখের

প্রতি।

কোথায় কবে যেন অমনি একখানি মুখ সে দেখেছে। কিন্তু কোথায়!

মিষ্টির পাত্র ও লোটাটা কিরীটীর হাত থেকে নিয়ে চলে গেল চন্দ্রলেখা অন্দরের দিকে।

কিরীটী তাকিয়ে থাকে মেয়েটির ক্রমঅপস্রিয়মাণ দেহের দিকে।

কি দেখছেন বাবুজী?

কিরীটী মৃদু হেসে প্রৌঢ় সুরযমলের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, আপনার নাতনীর ঠিক রাজরাণীর মতই রূপ সিংজী!

রাজরাণী! সবই ওর কপালের লিখন—, প্রৌঢ় সুরযমলের বুকখানা কাঁপিয়ে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন বের হয়ে আসে।

কথাগুলো অস্পষ্ট আত্মগতভাবে উচ্চারণ করেছিল সুরযমল। কিরীটী সঠিক বুঝতে পারে না।

কিন্তু বললে না তো সিংজী, এ দেশে কেন তুমি এসেছো?

ঐ যে বল্লাম বাবুজী, ভাগ্যের লিখন! ভাগ্যই টেনে এনেছেন আমাদের এই দেশে—নইলে—, কথাটা সুরযমল আর শেষ করে না। হঠাৎ যেন কথার মোড়টা ফিরিয়ে দিয়ে সুরযমল বলে, এই ধূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেন বাবুজী, চল ওপাশের আমবাগানের বিলের ধারে চমৎকার একটা জায়গা আছে।

চল।—

সত্যিই অপূর্ব জায়গাটা।

নিবিড় আম্রকানন। সম্মুখেই দিগন্তপ্রসারী বিলের জল। বৌরাণীর বিল।

দ্বিপ্রহরের খর সূর্যালোকে বিলের বুকে মন্থর বায়ুর তাড়নে জেগে-ওঠা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউগুলো যেন হীরার কুচির মতই জ্বলজ্বল করছে।

পত্রান্তরাল হতে একটা হরিয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে এবং মধ্যে মধ্যে শিস দিয়ে উঠছে একটা বুলবুলি।

কিরীটী ভাবছিল এমন নিরিবিলি জায়গাটিতে এমন একখানা বাড়ি কে তৈরী করল!

প্রশ্নটা সুরযমলকে জিজ্ঞাসা না করে পারে না সে।

লোকালয়ের বাইরে এই নির্জন জায়গায় এই বাড়িটার খোঁজ তোমাকে কে দিল সিংজী?

যে বাবুজী আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন তিনি এই বাড়িতে এনে তুলেছেন আমাদের।

বাবুজী! কি নাম তার?

উহুঃ বাবু, শুধাবেন না দয়া করে। ঐ কথাটি বললে বেইমানি করা হবে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমি—

হ্যাঁ?

কিরীটী মনের মধ্যে একটা জাল বুনে চলে।

একটা কাহিনীর ছিন্নসূত্র। কিছুতেই এ কয়দিন ধরে যার কোন হদিসই সে মনের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিল না, সেই ছিন্ন সূত্রটিই যেন সহসা মনের মধ্যে এসে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

চিন্তার জাল নীহারিকার মত এখনও দ্রুত ঘূর্ণ্যমান আকারহীন। অস্পষ্ট ধোঁয়াটে।

তাছাড়া বাবুজীর বোধ হয় ইচ্ছাও ছিল না কারো সঙ্গে এ দেশে আমি আলাপ-পরিচয় করি বা কথা বলি। কিন্তু দেড় মাস একটা লোকের মুখ দেখি না। এই প্রথম এখানে বাইরের লোক তোমার সঙ্গে আমি কথা বলছি—

তোমার খাওয়াদাওয়া, বাজার-হাট করতে হয় না?

না। বাবুজীর লোক হপ্তায় দুদিন করে সব পেঁছে দিয়ে যায়।

প্রৌঢ় সুরযমল ও তার অপূর্ব সুন্দরী তরুণী নাতনীর এখানে বাস করা হতে সব কিছুই যেন একটা ঘন রহস্যের জালে ঘেরা।

কিন্তু অদৃশ্য পরিচয় দানে অনিচ্ছুক সর্ব ব্যাপারে সদা সতর্ক প্রৌঢ়-বর্ণিত বাবুজীটি কে?

কি সম্পর্ক সেই বাবুজীর এই প্রৌঢ় রাজপুত ও তার তরুণী সুন্দরী নাতনীটির সঙ্গে? কেনই বা সে এদের সুদূর রাজপুতানা হতে এই নির্জন স্থানটিতে এনে লুকিয়ে রেখেছে? কি উদ্দেশ্যে?

কথায় বোঝা গেল, প্রৌঢ়ের নিকট হতে তার বাবুজীর কোন সংবাদই পাওয়া যাবে না। কিন্তু সংগ্রহ করতে হবে সংবাদটি।

কেন হঠাৎ দেড় মাস যাবৎকাল রাজপুতানা হতে ঐ প্রৌঢ় সুরযমল সিং ও তার তরুণী নাতনী চন্দ্রলেখা বৌরাণীর বিলের দক্ষিণ প্রান্তে এই নির্জন কুটিরে বাসা বেঁধেছে?

বিলের অপর প্রান্তে প্রমোদভবনের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই তো?

এ বাড়িটা কার জানো সিংজী? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

না বাবুজী।

কিরীটী যখন প্রমোদভবনে এসে পেঁছিল সূর্য তখন ঠিক মধ্যগগনে। তাম্রপাত্রের মত সমস্ত আকাশটা প্রখর তাপে যেন গনগন করছে। প্রচন্ড-অগ্ন্যুত্তাপ যেন মাথার উপরে আকাশ হতে ঝরে পড়ছে।

বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সবিতা ও কল্যাণী। কল্যাণীর হাতের মধ্যে ধরা একটা চিঠির কাগজ। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে নীল কোর্তা গায়ে কুলী শ্রেণীর একটা লোক। লোকটা বোধ হয় স্টেশনের কুলীই হবে।

সাইকেলটা বারান্দার এক পাশে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে বারান্দার উপরে উঠে এলো কিরীটী।

সবিতার সমস্ত মুখখানা যেন উদ্বেগে থম্‌থম্‌ করছে। কল্যাণীর চোখ-মুখেও চিন্তার ছায়া।

ব্যাপার কি মিস্ সান্যাল? কিরীটীই ওদের দিকে অগ্রসর হতে হতে প্রশ্ন করে সর্বপ্রথমে।

এই দেখুন—, কল্যাণী হাতের কাগজটা কিরীটীর সামনে এগিয়ে দেয়।

কি এটা? কাগজটা কিরীটী তার কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে তুলে ধরল।

চিঠি। সংক্ষিপ্ত চিঠি একখানা।

লিখেছেন নায়েব বসন্ত সেন।

কৌতূহলভরেই চিঠিটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে কিরীটী।

সুচরিতাসু মা সবিতা,

কয়েকটা বিষয়ে জরুরী কাজে একান্ত বাধ্য হইয়াই আমাকে কয়েকদিনের জন্য বাইরে যাইতে হইতেছে। এবং সেই কারণেই আপাততঃ লক্ষ্মীকান্ত দারোগার কথা অগ্রাহ্য করিয়া যাইতে হইল। তুমি কোনরূপ চিন্তা করিও না। পার তো এবং সর্বদিকে মঙ্গল চাও তো কিরীটীবাবুকে বিদায় দিও তাহার যথাযোগ্য প্রাপ্য মিটাইয়া। বৃদ্ধ চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তোমার কাকাবাবুর এই অনুরোধটি রাখিও মা। এটা আমার একান্ত অনুরোধ। তোমার পিতাঠাকুর আজ মৃত। সেই মৃতাত্মার প্রতি যদি তোমার এতটুকুও সম্মান, শ্রদ্ধা বা কর্তব্য থাকে তাহা হইলে তাহার মৃত্যুরহস্যের অনুসন্ধানের ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হও। লক্ষ্মীকান্ত দারোগাকেও পৃথক পত্র দিয়া গেলাম। টম্‌টম্‌টা স্টেশন-মাস্টারমশাইয়ের জিম্মায় রহিল, সেটা লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবে।

চিরআশীর্বাদক তোমার নায়েব কাকা

বসন্ত সেন

কিরীটীই কুলীটার দিকে চেয়ে বললে, তুই যা। মাস্টারবাবুকে বলিস গাড়িটা বিকেলে লোক গিয়ে নিয়ে আসবে। বলতে বলতে পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে কিরীটী লোকটাকে বকশিশ দিল।

কুলীটা হাসিমুখে সেলাম জানিয়ে চলে গেল।

বসন্তবাবু এভাবে চলে গেলেন, এটা কি ভাল হলো মিঃ রায়? কথাটা বললে কল্যাণী।

বিশেষ কোন কারণেই তাঁকে যেতে হয়েছে, চিঠিতেই তো তিনি জানিয়েছেন কল্যাণী। এ ব্যাপারে এত চিন্তার কি আছে?

কিন্তু লক্ষ্মীকান্ত দারোগা!

কল্যাণীর মুখের কথা শেষ হল না দেখা গেল ঝড়ের বেগে ধুলো উড়িয়ে এক অশ্বারোহী প্রমোদভ্রমণের দিকে আসছে।

দ্রুতধাবমান অশ্বের লৌহক্ষুরের খট্‌ খট্‌ শব্দ ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে।

কিরীটী সবিতা ও কল্যাণী তিনজনেই সোৎসুক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে অশ্বারোহীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

কে অশ্বারোহী!

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না।

ক্রমে অশ্বারোহী স্পষ্ট হয়ে উঠলো এবং তাকে চেনাও গেল।

ঝড়ের গতিতেই অশ্বারোহী সোজা একেবারে প্রমোদভবনের গেটের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে অভ্যস্ত দক্ষ অশ্বচালকের মতই মুহূর্তে অশ্বের বল্গা টেনে এক লহমায় যেন অশ্বের সমস্ত গতিকে রোধ করে জিনের পা-দানে পা দিয়ে নিচে নেমে দাঁড়ালেন।

অশ্বের সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত ও মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে।

অশ্বারোহীও ঘর্মাক্তকলেবর। বৃদ্ধ বয়সে পরিশ্রমে তখনও তিনি হাঁপাচ্ছেন। নিত্যানন্দ সান্যাল।

নিত্যানন্দ সান্যাল হাঁপাতে হাঁপাতে বারান্দায় এসে উঠে দাঁড়ালেন।

সবি মা তুমি আছ, কিরীটীবাবু আপনি আছেন—ব্যাপার বড় সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বসন্ত ভায়া থানায় ধরা না দিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছেন। দারোগা তো একেবারে অগ্নিশর্মা। কাছারীতে কাজ করছিলাম, একেবারে মারমূর্তিতে গিয়ে হাজির—

সংবাদ আমরাও পেয়েছি। ধীরকণ্ঠে কেবল কিরীটী কথাগুলো বলে।

পেয়েছেন? শুনেছেন সব?

হ্যাঁ, বসন্তবাবু সবিতা দেবীকেও স্টেশন থেকে একটা চিঠি দিয়েছেন সব ব্যাপার জানিয়ে।

চিঠি?

হ্যাঁ, এই দেখুন। কিরীটী চিঠিটা সান্যালের হাতে তুলে দিল।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সান্যাল চিঠিটা পড়লেন।

কিন্তু বুঝতে পারছি না এরকম আহাম্মকের মত কাজ ওঁর মত একজন স্থির বিবেচক লোক করতে গেলেন কেন? পুলিশ তো এসব কথা বিশ্বাস করবে না, আর লক্ষ্মীকান্ত দারোগা অত্যন্ত জঘন্য চরিত্রের লোক, সে তো কোনমতেই বিশ্বাস করবে না।

কেন?

এই সাধারণ সহজ কথাটা বুঝতে পারছেন না মিঃ রায়। পুলিশ বিশ্বাস করবেন না এ ব্যাপারে আমাদের কোন হাত বা যোগসাজস নেই। তাদের ধারণা আমরাই বসন্ত ভায়াকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছি। সে কোথাও যায়নি।

কিন্তু বাবা, লক্ষ্মীকান্ত দারোগাকেও নায়েবমশায় আলাদা চিঠি দিয়ে গিয়েছেন, লিখেছেন—, কথাটা বললে কল্যাণী।

চিঠি লিখে রেখে গিয়েছে—পুলিশের জাতও এমনি, ওসব চিঠির কথা বিশ্বাস করবে মনেও স্থান দিও না। সন্দিগ্ধ মন ওদের—সবেতেই ওরা সন্দেহ করে। স্টেশন পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। সেখানে স্টেশন মাস্টার পর্যন্ত নাকি বলেছে কলকাতাগামী ঐ সময় একটা ট্রেন ছিল কিন্তু ট্রেনটার স্টেশনে stoppage পর্যন্ত নেই, প্রথম শ্রেণীর প্যাসেঞ্জার এবং বিশেষ জরুরী প্রয়োজন বলিয়ে স্টেশন মাস্টারকে দিয়ে আগের জংশনে ফোন করিয়ে গাড়ি থামিয়ে সেই গাড়িতে নাকি বসন্ত সেন চলে গেছেন। লক্ষ্মীকান্ত সাহা স্টেশন মাস্টারের কথা পর্যন্ত বিশ্বাস করেনি, ছুটে ঐখান থেকেই কাছারীতে গিয়ে হাজির হয়েছে। কাছারীতে সব ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেছে, প্রত্যেকটি লোককে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে।

হুঁ। তাহলে দারোগা সাহেবের ধারণা বসন্তবাবুর কলকাতায় যাওয়ার জন্য ট্রেনে চাপাটাও চোখে ধুলো দেবার জন্যই? কথাটা যেন আবার বলে কল্যাণীই।

তা না হলে আর বলছি কি! এখানেও সে আসবে না ভাব! এলো বলে!

তা সেজন্য এত চিন্তারই বা কি আছে সান্যালমশাই। আসুন না তিনি। স্বচক্ষে এসে দেখেই যান না হয়। মনের মধ্যে সন্দেহ একটা পুষে রাখার চাইতে সন্দেহটা মিটিয়ে নেওয়াই তো ভাল। জবাব দেয় কিরীটী মৃদু হাস্য-তরল কণ্ঠে।

এদিকে আরো একটা মুস্কিল হয়ে গিয়েছে যে মা সবিতা! এবারে সান্যাল এতক্ষণ নির্বাক স্থাণুর মত দণ্ডায়মান সবিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, কাছারীতে গিয়ে আমি সব কাজকর্ম দেখতে যাওয়ায় নানা প্রশ্ন সব শুরু হল। বাধ্য হয়েই কতকটা তাই আমাকে প্রকাশ করতে হল, বসন্তকে থানায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে। যেই না ওই কথা আমার মুখ থেকে শোনা, সঙ্গে সঙ্গে অমনি চারিদিক থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুরু হয়ে গেল। কেন, কি বৃত্তান্ত, সাত-সতের। দয়াময় এ বৃদ্ধ বয়সে কি যে ঝামেলার মধ্যে এনে আমাকে ফেললেন! জীবনে মিথ্যার আশ্রয় আজ পর্যন্ত নিইনি। মিথ্যা বলি কি করে! বাধ্য হয়েই সব খুলে বলতে হল। আর কি বলবো, শুরু হয়ে গেল কর্মচারীদের মধ্যে যত কল্পনা আর জল্পনা। নানা ধরনের প্রশ্ন, মিথ্যা কথা তো বলতে পারবো না, পালিয়ে এলাম। কি করি এখন বল তো মা?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন সান্যাল সবিতার মুখের দিকে।

সবিতার কানে কিন্তু সান্যালের অত বড় দীর্ঘ বক্তৃতার কিছুই প্রবেশ করেনি।

সে তখন হতে বসন্ত সেনের পত্রটা পাওয়া অবধি পত্রমধ্যে বসন্ত সেন লিখিত কথাগুলোই ভাবছিল। মনের মধ্যে তার তোলপাড় করে ফিরছিল চিঠির কথাগুলোই।

কিরীটীকে চলে যাবার জন্য অনুরোধ জানাতে বিশেষ করে লিখেছেন বসন্ত কাকা। লিখেছেন তিনি, সেই মৃতাত্মার প্রতি যদি তার এতটুকু সম্মান, শ্রদ্ধা বা কর্তব্য থাকে তাহলে যেন তাঁর (পিতার) মৃত্যু-রহস্যের অনুসন্ধানের ব্যাপার হতে সে নিবৃত্ত হয়। কয়েকদিন ধরে তার মনের মধ্যে যে একটা সন্দেহের বিশ্রী কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করছে, তারপর পারিবারিক ইতিহাসে কোথায় যেন একটা জটিলতা জড়িয়ে আছে—সেটা স্বভাবতই একদিন সকলে ভুলে গিয়েছিল, অতীতের অন্ধকারে চাপা পড়ে গিয়েছিল, এইভাবে খোঁচাখুঁচি করতে গেলে হয়ত অতীতের সেই বিস্মৃতিপ্রায় জটিল কাহিনী দিনের আলোয় প্রকাশ হয়ে পড়বে। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে হয়ত গোখ্‌রো সাপ ফণা তুলে বের হয়ে আসবে—হানবে মৃত্যু ছোবল।

তবে কি সে কিরীটীকে বিদায় দেবে?

কিন্তু কেমন করে? কেমন করে এখন সে বলবে কিরীটীবাবুকে যে আপনি ফিরে যান মিঃ রায়?

কিন্তু কিরীটীবাবু এখন ফিরে গেলেই কি সব চাপা যাবে? সবাই সব কথা যাবে ভুলে? না, তা আর তো হবে না। কেউ কোনদিন ভুলবে না, ভুলতে পারে না। মুখে না বললেও ইঙ্গিতে হাবেভাবে প্রকাশ করবে। প্রকাশ না হলেও আড়ালে মুখ টিপে হাসাহাসি করবে, তার চাইতে সত্য যা প্রকাশ হোক। সংশয়ের এ পীড়ন থেকে মুক্তি হোক। সত্যিই যদি পারিবারিক কোনও কলঙ্ক তাদের থেকেই থাকে জানুক সকলে। ধনী জমিদারদের বংশে অমন কত কলঙ্ক থাকে। অপমানের ভয়ে লজ্জার ভয়ে আজ তাকে এড়িয়ে গেলেই

তা থেকে মুক্তি মিলবে না। পাপের, অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত যে করতেই হবে পূর্ব-পুরুষদের পরবর্তী বংশধরদের। হ্যাঁ, যদি কোন পাপ থেকেই থাকে তার পিতার, কন্যা সে তার প্রায়শ্চিত্ত করবে। ভয় পাবে না সে। সত্যকে সে অস্বীকার করবে না। বংশের কোন অজ্ঞাত পাপ যদি তাকে স্পর্শ করেই থাকে, ফলভোগ তাকে করতে হবে বৈকি। কিন্তু সত্যজিৎ, সত্যজিৎকে যদি হারাতে হয়? হারাতে হয় হারাবে। সত্যের জন্য কর্তব্যের জন্য দিতে যদি হয়ই, যদি হয়ই আবশ্যক, দেবে সে তার প্রেমকে বলিদান। কঠিন প্রতিজ্ঞায় সবিতা নিজেকে দৃঢ় করে তোলে। এবং এতক্ষণে কতকটা যেন সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে সান্যালের দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কি বলছিলেন মামাবাবু?

বলছিলাম বসন্তের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে কাছারী ও অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে বিশ্রী একটা সন্দেহ জেগেছে। মৃদুকণ্ঠে বললেন সান্যাল।

সেটা তো খুব স্বাভাবিক মামাবাবু। এ ধরনের ব্যাপারে ওরকম একটু-আধটু গোলমাল হৈচৈ হয়েই থাকে। এজন্য বিচলিত হলে তো আমাদের চলবে না। কালকে আপনার সঙ্গে আমিও একবার কাছারী ও অফিসে যাবো।

তুমি? তুমি যাবে? না, না—তার কোন প্রয়োজন হবে না। শক্ত হতে আমিও জানি। আমি দেখছিলাম কেবল আজ ব্যাটাদের দৌড়। বিকেলের দিকে গিয়ে সব ঠিক করে দিচ্ছি। মুহূর্তে নিত্যানন্দের কথার ধাঁচ পর্যন্ত পাল্টে গেল। কণ্ঠের সুর গেল বদলে।

ইতিমধ্যে সকলের পশ্চাতে সন্তোষ চৌধুরী যে কখন এসে দাঁড়িয়েছে এবং ওদের সকল আলাপ-আলোচনাও শুনেছে ধৈর্যের সঙ্গে নিঃশব্দে, ওরা কেউ টেরই পায় নি, এমন কি ওর উপস্থিতিটা পর্যন্ত। এতক্ষণে সন্তোষ চৌধুরী কথা বললে, সবিতা, তোমার যদি আপত্তি না থাকে—তুমি যদি আমার সম্পর্কটা স্বীকার করে নিতে দ্বিধা না করো—

উপস্থিত সকলেই বক্তা সন্তোষ চৌধুরীর দিকে ফিরে তাকাল। সন্তোষ চৌধুরীর কথা তখনও শেষ হয় নি, সে বলছিল, আমিও নায়েব ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে গিয়ে উপস্থিত থেকে সব দেখাশোনা করতে পারি।

না, না—তোমার মানে আপনার এখন এসব ব্যাপারে না যাওয়াই ভাল সন্তোষবাবু। প্রতিবাদটা জানালেন নিত্যানন্দ সান্যাল।

কেন? ক্ষতি কি তাতে? ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে তাকায় সন্তোষ চৌধুরী সান্যালের দিকে।

বুঝলেন না এটা? এখনও তো এ বাড়ির সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্কই প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ওতে করে আরো হয়ত ব্যাপারটা জটিল হয়েই উঠবে।

আমি এই বাড়িরই ছেলে। এখন আমিই বলতে গেলে সবিতার সব চাইতে নিকটতম আত্মীয়—ঝামেলার কোন কথাই তো এতে উঠতে পারে না।

আহা, আপনি ঠিক বুঝছেন না! আপনি কি বলেন মিঃ রায়?

বক্তব্যের শেষাংশটুকু সান্যাল পার্শ্বেই দণ্ডায়মান কিরীটীর দিকে ফিরে তাকিয়ে শেষ করলেন।

আপনাদের ঘরোয়া পারিবারিক ব্যাপারের মধ্যে আমার মতামত দেওয়াটা ঠিক শোভন হবে না সান্যাল মশাই। মৃদুকণ্ঠে কিরীটী জবাব দেয়।

কারোরই কিছু করতে হবে না মামাবাবু। নায়েব কাকা ফিরে না আসা

পর্যন্ত—যতদিন না সব গোলমাল মেটে, দেখাশোনা সব আমিই, হ্যাঁ—আমিই করবো। দৃঢ় সতেজ কণ্ঠে সবিতা বলে।

তুমি দেখবে! পাগলী! এসব ব্যবসা জমিদারীর ব্যাপার কি তুমি বুঝবে? কিছু তোমায় ভাবতে হবে না মা। আমি যখন এসে উপস্থিত হয়েছিই—

না মামাবাবু, আপনাকে আর কষ্ট দেব না। বুড়ো মানুষ আপনি, কটা দিন এখানে থাকলেই মনে বল-ভরসা পাবো। যা দেখবার আজ থেকে আমি দেখবো। বলে উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিল, বনমালী—বনমালী!

সবিতার ডাকে সাড়া দিয়ে বনমালী এসে হাজির হল, আমাকে ডাকছিলেন দিদিমণি?

হ্যাঁ, লছমনকে স্টেশনে পাঠিয়ে দে, টম্‌টম্‌টা নিয়ে আসুক। বিকেলে আমি কাছারীতে যাবো—

বনমালী চলে গেল।

এবার সবিতা কিরীটীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, মিঃ রায়, দয়া করে যদি আপনি এখন আমার ঘরে একবার আসেন উপরে। আপনার সংগে আমার কিছু জরুরী কথা ছিল।

আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে অতঃপর দৃঢ় সংযত পদবিক্ষেপে রাজেন্দ্রাণীর মতই অন্দরের দিকে এগিয়ে গেল। সকলে বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সবিতার গমনপথের দিকে।

আড়চোখে এবার তাকাল কিরীটী সান্যালের মুখের দিকে, প্রশান্ত মুখমণ্ডল প্রসন্ন হাসিতে যেন ঝলমল করছে।

কোথায়ও মুখের মধ্যে এতটুকু বিরাগ বা আক্রোশের চিহ্নমাত্রও নেই। কিরীটী অগ্রসর হলো ভিতরে যাবার জন্য।

প্রভু! তোমার লীলা দয়াময়। মা কল্যাণী, উপাসনার একটু আয়োজন করে দেবে চল তো মা জননী! নিরাকার পরম ব্রহ্ম কোন্ পথে যে কখন আমাদের চালিত করে নিয়ে যাচ্ছেন তা তিনিই জানেন। ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।

নিত্যানন্দ ভিতরের দিকে পা বাড়ালেন।

কল্যাণী অনুসরণ করল পিতাকে।

কেবল স্তব্ধ নির্বাক সন্তোষ একাকী পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সবিতা তার নিজের ঘরে একটা আরাম-কেদারার উপরে হেলান দিয়ে অর্ধশায়িত ভাবে চোখ বুজে নিঃশব্দে পড়েছিল, কিরীটীর পদশব্দ দোরগোড়া পর্যন্ত এলেও তার শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করল না। টের পায় না সে।

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে ডাকল, সবিতা দেবী!

চোখ মেলে তাকাল সবিতা, ওঃ মিঃ রায়, আসুন ভিতরে আসুন—, বলতে বলতে সবিতা কেদারাটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

কিরীটী ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করতেই সবিতা ভিতর থেকে ঘরের দরজাটায় খিল তুলে বন্ধ করে দিল।

বসুন মিঃ রায়।

দুজনেই উপবেশন করে মুখোমুখি দুটো কেদারায়।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।

কিরীটী পকেট হতে একটা সিগার বের করে অগ্নিসংযোগ করল।

নায়েব কাকার চিঠিটা পড়লেন তো মিঃ রায় ?

কিরীটী সবিতার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললে, হুঁ। শুধু চিঠিতেই আপনাকে বসন্তবাবু আমাকে এ ব্যাপারে নিবৃত্ত করতে বলেননি, আজ সকালে যাবার সময় নিজেও আমাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন ফিরে যাবার জন্য।

হুঁ। আপনি—আপনি তাতে কি জবাব দিয়েছেন ?

বলেছি আপনি আমাকে নিযুক্ত করেছেন, আপনি বললেই আমি চলে যেতে পারি। এখন আমার থাকা না-থাকাটা অবশ্য আপনার উপরেই নির্ভর করছে। তা আপনি কি বলেন ?

আমি !

হ্যাঁ।

শুনুন মিঃ রায়, যত বড় দুঃখ ও লজ্জার ব্যাপারই হোক না কেন, এর শেষ আমি দেখতে চাই। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বেশ।

কিন্তু একটা কথা মিঃ রায়—

বলুন ?

সত্যিই কি আপনি মনে করেন এ রহস্য আপনি উদ্ঘাটন করতে পারবেন ?

আমি আপনার এখানে এসেছি দিন পাঁচেক মাত্র। আর পাঁচটা দিন আমাকে সময় দিন সবিতা দেবী।

আর পাঁচ দিনের মধ্যেই ? বিস্মিতা সবিতা তাকাল কিরীটীর মুখের প্রতি।

হ্যাঁ। পাঁচদিন বলছি, হয়ত তা নাও লাগতে পারে। তবে তার বেশী প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না। ভাল কথা, সত্যজিৎবাবুকে দেখছি না যে ?

সদরে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন।

আপনার একটু আগেকার দৃঢ়তায় আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি সবিতা দেবী। এবং আপনি জানেন না, অজ্ঞাতেই সম্পূর্ণভাবে আপনি সমস্ত পরিস্থিতিরই একটা আকস্মিক মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। তারপর কতকটা যেন অস্ফুট আত্মগতভাবে বলে, I wanted this ! I wanted—now I am to see and wait !

কি বললেন ?

না, কিছু না। আচ্ছা আমি নিচে যাচ্ছি। কিরীটী ঘরের দরজা খুলে বাইরে চলে গেল। এবং সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অস্ফুটভাবেই পূর্বের মত বলতে থাকে, I hear the foot-steps ! আসবে—এবারে সে আসবে।

স্বপ্নোত্থিতের মতই যেন অকস্মাৎ কিরীটীর সমস্ত চেতনা, অনুভূতি সজাগ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। চিন্তার ঘন কুজ্ঝটিকা-জাল একটু একটু করে মুক্তির আলোকসম্পাতে দূরীভূত হতে শুরু করেছে।

আর দেরি নেই।

রাত্রি কত হবে? হাত-ঘড়িটার দিকে একবার তাকাল কিরীটী, পৌনে এগারটা।

অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্তে কিরীটী সুইমিং-কস্টিউমটা পরে নিয়ে তার উপরে ধুতিটা মালকোঁচা দিয়ে পরিধান করে নিল।

মাথায় এ'টে নিয়েছে সাঁতার দেবার একটা কালো রঙের রবারের তৈরি সুইমিং ক্যাপ। পায়ে রবার-সু।

ঘরের আলোটা কমিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে কক্ষ হতে বের হয়ে এলো কিরীটী দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে।

সত্যজিৎ সদর হতে ফেরে নি। ঘরের মধ্যে সে তাই একাই ছিল।

এর মধ্যেই সমগ্র প্রমোদভবন যেন ঘুমের নিঃসীম অতলে তলিয়ে গিয়েছে। পা টিপে টিপে সিঁড়ি-পথ অতিক্রম করে ভিতরের আঙিনা পার হয়ে পূর্ব-দিনের ঘরের মধ্যেকার সেই পথ দিয়েই নন্দনকাননে যাবার পথে এসে দাঁড়াল কিরীটী।

মাথার উপরে রাত্রির আকাশে শুক্লাত্রয়োদশীর চাঁদ। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে অদূরে নন্দনকানন, দিগন্তপ্রসারী বৌরাণীর বিল কেমন যেন স্বপ্ন-বিহ্বল।

দ্রুতপদে কিরীটী নন্দনকাননে এসে পৌঁছল। পূর্বদিনের সেই স্থানটি চিনে নিতে কিরীটীর কষ্ট হয় না। তারপর ধীরে ধীরে জলের মধ্যে গিয়ে নামল।

গ্রীষ্মের রাত, বেশ গরম বোধ হচ্ছিল, বিলের শীতল জলে আকণ্ঠ ডুবিয়ে শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। কিরীটী সম্মুখদিকে দৃষ্টি রেখে দ্রুত হস্ত-সঞ্চালনে জল কেটে সাঁতরে চলল।

ক্ষীণ চন্দ্রাকিরণস্নাত বিলের জলে সাঁতরাতে সাঁতরাতে কিরীটীর মনের মধ্যে কেমন যেন নেশা জাগে। মনে পড়ে বঙ্কিমের চন্দ্রশেখরের প্রতাপ ও শৈবলিনীর চন্দ্রালোকিত রাত্রে গঙ্গার বুকে সাঁতার দেবার কথা।

কিরীটী এগিয়ে চলে।

স্বপ্নের চাইতেও বর্তমানে যে চিন্তা তাকে এই রাত্রে বৌরাণীর বিলের জলে এনে ফেলেছে, ঐ অস্পষ্ট দূরবর্তী অন্ধকার বৃক্ষ-সমাকুল তটরেখা—সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কিরীটী সাঁতরে চলে আরও দ্বিগুণ উৎসাহে।

অনেকটা পথ চলে এসেছে কিরীটী।

সহসা তার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল অস্পষ্ট ক্ষীণ সঙ্গীতের সুরে। উৎকর্ণ হয়ে ওঠে কিরীটী সন্তরণ দিতে দিতেই। জলের মধ্যে গানের সুর! হ্যাঁ, সত্যি কে যেন গান গাইছে অল্প দূরে কোথাও। গানের সুরকে অনুসরণ করে কিরীটী আরও খানিকটা দ্রুত নিঃশব্দে সাঁতরিয়ে এগিয়ে যায়।

ক্রমে স্পষ্ট—আরো স্পষ্ট শোনা যায় এবার গানের সুরলহরী।

কি মধুর! কিবা অপরূপ কণ্ঠ! চন্দ্রালোকিত এই নিশীথ রাত্রি যেন বীণাবাদন করছে। গানের সুর-মূর্ছনায় যেন আকাশ বাতাস দিগন্ত প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে।

আরো কিছুটা অগ্রসর হবার পর সহসা এতক্ষণে কিরীটীর নজরে পড়ে তীরের সন্নিকটে একটি ছোট ভাসমান নৌকা জলের মধ্যে। ভাসমান সেই নৌকার উপরে বসেই ধীরে ধীরে বৈঠা দিয়ে জল কাটতে কাটতে আপন মনে

সম্বিৎহারা হয়ে কে যেন গান গেয়ে চলেছে।

আরো একটু এগিয়ে গেল কিরীটী সন্তর্পণে।

চন্দ্রালোকে এবারে গায়িকা নৌকার উপরে উপবিষ্টা চন্দ্রলেখাকে চিনতে কিরীটীর কষ্ট হয় না।

গায়ে একটা পাতলা জরির ওড়না চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। বক্ষের দুপাশ দিয়ে ঝুলছে পাকানো মত দুটি বেণী।

আশ্চর্যই হয়ে যায় কিরীটী এত রাত্রে নৌকায় বসে চন্দ্রলেখাকে গান গাইতে শুনে।

কে জানে ওর দাদু হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে! সেই ফাঁকে চন্দ্রা নৌকা নিয়ে বিলের জলে ভেসে পড়েছে এই রাত্রে।

কি একটা উর্দু গান গাইছে চন্দ্রা। গানের ভাষা না বুঝলেও ভারি মিষ্টি কিন্তু লাগে কিরীটীর গানের ভাব।

কিরীটী এবারে একটু অন্ধকার দেখে তীরের এক অংশে সাঁতরে গিয়ে ওঠে এবং উঠে ভিজে কষ্টিউমটা গা হতে খুলে ধুতিটা পরে নিল।

চন্দ্রা তখনও আপন মনে গান গাইছে। কিরীটী আলোছায়া-খচিত পথ দিয়ে বাড়িটার দিকে এগিয়ে চলল।

দিনের বেলায় আজ যখন প্রৌঢ় সুরযমলের সঙ্গে এই দিকে এসেছিল তখুনি বেশ ভাল করে চারিদিক দেখে রেখেছিল। বাড়ির পশ্চাৎভাগে পৌঁছাতে তার কষ্ট হয় না।

এদিককার দরজাটা ভেজানো ছিল মাত্র। বোধ হয় চন্দ্রলেখাই ভেজিয়ে রেখে গিয়েছে।

সন্তর্পণে ভেজানো দরজাটা ঠেলে ফাঁক করে কিরীটী ভিতরে প্রবেশ করল, সামনেই অপ্রশস্ত একটি আঙিনা।

অস্তগামী চন্দ্রালোকে চারিদিক তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে একবার দেখে নেয় কিরীটী।

ঘরের প্লিন্থ মাটি হতে প্রায় হাতখানেক উঁচু। তারপরেই একটা বারান্দা মত। বারান্দার উপরে এসে উঠলো কিরীটী।

পর পর তিনটি ঘর। দুটি ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। একখানা ঘরের ঈষদন্মুক্ত দ্বারপথে আসছে মৃদু আলোর একটুখানি আভাস।

পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল কিরীটী প্রথমেই সেই কক্ষের দিকে।

আলগোছে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপরে ভর করে দরজার সামান্য ফাঁক দিয়েই ঘরের মধ্যে উঁকি দিল। ঘরের এক কোণে দেওয়াল ঘেঁষে মাটির প্রদীপাধারের উপরে একটি মৃৎপ্রদীপ জ্বলছে মিট্‌মিট্‌ করে।

প্রদীপের সেই ক্ষীণালোকেই তীক্ষ্ম অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে কিরীটী কক্ষের চতুঃপার্শ্ব দেখে নিল। শূন্য কক্ষ।

এক কোণে একটা খাটিয়ার উপরে শূন্য শয্যা। তারই পাশে একটা মাটির কলসী, একটা গ্লাস। দেওয়ালে পেরেকের সাহায্যে দড়ি টাঙিয়ে খানকতক শাড়িকাপড় ঝোলানো।

কিরীটীর বুঝতে কষ্ট হয় না এই ঘরেই শোয় চন্দ্রলেখা। এটা তারই শয়নকক্ষ নিশ্চয়ই।

এইটা যদি চন্দ্রলেখার শয়নকক্ষ হয় তো ওর দাদু সুরযমলের ঘর

কোন্‌টা? কোন্‌ ঘরে তাহলে সুরযমল থাকে?

বাকী দুটো ঘর তো দেখছে ও তালাবন্ধ। তবে কি সুরযমল এই দুটো ঘরেরই কোন একটাতে থাকে! এখন নেই, কোথায় গিয়েছে! কিন্তু এত রাত্রে সে কোথায়ই বা যাবে বা যেতে পারে তার বয়সের তরুণী নাতনীকে একাকিনী এই নির্জন জঙ্গলের মধ্যে একা বাড়িতে রেখে?

তবে রাজপুত এরা, এদেশের লোকদের মত ভীতু তো নয়। তাছাড়া রাজপুতের মেয়ে আত্মরক্ষা করতেও হয়ত জানে।

সহসা এমন সময় অস্ফুটকাতর একটা শব্দে ও যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই থমকে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে উৎকীর্ণ হয়ে ওঠে। শিকারী বিড়ালের মতই সজাগ হয়ে ওঠে।

অস্ফুট কাতরোক্তি। স্পষ্ট ও শুনেছে।

উৎকর্ণ হয়ে আছে কিরীটী, অসম্ভব কিছুর একটা প্রতীক্ষায় ওর সমস্ত দেহটা যেন কঠিন ঋজু হয়ে উঠেছে।

আঙিনার উপরে চাঁদের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। কোথায় অন্ধকারে একটা তক্ষক টক্‌ টক্‌ করে শব্দ করে উঠলো, নিস্তব্ধ রজনী যেন ককিয়ে উঠলো। কুৎসিত শব্দটা যেন নিস্তব্ধ রজনীর বুকে একটা ভয়াবহ ইঙ্গিত দিয়ে গেল কোন আশু অশুভ অমঙ্গলের। আবার শোনা গেল অস্পষ্ট কাতরোক্তি। ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠের যন্ত্রণাকাতর শব্দ যেন। মনে হয় বুঝি একটা বুকচাপা দীর্ঘশ্বাস নিশুতি রাতের স্তব্ধতায় মর্মায়িত হয়ে উঠেছে।

কাতর শব্দটা আবার কানে ভেসে এলো। এবারে কিরীটীর মনে হলো যেন পাশেরই কোন ঘর থেকে শব্দটা অস্পষ্টভাবেই ভেসে আসছে।

সতর্ক দৃষ্টিতে তাকায় কিরীটী আধো আলো আধো ছায়া ঘেরা বারান্দার চারদিকে।

কোথা হতে আসছে শব্দটা শ্রবণেন্দ্রিয়কে সজাগ করে বোঝবার চেষ্টা করে।

ঐ তালাবন্ধ দুটো ঘরের একটা ঘর হতে কি? পায়ে পায়ে সন্তর্পণে এগিয়ে যায় কিরীটী প্রথম ঘরটার দিকে।

আবার সেই অস্পষ্ট কাতরোক্তি।

সহসা আবার কিরীটী থমকে দাঁড়াল। বহুদূর হতে যেন ভেসে আসছে দ্রুত ধাবমান অশ্বক্ষুরধ্বনি।

খট্‌ খট্‌—খট্‌ খট্‌—খট্‌ —

ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

কোন অশ্বারোহী হয়ত এই দিকেই আসছে।

ঘরের দিকে আর যাওয়া হল না। অস্পষ্ট কাতরোক্তি ক্ষণপূর্বে কোথা হতে আসছে তার আর সন্ধান করা হল না কিরীটীর। মুহূর্তে সে নিজের সংকটময় পরিস্থিতিটা সম্যক উপলব্ধি করে কর্মপন্থা স্থির করে ফেলে। অত্যন্ত দ্রুত ক্ষিপ্রপদে কিরীটী আঙিনাটা অতিক্রম করে বাড়িটার সম্মুখভাগে এসে দাঁড়াল। সকালবেলাতেই ঐদিন কিরীটী লক্ষ্য করেছিল একটা বড় শিমুল গাছ ও তেঁতুল গাছ পাশাপাশি একটা জায়গায় বাড়িটার সামনে দক্ষিণ দিকে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছায়া বিস্তার করে।

কিরীটী দ্রুতপদে সেই দুটি বৃক্ষের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করে

দাঁড়াল।

অশ্বক্ষুরধ্বনি এখন আরো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। অশ্বারোহী দ্রুতগতিতে এই দিকেই অশ্ব ছুটিয়ে আসছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই অশ্বারোহী বাড়ির সামনে এসে বেগবান অশ্বের রাশ টেনে অশ্বের গতি রোধ করল। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিরীটী দেখল দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি অশ্ব হতে অবতরণ করল।

কিন্তু অশ্বারোহীকে চিনবার উপায় নেই। সর্বাঙ্গ একটা কালো মখ্‌মলের আংরাখায় আবৃত। মুখাবয়বেরও প্রায় সবটাই কালো একটা রুমালে ঢাকা।

অশ্বারোহী ধীর মন্থর পদে চাবুকটা হাতের মুঠোর মধ্যে ধরেই এগিয়ে চলল বাড়িটার দিকে।

দৃঢ় বলিষ্ঠ পদবিক্ষেপ। চলার মধ্যে কোন সংকোচ বা দ্বিধামাত্রও যেন নেই।

স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো দ্রুত কিরীটী উল্টে যায়, মনে করবার চেষ্টা করে আগন্তুকের চলার ভঙ্গীটা—কোন পরিচিতজনের চলার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে কিনা।

কিরীটী কিন্তু বৃক্ষের আড়াল হতে বের হয়ে আসে না বা আগন্তুককে অনুসরণ করবার চেষ্টা করে না। নিশ্চেষ্ট হয়েই অপেক্ষা করে।

সে স্পষ্ট দেখতে পেল এক সময় আগন্তুক বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বৃক্ষের আড়াল থেকে বের হয়ে আবার বাড়ির দিকে অগ্রসর হবে কিনা ভাবছে এমন সময় অতর্কিতেই কিরীটী যেন চমকে ওঠে আবার পদশব্দে।

শুকনো ঝড়া পাতা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে মচ্‌মচ্‌ করে, কে যেন ধীর মন্থর পদে পশ্চাতের গাছপালার দিক থেকে হেঁটে আসছে।

চকিতে কিরীটী আধো আলো আধো অন্ধকারে পশ্চাতের দিকে তাকিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল। একটা অস্পষ্ট আবছা মূর্তি এগিয়ে আসছে। পদভরে তার শুকনো ঝরা পাতাগুলো মচ্‌মচ্‌ শব্দে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

মূর্তি ক্রমে আরো এগিয়ে আসে। অস্পষ্ট আলোছায়াতেও কিরীটীর এবারে চিনতে কিন্তু কষ্ট হয় না।

সুরযমল সিং—

সুরযমল এগিয়ে বাড়ির মধ্যেই গিয়ে প্রবেশ করল।

কিরীটী তথাপি নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে।

অপেক্ষাই করবে সে।

বোধ হয় মিনিট পনের বাদে আকাশে চাঁদের সামান্য অবশিষ্ট আলোকটুকুও যেন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

চাঁদ অস্তমিত।

চারিদিক একটা অস্পষ্ট ধূসর আবহাওয়ায় যেন রহস্যঘন হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ কিরীটী সচকিত হয়ে উঠল। পূর্বের সেই আগন্তুক ও সুরযমল প্রায় পাশাপাশি দুজনে হাঁটিতে বাড়ির ভিতর হতে বের হয়ে এলো।

নিম্নকণ্ঠে দুজনে তখনও যেন কি কথা বলছে পরস্পরের মধ্যে হিন্দী

ভাষাতেই। প্রথমটায় ওদের কারো কোন কথাই কিরীটী বুঝতে পারে না। ক্রমে হাঁটতে হাঁটতে ওরা দুজনে যখন কিরীটী যেখানে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল আত্মগোপন করে তার খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে, ওদের দু'একটা শব্দ খাপছাড়া অসংলগ্ন ভাবে ওর কানে এলেও সঠিক কিছু বুঝে উঠতে পারে না।

এগিয়ে যেতে যেতে একসময় দুজনেই কিরীটী যে গাছ দুটোর আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল তার হাত দেড়েক তফাতে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

এবারে ওদের কথাও স্পষ্ট শুনতে পেল কিরীটী।

সুরযমল বলছিল, তোমাকে তো বললাম বাবুজী, আর এভাবে এখানে আমি দেশ মুলুক ছেড়ে থাকতে পারব না।

চাপা ভারী কণ্ঠে প্রত্যুত্তর এলো, শোন সুরযমল, তোমারই ভালর জন্য এ ব্যবস্থা করেছি আমি।

কিন্তু—

আর বেশীদিন থাকতে হবে না। কাজ শেষ হয়ে এসেছে প্রায়।

ঝুটমুট তুমি এখানে আমাকে ধরে রেখেছ বাবুজী। এতদিন তো হয়ে গেল তোমার কথায় কথায়—

সুরযমল, ছেলেমানুষী করো না।

না বাবুজী, আর নয়। সামনের শনিবারই চলে যাবো।

পাগলা, তা হতে পারে না।

আমি যাবোই। মিথ্যেই তুমি আমাকে অনুরোধ করছো।

সুরযমল শোন, আমার বিনা হুকুমে এখান হতে যদি এক পা-ও নড়, তাহলে—

বাবুজী, ভুলে যাচ্ছো সুরযমল রাজপুতের বাচ্ছা। ও চোখরাঙানিকে থোড়াই কেয়ার করে।

দ্বিতীয় বক্তার কণ্ঠস্বর সহসা এর পর যেন একেবারে খাদে নেমে এলো, এতদূর এগিয়ে এসে এভাবে সব নষ্ট করো না সুরযমল। তোমারই ভালর জন্য বলছি আমি। আর একটা সপ্তাহ তুমি অপেক্ষা কর। এতদিনই তো অপেক্ষা করলে।

সুরযমল কোন প্রত্যুত্তর দেয় না। চুপ করেই থাকে।

কাল আবার দেখা হবে। আর মনে থাকে যেন যা বলে গেলাম। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে কি যেন মনে পড়ে গিয়েছে এইভাবে জামার ভিতর হাত চালিয়ে একমুঠো নোট বের করে সুরযমলের দিকে এগিয়ে দিল, এই নাও, এই টাকাগুলো রাখো। আমি চললাম।

সুরযমল হাত বাড়িয়ে নোটগুলো নিল।

অতঃপর আগন্তুক এগিয়ে অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহী হয়ে নিমেষে অশ্বকে ছুটিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। দূর হতে বিলীয়মান অশ্বক্ষুরধ্বনি ভেসে আসে খট্‌ খট্‌ খট্‌। ক্রমে মিলিয়ে যায়। সুরযমল আরো কিছুক্ষণ স্থাণুর মত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে একসময় বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

পুনর্বার বিল সাঁতরে প্রমোদভবনে এসে যখন পৌঁছল কিরীটী, রাত তখন প্রায় তিনটে হবে। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর অবসন্ন।

প্রমোদভবনটা মনে হচ্ছে যেন ঘুমে একেবারে পাথর হয়ে আছে।

বাতাসে ঝাউগাছের সরু সরু চিকন পাতাগুলো সোঁ সোঁ করুণ একটা শব্দে নিশীথের স্তব্ধতাকে একঘেয়ে ভাবে বিদীর্ণ করে চলেছে।

আর কোন শব্দ শোনা যায় না।

পূর্বের পথেই কিরীটী প্রমোদভবনে প্রবেশ করে আঙ্গিনা অতিক্রম করে ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করল।

সিঁড়ি-পথের দেওয়ালে আলোটা টিম্‌টিম্‌ করে জ্বলছে।

ঘোলাটে আলোয় সমস্ত সিঁড়ির পথটা যেন কেমন ছম্‌ছম্‌ করছে।

সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠেছে কিরীটী, নিচের বারান্দায় যেন কার পদশব্দ পাওয়া গেল। সিঁড়ির দিকেই কেউ এগিয়ে আসছে।

মুহূর্তে যেন কিরীটী সক্রিয় হয়ে ওঠে। নিঃশব্দ অথচ অত্যন্ত ক্ষিপ্র-গতিতে বাকী সিঁড়িগুলো কতকটা লাফ দিয়ে দিয়েই অতিক্রম করে কিরীটী দোতলার বারান্দায় উঠে সোজা একেবারে নিজের ঘরের দরজাটা ঠেলে ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করল। ঘরের আলোটা তেমনি কমানো, পিট্‌ পিট্‌ করে জ্বলছে। শয্যার দিকে তাকিয়ে দেখলো পাশাপাশি দুটি শয্যা তার ও সত্যজিতের, দুটিই শূন্য।

কিন্তু অত ভাববারও সময় নেই কিরীটীর। চকিতে ফুঁ দিয়ে চিমনির উপর ঘরের একটিমাত্র আলো নির্বাপিত করে দিল সে।

নিমেষে নিশ্ছিদ্র আঁধার যেন সমস্ত কক্ষটি গ্রাস করে নিল।

কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দ। কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় দুটি সজাগ। উৎকর্ণ।

চোখের দৃষ্টিতে ঘরের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ক্রমে সহ্য হয়ে আসে।

সতর্ক নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে অতঃপর কিরীটী এগিয়ে গেল কক্ষের ভেজানো দরজাটার দিকে।

কবাট দুটো ঈষৎ ফাঁক করে বাইরের মৃদু আলোকিত বারান্দায় দৃষ্টিপাত করলে কিরীটী। শুনতে ভুল করেনি। পদশব্দই। কে যেন সিঁড়ি-পথে উপরেই উঠে আসছে।

পদশব্দ ক্রমেই উপরের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু একজোড়া তো নয়, দুজোড়া পায়ের শব্দ যে শুনেছে কিরীটী!

আশ্চর্য! এত রাত্রে কারা উপরে আসছে?

আরো আশ্চর্য হলো কিরীটী যখন দেখলো শুনতে তার ভুল হয়নি—দুজনই!

সত্যজিৎ ও কল্যাণী। এবং পরস্পর ওরা হাত-ধরাধরি করে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে।

কল্যাণী ও সত্যজিৎ! এত রাত্রে দুজনে নিচে ওরা কোথায় ছিল

সবিতা দেবী! সবিতা দেবী কোথায়?

তুমি ঠিক দেখেছ তো কল্যাণী, তুমি যখন বিছানা ছেড়ে উঠে আস, সবিতা ঘুমিয়েই ছিল? কল্যাণীর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে সত্যজিৎ।

হ্যাঁ। মৃদু চপল হাসি কল্যাণীর ওষ্ঠপ্রান্তে, নাক ডাকাচ্ছিল।

এর মধ্যে যদি সে উঠে থাকে বা ঘুম ভেঙে গিয়ে থাকে?

দিন চারেক তো শুচ্ছি ওর সঙ্গে। গাঢ় ঘুম—এক ঘুমে রাত কাবার করে। কিন্তু কিরীটীবাবু—

এতক্ষণে তিনিও হয়ত নাক ডাকাচ্ছেন। চাপা হাসির সঙ্গে জবাব দেয় সত্যজিৎ।

বারান্দার ওয়াল-ক্লকটা এমন সময় ঢং ঢং করে বাজতে শুরু করল।

রাত্রি চারটে।

শেষ হয়ে এলো রাত।

উঃ রাত চারটে, চলি! ত্বরিতপদে কল্যাণী তার ঘরের দিকে চলে গেল।

কিরীটীও আর মুহূর্ত মাত্র দেরি করে না। সোজা ক্ষিপ্রপদে অন্ধকারেই গিয়ে শয্যার উপরে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

চোখ বুজেই পড়ে থাকে অন্ধকারে কিরীটী কান দুটো সজাগ রেখে। একটু পরেই ভেজানো কপাট খুলে গেল। নিঃশব্দে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল সত্যজিৎ। ওর পায়ের শব্দেই কিরীটী টের পায়।

কিরীটী যে অবস্থায় ছিল ঠিক সেই অবস্থায়ই শয্যায় শুয়ে পড়েছে। ভাল করে জলও মোছবার অবকাশ পায়নি, বেশটাও বদলাতে পারেনি।

সত্যজিৎ পকেট হতে টর্চ বের করে বোতাম টিপল। টর্চের আলোয় ঘরের চারিদিক একেবার দেখে নিল। শায়িত কিরীটীর মুদ্রিত চোখের পাতায় টর্চের তীব্র আলোর রশ্মিটা মুহূর্তের জন্য এসে পড়ে, কিরীটী বুঝতে পারে।

কিরীটীকে ঐ অবস্থায় শুয়ে ঘুমোতে দেখে সত্যজিৎ একটু অবাকই হয়।

এগিয়ে গেল সত্যজিৎ টেবিলের উপরে রক্ষিত আলোটা ফিরে আবার জ্বালাবার জন্য। টেবিলের উপরেই দিয়াশলাইটা ছিল।

দিয়াশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়ে—হাত বাড়িয়ে আলো হতে চিমনিটা খুলে হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তপ্ত কাচের চিমনির স্পর্শে উঃ করে একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সত্যজিতের হাত হতে চিমনিটা মেঝেতে পড়ে গিয়ে ঝনঝন শব্দে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়।

যেন হঠাৎ চিমনি ভাঙার শব্দেই আচম্‌কা ঘুমটা ভেঙে গিয়েছে, ধড়ফড় করে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি নিয়ে কিরীটী অন্ধকারেই শয্যার উপরে উঠে বসে প্রশ্ন করল, কে? কি হলো?

অপ্রতিভ সত্যজিৎ তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, আমি। কিরীটীবাবু, আমি। আলো জ্বালতে গিয়ে হাত হতে হঠাৎ চিমনিটা পড়ে ভেঙে গেল।

দাঁড়ান, নড়বেন না। ভাঙা কাচের টুকরোতে পা কাটবেন। আমার একটা ছোট হ্যারিকেন আছে, জ্বালাচ্ছি। কিরীটী শয্যা হতে নেমে ঘরের কোণে রক্ষিত একপাশে তার সঙ্গে আনা ছোট দামী লণ্ঠনটি তুলে নিয়ে বললে, দিয়াশলাই আছে—দিন তো দিয়াশলাইটা! ছুঁড়ে দিন এদিকে।

হাত বাড়িয়ে অন্ধকারেই টেবিলের উপর থেকে দিয়াশলাইটা খুঁজে নিয়ে কিরীটীর-দিকে অন্ধকারে ছুঁড়ে দিল সত্যজিৎ, অল্প চেষ্টাতেই কিরীটী আলোটা জ্বালল।

ঘরের অন্ধকার দূরীভূত হল উজ্জ্বল আলোয়।

বাতিটা ছোট হলেও প্রচুর আলো হয়।

হাতের বাতিটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে এতক্ষণে কিরীটী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সম্মুখে স্থির দণ্ডায়মান সত্যজিতের দিকে।

বাইরের দেওয়ালে ওয়াল-ক্লকটা বাজতে শুরু করে—ঢং—ঢং—

এক দুই তিন চার পাঁচ—

রাত শেষ হয়ে এলো, এই ফিরছেন বুঝি? ফিরতে এত দেরি হলো যে সত্যজিৎবাবু?

কিরীটীর প্রশ্নে বারেকের জন্য মুখ তুলে তাকাল সত্যজিৎ কিরীটীর দিকে, কিন্তু ওর প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উপর হতে সিগারকেসটা তুলে নিয়ে তা থেকে একটা সিগার বের করে সিগারটায় অগ্নিসংযোগ করল।

জ্বলন্ত সিগারটায় গোটাকয়েক টান দিয়ে কিরীটী আবার সত্যজিতের দিকে তাকাল।

সত্যজিৎ তখনও একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। স্থির নির্বাক।

বসুন সত্যজিৎবাবু। আপনার সঙ্গে কয়েকটা আমার কথা আছে।

সত্যজিৎ তথাপি নির্বাক।

বসুন!

এবার সত্যজিৎ চেয়ারটার ওপরে উপবেশন করল।

শুনুন সত্যজিৎবাবু, সবিতা দেবীর ব্যাপারে এখানে আমি এলেও এখানে আমার আসবার যে যোগাযোগ সেটা আপনার দ্বারাই হয়েছে। বলতে গেলে আপনিই সেদিন আমাকে এখানে এনেছেন।

সত্যজিৎ কিরীটীর দিকে চোখ তুলে তাকাল।

এখানে আসবার পর এই কদিনের অনুসন্ধানে—কিরীটী মৃদুভাবে বলতে লাগল, যতটুকু আমি জেনেছি বা বুঝেছি, সবিতা দেবীর পিতা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর মৃত্যুর ব্যাপারটা অতীতের একটা অত্যন্ত জটিল কাহিনীর সঙ্গে জড়িত আছে এটা স্পষ্টই বোঝা গেছে এবং আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তাহলে দু'চার দিনের মধ্যেই আর একটা বড় রকমের দুর্ঘটনাও যে ঘটবে সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। অবশ্য আমি যাতে এই অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনাটা না ঘটে সে চেষ্টাই করছি। কিন্তু এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে আমি বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছি, যে অবস্থায় সবিতা দেবীকে বাদ দিয়ে আমি আশা করছিলাম অন্ততঃ আপনার সাহায্য আমি পাবই, এই জটিল রহস্যের পাক খাওয়া সূত্রগুলোর—

কিরীটীর কথা শেষ হলো না, সত্যজিৎ কথা বললে, আমি তো সর্বদাই প্রথম হতে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত মিঃ রায়।

তাই যদি হবে তাহলে গত কদিন হতেই লক্ষ্য করছিলাম আমি, আপনি আমাকে avoid করেই চলেছেন। এবং শুধু তাই নয়, সব কথাও আপনি আমাকে খুলে বলছেন না!

কে বললে? যা যা এখানে এসে আমি জেনেছি সবই তো খুলে আপনাকে আমি বলেছি।

না, বলেননি। কিরীটীর কণ্ঠস্বরটা যেন হঠাৎ কেমন কঠিন মনে হয়।

কি বলছেন আপনি মিঃ রায় ?

ঠিকই বলছি। এই কদিনেই আপনি যে কল্যাণী দেবীর সঙ্গে সবিতা দেবীর অজ্ঞাতেই এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, কই এই কথাটা তো—

মিঃ রায় !

আমি ঘুমোইনি—জেগেই ছিলাম সত্যজিৎবাবু এতক্ষণ !

আপনি জেগে ছিলেন ?

হ্যাঁ। এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ এত রাত্রে সিঁড়িতে পদশব্দ পেয়ে কৌতূহলের বশেই এগিয়ে গিয়েছিলাম কে এত রাত্রে উপরে আসছে দেখবার জন্য। আপনাকে ও কল্যাণী দেবীকে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে হাত-ধরাধরি করে উঠে আসতে দেখে একটু বিস্মিতই হয়েছিলাম ; কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি সত্যজিৎবাবু, তার চাইতেও বিস্মিত হয়েছি আমার ভুল ভেঙে যাওয়াতে।

আপনার ভুল ভেঙে যাওয়ায় ! কি ভুল ?

সবিতা দেবী ও আপনার মধ্যে যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছে বলে আমি অনুমান করেছিলাম, এখন দেখছি সেটা ভুল !

না, ভুল নয় কিরীটীবাবু।

ভুল নয় ? বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে কিরীটী সত্যজিতের মুখের দিকে তাকাল।

না। এবং সবিতা সব জানে।

সবিতা দেবী সব জানেন ! আপনার ও কল্যাণীর—

হ্যাঁ, সে জানে।

কি বলছেন আপনি সত্যজিৎবাবু ? সব জেনেশুনে সবিতা দেবী—

হ্যাঁ, কারণ তার ও আমার সম্পর্কটা পূর্বের মতই অটুট আছে। কোন-প্রকার সন্দেহ বা গোলমাল হবার অবকাশ এখনও ঘটেনি আমাদের পরস্পরের মধ্যে।

কিরীটীও যেন সত্যিই কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে। কণ্ঠে তার স্বর ফোটে না। কিছুক্ষণ সে স্তব্ধ হয়েই বসে থাকে।

সহসা বিদ্যুৎ-চমকের মত একটা কথা তার মনের মধ্যে উদয় হওয়ায় সত্যজিতের দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, তাহলে সেরাত্রে আপনিই কি কানাইয়ের মার শোবার ঘরে—যে ঘর হতে সে নিরুদ্দিষ্টা হয়, সেই ঘরে গিয়েছিলেন ?

এবারে সত্যজিতের চমকাবার পালা। চমকে সে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল, আপনি সে কথা জানলেন কি করে মিঃ রায় ?

সে কথা পরে হবে, তার আগে আমি জানতে চাই, তাহলে আপনি last person এ বাড়ির মধ্যে যিনি শেষবারের মত কানাইয়ের মাকে সেরাত্রে এ বাড়ি হতে নিরুদ্দিষ্টা হবার পূর্বে দেখেছিলেন—and not I ! But at what time ! রাত তখন ক'টা মনে আছে কি আপনার ?

কানাইয়ের মার ঘর হতে আসি রাত বোধ করি তখন পোনে একটা হবে। গোপন না করে এবারে সত্যজিৎ বলে।

কিরীটী কিছুক্ষণ অতঃপর নিজের মনেই কি যেন চিন্তা করে এবং পরে মৃদুকণ্ঠে বলে, হুঁ ! তাহলে রাত একটার পর কোন এক সময়ে she was removed !

আপনার কি ধারণা মিঃ রায়, তাহলে তাকে কেউ জোর করেই—

সত্যজিতের কথা শেষ হয় না, কিরীটীই আবার পাল্টা প্রশ্ন করে, অবশ্যই এবং তাকে আমার যতদূর অনুমান কতকটা বাধ্য করা হয়েছিল এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্য! কিন্তু আপনার কি অন্য রকম কিছু বলে মনে হয় সত্যজিৎ-বাবু? কিরীটী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সত্যজিতের মুখের দিকে।

আমার মনে—, সত্যজিৎ যেন কেমন ইতস্তত করতে থাকে।

বলুন! বলুন! কি বলতে চান বলুন সত্যজিৎবাবু? বলুন সে রাত্রে হঠাৎ কেন আপনি নিচের মহলে কানাইয়ের মার ঘরে গিয়েছিলেন? কেন? কি কথা হয়েছিল আপনাদের মধ্যে? কিরীটীর কণ্ঠস্বরে যেন একটু অনুনয়, ব্যগ্রতা ঝরে পড়ে।

আপনার অনুমানই বোধ হয় ঠিক মিঃ রায়। আমি গিয়ে দেখি, কানাইয়ের মা already যেন যাবার জন্য তৈরি। ছোটমত একটা পুঁটলিতে খানকয়েক কাপড় ও টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বেঁধে একপ্রকার প্রস্তুত হয়েই আছে—কিন্তু আপনি সেটা অনুমান করলেন কি করে, আমি তো কারো কাছেই ও-কথা বলিনি। এমন কি—

এমন কি সবিতা দেবীর কাছেও বলেননি! বেশ করেছেন। আমি জানতে পেরেছি কি করে, আপনি জিজ্ঞাসা করছিলেন না? আপনার নস্যি নেওয়ার অভ্যাস আছে একমাত্র এ বাড়িতে, তাই না? সে নস্যি কিছু পড়ে আছে আমি ঘরের মেঝেতে পরের দিন সকালে দেখতে পেয়েছিলাম। তাছাড়াও ঐদিন সকালে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবার পর আপনার মুখের দিকে তাকিয়েও স্পষ্টই আমি বুঝলাম you have something under your sleeve! কিন্তু আপনি গোপন করেছেন এবং সেটা অবশ্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, কিছুক্ষণ পরেই কানাইয়ের মার ঘরে গিয়ে মেঝেতে নস্যির গুঁড়ো পড়ে থাকতে দেখে। কিন্তু কেন? কেন আপনি কানাইয়ের মার সঙ্গে অত রাত্রে দেখা করতে গিয়েছিলেন? কিরীটী যেন আবার তার পূর্বের প্রশ্নেই ফিরে এলো।

কারণ আমি তাকে সন্দেহ করেছিলাম। আরো অনেক কিছুই এ ব্যাপারের সে জানে। এ-বাড়ির বহুদিনের পুরাতন দাসী সে—আমার ধারণা হয়েছিল নিশ্চয়ই সে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর জীবনের এমন কোন রহস্যময় গোপন ব্যাপার জানে—

ঠিক তাই। সে জানত—আপনার ধারণা নির্ভুল। মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর জীবনের কোন জটিল গোপনীয় ঘটনা সে জানত এবং সেই কারণেই তাকে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছে।

তবে কি নায়েব বসন্ত সেনই? উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করে সত্যজিৎ।

না, বসন্ত সেন হত্যাকারী নন। তবে—

তবে?

মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর হত্যাকারীকে হয় তিনি জানেন, না হয় হত্যার কারণ তিনি জানেন।

বলেন কি! তা সত্ত্বেও তিনি সব কথা এভাবে গোপন করেছেন?

হ্যাঁ করেছেন। তারও কারণ হয়ত, আর কোন উপায় ছিল না।

তাই যদি হবে তাহলে এভাবে ধরা না দিয়ে নায়েব বসন্ত সেন mysteriously গা-ঢাকা দিলেন কেন?

ঐ একই কারণেই হয়ত—, কিরীটী আবার বলে।

কিন্তু এতে করে কি লাভ হল?

তাঁর লাভ হোক আর নাই হোক, অন্ততঃ আমার লাভ হয়েছে। গা-ঢাকা দিয়ে তাঁর একান্ত অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতেই তিনি আমাকে এই হত্যা-রহস্যের তদন্তের ব্যাপারে কিছু সময় দিয়েছেন যেটার প্রয়োজন আমার একান্ত ভাবেই হয়েছিল। কিন্তু আর একটা কথা সত্যজিৎবাবু—

বলুন?

আপনার ও কল্যাণী দেবী সম্পর্কে—

আজ নয়। আর একটা দিন আপনার কাছে সময় চাই মিঃ রায়। কাল—আগামী কাল সব কথা কল্যাণী সম্পর্কে আপনাকে খুলে বলব।

হয়ত তার আর কোন প্রয়োজন হবে না। মৃদুকণ্ঠে কিরীটী প্রত্যুত্তর দেয়। কিরীটী চেয়ার হতে উঠে এগিয়ে গিয়ে বিলের দিককার জানলার কবাট দুটো আরো ভাল করে খুলে দেয়।

রাতের আকাশ অত্যাসন্ন প্রভাতের প্রথম আলোর স্পর্শে ক্রমে ক্রমে লালচে হয়ে উঠছে।

ভোর হয়ে এলো।

মৃদুমন্দ রাত্রি-শেষের স্নিগ্ধ বায়ু কিরীটীর জাগরণ-ক্লান্ত চোখে একটা ঝাপটা দিয়ে গেল।

সত্যজিৎ এগিয়ে গিয়ে কাচের ভাঙা টুকরোগুলো এক এক করে মেঝের উপর থেকে কুড়িয়ে একটা কাগজের উপরে তুলতে লাগল।

দিগন্তপ্রসারী বৌরাণী বিলের বুকের উপর হতে রাত্রিশেষের ঘোলাটে পর্দাটা একটু একটু করে কে যেন টেনে তুলে নিচ্ছে।

অদূরে নন্দনকাননে গাছপালাগুলোও ক্রমে দৃষ্টির সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ভাঙা কাচের টুকরোগুলো কাগজের মধ্যে জড়ো করে সত্যজিৎ ঘরের বাইরে চলে গেল।

থানায় গিয়ে একবার দারোগা লক্ষ্মীকান্ত সাহার সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন।

কিরীটী আশা করেছিল, গত সন্ধ্যায়ই লক্ষ্মীকান্ত বসন্ত সেনের ব্যাপারে হয়ত প্রমোদভবনে আসবে, কিন্তু আসেনি।

কিরীটী একটু যেন আশ্চর্যই হয়েছে লক্ষ্মীকান্ত আসেনি দেখে।

সন্তোষ চৌধুরীকে থানায় নিয়ে যাবার পর কি এমন সে লক্ষ্মীকান্তকে বলেছে যাতে করে সেই রাত্রেই লক্ষ্মীকান্তকে বসন্ত সেনের সঙ্গে দেখা করতে আসতে হয়েছিল?

অবশ্য লক্ষ্মীকান্ত গতকাল সকালে বলেছিল সে থানায় গেলে নাকি অনেক interesting ব্যাপার জানতে পারত।

লক্ষ্মীকান্তর কথায় কিরীটী বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি এই কারণেই যে সে অনুমান করেছিল নিশ্চয়ই সে সব সন্তোষের কাছে শোনা কোন ঘটনা বা তার কাছে প্রাপ্ত চিঠিপত্রের মধ্যে কোন সংবাদ পেয়েছে, যাতে করে লক্ষ্মীকান্ত উত্তেজিত হয়ে এখানে ছুটে এসেছিল।

লক্ষ্মীকান্তর সঙ্গে এখন একবার দেখা করা প্রয়োজন।

প্রথম ভোরের আলো খোলা জানলাপথে কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল।

হঠাৎ কিরীটীর খেয়াল হয়, ভাঙা কাচের টুকরোগুলো ফেলবার অছিলায় সেই যে কিছুক্ষণ পূর্বে সত্যজিৎ এ ঘর হতে বের হয়ে গেল আর ফিরে আসেনি।

সহসা একটা কথা কিরীটীর মনে পড়ে যায়, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর ড্রয়ারের মধ্যে প্রাপ্ত দেবনাগরী অক্ষরে লেখা চিঠির বাণ্ডিলটা।

চিঠিগুলো সব পড়া হয়নি।

ঘরের দরজায় খিল তুলে দিয়ে কিরীটী চিঠির ফিতে বাঁধা বাণ্ডিলটা সুটকেসের ভিতর হতে টেনে বের করল।

চেয়ারে বসে চিঠির বাণ্ডিলটা খুলল কিরীটী।

বহুদিন আগেকার লেখা। কাগজগুলো লালচে হয়ে গিয়েছে। কালিও যেন অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

প্রত্যেকটি চিঠির শুরুতে সম্বোধন করেছে বাবুজী বলে এবং চিঠির শেষে নাম দস্তখত করেছে কোন এক লক্ষ্মণ।

আটখানা চিঠি। হাতের বাঁকা লেখা ও নাম দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না প্রত্যেকটি চিঠির লেখক একই ব্যক্তি এবং চিঠিগুলো দু'এক মাস তো বটেই, কোন কোন চিঠি আবার ছ মাস বা এক বৎসরের ব্যবধানে লেখা হয়েছে।

একটা চিঠিতে লেখাঃ

সে মরেছে। আমিও মরবো। কিন্তু মরতে পারছি না কেবল একজনের মুখ চেয়ে। ওর যাহোক একটা ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত মরতে পারছি না। তাছাড়া চেৎ সিং, সেও তোমাকে নিষ্কৃতি দেবে না।

কে এই চেৎ সিং!

আর একখানা চিঠিঃ

চেৎ সিং তোমাকে একদিন খুঁজে পাবেই, কারণ আমার স্থির ধারণা চেৎ সিং তোমারই খোঁজে মুলুক ছেড়েছে। চেৎ সিংয়ের বুকের পাঁজরা তুমি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছো। হায়, কেন সেদিন তোমায় বিশ্বাস করেছিলাম! লোভের উপযুক্ত শাস্তিই আমার মিলেছে।

আরো পরের একখানা চিঠি এবং সর্বশেষ চিঠিই বোধ হয়ঃ

এইবার আমি নিশ্চিন্ত। চেৎ সিং আমায় জানিয়েছে সে তোমার সংবাদ পেয়েছে, কিন্তু এই দুঃখ আমার থেকে গেল—তোমার সংবাদটা শোনা পর্যন্ত আর হয়ত আমার বাঁচা হবে না।

বন্ধ দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেল, মিঃ রায়!

কিরীটী চমকে ওঠে, কে?

দরজাটা খুলুন মিঃ রায়। আপনার চা এনেছি।

কল্যাণীর গলা।

ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিগুলো কোনমতে গুছিয়ে কিরীটী বাণ্ডিলটা সুটকেসের মধ্যে ভরে ফেলে।

দরজাটা খুলতেই দেখা গেল ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে প্রসন্ন হাস্যমুখে দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে কল্যাণী।

ঘুমোচ্ছিলেন নাকি এখনো? প্রশ্ন করে কল্যাণী চায়ের কাপ হাতে ঘরে প্রবেশ করতে করতে।

না। আসুন, সুপ্রভাত!

চায়ের কাপটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে কল্যাণী বলে, কাল রাত্রে আমাদের ঘরে কেউ বোধ হয় এসেছিল মিঃ রায়!

চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিয়ে কিরীটী সবেমাত্র চুমুক দিয়েছিল, কল্যাণীর কথায় চকিতে ওর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

অবাক হচ্ছেন নিশ্চয়ই এবং বোধ হয় বিশ্বাস করতে চাইছেন না আমার কথা?

দুটোর একটাও নয় কল্যাণী দেবী। কিন্তু কিসে বুঝলেন আপনি?

কল্যাণী বোধ হয় লক্ষ্য করলে না যে কিরীটী তাকে 'তুমি'র বদলে আবার 'আপনি' বলে কথা বলছে।

ঘুম ভেঙেছে প্রথমে আমারই—উঠেই দেখি ঘরে কতগুলো জুতোর অস্পষ্ট ছাপ—

ঘুম ভেঙেছে! কতটুকু সময় তাহলে ঘুমিয়েছিলেন?

মানে? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল কল্যাণী কিরীটীর প্রশ্নভরা দুই চোখের দিকে।

আমার চাইতে সে কথাটা কি আপনি ভাল জানেন না কল্যাণী দেবী!

কল্যাণী কিন্তু নিরুত্তর।

তার কণ্ঠে কোন ভাষাই যোগায় না যেন।

ঘরে তো গেলেন ভোর পাঁচটায়। ঘুমোবার সময় পেলেন কখন?

এবারে কিরীটী লক্ষ্য করে, কল্যাণীর সমস্ত মুখখানা যেন একটা চাপা রক্তিমাভা ধারণ করেছে।

কল্যাণী দেবী! মৃদুকণ্ঠে কিরীটী আবার ডাকে।

কল্যাণী তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

ঠিক এমনি সময় সবিতা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল, মিঃ রায়!

আসুন সবিতা দেবী। সুপ্রভাত। রাত্রে নিশ্চয়ই কাল খুব গভীর নিদ্রা দিয়েছিলেন!

প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে সবিতা তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

যাক্, আপনার সৌভাগ্য বলতে হবে, গতরাত্রে আপনার কোন ক্ষতি হয়নি!

আপনি—

হ্যাঁ। এইমাত্র কল্যাণী দেবীর মুখেই শুনলাম আপনার শয়নঘরের দরজা খোলা পেয়ে সেই সুযোগে কে নাকি আপনার শয়নঘরে অনধিকার প্রবেশ করেছিলেন। এবং এও বোঝাই যাচ্ছে যিনিই গতরাত্রে আপনার শয়নঘরে প্রবেশ করে থাকুন না কেন, সুযোগের অভাবে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি।

কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না মিঃ রায়, কেউ যে গতরাত্রে কোন এক সময় আমার ঘরে প্রবেশ করেছিল সন্দেহ নেই সত্যি, কিন্তু কি করে সেটা আদৌ সম্ভব হলো? আমি ও কল্যাণী শোবার আগে, নিজে হাতে আমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম ঘরের—, সবিতা বিহ্বলভাবে কথাগুলো বললে।

কিরীটী কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে বারেকের জন্য কল্যাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে সবিতার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, বন্ধ থাকলেই বা! কারো

খুলতে তো সেটা কষ্ট হতে পারে না!

কিন্তু আমি বা কল্যাণী কেউই তো রাত্রে আমরা উঠিনি! সবিতা আবার বলে।

আপনি ওঠেননি এটা ঠিকই, কিন্তু কল্যাণী দেবী? কিরীটী প্রশ্ন করল।

না, কলিও ওঠেনি। আমাদের দুজনের ঘুম প্রায় একই সংগে ভেঙেছে। সবিতা জবাব দেয়।

সে প্রশ্নের মীমাংসা পরে করলেও চলবে। আগে একবার চলুন দেখি, দেখে আসি আপনার ঘরটা। কল্যাণী দেবী বলছিলেন আপনার শয়নঘরের মেঝেতে নাকি কার জুতোর অস্পষ্ট ছাপ রয়েছে!

আলোচনাটা যেন কতকটা ইচ্ছে করেই বন্ধ করে দিয়ে কিরীটী চেয়ার হতে উঠে সবিতাকে নিয়ে অগ্রসর হল তার ঘরের দিকে।

শ্লথ মন্থর পায়ে কল্যাণীও ওদের অনুসরণ করল।

অস্পষ্ট জুতোর ছাপই বটে।

এবং সেই পূর্বের ক্রেপসোল দেওয়া জুতোরই ছাপ কয়েকটা ঘরের মেঝেতে তখনও রয়েছে।

কিরীটী তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে ছাপগুলো পরীক্ষা করে দেখে আর একবার ঘরের চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল।

সবিতার নিদ্রিত অবস্থায় যে সময়টা কল্যাণী ঘরে ছিল না এবং ঘরের দরজা খোলা ছিল সেই সুযোগেই কেউ এসেছিল এই ঘরে সুনিশ্চিত।

কিন্তু কেন? কি উদ্দেশ্যে এসেছিল সে?

নিশ্চয়ই একেবারে বিনা উদ্দেশ্যে কেউ গতরাত্রে কল্যাণীর অবর্তমান ঘরে আসেনি এবং সম্ভবতঃ রাত্রে ঠিক এ সময় কল্যাণী যে ঘরে থাকবে না এবং দরজা খোলাই থাকবে তাও তো নিশীথ আগন্তুক জানত না!

কিন্তু—

পরক্ষণেই যেন কিরীটীর সন্দিগ্ধ মন প্রশ্নে আবর্তিত হয়ে ওঠে।

অপাঙ্গে একবার অদূরে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান কল্যাণীর মুখের দিকে না তাকিয়ে পারে না কিরীটী।

আবার কিরীটী মেঝের উপরে জুতোর ছাপগুলোর দিকে তাকাল।

সবিতার পালঙ্কের একেবারে কাছ-বরাবর ঘেঁষে জুতোর ছাপগুলো।

ঘরের দক্ষিণ দিক ঘেঁষে দুটো শয্যা, একটা সবিতার দামী পালঙ্কের উপরে, অন্যটা হাত দুই ব্যবধানে কল্যাণীর, ছোট একটা তক্তপোশের উপরে।

দুটি খাটের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় মেঝেতেই জুতোর ছাপগুলো রয়েছে।

সহসা কিরীটী সবিতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, আপনাদের মধ্যে কে প্রথম ঐ ছাপগুলো দেখতে পান মিস চৌধুরী?

কল্যাণী। ওই আমাকে পরে দেখায়।

দরজার বাইরে এমন সময় ভৃত্যের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, দিদিমণি?

কে রে?

কলকাতা থেকে উকীলবাবু এসেছেন। মামাবাবু আপনাকে একবার এখুনি নিচে ডেকে দিতে বললেন।

যান মিস্ চৌধুরী। বোধ হয় কলকাতা থেকে আপনাদের সলিসিটার

অতীনলাল বোস এসেছেন। কিরীটীই এবারে সবিতার দিকে তাকিয়ে বললে।

মিঃ বোস, সলিসিটার! তাঁর আসবার কথা ছিল কই—

হ্যাঁ, নায়েব বসন্তবাবুই তাঁকে আসতে লিখেছিলেন আপনার বাবার উইল সংক্রান্ত ব্যাপারেই। কিরীটী জবাব দিল।

বাবার উইলের ব্যাপারে?

হ্যাঁ। যদিও সাধারণভাবে বিচার করে দেখতে গেলে আপনিই আপনার পিতার যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী, তাহলেও সকলের অজ্ঞাতে যদি উইলের মধ্যে অন্য কোন ব্যবস্থা বা এমন কোন প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে গিয়ে থাকেন যেটা জানা দরকার, সেদিক দিয়েও তো উইলের মধ্যে কি লেখা আছে বা না আছে আপনার জানা দরকার সবিতা দেবী। যান নিচে যান।

আপনিও আসুন মিঃ রায়!

কিন্তু আমার সেখানে থাকাটা কি উচিত হবে সবিতা দেবী? আমি তো আপনাদের ফ্যামিলির কেউ নই, সম্পূর্ণ তৃতীয় ব্যক্তি!

তা হোক, আপনি চলুন। সত্যজিৎবাবু কোথায়?

তিনি তো অনেকক্ষণ ঘর থেকে বের হয়ে এসেছেন, জানি না তো! কিরীটী জবাব দেয়।

তুমি দেখ তো কল্যাণী, সত্যজিৎবাবু কোথায়? কল্যাণীর দিকে ফিরে তাকিয়ে সবিতা কথাটা বললে।

সকাল থেকে কই সত্যজিতের সঙ্গে তো আমার দেখাও হয়নি!

কিরীটী চকিতে একবার কল্যাণীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললে, চলুন দেখা যাক, নিচেও হয়ত তিনি থাকতে পারেন।

নিচে বাইরের ঘরেই সত্যজিতের দেখা পাওয়া গেল।

নিত্যানন্দ সান্যাল একজন সাহেবী পোশাক পরিহিত সুশ্রী গৌরবর্ণ হৃষ্টপুষ্ট মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁদের পাশেই দাঁড়িয়েছিল সত্যজিৎ রায়।

ওদের সকলকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে নিত্যানন্দ সান্যালই আহ্বান জানালেন, এই যে সবি মা, এসো! ইনি অতীনলাল বোস, তোমাদের সলিসিটার। এবং উপবিষ্ট মিঃ বোসের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, মিঃ বোস, এই সবিতা—মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর একমাত্র মেয়ে।

নমস্কার মিস্ চৌধুরী—বসুন। বসন্তবাবুরই জরুরী চিঠি পেয়ে আমি আসছি, কিন্তু এখানে এসে ওঁর মুখে বসন্তবাবু সম্পর্কে সব কথা শুনে তো—

বিরক্তি ও ভ্রূকুটিপূর্ণ দৃষ্টিতে সবিতা সম্মুখেই উপবিষ্ট নিত্যানন্দ সান্যালের মুখের দিকে তাকাল এবং পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অতীনলালের দিকে তাকিয়ে বললে, কি আপনি শুনেছেন নায়েবকাকার সম্পর্কে মিঃ বোস, আমি জানি না—তবে আমি বলতে পারি, ব্যাপারটা সম্পূর্ণই একটা misunderstanding বা দারোগা লক্ষ্মীকান্তবাবুর misjudgement! যাক, সে আলোচনা বর্তমানে আমাদের না করলেও চলবে। আর আমার ইচ্ছাও নয় আপাতত ঐ বিষয় নিয়ে আর আলোচনা করবার। আপনি বোধ হয় বাবার উইল এনেছেন?

সবিতার অদ্ভুত সংযত কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত কথাগুলি কিরীটীকে বিস্মিত

করে। গতকাল দ্বিপ্রহরের দিকে জমিদারী দেখাশোনার ব্যাপারে সবিতার যে অদ্ভুত দৃঢ়তা ও সংযমের পরিচয় পেয়েছিল, আজও সবিতার কণ্ঠে যেন ঠিক সেই সুরটিই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

অকস্মাৎ কক্ষের মধ্যে যেন একটা অপ্রিয় পরিস্থিতি ঘনিয়ে ওঠে।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। কিছুক্ষণের জন্য একটা স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে বিরাজ করে।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে সলিসিটার অতীনলালই আবার কথা বললেন, হ্যাঁ, উইলটা আমি সঙ্গেই এনেছি বসন্তবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী। পূর্বের অপ্রিয় আলোচনাটা যেন কতকটা ইচ্ছা করেই সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে, একেবারে অন্য ধারায় বক্তব্য শুরু করলেন, তা সে যাই হোক, তিনি উপস্থিত যখন নেই-ই, আপনাদের সকলের সামনে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর উইলটা পড়তে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু উইল পড়বার আগে সবিতা দেবী আপনাকে আমার একটা প্রশ্ন আছে—এবং যে প্রশ্নের উপরে উইল এখন আর পড়া না-পড়াটা সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করছে। অতীনলাল সবিতার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সবিতা তাকায় অতীনলালের দিকে, প্রশ্ন?

হ্যাঁ। যে শিলমোহর-করা খামটা আপনার নামে তাঁর আয়রন-সেফে ছিল সেটা খুলে আপনি আপনার বাবার শেষ চিঠিটা পড়েছেন কি?

অতীনলালের প্রশ্নে মনে হল সবিতা যেন অতিমাত্রায় বিস্মিতা হয়েছে এবং বিস্ময়সন্দিগ্ধভরা কণ্ঠে কোনমতে বললে, বাবার আয়রন-সেফে আমার নামে শিলমোহর করা খামের মধ্যে তাঁর শেষ চিঠি?

হ্যাঁ, কেন পাননি আপনি সে চিঠি? আমার প্রতি মৃত্যুঞ্জয়বাবুর শেষ নির্দেশ ছিল, যে নির্দেশ তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর মাত্র আট দিন আগে জরুরী রেজিস্টার্ড একটা চিঠির মারফৎ পাই যে, এ চিঠি যেটা তিনি তাঁর সেফে রেখে গেলেন, আপনি খুলে না পড়া পর্যন্ত উইল যেন সর্বসমক্ষে তো নয়ই—আপনাকে পর্যন্তও যেন পড়ে না শোনানো হয়।

কিন্তু বাবার আয়রন-সেফ এবং যে টেবিলে বসে তিনি সাধারণতঃ লেখা-পড়া করতেন, সব আমি বসন্তকাকার কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে এখানে আসবার পরদিনই তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখেছি যদি কোন চিঠি বা এ ধরণের কোন কাগজপত্র পাওয়া যায় যাতে করে বাবার মৃত্যুর ব্যাপারে কোন হদিস পাওয়া যায়, কিন্তু কিছুই তো পাইনি!

সবিতার কথায় অতীনলাল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে কি যেন ভাবলেন। অতঃপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, এ অবস্থায় তাহলে নায়েববাবু ফিরে না আসা পর্যন্ত বা তাঁর কাছ হতে ঐ চিঠি সম্পর্কে সব না জানা পর্যন্ত তো উইলটা আমি পড়তে পারবো না সবিতা দেবী!

নিত্যানন্দ সান্যাল এবারে কথা বললেন, একটা কথা মিঃ বোস, ক্ষমা করবেন, অবশ্য না বলে এক্ষেত্রে আমি পারছি না। ধরুন যদি সে লেফাপাটার কোন হদিসই না পাওয়া যায়, তাহলে সবি মা কি তার উইলটা সম্পর্কেও জানতে পারবে না?

পারবেন। তবে কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে।

অপেক্ষা করতে হবে মাত্র ঐ সামান্য একটা কারণে?

কারণটা যে সামান্য, সে কথা আপনি জানলেন কি করে, মিঃ সান্যাল? ঐ

চিঠির বিষয়বস্তুর সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর উইলেরও এমন একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে যে, যাতে করে ঐ চিঠিটা পূর্বে না পড়া থাকলে উইলের বিষয়বস্তু সঠিকভাবে উপলব্ধিই করতে পারবেন না অন্ততঃ সবিতা দেবী।

তার মানে?

ক্ষমা করবেন মিঃ সান্যাল। বর্তমানে এর বেশী কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ যেটুকু আমি বলেছি ঐটুকুই চিঠিতে মৃত্যুর আগে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী আমাকে জানিয়েছিলেন। ঐ শিলমোহর করা লেফাপার মধ্যে চিঠিতে তিনি তাঁর মেয়েকে কি লিখেছিলেন বা না লিখেছিলেন, সে সম্পর্কে আমিও কিছু জানি না বিশ্বাস করুন।

দেখ মা—, সবিতাকে লক্ষ্য করে নিত্যানন্দ সান্যালই আবার কথা বললেন। এবং সকলেই নিত্যানন্দ সান্যালের মুখের দিকে তাকায়।

নিত্যানন্দ বললেন, তুমি মনে হয়ত দুঃখ পাবে মা আমার কথাটা শুনে, কিন্তু কথাটা আমি না বলেও পারছি না। জীবনে কোন দিন মিথ্যার আশ্রয় নিইনি—চিরদিন সত্যকেই জীবনের লক্ষ্য করে এসেছি এবং অপ্রিয় হলেও সত্য যখন মনে হচ্ছে, বলতে বাধ্য হচ্ছি কথাটা—আমারও এখন স্থিরবিশ্বাস হচ্ছে, এ কাজ বসন্ত ভায়ারই।

তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সবিতা তাকাল নিত্যানন্দ সান্যালের দিকে, না।

না, না, না—স্থিরভাবে বিবেচনা করে দেখো, সে ছাড়া আর কারো পক্ষেই মামাবাবু?

মা রে! চুলে পাক ধরেছে, বয়সও আমার অনেক হলো। এ বয়সে দেখলামও অনেক, অবশ্য বসন্ত ভায়াও আমার বহুদিনের এবং যথেষ্ট পরিচিত। এ কাজ তার দ্বারা সম্পন্ন হয়নি প্রমাণ হলে আমার চাইতে এ জগতে আর কেউ বেশী সুখী ও আনন্দিত হবে না হয়ত, তবু চক্ষুলজ্জার খাতিরে অপ্রিয় ও কষ্টকর বলে সত্যকে যদি আমরা অস্বীকার করি, তার চাইতে দুঃখ ও গ্লানি আর বেশী কিছু থাকবে না মা। তাই বলছিলাম, আমার মনে হয় এ কাজ তারই। ভেবে দেখো মা, তোমার পিতার আকস্মিক অপঘাতে মৃত্যুর পর একমাত্র এ বাড়িতে সে-ই তো এ কটা দিন ছিল। এবং তার হাতেই চাবি ছিল। বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে দেখতে গেলেও স্বভাবতই কি মনে হবে না যে, লেফাপাটা সরানো তার পক্ষে যতটা সহজ ও সুবিধা ছিল তেমন আর কারো পক্ষেই সুবিধা ছিল না। শুধু সেই নয় মা, আরো একটা কথা আমাদের এক্ষেত্রে ভাবতে হবে, মিঃ বোস যখন বলছেন মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর মাত্র কয়েক-দিন আগেই ওঁকে ঐ লেফাপার সংবাদ দিয়ে একটা জরুরী পত্র দিয়েছিলেন, তখন নিশ্চয় তাঁর Iron-safe-এ লেফাটা ছিল। এবং ছিলই যখন, তখন সেটা গেল কোথায়? চাবিবন্ধ Iron-safeএর ভিতর থেকে পাখা মেলে তো কিছু আর লেফাপাটা উধাও হয়ে যেতে পারে না!

উপস্থিত নিত্যানন্দ সান্যালের যুক্তিকে কেউ যেন অস্বীকার করতে পারে না, করবার উপায়ও নেই।

অতীনলালই বলেন, মিঃ সান্যাল ঠিকই বলেছেন সবিতা দেবী। কথাটা ভেবে দেখবার মত।

ভাবতে আর হবে না মিঃ বোস—

অতর্কিত কণ্ঠস্বরে সকলেই একসঙ্গে চমকে বক্তার দিকে ফিরে তাকায়

ঘরের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন। বক্তা সন্তোষ চৌধুরী।

কেউই ঘরের মধ্যে উপস্থিত ইতিমধ্যে টের পায়নি কখন একসময় সন্তোষ চৌধুরী সবার পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছে এবং তার উপস্থিতিটা না জানলেও ক্ষণপূর্বে ঘরের মধ্যে যে আলোচনাটা চলছিল সেটা সে শুনছে।

সন্তোষ চৌধুরী বক্তব্যটা শেষ করে, সেই শয়তানের কাজ! এখন সময় বুঝে ধরা পড়ে কৌশলে গা-ঢাকা দিয়েছে।

আপনি! আপনাকে তো চিনতে পারছি না? কথাটা বললেন মিঃ অতীনলাল সন্তোষকে লক্ষ্য করে।

আমি! আমার নাম সন্তোষ চৌধুরী, সবিতার জাঠতুতো ভাই আমি। ওর বাবা ও আমার বাবা আপন জাঠতুতো ভাই ছিলেন। দিন তিনেক হলো আমি এডেন থেকে এসে পেঁৗছেছি।

অতীনলাল সন্তোষ চৌধুরীর কথা শুনে তীব্র তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটি কথাও বললেন না।

এতক্ষণ পর্যন্ত কিরীটী একটিও কথা উচ্চারণ করেনি। একান্ত নির্লিপ্ত-ভাবেই চক্ষু কর্ণকে সজাগ রেখে এক পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে সকলের কথা শুনছিল এবং এখনও কোন কথাই বলল না—কেবল অতীনলালের সন্তোষ চৌধুরীর মুখের প্রতি নিবদ্ধ স্থিরসন্ধানী দৃষ্টিটাই তাকে যেন বিশেষভাবেই কৌতূহলী করে তুলল।

স্পষ্টই বুঝতে পারছিল কিরীটী, এবারে অতীনলাল কিছু একটা বলবেন। প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে কিরীটী।

আপনি সন্তোষ চৌধুরী? এডেন থেকে এসেছেন? ধীরকণ্ঠে অতীন-লাল সন্তোষের মুখের দিকে স্থির-নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েই প্রশ্নটা করলেন।

হ্যাঁ।

অদ্ভুত যোগাযোগ তো! এত আস্তে অতীনলালের কণ্ঠে কথাটা উচ্চারিত হল যে, একমাত্র কিরীটীর অতিমাত্র সজাগ শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত ঘরের মধ্যে উপস্থিত অন্য কারোরই শ্রবণে কথাটা প্রবেশ করল না। এমন কি সন্তোষ চৌধুরীও কথাটা শুনতে পেল না।

কি বললেন মিঃ বোস?

না, কিছু না! অতীনলাল শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন।

তাহলে উইলটা পড়বার কি হবে মিঃ বোস? প্রশ্নটা এবারে নিত্যানন্দ সান্যালই করলেন।

উইল! আরো দুটো দিন বসন্তবাবুর জন্য আমি অপেক্ষা করবো এখানে। পরশু সকালে উইল পড়ে শোনাব সকলকে। জবাব দিলেন অতীনলাল।

তুমি কি বল মা সবি? প্রশ্ন করলেন সান্যাল সবিতাকে।

ক্ষতি কি, তাই হবে। আপনি কি বলেন মিঃ রায়?

কালকের দিনটা তো মধ্যে, তাই হবে না হয়। কিরীটী জবাব দিল।

প্রভু হে, দয়াময়! মা কালি, আমার উপাসনার আয়োজন করে দেবে চল মা—বহুক্ষণ সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

নিত্যানন্দ সান্যাল অতঃপর কক্ষত্যাগ করবার জন্যই বোধ হয় চেয়ার হতে গাত্রোত্থান করে, দুয়ারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, তাহলে মিঃ অতীনলালের থাকা-খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দাও মা।

পথশ্রমে উনি ক্লান্ত—চায়ের ব্যবস্থা করো।

প্রশান্ত পদক্ষেপে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন সান্যাল। পশ্চাতে পশ্চাতে তাঁকে অনুসরণ করে কল্যাণী।

চাকর বেটারাই বা সব গেল কোথায়? ভদ্রলোককে যে এক কাপ চা দিতে হয়, সে হুঁশও কি বেটাদের নেই? এই বনমালী! বলতে বলতে সন্তোষ চৌধুরীও কক্ষ ত্যাগ করলেন।

সত্যজিৎ এরপর ইঙ্গিতে সবিতাকে ডেকে নিয়ে কক্ষ ত্যাগ করল।

॥ ২২ ॥

ঘরের মধ্যে এখন দুজন।

কিরীটী ও অতীনলাল সলিসিটার।

কিরীটীবাবু! এতক্ষণে সর্বপ্রথম অতীনলাল কিরীটীর দিকে তাকিয়ে সম্বোধন করলেন ওকে। দুজনেরই পূর্ব-পরিচয় ছিল, কিন্তু এতক্ষণ কেউ সেটা প্রকাশ করেননি।

গতকাল নায়েব বসন্ত সেনের মুখে অতীনলাল বোস সলিসিটারের নাম শোনা অবধিই কিরীটী ভাবছিল এ কোন্ অতীনলাল এবং আজ সলিসিটারের আসার সংবাদ পেয়ে এই ঘরে প্রবেশ করেই অতীনলালকে দেখে বুঝতে পেরেছিল ইনি তার পরিচিতই।

বলুন?

ব্যাপারটা যেন একটু ঘোরালই মনে হচ্ছে!

একটু নয়, বেশই ঘোরাল মিঃ বোস। মৃদুকণ্ঠে কিরীটী জবাব দেয়।

উইলটা পড়া সম্পর্কে কি করা যায় বলুন তো?

উইলের বিষয়বস্তু আপনার জানা আছে তো?

না। মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর এটা নতুন উইল। মাস দেড়েক আগে পূর্বের উইলটা বদলে তিনি এই নতুন উইলটা করেছিলেন। এ উইলটা যখন লেখা হয় আমি উপস্থিত ছিলাম না। ফেডারেল কোর্টে একটা মামলায় আমাকে দিল্লী যেতে হয়েছিল—আমার সিনিয়ার পার্টনার উইলটা করে দেন। হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমাকে উইলটা নিয়ে আসতে হয়েছে।

হুঁ। আচ্ছা একটু আগে যে বলছিলেন—মৃত্যুঞ্জয়বাবু নিহত হবার দিন আষ্টেক আগে যে জরুরী চিঠিটা লিখেছিলেন, সে চিঠিটা কি সঙ্গে এনেছেন?

হ্যাঁ।

দেখতে পারি কি চিঠিটা?

এই যে—, অতীনলাল তাঁর পোর্টফোলিওটা খুলে একটা লেফাপা বের করে তার ভিতর হতে একটা মুখ-কাটা রেজিস্ট্রী খাম বের করে দিলেন।

কিরীটী চিঠিটা খাম থেকে টেনে বার করল। চিঠিটা বোসের সিনিয়র পার্টনারকেই লেখা। এবং তারিখ দেখেই বোঝা যায় নিহত হবার ঠিক নদিন পূর্বে চিঠিটা মৃত্যুঞ্জয় লিখেছিলেন।

চিঠিটা অবশ্য সংক্ষিপ্ত। চিঠিতে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে, তিনি একটা

শিলমোহর করে চিঠি তাঁর মেয়ের নামে লেফাপার মধ্যে রেখে গেলেন ; সেই চিঠিটা তাঁর মেয়ে না পড়ার আগে যেন কোনমতেই উইল পড়ে শোনানো না হয় তাকে।

যাই হোক মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী লিখিত এই চিঠি ও লেফাপার মধ্যে শিল-মোহল করে যে গোপন চিঠি তিনি লিখে গিয়েছেন এবং মাত্র মাস দেড়েক আগে আবার নতুন করে উইল করার ব্যাপারে পূর্বের উইল বদল করে এ সব কিছু হতে একটা কথা কিরীটীর মনে স্বতই উদয় হয়, গত মাস-দুয়ের মধ্যে এমন কোন ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছিল যা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীকে যথেষ্ট বিচলিত করেছিল।

এবং যে কারণে তাঁকে উইল পর্যন্ত বদলাতে হয়েছিল।

চিঠিটা পড়ে কিরীটী সেটা অতীনলালের হাতে আবার ফেরত দেয়।

পূর্বের উইলে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী কিভাবে তাঁর সম্পত্তির ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন আপনার মনে আছে কি মিঃ বোস?

আছে, তবে details তো মনে নেই!

তবু বলুন তো শুনি?

দুই ভাগে সম্পত্তি ভাগ করা হয়েছিল—এক অংশ তাঁর মেয়ে সবিতা দেবী পাবেন। বাকী অর্ধেকের অর্ধাংশ যদি তার জাঠতুত ভাই রামশঙ্কর চৌধুরীর ছেলে সন্তোষ চৌধুরী ফিরে আসেন তো তিনি পাবেন, এবং অবশিষ্ট পাবেন সৌদামিনী দেবী বা তস্য পুত্র ধনঞ্জয়।

সৌদামিনী ও তস্য পুত্র ধনঞ্জয়—এ'রা কে?

তা ঠিক বলতে পারি না।

পূর্বের উইলে ওঁদের সম্পর্কে তাঁর কোন নির্দেশ বা পরিচিতি তো ছিল না?

আপনাকে বা আপনার সিনিয়র পার্টনারকেও ওঁদের পরিচয় দেননি?

আমি বা আমার পার্টনার কেউই জানি না, তবে বলেছিলেন মিঃ চৌধুরী যে সময়মত সে সব ব্যবস্থাই তিনি করে যাবেন।

কিরীটী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কি যেন ভাবে এবং সহসা একটা কথা মনে পড়ায় আবার প্রশ্ন করে, আচ্ছা মিঃ বোস, বলতে পারেন মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী যে তাঁর পূর্বেকার উইল বদল করে আবার নতুন উইল তৈরী করেছিলেন, এ সংবাদ বসন্তবাবু জানতেন কিনা?

মনে হয় জানতেন, কারণ প্রথমবারের উইলে বসন্তবাবু একজন সাক্ষী ছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়বারের উইলে শুনেছি আমার সিনিয়রের মুখেই, বসন্ত-বাবু সাক্ষী হিসাবে নামসই করেননি। তবে মৃত্যুঞ্জয়বাবু যদি বসন্তবাবুকে বলে থাকেন পরে এক সময়ে সেটা অবশ্য বলতে পারি না।

দ্বিতীয়বারের ঐ নতুন উইল সম্পর্কে আপনার কোন idea নেই তাহলে?

না।

ও সম্পর্কে কোন কথা আপনার সিনিয়রও কোন দিন আপনাকে বলেননি?

না।

কখনও সামান্য discussion—আলোচনাও হয়নি?

না।

ভৃত্য প্লেটে করে চা-জলখাবার নিয়ে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

* * *

ঐদিনই দ্বিপ্রহরে কিরীটী তার ঘরে সবিতাকে ডেকে পাঠিয়েছিল।

প্রয়োজনীয় কিছু আলোচনা ছিল সবিতার সঙ্গে ওর।

আজ রাত্রে—আপনি যে ঘরে ও যে শয্যায় শোন, সে ঘরে ও সেই শয্যায় আপনার শোয়া চলবে না সবিতা দেবী। কিরীটী বলে।

কেন?

এখন কোন প্রশ্নই আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে করবেন না সবিতা দেবী ও সম্পর্কে। সময়ে সবই আপনি জানতে পারবেন।

কিন্তু—

এইটুকু শুধু বলতে পারি, যে ব্যবস্থা আমি করছি সব কিছু বিবেচনা করেই আমাকে করতে হচ্ছে, এবং এর চাইতে বেশী কিছু খুলে বলা বর্তমানে আমার পক্ষে সম্ভব নয় সবিতা দেবী।

বেশ, তাই হবে। কিন্তু কোন্ ঘরে শোব রাত্রে?

আপনার বাবার ঘরে। আর এ কথাটা যেন কেউ জানতে না পারে, এমন কি কল্যাণী দেবী বা সত্যজিৎবাবুও না।

কিন্তু বুঝতে পারছি না মিঃ রায়, একই বাড়িতে ওদের সকলের সঙ্গে থেকে সকলের অজ্ঞাতে অন্য ঘরে শোওয়া কেমন করে আমার পক্ষে সম্ভব হতে পারে!

কোন কৌশলে বুদ্ধি খাটিয়ে সামান্য কাজটুকু সম্পন্ন করতে আপনি পারবেন না সবিতা দেবী?

সবিতার মুখের দিকে তাকিয়েই কিরীটী বুঝতে পারে, সবিতা ওর প্রস্তাবে সত্যিই একটু বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

শুনুন সবিতা দেবী, যেমন usual আপনি ঘরে শুতে যান শুতে যাবেন নিজের ঘরে, তারপর রাত্রে কোন এক সময় ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে ছাদের দরজা খুলে ছাদ দিয়েই পাশের আপনার বাবার ঘরে গিয়ে শোবেন। বুঝতে পেরেছেন আমি কি বলতে চাই?

হ্যাঁ। মৃদু নিরুৎসুক কণ্ঠে জবাব দেয় সবিতা।

আর একটা কথা সবিতা দেবী—

বলুন।

সৌদামিনী ও তাঁর পুত্র ধনঞ্জয়—এঁদের আপনি চেনেন?

কই, ও নাম দুটো কখনও শুনেছি বলেও তো আমার মনে পড়ছে না!

মনে করে দেখুন তো! আপনার কোন দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় বা—

না, ও নাম দুটো জীবনে কখনও শুনিনি।

কখনও আপনার বাবার মুখে কোন আলোচনার মধ্যে?

না।

ভাল করে আর একবার ভেবে দেখুন সবিতা দেবী!

না, কখনও ও দুটো নাম শুনিনি কারো মুখেই।

কানাইয়ের মার মুখেও নয়?

না। কিন্তু কেন বলুন তো?

ওই দুটি নামের পরিচয় আমার জানা একান্ত আবশ্যক সবিতা দেবী। আচ্ছা এবারে আপনি যেতে পারেন সবিতা দেবী। হ্যাঁ ভাল কথা, দুটো দিন

অন্ততঃ আপনি বাড়ি থেকে কোথাও বের হবেন না। এটিও আমার একটা বিশেষ অনুরোধ।

বেশ।

সবিতাকে বিদায় দিয়ে কিরীটী চটপট প্রস্তুত হয়ে নিল, এখুনি একবার থানায় যেতে হবে। লক্ষ্মীকান্তর সঙ্গে কথা আছে।

কিরীটী থানায় গিয়ে পৌঁছাল যখন, বেলা তখন প্রায় তিনটে।

লক্ষ্মীকান্ত বাইরে অফিস ঘরেই ছিলেন, কিরীটীকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে গম্ভীর কণ্ঠে আহ্বান জানালেন, আসুন কিরীটীবাবু, বসুন।

কিরীটী নিঃশব্দে উপবেশন করল। বললে, বসন্তবাবুর কোন খোঁজ পেলেন মিঃ সাহা?

না। তবে কলকাতায় ঘটনার বিবরণী ও বসন্ত সেনের full description দিয়ে special branch-এ জরুরী তার করে দিয়েছি। যে কোন মুহূর্তেই সংবাদ একটা কিছু আশা করছি।

আমার মনে হয় দু-চার দিনের মধ্যে হয়ত বসন্তবাবু নিজেই ফিরে এসে ধরা দেবেন মিঃ সাহা!

হুঃ! আপনি তাই মনে করেন কিরীটীবাবু? আপনি জানেন না তাহলে ঐসব চরিত্রের লোকদের—they are dangerous! প্রথম হতেই ব্যাপারটা আমি লঘু করে নিয়েছিলাম। ভাবতেও পারিনি এত জটিলতা আছে ভিতরে। আফসোস হয় আমার—প্রথমেই ও লোকটাকে সন্দেহ করিনি কেন? প্রথমেই ওকে গ্রেপ্তার করলে হয়ত এতদিনে সব সুরাহা একটা হয়ে যেত—

ভাববেন না, সে যাবে কোথায় পালিয়ে, ধরা পড়বেই!

সে আমিও জানি। তবে—

আপনি পরশু বলছিলেন, সন্তোষ চৌধুরীর নিকট অনেক কিছুই নাকি জানতে পেরেছেন!

হ্যাঁ সন্তোষ চৌধুরী দুখানা চিঠি দেখাল মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর লেখা রামশঙ্করের কাছে।

সে চিঠি দুটোতে কি লেখা ছিল আপনার মনে আছে কি মিঃ সাহা?

সংসারের নানা কথা।

সে চিঠির মধ্যে টাকা বা সম্পত্তির কোন কথা ছিল কি?

না, সে ধরনের কোন কথাই ছিল বলে তো মনে পড়ছে না!

কিরীটী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

আবার প্রশ্ন করে, কানাইয়ের মার কোন সংবাদ পেলেন মিঃ সাহা?

না। চারিদিকে লোক তো পাঠিয়েছিলাম, কেউই কোন সংবাদ আনতে পারেনি।

আপনার লোকদের বিলের চৌহদ্দিটা একবার ভাল করে খুঁজে দেখতে বলবেন তো!

কেন বলুন তো?

দেখুন না খোঁজ করে, কানাইয়ের মার সন্ধান না পেলেও, আর কারো সংবাদও তো পেতে পারেন!

বেশ তো, এখুনি লোক পাঠাচ্ছি। কিন্তু আপনার অনুসন্ধান কতদূর

এগুলো?

কিরীটী তখন নিম্নকণ্ঠে কতকগুলো কথা লক্ষ্মীকান্তকে বললে। কিরীটীর কথা শুনতে শুনতে লক্ষ্মীকান্ত বেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং বলেন, আশ্চর্য! তাহলে তো আমার মনে হয়—

সন্তর্পণে এবারে আমাদের এগুতে হবে। He is desperate now! মরীয়া হয়ে এবারে হত্যাকারী তার শেষ attempt নেবেই—এবং সেই চরম মুহূর্তে আমরা red-hand ধরবো তাকে। আপনি প্রস্তুত থাকবেন। বিশেষ করে এই কথা বলবার জন্যই আমার এখানে আসা।

ধন্যবাদ। আমি প্রস্তুত থাকবো।

প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ কিরীটী সাইকেলে চেপেই আবার প্রমোদভবনে ফিরে এলো।

সন্ধ্যা একসময় উত্তীর্ণ হয়ে ঘনিয়ে এলো অন্ধকার রাত্রি চারিদিকে ঘন কালো পক্ষ বিস্তার করে।

ক্রমে রাত্রি বেড়ে চলে, নিস্তব্ধ হয়ে আসে চারিদিক।

প্রমোদভবনের সকলের চোখে নেমে আসে ঘুমের ঢুলুনি। একটা কিছু ঘটনার প্রতীক্ষায় রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরগুলো কেটে যেতে থাকে কিরীটীর। কিন্তু কোন কিছুই ঘটলো না, ব্যর্থ প্রতীক্ষার ব্যাকুলতায় নিশি প্রভাত হলো।

একটা অস্বাভাবিক গুমোট ভাব যেন সমস্ত প্রমোদভবনকে গ্রাস করেছে। চলাফেরা করে সব নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। কারো মুখেই কোন কথা নেই।

এমনি করেই কেটে গেল সমস্ত দিন—সূর্য গেল অস্তাচলে, সন্ধ্যার তরল ছায়া নেমে এল চারিদিকে, রাত্রিও আসন্ন।

রাত্রি!

রহস্যময়ী রাত্রি আসে তার কালো ওড়না মেলে ধরণীর বুকে শ্লথ মন্থর পদসঞ্চারে। রহস্যঘন আশঙ্কার পূর্বাভাস যেন রাত্রির ঘনিয়ে ওঠা স্তব্ধতায়।

গেটের পাশে ঝাউগাছগুলো শ্বাস টানছে যেন থেকে থেকে কোন ক্লান্ত প্রেতাত্মার মতই। বৌরাণীর বিলের অথৈ কালো জল অন্ধকারে যেন ঘন জমাট বেঁধে আছে। কালো রহস্যঘন আকাশে তারাগুলো মিটিমিটি তাকাচ্ছে ভয়ে ভয়ে বুঝি।

ঢং...ঢং...ঢং। রাত্রি তিনটে ঘোষিত হলো দেওয়াল-ঘড়িটায়।

একটা চাপা পদশব্দ অন্ধকারে যেন মর্মরিত হয়ে উঠলো। কিরীটী প্রস্তুতই ছিল সত্যজিৎকে নিয়ে। চকিতে কিরীটী উঠে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যেও অন্ধকার। আলোটা আগেই নিবিয়ে রাখা হয়েছে।

পা টিপে টিপে কিরীটী এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দরজার ঈষৎ ফাঁক দিয়ে কিরীটী বাইরের মৃদু আলোকিত বারান্দার দিকে দৃষ্টিপাত করল।

শুনতে সে ভুল করে নি।

কালো আংরাখায় আবৃত সেই দীর্ঘ মূর্তি, মুখের নিম্নাংশে কালো একটা রুমাল বাঁধা। পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর ঘরের দিকেই।

কিরীটী আর মুহূর্তও বিলম্ব করে না। ক্ষিপ্র ত্বরিৎপদে ছাদের দরজা দিয়ে বের হয়ে ছাদ দিয়েই সবিতার শয়নকক্ষে গিয়ে প্রবেশ করল। সবিতার ঘর ও মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা খুলে যেমন সে হাতের

টর্চের আলো ফেলেছে ঘরের মধ্যে এবং চাপা দৃঢ়কণ্ঠে বলেছে, হাত তোল বন্ধু—your game is up. আংরাখা-আবৃত মূর্তি শয্যাটার উপরে সবে ঘুমন্ত সবিতার উপরে দুই হাত প্রসারিত করে ঝুঁকেছিল, চকিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একলাফে দক্ষিণ দিকে সরে গেল এবং বিদ্যুৎগতিতেই যেন পরমুহূর্তে আর এক লাফে ছাদের দরজা দিয়ে বাইরে অদৃশ্য হলো।

কিরীটী ও সত্যজিৎও লাফ দিয়ে মূর্তিকে অনুসরণ করে ছাদের দরজার দিকে ছুটে যায়। ছাদে এসে কিরীটী দেখলে মূর্তি ছাদের প্রাচীরের উপরে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং চক্ষের পলকে নীচে লাফিয়ে পড়ল।

দুজনেই ছুটে প্রাচীরের কাছে এল এবং প্রাচীরের উপরে উঠে নীচে ঝুঁকে দেখতে পেল, আবছা ছায়ার মত মূর্তিটা তখন নন্দনকাননের পথ ধরে ছুটছে।

কিরীটী ও সত্যজিৎ কালবিলম্ব না করে পর পর দুজনেই নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আশ্চর্য, পায়ে তাদের এতটুকু লাগলো না, যেখানে তারা লাফিয়ে পড়েছে সেখানকার মাটি ঝুরঝুরে নরম ধুলোর মত।

এ ব্যবস্থা তাহলে প্রয়োজনের খাতিরে পূর্বাহ্নেই করা ছিল!

কিরীটী আগে আগে এবং পশ্চাতে ছুটলো সত্যজিৎ নন্দনকাননের দিকে। হঠাৎ মনে হলো যেন ঝুপ্‌ করে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার অস্পষ্ট একটা শব্দ পাওয়া গেল। শব্দটা কিরীটীর সতর্ক শ্রবণেন্দ্রিয়কে এড়াল না।

কিরীটী দাঁড়িয়ে পড়ল। পশ্চাতে সত্যজিৎও।

কেউ যেন জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো বলে মনে হল না? সত্যজিৎই প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। কিন্তু—চুপ! আস্তে! কিরীটী সত্যজিৎকে সতর্ক করে দেয় চাপা কণ্ঠে, চেয়ে দেখুন ঐ—

সত্যি! সত্যজিৎ কিরীটীর চাপাকণ্ঠের সতর্ক নির্দেশে সামনের অন্ধকারে জলের দিকে তাকিয়ে দেখল, নিঃশব্দ সাঁতারে কেউ একটা কালো সর্পিল রেখার মত এগিয়ে চলেছে প্রমোদভবনের প্রাচীরের দিকে।

ওদিকে যাচ্ছে যে—

নিশ্চয়ই ওদিকে কোন গুপ্ত দ্বারপথ আছে—wait and see!

অনুমান মিথ্যা নয়। দেখা গেল কে একজন প্রাচীর ঘেঁষে উঠে দাঁড়িয়েছে অন্ধকারেই ছায়ার মত জল থেকে।

পরমুহূর্তেই অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল যেন প্রাচীরের মধ্যে আশ্চর্য মন্ত্রবলে!

Now quick, follow me! বলেই কিরীটী জলে নামল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে দুজনে সাঁতরিয়ে প্রাচীরের সামনে এসে পৌঁছল। এবং ঐখানে জলের গভীরতা বুঝবার জন্য নিচে পা দিতেই জলের নিচে মাটি পায়ে অনুভব করে। এক কোমরও জল নয় ওখানে।

সামনেই একটা ছোট দ্বারপথ—কপাটটা এখনও উন্মুক্ত আছে।

সিক্ত অবস্থাতেই আগে আগে কিরীটী ও পশ্চাতে সত্যজিৎ সেই ছোট দ্বারপথ দিয়ে নিচু হয়ে কতকটা হামাগুড়ি দেবার মত করেই ভিতরে প্রবেশ করতেই দেখলে সরু একটি অপ্রশস্ত গলিপথ সামনে—অন্ধকার।

বদ্ধ বায়ুর ভ্যাপ্‌সা গরমে গলি-পথটা যেন কালো মুখব্যাদান করে

আছে।

কোথায় গেছে এই গুপ্ত গলি-পথ! প্রমোদভবনের কোন অংশের সঙ্গে নিশ্চিত যোগাযোগ আছে এই গোপন গলি-পথের!

সতর্ক পদসঞ্চারে দুজনে অগ্রসর হয়।

কিছুটা অগ্রসর হবার পরই ক্ষীণ একটা আলোর শিখা অন্ধকারে যেন অনিশ্চিতের মধ্যে আশার হাতছানি জানায়।

আরো অধিক সতর্ক পায়ে এগিয়ে চলে কিরীটী।

অগ্রসর হয় দুজনে। একটা কটু অ্যামোনিয়ার তীব্র গন্ধ যেন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে আসছে। নাক জ্বালা করে।

অশ্বের হ্রেষাধ্বনি শোনা গেল।

তবে কি ওরা আস্তাবলের দিকেই এগিয়ে চলেছে?

হ্যাঁ, কয়েক পদ আর অগ্রসর হতেই দুজনে—প্রথমে কিরীটী ও পশ্চাতে সত্যজিৎ প্রমোদভবনের আস্তাবলের মধ্যে এসেই প্রবেশ করল।

সামনেই পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে অদূরে সেই মূর্তি। এক কোণে একটা আলো জ্বলছে। মূর্তি তার গা হতে ভিজে জামা-কাপড়গুলো খুলতে ব্যস্ত।

চোখের ইশারায় কিরীটী সত্যজিৎকে বাঁ দিক দিয়ে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে নিজে ডান দিকে এগিয়ে যায়।

হঠাৎ অসতর্ক সত্যজিতের পায়ের নিচে ঘরের মেঝেতে ইতস্তত ছড়ানো ঘোড়ার আহার্য চানার দানা পিষ্ট হবার মুচমুচ শব্দে চকিতে মূর্তি ফিরে ঘুরে দাঁড়ায়।

গায়ের জামাটা খুলেছে মাত্র, মুখের রুমালটা এখনো খোলা হয়নি।

ধকধক করে হিংস্র শ্বাপদের মতই লোকটার চোখের তারা দুটো জ্বলে ওঠে একটা নিষ্ঠুর ক্রোধে।

আকস্মিক পরিস্থিতিটা কিরীটী মুহূর্তে উপলব্ধি করে নেয় এবং আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হবার পূর্বেই লোকটা চকিতে পা বাড়িয়ে ঠিক তার পায়ের নাগালের মধ্যেই অলোটায় প্রচণ্ড একটা লাথি মারে। ঝন্‌ঝন্‌ করে আলোর চিমনিটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়, মুহূর্তে ঘরটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে যায়।

কিরীটী মুহূর্তের জন্য যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু পরক্ষণেই অন্ধকারে আন্দাজ করে সম্মুখের দিকে লাফিয়ে পড়ে।

অন্ধকারেও কিরীটীর লক্ষ্য ব্যর্থ হয় না। লোকটাকে জাপটে ধরে।

জড়াজড়ি করেই কিরীটী লোকটাকে নিয়ে মেঝেতে পড়েই চেঁচিয়ে ওঠে, সত্যজিৎবাবু, টর্চটা জ্বালান!

হতভম্ব সত্যজিৎ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়েছিল অন্ধকারে।

কিরীটীর আদেশে যেন সম্বিৎ ফিরে পায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই কোমরে ঝোলানো টর্চটার বোতাম টিপে আলো জ্বালে।

কিরীটীর বুঝতে বিলম্ব হয় না, যাকে আক্রমণ করেছে তার গায়ে শক্তি প্রচুর। দ্রুত করে মাটিতে চেপে ধরে তার বুকের ওপর উঠে বসবার চেষ্টা করে কিরীটী, কিন্তু সুবিধা করে উঠতে পারে না প্রতিপক্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী বলে।

সহসা সত্যজিতের নজরে পড়ে ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে একটা মোটা মত হাত দেড়েক কাঠের টুকরো। এগিয়ে গিয়ে কাঠটা তুলে নিয়ে সত্যজিৎ সুযোগ বুঝে লোকটার মাথায় একটা সজোর আঘাত হানে।

একটা অস্পষ্ট যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে এবারে প্রতিপক্ষ এলিয়ে পড়ে নিস্তেজ হয়ে। হাত-পা এলিয়ে দেয়।

বুঝতে পারে কিরীটী, মাথায় আঘাত পেয়ে ক্ষণেকের জন্য সংজ্ঞালোপ হয়েছে প্রতিপক্ষের।

ঘরের কোণ হতে একটা মোটা দড়ি এনে অতঃপর ভূতলশায়ী সংজ্ঞাহীন লোকটার হাত বেঁধে তাকে বন্দী করতে ওদের বেগ পেতে হয় না।

প্রতিপক্ষকে বন্দী করে কিরীটী যখন উঠে দাঁড়াল, গুরু পরিশ্রমে তখন সে হাঁপাচ্ছে।

কে লোকটা!

রহস্যের মেঘনাদ—মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর হত্যাকারী—, ক্লিষ্ট কণ্ঠে জবাব দেয় কিরীটী সত্যজিতের প্রশ্নের।

সত্যজিৎ বলে, সত্যি?

হ্যাঁ।

কৌতূহলভরে সত্যজিৎ এগিয়ে গিয়ে বন্দী সংজ্ঞাহীন ভূপতিত ব্যক্তির মুখ হতে কালো রুমালটা খুলে নিয়ে যেন ভূত দেখবার মত চমকে উঠে, এ কি, পাপ তিনি সহ্য করবে

হ্যাঁ, বজ্রের মুবটে। তবে আসলে ও নামধারী মাত্র—ছদ্মনাম ওর ওটা।

ছদ্মনাম?

হ্যাঁ।

কিন্তু লোকটাকে তো মনে হতো বুড়ো অকর্মণ্য!

সে-ও ওর ভেক ধারণ করা মাত্র। দেখতেই তো পেলেন ওর শক্তির বহর। কিন্তু এখানে আর নয়, চলুন বাইরে যাওয়া যাক। বাগানে দলবল নিয়ে লক্ষ্মীকান্ত অপেক্ষা করছেন। এ নাটকের শেষ দৃশ্যের এখনও বাকী।

কিরীটী ও সত্যজিৎ বাগান অতিক্রম করে বারান্দার দিকেই অগ্রসর হতেই অন্ধকার হতে লক্ষ্মীকান্ত সামনে এসে দাঁড়ালেন, কিরীটীবাবু?

মিঃ সাহা! কি ব্যাপার?

চুপ, আস্তে, কানাইয়ের মা—

কানাইয়ের মা! এসেছে তাহলে? কিন্তু কোথায়?

সন্তোষ চৌধুরীর ঘরে ঢুকেছে।

॥ ২৩ ॥

ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে।

দরজার ফাঁক দিয়ে ওরা দেখলো ঘরের মধ্যে সন্তোষ চৌধুরী ও কানাইয়ের মা।

তুই আবার ফিরে এলি কেন? রুক্ষ সন্তোষের কণ্ঠস্বর।

তুই বলেছিলি আসবি—আসিসনি বলে—চল, এবার তোকে সঙ্গে করে নিয়ে তবে আমি যাব।

আমার যাবার এখনও সময় হয়নি, তুই যা।

না, তোকে না নিয়ে যাবো না।

যা বলছি হারামজাদী! এখনো ফিরে যা, নইলে তোকে খুন করবো বলছি!

তাই কর, তাই কর। তবু সবুর অমঙ্গল আমি করতে দেব না।

রাক্ষসী শয়তানী! সবু তোর কে যে তার জন্যই তুই হেদিয়ে মরছিস?

তোর সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। তুই যাবি কিনা বল?

না—না—না। তুই যা।

তুই তাহলে যাবি না? কানাইয়ের মা দৃঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করে

না।

যাবি না?

না।

এক্ষুনি তবে আমি চেঁচিয়ে সকলকে ডেকে তোর আসল পরিচয় দেবো!

খুন—খুন করে ফেলবো তবে তোকে রাক্ষসী। হিংস্র রাগে এগিয়ে গিয়ে সত্যি সত্যি সন্তোষ কানাইয়ের মার গলা টিপে ধরে।

সেই মুহূর্তেই কিরীটীর ইঙ্গিতে লক্ষ্মীকান্ত দরজায় ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, দরজা খোল! দরজা খোল!

কিন্তু ভিতর হতে কোন নেই।

দরজা খোল! না হলে দরজা ভেঙে ঢুকবো!

তথাপি কোন সাড়া নেই।

ভাঙুন দরজা। কিরীটীই বলে।

তিনজনে মিলে একত্রে ধাক্কা দিতেই ভিতর হতে মড়াৎ করে দরজার খিল ভেঙে গেল। তিনজনেই হুড়মুড় করে গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে।

সন্তোষবাবু, you are under arrest! লক্ষ্মীকান্ত গর্জন করে ওঠেন।

হতচকিত বিহ্বল সন্তোষ ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, পাশেই আবক্ষ অবগুণ্ঠন টেনে নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে কানাইয়ের মা।

কি, ব্যাপার কি! কি ব্যাপার? খোলা দ্বারপথে ঠিক ঐ সময় সান্যালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

এই যে সান্যাল মশাই! আসুন আসুন—ঠিক সময়েই আপনি এসেছেন! সহসা অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে যেন সাদর আহ্বান জানাল কিরীটী দ্বারপ্রান্তে উপনীত নিত্যানন্দ সান্যালকে।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই চমকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকায় কিরীটীর মুখের দিকে। এবং সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ-চমকের মতই অবগুণ্ঠনবতী কানাইয়ের মা তার দীর্ঘ অবগুণ্ঠন সহসা মাথার উপরে তুলে দিয়ে তাকাল সান্যালের মুখের দিকে।

এ কি, সেই কানাইয়ের মা না? আকস্মিক উত্তেজনায় অসতর্ক কণ্ঠ হতে নিত্যানন্দের উচ্চারিত হলো কথাগুলো।

হ্যাঁ, আমি। ফিরে আসতে হলো আমাকে।

ব্যাপারটা যেন আদৌ কিছুই নয় এমনি একটা উদাসীন শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে নিত্যানন্দ বললেন, হঠাৎ তুই কাউকে না বলে চলেই বা গেলি কেন, আবার ফিরেই বা এলি কেন? এদিকে তোর জন্য সকলে আমরা ভেবে মরি!

কানাইয়ের মা নিত্যানন্দ সান্যালের কথার কোন জবাব দিল না, কেবল তার ওষ্ঠপ্রান্তে অদ্ভুত হাসির একটা বঙ্কিম রেখা জেগে উঠলো মাত্র।

বিস্মিত নির্বাক কিরীটী কানাইয়ের মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এ তার পূর্ব-পরিচিতা এ বাড়ির পুরাতন দাসী কানাইয়ের মা নয় যেন। ভীরু সঙ্কোচে দৈন্যবিলুণ্ঠিতা কানাইয়ের মাও নয়।

দাঁড়াবার ভঙ্গীটি পর্যন্ত যেন পাল্টে গিয়েছে। মাথার উপরে অবগুণ্ঠন স্খলিত। মাথার সম্মুখের দিকে কাঁচা-পাকায় মিশানো চুলগুলো। ছোট ললাট। ধোপদুরস্ত একটা সাদা থানকাপড় পরিহিতা। গায়ে একটা সাদা খদ্দরের মোটা চাদর।

ওর সর্বাঙ্গ দিয়ে, এমন কি দাঁড়াবার ভঙ্গীতে পর্যন্ত যেন একটা আভিজাত্য ফুটে বের হচ্ছে।

সেই চিরপরিচিত কানাইয়ের মা যেন দাসীর পদ হতে অভিজাত বংশের এক নারী-পদমর্যাদায় উন্নীতা হয়েছে হঠাৎ। গৌতম-অভিশাপে পাষাণী অহল্যা যেন অকস্মাৎ রাঘবের রাতুল চরণস্পর্শে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে।

আর কেন, এবার ক্ষান্ত হও দাদা। মাথার উপরে ভগবান আছেন, এত পাপ তিনি সহ্য করবেন না। অবিচলিত শান্ত কণ্ঠ হতে কানাইয়ের মার কথাগুলো বজ্রের মতই উচ্চারিত হল।

ঘরের মধ্যে যেন অকস্মাৎ কানাইয়ের মার নিত্যানন্দ সান্যালকে সম্বোধিত কথাগুলো উচ্চারিত হল।

নিত্যানন্দ সান্যালের সমস্ত মুখে যেন কে একপোঁচ কালি বুলিয়ে দিয়েছে। কালো মুখখানা থমথম করছে একটা হিংস্র উত্তেজনায়।

কিন্তু মুহূর্তে সামলে নিলেন নিত্যানন্দ সান্যাল নিজেকে, কানাইয়ের মা! অনেক দিনের চাকরানী তুই আমাদের বাড়ির। বালবিধবা হেম তোকে বড় স্নেহ করত। হেম আমাকে দাদা বলে ডাকত, তুইও তার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দাদা বলে ডাকতিস। দাসী হলেও তোকে আমি চিরদিন ছোট বোনের মতই দেখেছি। বুঝতে পারছি, কোন কারণে তুই মনে বড় ব্যথা পেয়েছিস। তাই বোধ হয় মাথারও ঠিক নেই তোর। চল, পাশের ঘরে চল, বুঝতে পারছি তোর বিশ্রামের প্রয়োজন—আর—, বলে নিজেই সান্যাল ঘর ছেড়ে যাবার জন্য পা বাড়ান।

কানাইয়ের মা কোন কথা বলার পূর্বেই কিরীটী গমনোদ্যত নিত্যানন্দ সান্যালকে বাধা দিল, দাঁড়ান সান্যাল মশাই! ঘর ছেড়ে যাবেননা!

নিঃশব্দে ফিরে দাঁড়ালেন সান্যাল এবং চোখ তুলে তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটীও তাকিয়ে আছে সান্যালের মুখের দিকে।

যুধ্যমান দুটো শাণিত তরবারি যেন পরস্পরের প্রতি উদ্যত।

সহসা কানাইয়ের মার কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, মাথা আমার ঠিকই আছে দাদা। দেখছি গোলযোগ ঘটেছে আপনারই, নর শিশুপুত্রকে বুকে করে চিনতে পারছেন না!

তবে রে হারামজাদী—ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতই যেন অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই হাত দিয়ে কানাইয়ের মার কণ্ঠদেশ টিপে ধরলেন সান্যাল।

মুখোশটা খুলে গেল সান্যালের।

ঘটনাটা এত দ্রুত ও আকস্মিক ভাবে ঘটে গেল যে, ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই মুহূর্তের জন্য হতচকিত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে।

নিষ্ঠুর পেষণে কানাইয়ের মা'র গলা দিয়ে একটা গোঁ গোঁ শব্দ কেবল বের হচ্ছে।

তোকে খুনই করে ফেলবো হারামজাদী—, গর্জাতে থাকে ক্রোধান্ধ সান্যাল, আর পেষণ আরো কঠিন করেন হাতের মুষ্টির।

কিরীটী সর্বাগ্রে এগিয়ে বলিষ্ঠ দুই বাহুতে সান্যালের কাঁধ টিপে ধরে প্রবল এক ঝাঁকুনি দেয়, ছাড়ুন, ছাড়ুন!

কিন্তু মরীয়া হয়ে উঠেছেন সান্যাল। চীৎকার করে ওঠেন, না না—খুন—খুন করবো ওকে আমি। বাধ্য হয়ে কিরীটী তখন যুযুৎসুর প্যাঁচে সান্যালের কঠিন মুষ্টি শিথিল করে কানাইয়ের মাকে মুক্তি দেয়।

কানাইয়ের মা ঢলে পড়ে যাচ্ছিল, সত্যজিৎ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলে। এলিয়ে পড়ে কানাইয়ের মা চেয়ারটার উপরেই।

বাইরে এমন সময় পদশব্দ পাওয়া গেল। সকলেই সোৎসুক দৃষ্টিতে তাকায় খোলা দরজার দিকে। ঘরে প্রবেশ করলেন নায়েব বসন্ত সেন।

হ্যাঁ, আমি। কিন্তু এসব কি ব্যাপার লক্ষ্মীকান্ত?

জবাব দিল কিরীটী, আসুন নায়েব মশাই। আজকের ঘটনার you were the missing link,—হারানো সূত্র!

কিরীটী তখনও নিত্যানন্দ সান্যালকে দুই হাতে ধরে আছে। নিত্যানন্দকে অতঃপর অন্য একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে কিরীটী বললে, সুবোধ বালকের মত এবারে বসুন তো সান্যাল মশাই! Don't try to play any more dirty tricks! আপনার খেলা শেষ হয়েছে।

চোখের জলের মধ্যে দিয়েই কানাইয়ের মা—হতভাগিনী সৌদামিনী তার জীবনের কলঙ্ক-মাখা ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো একের পর এক মেলে ধরতে লাগল।

নির্বাক সকলে বসে ঘরের মধ্যে। কিরীটী, সত্যজিৎ, নিত্যানন্দ সান্যাল, সন্তোষ চৌধুরী, বসন্ত সেন, কল্যাণী, সবিতা, সৌদামিনী দেবী, লক্ষ্মীকান্ত সাহা ও অতীনলাল।

রাত শেষ হয়েছে। ভোরের প্রথম আলো পূর্বাকাশ রাঙিয়ে তুলছে।

সৌদামিনীর কথা

হতভাগিনী কলঙ্কিনী সৌদামিনীর কথা কি আর নতুন করে শুনবেন কিরীটীবাবু! বাংলাদেশের ঘরে ঘরেই তো এমনি কত ইতিহাস আছে, কিন্তু নত্যানন্দের উচ্চারিত হলো তিলতিল করে কত হতভাগিনীর জীবন-প্রদীপ যে নিভে যায়—তুষানলে ধিকিধিকি জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যায় কত সৌদামিনী, সে

সংবাদই বা কজনে এ সংসারে পায়!

তের বৎসর বয়সের সময় বিবাহ হল আমার। স্বামী কেমন চিনলামই না। খেলাঘরের মতই স্বামীর ঘর আমার নিষ্ঠুর পদাঘাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। হাতের নোয়া, সিঁথির সিঁদুর মুছে এক বৎসরের মধ্যেই ফিরে এলাম বাপের ঘরে ; রাক্ষুসী পোড়াকপালী আমি।

হেম আমার তিন বৎসরের ছোট হলেও আমার খেলার সাথী সে ছিল। সে-ই ছিল আমার সংগী। ফিরে এসে আবার হেমের সংগেই খেলাঘর পাতলাম। তিনটি বছর কেটে গেল, হঠাৎ একদিন শিউরে উঠলাম নিজের দিকেই তাকিয়ে। দেহের দুকূল ভেঙে নেমেছে কখন জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস টেরও পায়নি। অসংবৃত দেহকে যেন কোনমতেই আর লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে পারি না। এমন সময় হেমের হল বিয়ে।

হেমের স্বামী মৃত্যুঞ্জয় বিবাহের পর একটা বছর ঘন ঘন আমাদের ওখানে আসত। প্রথম প্রথম মৃত্যুঞ্জয়কে এড়িয়েই চলতাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা ছাদের ওপরে একাকী দাঁড়িয়ে আছি, সহসা কার পদশব্দে ফিরে তাকালাম। যাকে দেখলে আমার এত ভয়, যার চোখের দিকে তাকাতে বুক কেঁপে ওঠে, নিজেকে যেন আর কোনমতেই ধরে রাখতে পারি না—সেই মৃত্যুঞ্জয়! আমার দেবতা! আমার সর্বস্ব!

* * *

ভয় পেলে সৌদামিনী?

না—, সৌদামিনীর বুক তখন কাঁপছে দুরু দুরু।

তুমি আমাকে এড়িয়ে চল কেন মিনি? আমি কি বাঘ না ভাল্লুক? কেন তুমি আমায় ভয় কর বল তো?

কই, না তো! ভয় করি কে বললে? মনে মনে বলে সে, ওগো দেবতা, আমার ভয় নয় গো, ভয় নয়—আমি কেমন বিবশ হয়ে যাই।

চাও তো দেখি আমার চোখের দিকে? কই, চাও? সহসা হাত বাড়িয়ে মৃত্যুঞ্জয় সৌদামিনীর একটা হাত ধরে ফেলেন।

না না, ছাড়—কেউ এসে যাবে এখুনি লক্ষ্মীটি!

এত ভয় তোমার সৌদামিনী?

না না! ছিঃ!

সমস্ত যৌবন সৌদামিনীর তৃষিত হয়ে উঠেছিল কিন্তু সে তৃষ্ণা তার মিটল না। বরং দিনকে দিন যে বেড়েই চলে। শেষ পর্যন্ত যেদিন তার খেয়াল হল, সারা দেহ ছাপিয়ে এসেছে তার অনাকাঙ্ক্ষিত মাতৃত্ব—সেদিন ভয়ে সে নীল হয়ে গেল।

নীলকণ্ঠ সারা বিশ্বের গরল ধারণ করে যেখানে কলকল্লোলকান্তি জাহ্নবী-বেষ্টিত হয়ে অন্নপূর্ণার দুয়ারে ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়িয়েছেন, সৌদামিনী সেখানে ছুটে এলো তার কলঙ্কিত দেহের যৌবনমথিত গরলটুকু নিয়ে ; সেই গরলে নীলকণ্ঠ দেবাদিদেবের চরণেরই আশ্রয়ে।

ধনঞ্জয় সেখানেই জন্ম নিল এক সেবাশ্রমে।

সৌদামিনী যেদিন সেবাশ্রম হতে দুই মাসের শিশুপুত্রকে বুকে করে ফিরে এলো, নিত্যানন্দ তখন দুয়ার রোধ করে দাঁড়ালেন, যাও, এখানে নয়।

কলঙ্কিনী! লজ্জা করে না তোর! দূর হ!

কি করবে এখন সে? কোথায় যাবে? অনন্যোপায় সৌদামিনী আবার কাশীতেই ফিরে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে এক পত্র দিল।

মৃত্যুঞ্জয় পত্র পেয়ে কাশীতে এলেন এবং বললেন, এখানে এভাবে তোমার সন্তানকে তুমি মানুষ করতে পারবে না মিনি। তার চাইতে ওকে কোন অনাথ আশ্রমে দাও, আমি সব ব্যয়ভার বহন করবো, আর তুমি আমার ওখানেই চলো।

কি জানি কেন, সৌদামিনী তাতেই রাজী হলো। ধনঞ্জয়কে এক আশ্রমে রেখে সৌদামিনী মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহেই এসে উঠলো।

কিন্তু পরিচয় দিল তার সৌদামিনী নয়—দাসী কানাইয়ের মা বলে।

কানাইয়ের মা পরিচয়েই সৌদামিনি চৌধুরী-গৃহে থেকে গেল। সৌদামিনী মরেছে।

হেমপ্রভার ব্যাপারটা আদৌ মনঃপূত না হলেও, মুখে সে কিছু বললে না বটে তবে দুঃখ পেল স্বামীর ব্যবহারে।

সৌদামিনীর মাতৃত্বের সংবাদ না পেলেও সৌদামিনীর সম্পর্কে তার স্বামীর দুর্বলতার কথাটা তার অবিদিত ছিল না।

কিন্তু ক্রমে সৌদামিনীকে হেমপ্রভার সহ্য হয়ে গিয়েছিল, যখন সে দেখলে সৌদামিনী তার গৃহে এলেও সত্যি-সত্যিই দাসীর মতই সে দিন কাটাচ্ছে। সে তার অধিকারের সীমাকে কোন অজুহাতেই লঙ্ঘন করে না বা করবার চেষ্টাও করে না।

সবিতা এলো হেমপ্রভার গর্ভে এবং ঐ সময় হতেই হেমপ্রভা স্বামীর ব্যবহারে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করতে লাগল। স্বামী যেন তার সদাই গম্ভীর, চিন্তাকুল।

আরো দেখলে, প্রতি মাসে স্বামী তার দাদা নিত্যানন্দকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা ইনসিওর করে পাঠায়।

একদিন প্রশ্ন না করে আর পারে না, কিন্তু স্বামীর কাছে কোন জবাবই পায় না।

কথাটা একদিন সৌদামিনীর কাছে কিন্তু প্রকাশ হয়ে গেল।

সৌদামিনী ঐ বাড়িতে থাকলেও স্বামী-স্ত্রীর কোন ব্যাপারেই থাকত না।

কিন্তু হেমের মুখের দিকে চেয়েই একদিন রাত্রে সৌদামিনী মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরে এসে প্রবেশ করল, ওখানে আসবার দীর্ঘ আট মাস পরে।

দীর্ঘদিন পরে সৌদামিনীকে নিজের ঘরে প্রবেশ করতে দেখে মৃত্যুঞ্জয় প্রশ্ন করেন, সৌদামিনী, তাহলে তুমি আজও বেঁচে আছো?

সৌদামিনী তো অনেকদিন আগেই মরে গেছে চৌধুরী মশাই—এ কানাইয়ের মা—সৌদামিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে, যে পাপ সে তার নিজের কাছে করেছিল। কিন্তু সে কথা যাক, আমি একটা কথা আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম চৌধুরী মশাই!

বল?

প্রতি মাসে আপনি লুধিয়ানায় দাদাকে টাকা পাঠান, এ কথা কি সত্য?

সৌদামিনীর প্রশ্নে মৃত্যুঞ্জয় কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন, তারপর বললেন, হ্যাঁ সত্য। কিন্তু একান্তই শুনতে চাও কি কেন?

হ্যাঁ বলুন।

হেমও আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে অনেকবার, কিন্তু বলতে পারিনি। দুঃখের ও লজ্জারই কথা, তোমাকে বলছি তবু হেমকে বলতে পারিনি, এবং কেন পারিনি হেম না বুঝতে পারলেও তুমি বুঝবে। হেমকে বিবাহ করবার মাস আষ্টেক আগে একবার দেশভ্রমণে বের হয়ে ঘুরতে ঘুরতে উজ্জয়িনীতে গিয়েছিলাম। সেখানে এক চৌহান রাজপুতের মেয়ে কাঞ্চনমালার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করি।

চৌধুরী মশাই! একটা আর্ত চীৎকার যেন সৌদামিনীর কণ্ঠ চিরে বের হয়ে আসে।

ভাবছো আমি মহাপাষণ্ড, না! তাই। আমারও পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়েছে। মুক্তি পাইনি। কিন্তু যা শুনতে চাইছিলে শোন। বিবাহের পর মাস তিনেক কেটে গেল, ভাবছি বাবাকে সব লিখে জানাব এবং বৌকে নিয়ে দেশে আসব, এমন সময়—কাঞ্চনের এক বন্ধু ছিল রাজপুত—যুবক চেৎ সিং, তারই সঙ্গে একদিন রাত্রে বাগানে কাঞ্চনকে দেখে হিংসায় বুক আমার জ্বলে গেল। ওদের উপর নজর রাখতে লাগলাম। বুঝলাম কাঞ্চন চেৎ সিংকে ভালবাসে। মাঝখানে আমি এসে না পড়লে ওদের বিবাহও হত একদিন। হিংসায় ক্রোধে অন্ধ হয়ে কাঞ্চনকে ফেলে এক রাত্রে চুপে চুপে পালিয়ে এলাম। ওরা আমার ঠিকানাও জানত না। পরে ফিরে এসে মাস আষ্টেক বাদে হেমকে বিবাহ করি। ওদের আর খোঁজ নিইনি। মাস পাঁচেক পূর্বে তোমার দাদা নিত্যানন্দর চিঠিতে জানতে পারি, যখন চলে আসি কাঞ্চন তখন নাকি অন্তঃসত্বা ছিল। এবং একটি মেয়ের জন্মদান করেই সে মারা গিয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় চুপ করলেন।

তারপর?

তারপর তোমার দাদা নিত্যানন্দ উজ্জয়িনীতে গিয়েছিল বেড়াতে। কেমন করে জানি না কাঞ্চনের বাপ লক্ষ্মণ সিংয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং বোধ হয় সে সব কথা জানতে পারে এবং বুঝতে পারে আমিই সেই।

কেমন করে বুঝতে পারলেন তিনি?

কাঞ্চনের কাছে আমার একটা ফটো ছিল সেই ফটোটা দেখে। ফটোটাই এখন তার সম্পত্তি এবং তারই জোরে গত কয়েক মাস ধরে সে আমাকে শোষণ করছে। মাথা নীচু করলেন মৃত্যুঞ্জয়।

দাদার এতদূর অধঃপতন হয়েছে!

মাঝে মাঝে ভাবি কি জান সৌদামিনী, কলঙ্কসাগরে তো ডুবেছিই। কাঞ্চনের মেয়ে সে তো আমারই, তাকে এখানে নিয়ে আসি।

আপনি কি পাগল হলেন? ও চিন্তাও মনে স্থান দেবেন না। এক-বারটি ভাবুন তো, এ সংবাদ হেম জানতে পারলে সে কত বড় দুঃখ পাবে? কিন্তু আমার একটা কথা শুনবেন?

বল?

দাদাকে এখানে একবার আসতে লিখুন, আমি তার সঙ্গে কথা বলবো।

তাতে কি কোন ফল হবে সৌদামিনী, বরং টাকা যেমন সে নিচ্ছে নিক।

এতে যদি সে সন্তুষ্ট থাকে তো—

সন্তুষ্ট! জানেন না চৌধুরী মশাই, লোভ বেড়েই চলে ক্রমে, ওর হাঁ সামলাতে আপনাকে সর্বস্বান্ত হতে হবে। তার চাইতে লিখে দিন দাদাকে এখানে আসতে।

বেশ।

মাসখানেক বাদে নিত্যানন্দ এলেন। সৌদামিনী ভুল করেছিল। নিজের মায়ের পেটের ভাই হলেও নিতানন্দ-চরিত্র সে ঠিক বুঝতে পারেনি। যাবার আগে বরং সে শাসিয়েই গেল উল্টে সৌদামিনীকে।

নিত্যানন্দ চলে গেল বটে, তবে মনে মনে যাবার আগে সে নতুন এক ফন্দী মাথায় নিয়ে ফিরে গেল এবং তারপর দেখা গেল, ঘন ঘন সে কাঞ্চনপুরে যাতায়াত শুরু করেছে। হেমপ্রভার প্রতি তার স্নেহ ও ভালবাসা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে দিনের পর দিন।

বৎসর দুই এইভাবে নিয়মিত মৃত্যুঞ্জয়ের ওখানে আসা-যাওয়া করে করে এবারে সে আর এক মর্মঘাতী তীর নিক্ষেপ করল মৃত্যুঞ্জয়ের বুকে।

দুর্বলচিত্ত সন্দিগ্ধ-চরিত্র মৃত্যুঞ্জয় সহজেই সেই নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে কাবু হয়ে পড়লেন, হেমপ্রভা মধ্যে মধ্যে একমাত্র নিত্যানন্দকেই পত্র দিত। হঠাৎ একবার দুদিনের জন্য এসে নিত্যানন্দ হেমপ্রভা ও তার শিশুকন্যাকে সঙ্গে করে লুধিয়ানায় নিয়ে গেল মৃত্যুঞ্জয়ের অবর্তমানেই। সেই সময় কিছুদিন ধরে হেমপ্রভার সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের মন-কষাকষিটা একটু বেশীই চলছিল। বাড়ী ফিরে মৃত্যুঞ্জয় হেমপ্রভাকে না দেখতে পেয়ে মনে মনে ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেও মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না। স্ত্রীকে চিঠিও দিলেন না। হেমপ্রভাও অভিমানভরে একখানি চিঠিও স্বামীকে লিখল না। সৌদামিনী এসবের কিছুই জানত না। দীর্ঘ ছয় মাস পরে হেমপ্রভা আবার ফিরে এল স্বামীর গৃহে এবং শরীর তার তখন খুবই খারাপ। মনে যার ঘুণ ধরে, দেহ তার ভাঙতে দেরি হয় না। হেমপ্রভারও হয়েছিল তাই। হেমপ্রভা ফিরবার দিন পাঁচেক বাদেই মৃত্যুঞ্জয় স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে নিয়ে প্রমোদভবনে উঠে এলেন এবং ওখানে আসবার দিন চারেক বাদে এক রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রচণ্ড বচসা হয়ে গেল। নিত্যানন্দকে নিয়ে হেমপ্রভার চরিত্রে সন্দেহ করে স্পষ্টাস্পষ্টিই মৃত্যুঞ্জয় অভিযোগ জানালেন এবং বললেন, নিত্যানন্দ নিজে নাকি চিঠিতে অনেক দিন আগেই তাকে ও সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছিল। ঘৃণায় লজ্জায় হেম-প্রভা একেবারে পাথর হয়ে গেল। ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জা! এর চেয়ে যে মৃত্যুও ছিল ভাল!

এবারে কিরীটী বললে, এবং সেই দুঃখ ও অপমানেই তিনি বিষপান করে আত্মহত্যা করেন নিশ্চয়ই! কেউ তাঁকে হত্যা করেনি!

সৌদামিনী বললে, হ্যাঁ। কিন্তু আপনি সেকথা জানলেন কি করে মিঃ রায়?

আপনার বর্ণিত কাহিনী প্রথমে সত্যজিৎবাবুর ও পরে আপনার মুখে শুনেই বুঝেছিলাম, আসল ও সত্যি কথাটা আপনি গোপন করেছেন। আপনার বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে অনেকটা ফাঁক ছিল। তাছাড়া যে মুহূর্তে বুঝেছিলাম দীর্ঘ উনিশ বৎসরের ব্যবধানে দুটো মৃত্যুর কারণ এক নয় এবং শেষেরটা যখন অবিসংবাদিত ভাবেই আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল সত্য বলে, তখনই

বুঝেছিলাম আগের ব্যাপারটা আত্মহত্যা ভিন্ন আর কিছুই হতে পারে না। অবশ্য এরূপ ভাববার আমার দুটি কারণ ছিল। প্রথমত হেমপ্রভা দেবীকে একমাত্র হত্যা করা সম্ভব ছিল তাঁর স্বামীর পক্ষেই, কিন্তু তা তিনি যে করেননি সেটা বুঝেছিলাম সাত দিন বাদে কলকাতা হতে ফিরে এসে—তাঁর স্ত্রীর মৃত-দেহটা খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারেই। তিনি প্রথম হতেই সন্দেহ করেছিলেন তাঁর স্ত্রী গৃহত্যাগ করেছে এবং গেছে নিত্যানন্দবাবুর ওখানেই। তাই তিনি অসুস্থা স্ত্রীর একটা কল্পিত চিকিৎসার ভান করে মেয়ে ও আপনাকে নিয়ে কলকাতায় যান, কিন্তু আসলে কলকাতা থেকে নিত্যানন্দবাবুর ওখানে গিয়ে স্ত্রীর খোঁজ নেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—

ঠিক তাই। চৌধুরীমশাই লুধিয়ানাতেই দাদার ওখানে হেমের খোঁজে গিয়েছিলেন। জবাব দেয় সৌদামিনী।

কিন্তু সেখানে স্ত্রীর খোঁজ না পেয়ে গৃহত্যাগিনী স্ত্রীকে জন্মের মত ত্যাগ করবেন এই মনস্থ করে ও নিজের বংশমর্যাদা ও সম্মান বাঁচাতে রটনা করে দিলেন তার মৃত্যুর কথা। ফিরে এলেন তিনি এখানে। কিন্তু চরম দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে স্ত্রীর প্রতি তিনি যতই সন্দিহান হন আসলে হয়তো স্ত্রীকে সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। তাই স্ত্রীকে অমন করে চলে যেতে দেখে মর্মান্তিক যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করে বেরিয়েছিলেন, এমন সময় মৃতা স্ত্রীর দেহ আবিষ্কৃত হল নন্দনকাননে। তার পরের ব্যাপারটাও স্বাভাবিক গতিই নিয়েছে। এ ছাড়া হেমপ্রভা যে নিহত হয়নি কারো দ্বারা সন্দেহ করেছিলাম দ্বিতীয় অন্য একটি কারণে—হেমপ্রভা দেবীকে যদি তাঁর স্বামী না হত্যা করে থাকেন আর কারো পক্ষে যেমন তাঁকে হত্যা করবার কোন কারণই থাকতে পারে না, তেমনি নিহত হলে অন্তত কানাইয়ের মা অর্থাৎ আপনি সর্বদা যখন তাঁর পাশের ঘরে শুতেন ও সর্বদা প্রাণ দিয়ে তাঁর দেখাশুনা করতেন, আপনি নিশ্চয় সেটা জানতে পারতেন। আপনার কাছে সে ধরা পড়তই এবং সেক্ষেত্রে অন্তত আপনি এতদিন পরে বিশেষ করে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর মৃত্যুর পরে আর সে কথা গোপন করে রাখতেন না।

সৌদামিনী চুপ করে রইলেন।

কিরীটী আবার তার বক্তব্য শুরু করে, হেমপ্রভা দেবীর মৃত্যু-রহস্যটা আমার কাছে খোলসা হয়ে যায়, যে রাত্রে সৌদামিনী দেবী এখান হতে চলে যান সেই রাত্রে ওঁর সঙ্গে ঐ সম্পর্কে আলোচনা করবার পরই। এবং যে মুহূর্তে বুঝলাম হেমপ্রভা দেবীর মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর স্বামী মৃত্যুঞ্জয়বাবুর মৃত্যুর সাক্ষাৎ কোন যোগাযোগ নেই, পরোক্ষে থাকলেও তখনই ভাবতে লাগলাম এতকাল পরে তাহলে মৃত্যুঞ্জয়বাবু নিহত হলেন কেন? এইখানে একটা ব্যাপার প্রথমটায় সত্যিই আমাকে বিশেষভাবে delimma-র মধ্যে ফেলেছিল—অকুস্থানটি। একই স্থানে বকুলবৃক্ষতলে দুটি মৃতদেহ কেন আবিষ্কৃত হল! পরে অনেক ভেবে দেখেছি এবং সৌদামিনী দেবীর মুখে একটা কথা শুনে বুঝেছি, তাঁরও সম্ভবত, মানে হেমপ্রভা দেবীর বকুলতলে আত্মহত্যা করবার দুটি কারণ ছিল। ১নং সৌদামিনী দেবী বলেছিলেন প্রমোদভবনে আসা অবধি তো বটেই, তারও পূর্বে দু'একবার হেমপ্রভা দেবী নাকি প্রমোদভবনে বেড়াতে এসেও ঐ বৃক্ষ-তলটিতে গিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। স্থানটি নাকি তাঁর বড় প্রিয় ছিল, শুনেছি বৌরাণীর বিল বলা হত ঐ বিলটিকে—এই চৌধুরী-বংশেরই নাকি কোন

বোরাণীর ইচ্ছাতেই বিলের মধ্যে ঐ বিরাম-কুটিরটি তৈরী হয়েছিল বলে এবং পরে ঐ বিলের জলে সেই বোরাণী সাঁতার কাটতে গিয়ে তলিয়ে যান আর ওঠেন না। সেই হতেই বিলটিকে লোকে বোরাণীর বিল নাকি বলত। এবং সেই হতেই চৌধুরী-বংশে একটা প্রবাদের মতই শেষে দাঁড়িয়েছিল ঐ বিল এ বাড়ির বৌদের পক্ষে নাকি অভিশপ্ত। যাক যা বলছিলাম, ২নং কারণ হয়ত হেমপ্রভা দেবীর ইচ্ছা ছিল ঐখানে গিয়েই আত্মহত্যা করবার, নিজের মৃত-দেহটা যাতে আদরিণী একমাত্র কন্যার চোখে না পড়ে। অবশ্য সবই আমার অনুমান। সে যাই হোক, হেমপ্রভা দেবীর মৃত্যু-রহস্যটা মীমাংসিত হবার পরই মৃত্যুঞ্জয়বাবুর মৃত্যু-রহস্যে আমি মন দিই। একটা ব্যাপার অবশ্য—গোড়া হতেই সব ইতিহাস শুনে বুঝেছিলাম, চৌধুরী মশাইয়ের নিহত হবার পশ্চাতে কোন একটা পারিবারিক জটিল কাহিনী আছে এবং আর অকুস্থান যে রাজপুতানায়—তাও বুঝতে পারি, তাঁর ড্রয়ার হতে যে অ্যালবামটি উদ্ধার করি তারই ফটোগুলো দেখে। সেই ফটোগুলোর মধ্যে একটা ফটো ছিল এক নব-যৌবনা অপরূপ সৌন্দর্যময়ী এক নারীর। বুঝলাম মিঃ চৌধুরীর জীবনের কয়েকটি ছিন্ন পৃষ্ঠা সুদূর ঐ রাজপুতানাতেই ছড়িয়ে রয়েছে—যার সাক্ষ্য দিচ্ছে আজও তাঁরই সযত্নরক্ষিত অ্যালবামটি। কিন্তু কে ঐ তরুণী? কেন তার ফটো অ্যালবামের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত? তার পরই কুড়িয়ে পেলাম নন্দন-কাননে একটি স্বর্ণঅঙ্গুরীয়। যার উপরে খোদাই করা ছিল একটি দেবনাগরী অক্ষর 'ল'। কার অঙ্গুরীয়? অঙ্গুরীয়টি দেখেই বুঝেছিলাম সদ্য না হলেও দু'দশ দিনের মধ্যে কোন এক সময় কারো হাত হতে ঐ অঙ্গুরীয়টি ওখানে খসে পড়েছে। আর একটা জিনিস—ঐ জায়গায় জলের ধার ঘেঁষে পাড়ে ঘাসের অবস্থা দেখে বুঝেছিলাম নিয়মিত কিছুদিন ধরে ওখানে নৌকা বা বোট জাতীয় কিছু এসে ভিড়বার জন্যেই ঘাসগুলো যেন নিস্তেজ হয়ে আছে। বুঝলাম এখানে বোটে চেপে কারো যাতায়াত ছিল। তারও প্রমাণ পেলাম বিরাম-কুটিরের ঘরে ধুলোর ওপরে জুতোর সোলের ও খালি পায়ের ছাপ দেখে। সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল মন। খোঁজ নিতে গিয়ে সুরযমল সিং ও তার নাতনী চন্দ্র-লেখার সন্ধান পেলাম। সুরযমলের সঙ্গে সামান্য আলাপ করতেই বুঝলাম তারা রাজপুত। এবং চন্দ্রলেখার মুখের আদলটি হুবহু একেবারে মিলে গেল অ্যালবামের ফটোর সেই রাজপুতানী মেয়েটির মুখের সঙ্গে। ছিন্নসূত্র জোড়া লাগল।

হ্যাঁ, ঐ চন্দ্রলেখাই চৌধুরী মশাইয়ের মেয়ে কাঞ্চনমালার বা লছমীর (কাঞ্চনের ডাকনাম) গর্ভজাত কন্যা এবং সবিতার চাইতে বছরখানেকের বড়। সুরযমল লক্ষ্মণের ছোট ভাই লছমীর কাকা। জবাব দিল সৌদামিনী।

তাহলে ওই আংটিটা বোধ হয় চন্দ্রার মায়েরই! কিরীটী বলে।

লক্ষ্মীকান্ত তখন হঠাৎ বলেন, কিন্তু ক্রেপসোল দেওয়া কোন জুতো সেখানে পাইনি মিঃ রায়!

প্রমোদভবনের আস্তাবল খুঁজলেই পাবেন। সেটা লছমনের সম্পত্তি।

লছমনের?

হ্যাঁ, কারণ সে-ই যে সেটা ব্যবহার করতো! জবাব দেয় কিরীটী।

কিন্তু—

ভয় নেই। মোক্ষম বন্ধনে বাঁধা রয়েছেন শ্রীমান। পালাবার উপায় নেই।

মৃদু হেসে কিরীটী জবাব দেয়, এ বাড়ির নূপুর-রহস্যের মেঘনাদ ঐ লছমনই। আসলে লছমন ওর ছদ্মনাম মাত্র।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই বিস্ময়ে কিরীটীর দিকে তাকায়।

বসন্ত সেন বলেন, কি বলছেন আপনি মিঃ রায়? লছমন যে অনেক দিনকার পুরাতন সহিস এ বাড়ির!

সে পুরাতন সহিস আসল লছমন এতদিন বন্দী হয়ে বৌরাণীর বিলের দক্ষিণ দিকের বাড়িতে সুরযমলের হেপাজতে ছিল। তাই না মিঃ সাহা?

হ্যাঁ, তাকে মুক্তি দিয়ে থানায় রেখে এসেছি। জবাব দিলেন লক্ষ্মীকান্ত।

বৃদ্ধ লছমনকে গায়েব করে তার ছদ্মবেশ ধারণ করে চেৎ সিং, একদা যে প্রথম যৌবনে কাঞ্চনমালার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। তাঁর এখানে এসে সকলের চোখে ধুলো দিতে কষ্ট হয়নি। প্রথমে নানারূপ ভয় দেখিয়ে নূপুরের শব্দ শুনিয়ে চৌধুরী মশাইকে চেৎ সিং সন্দিগ্ধ করে তোলে। এবং খুব সম্ভবত হয়ত কৌতূহলী হয়ে অদৃশ্য নূপুরের শব্দ অনুসরণ করতে করতে কোন এক রাত্রে ঘটনাচক্রে যখন হতভাগ্য চৌধুরী মশাই নন্দনকানন পর্যন্ত চলে যান, সেই সময় সুযোগ পেয়ে চেৎ সিং তাকে আক্রমণ করে কৌশলে অজ্ঞান করে, পরে গলা টিপে হত্যা করে। ঐ কারণেই হয়ত চৌধুরী মশাইয়ের মৃতদেহ বকুল-বৃক্ষতলে পাওয়া যায়। সব ব্যাপারটাই আকস্মিক এবং নিষ্ঠুর নিয়তি-চালিত।

সৌদামিনী আবার বলে, মৃত্যুর কিছুদিন আগে হতেই প্রায় চৌধুরী মশাই আমাকে বলতেন হেম নাকি প্রত্যহ রাত্রে তাঁকে ডাকে। তার পায়ের নূপুর তিনি স্পষ্ট শুনেছেন। হেম নূপুর পরতে খুব ভালবাসত।

তাহলেই দেখুন, অনুমান আমার মিথ্যা নয়। এবারে আসা যাক আসল পরিকল্পনাকারীর রহস্যে। নিত্যানন্দ সান্যাল—সমস্ত ঘটনাটির তিনিই ছিলেন মূল। প্রথমে তিনি কাঞ্চনমালার ব্যাপার নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীকে ব্ল্যাকমেল করেছেন, পরে নিজেকে হেমপ্রভার প্রেমিক প্রতিপন্ন করে সন্দিগ্ধ চৌধুরীর মনে সংশয় এনে দিয়ে further blackmail করেছেন। শেষ পর্যন্ত যখন চৌধুরী মশাই সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছেন, তখন তিনিই সুরয-মল প্রভৃতিকে এখানে আনিয়ে চেৎ সিংকে চৌধুরীর সংবাদ দিয়ে তার নৃশংস প্রতিশোধস্পৃহার অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে তাকে দিয়েই হত্যা করিয়েছেন চৌধুরীকে। উনি যখন বুঝেছিলেন, লেবু তেঁতো হয়ে গিয়েছে টিপতে টিপতে, গাই আর দুধ দেবে না, তখন ওদের দিয়ে কাজ হাসিল করিয়ে সমস্ত সম্পত্তিটা বাগাবার চেষ্টায় ছিলেন। প্রত্যক্ষ না থেকে পরোক্ষে বসে কলকাঠি ঘুরিয়েছেন। আর ঐ হতভাগ্য ধনঞ্জয়—আমাদের সন্তোষবাবু—সৌদামিনী দেবীর বয়ে-যাওয়া-পুত্র সন্তোষ চৌধুরীর পরিচয় এখানে এসেছিল সম্পত্তির লোভে। কিন্তু সন্তোষবাবু তো আজ দুবছর মৃত, তবে পরিকল্পনাটি উনি পেলেন কোথায়? সন্তোষের সংবাদ জানলেনই বা কেমন করে? বলুন ধনঞ্জয়-বাবু, অন্যথায় আপনি কিন্তু প্রতারণার চার্জে পড়বেন।

সন্তোষ নিত্যানন্দের দিকে আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, ঐ—ঐ নিত্যানন্দই প্রলোভন দেখিয়ে আমাকে এখানে এনেছে। আমার—আমার কোন দোষ নেই। আমি কিছু জানি না।

কিরীটী মৃদু হাসে, চমৎকার! একেবারে আটঘাট বেঁধেই নেমেছিলেন

সান্যাল মশাই। এবং এত করেও শেষ বজায় রাখতে পারলেন না। ধর্মের কল এমনি করেই বাতাসে নড়ে। Really I pity you!

উঃ, কি শয়তান উনি! আপনি জানেন না মিঃ রায়, ওঁর আরো কীর্তি আছে। সত্যজিৎ বলে।

কিরীটী মৃদু হাসির সঙ্গে জবাব দেয়, জানি। শেষ পর্যন্ত মেয়ে কল্যাণীকে আপনার পিছনে লাগিয়েছিলেন, force করে আপনার ও সবিতা দেবীর মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করতে, তাই না?

কিন্তু আপনি সে কথা জানলেন কি করে?

জানাটাই যে আমার কাজ সত্যজিৎবাবু! কিরীটী জবাব দেয়।

কল্যাণীর মাথাটা লজ্জায় নুয়ে আসে।

লক্ষ্মীকান্তবাবু, আমার যা বলবার ছিল বললাম। কেবল একটা কথা বসন্তবাবুকে জিজ্ঞাস্য আছে—সেই শীলমোহর করা লেফাপাটা, আয়রণ সেফে যেটা ছিল—, কিরীটী বসন্তবাবুর মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ, আমিই সেটা সরিয়ে ফেলেছিলাম, সবিতার নামে লেখা আছে দেখে এবং কৌতূহলের বশে খুলে পড়তে গিয়েই চৌধুরীর অতীত জীবনের ইতিহাস আমি সব জানতে পারি। আমার ইচ্ছা ছিল না সবিতা আর ওসব জানতে পারে, তই আমি আপনাকে ফিরে যেতে বলেছিলাম। সবিতাকেও নিবৃত্ত হতে বলেছিলাম। শেষকালে যখন বুঝলাম, আমরা কত অসহায় নিয়তির হাতে—তখনই বাধ্য হয়ে লক্ষ্মীকান্তর হাতে না ধরা দিয়ে উজ্জয়িনীতে ছুটেছিলাম ব্যাপারটার শেষ জানতে, কিন্তু গিয়ে তাদের সন্ধান পেলাম না। তখনও বুঝিনি সান্যাল মশাই এমন জঘন্য খেলায় নেমেছেন—

সে চিঠি কোথায় কাকা? সবিতা প্রশ্ন করে।

সে চিঠি ছিঁড়ে আমি বৌরাণীর বিলেই ভাসিয়ে দিয়েছি। বাপ যত অপরাধীই হোন না কেন, তাঁর পদস্খলনের কথা সন্তানের শোনা বা জানাও মহাপাপ মা। ভুলে যাও সে কথা। বসন্ত সেন বললেন।

তাহলে এবারে আমার উইলটা পড়তে আর আপত্তি নেই—, বলে অতীনলাল খাম ছিঁড়ে উইল পাঠ করলেন। নতুন উইলে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি সন্তোষ মৃত জেনে সমান তিন অংশে ভাগ করে দিয়েছেন তাঁর তিন পুত্র-কন্যাদের মধ্যে। সবিতা, চন্দ্রলেখা ও ধনঞ্জয় সম্পত্তির সকলেই সমান অংশীদার।

সবিতা সকলের নিকট হইতে দূরে এসে খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়িয়েছিল। পূব আকাশকে রাঙা করে সূর্যোদয় হচ্ছে। দিগন্তপ্রসারী বৌরাণী বিলের জলে কে যেন মুঠো মুঠো রাঙা আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। চৌধুরীবংশের সমস্ত পাপ স্খলিত করে সর্বপাপঘ্ন দিবাকর যেন উদয়াচল থেকে শান্তির মন্ত্র আকাশে মাটিতে জলে সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছেন দিক হতে দিগন্তে।

সবিতার দু' চোখের কোলে জল।

মৃত পিতাকে স্মরণ করে দুটি হাত একত্র করে সে প্রণাম জানায়, তার পিতার আত্মা যেন শান্তি পায়। হে সর্বপাপঘ্ন সবিতা—সবিতাকেও ক্ষমা করো।

হাড়ের পাশা

কিরীটী একটা ঘর খুঁজছিল শ্যামবাজার অঞ্চলে।

শুধু শ্যামবাজার অঞ্চলেই নয়, বিশেষ করে শ্যামবাজার ট্রামডিপোর কাছাকাছি কোন এক জায়গায় হলেই যেন ভাল হয়।

যে সময়কার কথা বলছি তখনও কলকাতা শহরে ভাড়াটে বাড়ি পাওয়ার বিভ্রাটটা এখনকার মত এতটা প্রকট হয়ে ওঠেনি। রাস্তায় যেতে যেতে অনেক 'টু লেট'ই চোখে পড়ত।

নির্দিষ্ট অঞ্চলে দু'একটা ঘর যে কিরীটী পায়নি তাও নয়, কিন্তু ঠিক পছন্দসই হচ্ছিল না যেন।

বিশেষ করে নির্দিষ্ট একটি পরিধির মধ্যেই নয়, কিরীটী যে একটি ঘর খুঁজছিল ঐ অঞ্চলে—তার কারণও অবশ্য একটা ছিল কিন্তু সেটা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

এমন সময় অকস্মাৎ একদিন দ্বিপ্রহরে ডালহাউসী স্কোয়ার অঞ্চলে কলেজের একদা সহপাঠী সত্যশরণের সঙ্গে একটা চলমান ট্রামে দেখা হয়ে গেল কিরীটীর। এবং কথায় কথায় সত্যশরণ শ্যামবাজার অঞ্চলেই থাকে শুনে তাকেও ঘরের কথা বলায় সত্যশরণ বললে, আমরা ন্যায়রত্ন লেনে যে সেমি মেস-বাড়িটায় থাকি সেইখানেই তো কিছুদিন হলো একটি ঘর খালি পড়ে আছে! অতিমাত্রায় যেন উৎসুক হয়ে ওঠে।

সত্যি কথা বলতে গেলে বাড়িটার মধ্যে দোতলায় সেই ঘরটিই সব চাইতে ভাল। আকারে বড়। দক্ষিণ খোলা।

চমৎকার, ঐ ঘরটা তাহলে আমার জন্য ঠিক করে দাও ভাই। কিরীটী অতি মাত্রায় যেন উৎসুক হয়ে ওঠে।

আরে সেজন্যে আটকাবে না। ঘরটা তো দেখেই আগে পছন্দ করো, তাছাড়া বাড়িওয়ালা মন্দ লোক নয়, ভাড়াও দেবে যখন।

পছন্দ ঠিক হয়ে যাবে ভাই। অন্ততঃ তোমার মুখে শুনে তাই মনে হচ্ছে। ঘরটা আজই পাওয়া যায় কিনা বল। তাহলে সন্ধ্যার পর তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করবো!

ব্যাপার কি হে! তোমার যে একেবারে তর সইছে না। তোমার সে শিয়ালদার বাণীভবন মেস কি হলো?

সেখানে ঠিক সুবিধা হচ্ছে না ভাই। তাই অনেক দিন থেকেই ছেড়ে দেবো দেবো ভাবছি।

বেশ তাহলে চল। আমি তো এখন বাসাতেই ফিরছি।

ঠিক আছে, তাই চল। শুভস্য শীঘ্রম।

দ্বিপ্রহরের কর্মব্যস্ত কলকাতা শহর।

ট্রাম চলছে ঠং ঠং ঘণ্টি বাজিয়ে শ্যামবাজার অভিমুখেই।

কিরীটী সত্যশরণের পাশে বসে মনে মনে ভাবছিল তারই দেওয়া সংবাদটির কথা।

ঘরটা দেখেই কিরীটীর বিশেষ পছন্দ হয়ে গেল।

ন্যায়রত্ন লেনে এমন একটি ঘর পাওয়া যাবে এবং একেবারে ঠিক এতটা মনোমত জায়গায় কিরীটী ভাবেনি—আশাও করেনি, অদ্ভুত যোগাযোগ।

দিন কয়েক আগে কিরীটীর পূর্বপরিচিত শ্যামপুকুর থানার ও. সি. বিকাশ সেনের ওখানে কিরীটী নিজেই ঘুরতে গিয়েছিল বলতে গেলে একপ্রকার তার

নিজের কৌতূহলেরই তাগিদে।

গত তিন মাসের মধ্যে শ্যামবাজার ট্রামডিপোর আশেপাশে তিন-তিনটি অত্যন্ত রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

তিনজন নিহতের মধ্যে একজন অবাঙালী বেহারী মধ্যবয়সী, একজন অল্পবয়েসী পাঞ্জাবী মুসলমান ও সর্বশেষজন ৩৫/৩৬ বৎসর বয়স্ক বাঙালী যুবক।

এবং কোনবারই মৃতের দেহে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কেবল প্রত্যেকেরই গলায় একটি সরু কালো দাগ দেখা গিয়েছে মাত্র।

এবং করোনার্স রিপোর্ট হচ্ছে : শ্বাসরোধে মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে।

নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলের এবং বলতে গেলে নির্দিষ্ট একটি পরিধির মধ্যে গত তিন-চার মাসের মধ্যে তিন-তিনটি রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড এবং প্রত্যেকেরই শ্বাসরোধে মৃত্যু ও প্রত্যেকেরই গলায় একটি করে সরু কালো দাগ—সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঐ সংবাদটি কিরীটীর কৌতূহলকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। এবং ঐ অঞ্চলের থানা অফিসার বিকাশের সঙ্গে কিছুটা পূর্বপরিচয় থাকায় শেষ পর্যন্ত কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই কিরীটী বিকাশের ওখানে গিয়ে এক সন্ধ্যারাত্রে হাজির হয়।

একথা সেকথার পর আসল কথা উত্থাপন করায় বিকাশ সেন বলেন, ব্যাপারটা যেন আগাগোড়াই মিস্টিরিয়াস কিরীটী। অনেক অনুসন্ধান করেও কোন হদিস করতে পারিনি আজ পর্যন্ত।

কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ বিকাশ, তিন-তিনটি হত্যাব্যাপারে minutely observe করলে একটা কথাই মনে হয় না কি কোথায় যেন একটি অদৃশ্য যোগসূত্র ঐ হত্যা-ব্যাপারগুলোর মধ্যে বর্তমান আছে! কিরীটী জবাব দিয়েছিল।

তুমি যেন বেশ একটু interested বলেই মনে হচ্ছে রায় ঐ ব্যাপারে! বিকাশ জবাব দেন।

সত্যি কথা বলতে কি সেন, সেইজন্যই আমার আসা।

হ্যাঁ, তা বেশ তো, দেখ না, যদি কোন কিনারা করতে পার ব্যাপারটার। আমরা পুলিশ বাধ্য হয়ে হাত ধুয়েই বসে আছি ও ব্যাপারে।

বলা বাহুল্য সেই রহস্যপূর্ণ ব্যাপারটার একটা ভাল করে অনুসন্ধান করবার মতলবেই তারপর থেকে কিরীটী ঐ অঞ্চলে একটা থাকবার আস্তানা খুঁজছিল। কারণ তার ধারণাই হয়েছিল ঐ হত্যা-ব্যাপারগুলোর পশ্চাতে বিশেষ কোন একটা রহস্য আছে। এবং ঐ রহস্যের কিনারা করতে হলে সর্বাগ্রে অকুস্থানের আশেপাশে বা নিকটে কোথাও তাকে কিছুদিন ডেরা বেঁধে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।

ট্রাম চলেছে মন্থর গতিতে।

কিরীটীর আত্মচিন্তায় বাধা পড়ল হঠাৎ সত্যশরণের কথায়।

তোমাকে একটা কথা পূর্বেই খুলে বলে রাখা ভাল কিরীটী। সত্যশরণ যেন একটু ইতস্ততঃ করতে থাকে কথাটা বলতে গিয়েও।

কি বল তো?

বলছিলাম কি ঘরটা পাওয়া যাবে ঠিকই! বাড়ীওয়ালাও ভাড়াটে পেলেই ভাড়াও দেবেন। কিন্তু—

কিন্তু কি? বল না ভাই কি বলতে চাও?

বলছিলাম ঐ ঘরটা সম্পর্কেই। ঘরে যিনি পূর্বে ছিলেন, মানে আমাদের অনিলবাবু, আজ থেকে ঠিক একমাস আগে হঠাৎ একদিন ভোরে তাঁকে মেসের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, তারপর খুঁজতে খুঁজতে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয় শ্যামবাজার ট্রামডিপোর ঠিক সামনে বড় লাল দোতলা বাড়িটার গাড়ি-বারান্দার নিচে। সংবাদপত্রেও অবশ্য ব্যাপারটা প্রকাশিত হয়েছিল—পড়েছিলে কিনা জানি না।

সত্যশরণের কথায় কিরীটী চমকে ওঠে।

ঐ অঞ্চলের শেষ হত্যাকাণ্ডটির কথা মনের পাতায় সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে। অদ্ভুত যোগাযোগ তো! মনের কৌতূহল দমন করে কিরীটী শান্ত-কণ্ঠে বলে, তাতে আর হয়েছে কি!

না, তাই বলছিলাম আর কি। হাজার হলেও বন্ধুমানুষ তুমি, সব কথা তোমাকে আগে থাকতে খুলে বলাই ভাল। আর ঠিক তার পাশের ঘরেই আমি থাকি কিনা।

বটে! তা ভদ্রলোক মানে সেই অনিলবাবুর সঙ্গে তোমার নিশ্চয়ই আলাপ-পরিচয় ছিল সত্য? কিরীটী এবারে পাল্টা প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, তা একটু-আধটু ছিল বৈকি। পুলিশ অবশ্য সেজন্য আমাকে প্রশ্ন করে কম হয়রানি করেনি!

অনিলবাবু তোমাদের ওখানে কতদিন ছিলেন?

তা প্রায় মাস দশেক তো হবেই। তাই তো বলছিলাম, শান্তশিষ্ট নিরীহ ভদ্রলোক, তিনি যে হঠাৎ ঐ ভাবে মারা যাবেন ভাবতেই পারিনি।

জীবন-মৃত্যুর কথা তো বলা যায় না সত্যশরণ। তাছাড়া কার জীবনে কখন কোন্ পথে যে কোন্ আকস্মিক ঘটনার আবির্ভাব ঘটে কেউ তো তা বলতে পারে না।

তা যা বলেছ ভাই!

তা ছাড়া হয়ত এমনও হতে পারে, তোমরা তার সম্পর্কে যতটুকু জানতে তার বাইরে এমন কোন ব্যাপার হয়ত তার জীবনে ছিল যেখানে তার ঐ আকস্মিক মৃত্যুর কোন যোগসূত্র ছিল।

কিরীটীর কথায় সত্যশরণ যেন হঠাৎ চমকে ওঠে, বলে আশ্চর্য! তুমি—তুমি সেকথা জানলে কি করে কিরীটী?

কিরীটীও কম বিস্মিত হয়নি সত্যশরণ ঐভাবে হঠাৎ তার কথায় চমকে ওঠায়। নিছক কথার পিঠে কথা হিসাবেই কথাটা কিরীটী বলেছিল।

তাই পরক্ষণেই মৃদুকণ্ঠে বলে, এর মধ্যে আর জানাজানির কি আছে! এ তো অনুমান মাত্র। আর এমন কিছু অসম্ভবও নয়।

আমি অবশ্য পুলিসের কাছে বলিনি কিছুই। কারণ পুলিসের ব্যাপার তো জানই। তিলকে তাল করতে তারা সিদ্ধহস্ত। ওদের যত এড়িয়ে চলা যায় ততই বুদ্ধিমানের কাজ।

সত্যশরণের কথায় কিরীটী বেশ যেন একটু চাঞ্চল্য অনুভব করে এবং আরো একটু ঘেঁষে বসে প্রশ্ন করে, সত্যিই কোন interesting ব্যাপার কিছু

ছিল নাকি তোমাদের সেই অনিলবাবুর জীবনে?

তেমন কিছু না অবশ্য। সত্যশরণ এবারে আমতা আমতা করে জবাব দেয়।

কিরীটী বুঝতে পারে, সত্যশরণ ঝোঁকের মুখে হঠাৎ কথাটা শুরু করে এখন কোন কারণে এড়িয়ে যেতে চাইছে তাকে।

কিরীটী তাই এবারে বন্ধুকে যেন একটু উৎসাহ দেবার চেষ্টা করেই কণ্ঠে আরো ঘনিষ্ঠতার সুর ঢেলে বলে, আহা, বলই না। শোনাই যাক না। প্রেম-ট্রেম ঘটিত কিছু নাকি?

আশ্চর্য, সত্যি তাই! But how the devil you could guess!

আন্দাজে অন্ধকারে ঢিলটা নিক্ষেপ করলেও লক্ষ্যভেদ করেছে। কিরীটী মৃদু হেসে জবাব দেয়, আরে এ আর এমন কি কঠিন ব্যাপার? Young man —ওইটাই তো স্বাভাবিক!

সত্যিই তাই। অনিলবাবুর জীবনে সাত বছরের এক মধুর প্রেমকাহিনী ছিল।

বটে!

বাধা বা সংকোচ যতটুকু ছিল হঠাৎ সেটা একবার অপসারিত হওয়ায়

ছিল। তবে একতরফা। অনিলবাবুই যেতেন দেখতাম মধ্যে মধ্যে বিনতা দেবীর সঙ্গে ছিল অনিলবাবুর ভালবাসা। অবস্থার উন্নতি না করা পর্যন্ত বিবাহ হবে না, তাই চলেছিল ওঁদের উভয়ের অপেক্ষার পালা। অনিলবাবু প্রায়ই বলতেন আমাকে, ছোট একটি নিজস্ব নিরালা গৃহকোণ, ব্যাঙ্কে কিছু টাকা ও শান্ত নিরপদ্রব জীবন। দীর্ঘ অপেক্ষার পর গত ফাল্গুনে তাদের বিবাহের সব স্থিরও একপ্রকার হয়ে গিয়েছিল, সামনের বৈশাখেই শুভকাজটা সম্পন্ন করবেন তাঁরা। এবং অনিলবাবুর আকস্মিক রহস্যজনক মৃত্যুর দিন দুই আগেই ঐ আসন্ন উৎসবের কথা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনাও হয়েছিল।

অনিলবাবুর সেই পরিচিতা বিনতা দেবীর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়নি?

না। ফটোই দেখেছি কেবল, সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেনি।

উভয়ের আসা-যাওয়া ছিল না?

ছিল। তবে একতরফা অনিলবাবুই যেতেন দেখতাম মধ্যে মধ্যে বিনতা দেবীর ওখানে। বিনতা দেবীকে কখনো আসতে দেখিনি এখানে।

অনিলবাবুর মৃত্যুর সংবাদ পেয়েও আসেনি?

না। তবে তাঁর দাদা এসেছিলেন ভাগলপুর থেকে। মেসে অনিলবাবুর জিনিসপত্র যা ছিল নিয়ে যেতে।

বিনতা দেবী কলকাতাতেই কোন স্কুলে বুঝি শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতেন?

না। শুনেছি বাগনান গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রী তিনি।

ইতিমধ্যে গাড়ি শ্যামবাজারের কাছাকাছি এসে পড়ায় তখনকার মত আলাপ-আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। পরবর্তী স্টপেজে উভয়ে ট্রামগাড়ি থেকে অবতরণ করে।

॥ ২ ॥

অবশ্য ন্যায়রত্ন লেনে সত্যশরণের বর্ণিত নির্দিষ্ট বাসাটা ঠিক বাসা নয়, সেটি মেস-বাড়ি, পূর্বেই সে কথা সত্যশরণ কিরীটীকে জানিয়েছিল।

বাড়িটা দোতলা; ওপরে ও নীচে চার ও তিন সর্বসমেত সাতটি ঘর। এবং বাড়িটা নাতিপ্রশস্ত গলির একপ্রকার শেষপ্রান্তে।

ওপরের তলার চারটি ঘরই মাঝারি আকারের। ছোটও নয় খুব, প্রশস্তও নয়। এবং চারটি ঘরের মধ্যে সর্বশেষ ঘরের আগের দক্ষিণখোলা ঘরটিই খালি ছিল। ঘরটা কিরীটীর পছন্দ হওয়ায় গৃহকর্তার সঙ্গে সত্যশরণই কিরীটীর হয়ে কথাবার্তা বলে সব ঠিক করে দিল এবং কিরীটী যথারীতি পরের দিনই দ্বিপ্রহরে এসে ঘরটি অধিকার করল।

ঘরটি তার পছন্দ হয়েছে এবং বলতে গেলে পূর্বের ভাড়ার চাইতে কয়টি টাকা কম ভাড়াতেই পাওয়া গিয়েছে সত্যশরণের সুপারিশে।

কিরীটীর ঘরে কিরীটী একা। বাকী তিনটি ঘরে সত্যশরণকে নিয়ে মোট ছয়জন বোর্ডার আছেন। সত্যশরণকে বাদ দিয়ে বাকী পাঁচজনের মধ্যে দুইজন হরবিলাস ও শ্যামবাবু উভয়েই প্রৌঢ় এবং সর্বাপেক্ষা পুরাতন বাসিন্দা এ বাড়ির। এবং বলতে গেলে তাঁরাই বাকী বোর্ডারদের জুটিয়ে দোতলাটাকে সেমি মেসে পরিণত করেছেন। দুজনেই মার্চেন্ট অফিসে কাজ করেন এবং প্রতি শনিবার অফিস থেকে আর বাসায় না ফিরে সোজা একেবারে দেশের বাড়িতে চলে যান। শনি ও রবিবারটা সেখানে কাটিয়ে সোমবার ভোরের গাড়িতে ফিরে আর মেসে না গিয়ে সোজা একেবারে অফিস করতে চলে যান। এমনি করেই প্রতি শনি ও রবিবারটা দেশের বাড়িতে কাটিয়ে সোমবার ভোরের গাড়িতে ফিরে অফিস করেন ছাপোষা নিরীহ কেরানীর মত। এবং একেবারে ঘোরতর সংসারী ওঁরা দুইজন এক ঘরেই থাকেন।

আর তিনজনই অল্পবয়সী। জীবনবাবু একটা সিনেমার গেটকীপার। মাসে ত্রিশটি টাকা পান ও এক জায়গায় টিউশনি করেন। সুধাংশুবাবু কোন একটি বিলাতী ঔষধের কোম্পানীর নন-মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ এবং রজতবাবু একটি নামকরা বিলাতী ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ভ্রাম্যমাণ দালাল। সত্যশরণ বাসাটা সেমি মেস বলেছিল, কারণ ওখানে কেবল থাকবারই ব্যবস্থা আছে। আহারের কোন ব্যবস্থাই নেই। দুটি ভৃত্য আছে, বলাই ও রতন, বাবুদের প্রয়োজনমত দিনের বা রাত্রের আহার্য সামনের ট্রামরাস্তার ঠিক ওপরেই অন্নপূর্ণা হোটেল থেকে নিয়ে আসা থেকে চা জলখাবার ও অন্যান্য যাবতীয় সর্বপ্রকার ফুট-ফরমাসই খেটে থাকে। বেশীর ভাগ সময় দুবেলা বোর্ডাররা অবশ্য যে যার হোটেলে গিয়েই আহারপর্বটা সেরে আসেন প্রত্যহ।

অন্নপূর্ণা হোটেলটির ব্যবস্থাও ভালই। দামেও সস্তা এবং সাধারণ ডাল ভাত তরকারি মাছের ঝোল এবং মধ্যে মধ্যে মাংসও পাওয়া যায়।

অন্নপূর্ণা হোটেলটি অনেক দিনকার। এবং তার সামনের অংশে ছোট-খাটো একটা পার্টিশন তুলে ও গোটা দুতিন ভাঙা নড়বড়ে টেবিল ও চেয়ার বেঞ্চ পেতে রেস্টুরেন্টের ব্যবস্থাও একটা আছে। অন্নপূর্ণা হোটেল রেস্তোরাঁ।

অন্নপূর্ণা হোটেল ও রেস্তোরাঁর মালিক একজন ঢাকার লোক।

ভদ্রলোকের নাম ভূপতিচরণ চাটুয্যে। সরু প্যাকাটির মত রোগা ডিগ-ডিগে এবং কালো কালির মত গায়ের রং।

দাড়িগোঁফ কামানো, তেল-চক্‌চকে ভাঙা তোবড়ানো একখানা মুখ। পানের রস ও দোক্তার ছোপে পড়া ইঁদুরের মত ছোট ছোট দুপাটি দাঁত।

গরুর মত দিবারাত্রই প্রায় সর্বদা মুখে পানের জাবর কাটছেন।

লোকটি কিন্তু ভারি অমায়িক ও মিশুকে প্রকৃতির। খদ্দেরের সুখ-দুঃখ সুবিধা-অসুবিধা বেশ বোঝেন। হৃদয় আছে লোকটার। এবং সেইজন্যই পাড়াতে হোটেল বনাম রেস্তোরাঁটি চলেও বেশ ভালই।

সত্যশরণদের মেসবাড়ি অর্থাৎ দোতলায় ওঠবার সিঁড়িটার কাছেই নীচের বাঁধানো উঠানের মধ্যে পার্টিশন তুলে উপরের তলার অধিবাসীদের কল-পায়খানার ব্যবস্থা হয়েছে। মোট কথা ওপরের তলার বাসিন্দাদের সঙ্গে নীচের তলার অর্থাৎ বাড়িওয়ালা ও তাঁর পরিবারবর্গের কোন সম্পর্কই নেই, যদিচ ওপরের ঘরের জানালা ও বারান্দা থেকে নীচের তলার পার্টিশনের অপর পার্শ্বের বাঁধানো উঠানের প্রায় সবটাই এবং ঘরের সামনেকার বারান্দার কিছুটা অংশ চোখে পড়ে।

নীচের তলায় থাকেন সবটাই নিয়ে বাড়ির মালিক কবিরাজ শ্রীশশিশেখর ভিষগ্‌রত্ন সপরিবারে। শান্ত নির্বিরোধী ভদ্রলোক শশিশেখর ভিষগ্‌রত্ন।

কালো আলকাতরার মত গাত্রবর্ণ। মেদবহুল থলথলে চেহারা। পিঠ ও বুকভর্তি ঘন কুঞ্চিত রোমপ্রাচুর্যে মনে হয় যেন একটি অতিকায় রোমশ ভাল্লুক। বিশেষ করে যখন তিনি বাইরের ঘরের তক্তপোশের ওপরে বিস্তৃত মলিন ফরাসের ওপরে বসে থাকেন একটি থেলো হুঁকো হাতে নিয়ে।

দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। মাথায় তৈলসিক্ত বাবরি চুল। কপালে আঁকা সর্বদাই একটি রক্তসিন্দুরের ত্রিপুণ্ড্রক। মুলোর মত সাদা ঝকঝকে দন্তপাটি হাসতে গেলেই শুধু যে বিকশিত হয়ে পড়ে তাই নয়, সেই সঙ্গে অতিরিক্ত তাম্রকূট সেবনে অভ্যস্ত কালচে বর্ণের মাড়িটিও যেন খিঁচিয়ে ওঠে। তাতেই হাসিটা বিশ্রী কুৎসিত দেখায় আরো। কুৎসিত সেই হাসি শশিশেখরের পুরু কালচে ওষ্ঠপ্রান্তে যেন লেগেই আছে। কথায় কথায়ই তিনি হাসেন সেই কুৎসিত হাসি। তবে সশব্দ নয়, নিঃশব্দ। এবং কথা বলেন অত্যন্ত কম। স্বল্পভাষী। শশিশেখরকে কেউ বড় একটা কথা বলতেই দেখে না। ভদ্রলোকের সংসারে স্ত্রী—যাকে কখনো বড় একটা দেখাই যায় না এবং গলাও যার বড় একটা শোনাই যায় না, মুখের উপরে সর্বদাই দীর্ঘ একটি অবগুণ্ঠন টানা। বাড়ির বাইরেও বড় একটা তাকে দেখা যায় না।

এবং একটি ছেলে অনিলশেখর, বয়স বাইশ-তেইশ হবে।

আর একটি মেয়ে অমলা, বয়স বছর উনিশ-কুড়ির বেশী হবে না।

কি চেহারায় বা গাত্রবর্ণে কবিরাজ মশায়ের সঙ্গে তার ছেলে ও মেয়ে অনিলশেখর বা অমলার যেন কোন সৌসাদৃশ্যই নেই।

অনিলশেখর ও অমলার রূপ যেন ঝলমল করে। যেমনই সুঠাম সুন্দর চেহারা তেমনই উজ্জ্বল গৌর গাত্রবর্ণ।

সংসারে আরো একটি প্রাণী আছে। কবিরাজ মশাইয়ের দূরসম্পর্কীয় ভাগ্নে দ্বিজপদ।

ছেলেটির বয়স তেইশ-চব্বিশের মধ্যেই। দ্বিজপদই কবিরাজ মশাইয়ের কম্পাউন্ডার বা অ্যাসিস্টেন্ট। নীচের তলার তিনখানি ঘরের মধ্যে বাইরের প্রশস্ত ঘরটিতেই কবিরাজ মশাইয়ের রোগী দেখা হতে শুরু করে ডিসপেন-সারীর, ঔষধের কারখানা এবং দ্বিজপদর থাকা-শোয়ার সব কিছু ব্যবস্থা।

ঘরের ২।৩ ও ১।৩ অংশের মধ্যে একটি কাঠের ফ্রেমে চটের পার্টিশন বসানো।

পার্টিশনের একদিকে খানচারেক পুরানো সেকেলে সেগুন কাঠের তৈরি ভারী বার্নিশ ওঠা আলমারি। তার মধ্যে তাকের উপরে সাজানো ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের শিশি, বোতল, বয়ম, জার—নানাবিধ কবিরাজী তৈল, ভস্ম, গুলি, বটিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধে ভর্তি।

সামনাসামনি বড় বড় দুটি তক্তপোশ, পাশাপাশি জোড়া দিয়ে উপরে একটি তৈল-চিটচিটে মলিন ফরাস বিছানো এবং তদুপরি অনুরূপ চারটি তাকিয়া।

শশিশেখর ভিষগ্‌রত্ন ঐ চৌকির ওপরে উপবিষ্ট অবস্থাতেই রোগীদের দেখা ও তাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা চালান। একপাশে একটি বেঞ্চ পেতে রঙিন পুরাতন একটি শাড়ি দড়ির সাহায্যে টাঙিয়ে আড়াল তুলে স্ত্রীরোগীদের দেখবারও ব্যবস্থা আছে।

বাড়িটার উপরের তলাটা ভাড়া দিয়ে, কবিরাজী ব্যবসা করে, নিজস্ব তৈরি পেটেণ্ট দ্রাক্ষারিষ্ট, মহাবলচূর্ণ, অক্ষয় অমৃত সঞ্জীবনী সুধা, পারিজাত মোদক, মুক্তাভস্ম, মহাশান্তি বৃহৎ বনরাজী তৈল, ব্যাঘ্রাবল রসবটিকা, নয়নরঞ্জন সুর্মা ইত্যাদি সব বিক্রয় করে কবিরাজ মশায়ের যে বেশ দু'পয়সা উপার্জন হয় সেটা তাঁর সচ্ছল অবস্থা দেখলেই অনুমান করতে একটুও কষ্ট হয় না। প্রতি মাসে ২রা তারিখে একটিবার করে সকালে কবিরাজ মশাইয়ের কাষ্ঠপাদুকার খট্‌খট্‌ শব্দ উপরে ওঠবার সিঁড়ির মুখে ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

বোর্ডারদের সামনে এসে একের পর এক দাঁড়ান দন্ত ও মাড়িযোগে নিঃশব্দ কুৎসিত তাঁর সেই পেটেণ্ট হাসিটি নিয়ে।

দেহরোম ও মেদবাহুল্যের জন্যই বোধ হয় কবিরাজ মশাইয়ের গ্রীষ্মবোধটা একটু বেশিই। শীত গ্রীষ্মে কোন প্রভেদ নেই। কবিরাজ মশাই তন্ত্রমতে কালীসাধক।

কপালের রক্তসিন্দুরের ত্রিপুণ্ড্রকটিই তার পরিচয়।

মাথার ঘন বাবরি চুল হতে উগ্র কটু একটা কবিরাজী তেলের গন্ধ কবিরাজ মশাই সামনে এসে দাঁড়ালেই যেন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

গা পাক দিয়ে ওঠে, বমনোদ্রেক আনে।

কবিরাজ মশাই বলেন, তেলটি তাঁরই নিজস্ব আবিষ্কার। মহাশক্তি-দায়িনী বৃহৎ বনরাজী তৈল। মস্তিষ্ক শান্ত ও শীতল রাখার অব্যর্থ মহৌষধি।

উপরে এসে একটিমাত্র কথাই বলেন কবিরাজ মশাই, গরীব ব্রাহ্মণকে দয়া করুন।

ভাড়াটে ও বাড়িওয়ালা পরস্পরের মধ্যে মাসান্তে একটিবার মাত্র ও ঐ একটি কথারই আদান-প্রদান ছাড়া আর কোন সম্পর্কই নেই।

ঘরভাড়া অবশ্য যে যার সকলেই চুকিয়ে দেন চাওয়া মাত্রই।

বলতে গেলে উপরের তলার অধিবাসীরা প্রতি মাসের দুই তারিখের ঐ সময়টির জন্য যেন পূর্ব হতে প্রস্তুতই হয়ে থাকেন।

দিন পনের হলো কিরীটী এই বাড়ীতে এসেছে এবং ইতিমধ্যেই সকলের সঙ্গেই অল্পবিস্তর আলাপ-পরিচয়ও হয়ে গিয়েছে। সত্যশরণকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বাদবাকি পাঁচজন সহ-বোর্ডারদের মধ্যে একমাত্র ইনসিওরেন্সের দালাল রজতবাবুই যেন কিরীটীর দৃষ্টি একটু বেশি আকর্ষণ করেছেন।

কিরীটীর ঘরের একপাশে থাকেন রজতবাবু ও অন্যপাশে সত্যশরণ।

রজতবাবুর বয়স যাই হোক না কেন, ৩০-৩১-এর বেশি নয় বলেই মনে হয়। রোগাটে ছিপছিপে গড়ন। উজ্জ্বল শ্যাম গাত্রবর্ণ। চোখেমুখে বুদ্ধির একটা অদ্ভুত ধারালো তীক্ষ্ণদীপ্তি। চোখে সরু সোনার ফ্রেমে শৌখিন চশমা। ভদ্রলোকের বেশভূষাতেও সর্বদা একটা শৌখিন পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ইনসিওরেন্সের দালালীতে যে তাঁর অর্থাগমটা ভালই ভদ্রলোকের চাল-চলন আচার-ব্যবহার ও রুচিবিলাস হতেই স্পষ্ট বোঝা যায়। হাতও বেশ দরাজ।

কারণ এই বাড়ির সহ-বোর্ডারদের প্রায়ই এটা ওটা পাঁচরকম দামী খাবার এনে খাওয়ান ও নিজেও খান এবং মধ্যে মধ্যে সিনেমা-থিয়েটারেও নিয়ে যান।

ভ্রাম্যমাণ দালাল, সেইজন্য মধ্যে মধ্যে দু'চার-পাঁচদিনের জন্য এবং কখনো-কখনো দশদিনের জন্য কলকাতার বাইরে বাইরে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়।

উপরের তলার অধিবাসীদের মধ্যে একমাত্র রজতবাবুরই নীচে কবিরাজ মশাইয়ের বহিঃ ও অন্দরমহলে যে যাতায়াত আছে, প্রথম দু'চারদিনেই কিরীটীর সেটা নজর এড়ায়নি। এবং রজতবাবুর নীচের তলার ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে উপরতলার বোর্ডার সিনেমার গেটকীপার জীবনবাবুর দু'চারটে অম্লমধুর রসালো মন্তব্য যে কিরীটীর সদাসতর্ক শ্রবণেন্দ্রিয়কে এড়িয়ে গিয়েছে তাও নয়। কিরীটী লক্ষ্য করেছিল নীচের তলাকার অধিবাসীদের মধ্যে কবিরাজ মশাইয়ের ছেলে ও মেয়ে অনিলশেখর ও অমলা উভয়ের সঙ্গেই রজতবাবুর কিঞ্চিৎ বেশ যেন আলাপ-পরিচয় আছে। কেবলমাত্র অবগুণ্ঠনের অন্তরালবর্তিনী, নিঃশব্দচারিণী কবিরাজের গৃহিণীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আছে কিনা সেটা জানবার সুযোগ হয়নি কিরীটীর। কবিরাজ-গৃহিণীকে তো কখনোও বাইরে বের হতে দেখা যেত না, কারণ শোনা যায় কবিরাজ মশায়ই নাকি সেটা পছন্দ করেন না। তাঁকে নিজেকেও বড় একটা বাইরে বের হতে দেখা যায় না। বেশীর ভাগ সময় সকাল সাতটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত ও দ্বিপ্রহর দুটো থেকে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত ও সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে রাত্রি এগারটা প্রত্যহই এবং কোন কোন রাত্রে বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত কবিরাজ মশাই বাইরের ঘরেই থাকেন। এবং তিনি যে আছেন সেটা মধ্যে মধ্যে একটি-মাত্র তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত শব্দে জানা যেতঃ মাগো করালবদনী নৃমুণ্ডমালিনী, সবই তোর ইচ্ছা মা—

প্রায় সদা নিঃশব্দ লোকটির বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ হতে ঐ করালবদনী নৃমুণ্ড-মালিনী শব্দ দুটি যেন সমস্ত নীচের তলাটা গম গম করে তুলত।

কবিরাজ ও তস্য গৃহিণীকে বাড়ির বাইরে না দেখা গেলেও দ্বিজপদ, ঝি সুন্দরী ও কবিরাজের ছেলে অনিলশেখর ও মেয়ে অমলাকে প্রায়ই আসতে যেতে দেখা যেত।

তাদের চেহারা চালচলন বেশভূষা কোনটারই যেন কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যেত না কবিরাজের সংস্কৃতির সঙ্গে।

পরিচ্ছন্ন ছিমছাম বেশভূষা উভয়েরই।

অনিলশেখর বি. এ. ক্লাসের চতুর্থ বার্ষিকীর ছাত্র এবং মেয়ে অমলা আই. এ. ক্লাসের ছাত্রী।

একদিন সন্ধ্যার দিকে নিত্যকারের মত সান্ধ্যভ্রমণে বের হয়ে গলির মুখে নিম্নকণ্ঠে ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনারত অমলা ও রজতবাবুকে দেখে কিরীটী বুঝতে পেরেছিল রজতবাবুর নীচের তলায় সত্যকারের আকর্ষণটি কোন্‌খানে।

কিন্তু ন্যায়রত্ন লেনের উপর ও নীচের তলার অধিবাসীদের লক্ষ্য করার চাইতেও যে উদ্দেশ্যে কিরীটী খুঁজে-পেতে কষ্ট করে ঐ অঞ্চলে এসে ডেরা বেঁধেছিল, কিরীটীর চিন্তাধারাটা বেশির ভাগ সময় বিক্ষিপ্ত ভাবে তারই মধ্যে আবদ্ধ থাকত বলাই বাহুল্য।

দিন পনের গত হয়ে গেল কিন্তু এখনো পর্যন্ত বিশেষ কোন কিছুই ঐ অঞ্চলের কিরীটীর অনুসন্ধিৎসু মনকে নাড়া দিতে পারেনি।

তবু তার সতর্কতার অভাব ছিল না। বাইরে থেকে বেকার শান্তশিষ্ট ও একান্ত নির্লিপ্ত তাকে মনে হলেও ভিতরে ভিতরে তার তীক্ষ্ণ শ্রবণ-মননশক্তি চারিদিকেই সমভাবে প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকত।

সকালে ও দ্বিপ্রহরে কিরীটী নিজের ঘর থেকে বড় একটা বেরই হত না। বের হত একেবারে সন্ধ্যা সাতটার পর। এবং রাত বারোটা, কখনো কখনো বা একটা দেড়টা পর্যন্ত আশেপাশে সমস্ত অঞ্চলটার পথে গলিতে সদাসতর্ক দৃষ্টিতে, অথচ বাইরে নির্লিপ্ত পথিকের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াত।

এমনি করেই দিন চলছিল।

সহসা এমন সময় একদিন শান্তস্থির পুষ্করিণীর জলরাশিতে ছোট্ট একটি লোষ্ট্রাঘাতে যেমন তরঙ্গ জাগে এবং ক্রমে সেই চক্রাকারে ক্রমবিস্তৃতমান তরঙ্গ-চক্র তটপ্রান্তে আছড়ে পড়ে শব্দ তোলে, ঠিক সেইভাবেই ব্যাপারটা শব্দায়িত হয়ে উঠলো আচমকা।

বিকেল চারটে হবে।

উপরের তলার সেমি-মেসের বোর্ডাররা কেউই তখন অফিস ও কর্মস্থল থেকে ফেরেন নি, একমাত্র রজতবাবু ব্যতীত। অবশ্য কিরীটী তার ঘরে নিত্যকারের মত দরজাটা ভেজিয়ে ঐদিনকার বহুবার পঠিত সংবাদপত্রটাই আবার উল্টে-পাল্টে দেখছিল।

রজতবাবু দিন চারেক ছিলেন না মেসে। ঐদিন সকালের দিকে পাটনা থেকে ফিরেছেন টুর সেরে।

গুনগুন করে সর্বদাই প্রায় যতক্ষণ রজতবাবু তাঁর ঘরে থাকেন, গান করা তাঁর একটা অভ্যাস। এবং কিরীটী পাশের ঘর থেকে তাঁর সেই গুনগুনানি শুনেই বুঝতে পেরেছিল রজতবাবু তাঁর ঘরেই আছেন। আর মাত্র মিনিট কুড়ি আগে যে রজতবাবু নীচে নেমেছিলেন তাঁর জুতোর শব্দেই বুঝতে

পেরেছিল কিরীটী।

হঠাৎ নীচের তলা থেকে, বলতে গেলে এখানে আসবার পর এই প্রথম কিরীটী ভিষগ্‌রত্নের নাতি-উচ্চ কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে সত্যিই চমকে ওঠে।

ভদ্রলোক! জেন্টেলম্যান! ঢের ঢের দেখা আছে আমার। ফের এ-বাড়ি-মুখো হয়েছো কি ঠ্যাং ভেঙে খোঁড়া করে দেবো জন্মের মতো। বেরোও! বেরিয়ে যাও!

কৌতূহলে কিরীটীর শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ ও উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

কবিরাজের চিৎকারের সংগে সংগেই প্রায় রজতবাবুর মেয়েলী ঢংয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আপনি বা অত চেঁচাচ্ছেন কেন বলুন তো মশাই! বিবাহ করবো তো আমি, আর বিবাহটা হবে অমলার সংগে—আপনি তো অবান্তর তৃতীয় পক্ষ।

বাঘের মতই যেন ভিষগ্‌রত্ন এবারে গর্জে উঠলেন, কি কি বললি বেটা! আমি তার জন্মদাতা বাপ, আমি তৃতীয় পক্ষ! আর তুই কোথাকার এক ভবঘুরে ইনসিওরেন্সের দালাল, তুই হলি প্রথম পক্ষ! বেরো। বেরো এখান থেকে—

বেরিয়ে আমি নিশ্চয়ই যাবো। মনে রাখবেন কেবল শ্রেফ ভদ্রতার খাতিরেই কথাটা বলতে এসেছিলাম, নচেৎ মেয়েও আপনার সাবালিকা এখন। এ বিয়ে আপনি চেষ্টা করলেও আটকাতে পারবেন না।

রজতবাবুর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই ভিষগ্‌রত্নের কণ্ঠ আবার শোনা গেল, কালই তুই আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি। নইলে তোর মত কুকুরদের কেমন করে শায়েস্তা করতে হয় তা আমি জানি। বেটা নচ্ছার পাজী ছুঁচো—

থামুন থামুন—অত চেঁচাবেন না, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবো মশাই!

ওঃ, অথ বিবাহঘটিত! প্রেম—প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ব্যাপার!

সেই চিরপুরাতন অথচ চিরনতুন পঞ্চশরের ফুলবাণ পর্ব!

হায় হায় সন্ন্যাসী! কি করছো তুমি পঞ্চশরের ভস্মরাশি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে জানতে যদি! কিন্তু এ যে বেশ গুরুতর ব্যাপার!

প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে, বিবাহটা শেষ পর্যন্ত যদি ঘটে যায়ই, ভদ্রলোক শৌখিন রজতবাবুর পক্ষে তাঁর রোমশ ভল্লুকাকৃতি কবিরাজ শ্বশুরমশাইটির তো একেবারে বদহজম ঘটাবে!

নাঃ, আজকালকার আধুনিক মতিগতির ছেলেমেয়েরা বড্ড বেশী যেন দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে।

আবার রজতবাবুর কণ্ঠস্বর কিরীটীর কানে এলো, শুনুন মশাই, ভালর জন্যই বলছি, বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না এ নিয়ে। অমলাকে আমি বিবাহ করবোই, আপনার পিতৃত্বের পেনাল-কোডের আইন-কানুন ধোপে টিঁকবে না। মিথ্যে মিথ্যে কেন ঝামেলা করছেন! ভালয় ভালয় রাজী হয়ে যান। ভদ্রভাবে ব্যাপারটা চুকেবুকে যাক, all expense আমার I promise!

কে তোমার promise চায় হে ছোকরা! দ্বিজপদ, আমার লাঠিটা দাও তো—কবিরাজ মশাই হাঁক দিলেন।

পূজ্যপাদ ভাবী শ্বশুরের লাঠি! ভাবী পত্নীর পূজনীয় পিতৃদেব হলেও এযুগের আধুনিক হবু জামাইয়ের বোধ হয় আর সাহসে কুলায় না। সবেগে

প্রস্থান করলেন। বেচারী রজতবাবু!

এমনিতে বাইরে শৌখিন প্রকৃতির ও নিরীহ শান্তশিষ্ট দেখতে হলে হবে কি, রজতবাবু ভদ্রলোকটিকে তো কিরীটীর মনে হচ্ছে এখন বেশ কর্মিতকর্মাই।

ইতিমধ্যে একসময় কখন এক ফাঁকে দিব্বি সুন্দরী কবিরাজ-নন্দিনীর মনোরঞ্জন করে বসে আছেন এবং স্বয়ং পিতৃদেব হয়েও ভিষগ্‌রত্ন ব্যাপারটির বিন্দুবিসর্গ টের পাননি।

কিরীটী সংবাদপত্রে আর মনোনিবেশ করতে পারে না।

এবং একটু পরেই রজতবাবুর পদশব্দ সিঁড়িতে আবার শোনা গেল।

কিরীটী বুঝতে পারে রজতবাবু তাঁর ঘরে এসে প্রবেশ করলেন এবং আবার সঙ্গে সঙ্গে পদশব্দে বোঝা গেল বাইরে বের হয়ে গেলেন।

সেই যে রজতবাবু গেলেন, দিন দুই আর ফিরলেন না মেসে।

কিন্তু আশ্চর্য, উক্ত ব্যাপার নিয়ে সেই দিন বা তার পরের দিনও নীচে ভিষগ্‌রত্নের অন্দরমহলে কোনপ্রকার সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না!

এমন কি পরের দিন দ্বিপ্রহরের দিকে কিরীটীকে একটু বের হতে হয়েছিল, ফিরবার পথে গলির মাথায় অমলার সঙ্গে চোখাচোখিও হয়ে গেল। সঙ্গে তার এক সহপাঠিনী বা বান্ধবী বোধ হয় ছিল। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে বলতে কবিরাজ-গৃহের দিকেই আসছিল।

রজতবাবু ফিরে এলেন দিন দুই পরে দ্বিপ্রহরে।

জ্যৈষ্ঠের শেষ। প্রখর রৌদ্রতপ্ত দ্বিপ্রহরে আকাশটা যেন একটা তামার টাটের মত পুড়ে ঝাঁ-ঝাঁ করছে। বাতাসে যেন আগুনের উগ্র একটা বিশ্রী ঝাঁজ।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কিরীটী একটা টেবিলফ্যান চালিয়ে একজোড়া তাস নিয়ে পেসেন্স খেলছিল—বাইরে থেকে রজতবাবুর গলা শোনা গেল।

ভিতরে আসতে পারি কিরীটীবাবু!

আরে কে ও, রজতবাবু যে! আসুন আসুন।

দরজা ঠেলে রজতবাবু এসে কিরীটীর ঘরে প্রবেশ করলেন।

বেশভূষা যেন সামান্য একটু মলিন, মাথার চুল অযত্ন-বিন্যস্ত, মুখখানি কিন্তু বেশ প্রফুল্লই মনে হল।

হঠাৎ রজতবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে কেন যেন কিরীটীর মনে হয়, মাত্র এই দুই দিনেই ভদ্রলোকের বয়সটা যেন হু হু করে বেড়ে গিয়ে গালে ও কপালে বয়সের রেখা পড়েছে।

বসুন বসুন—তারপর কি খবর রজতবাবু? এ দুদিন ছিলেন কোথায়?

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে রজতবাবু বললেন, একটু কাজে গিয়েছিলাম বর্ধমানে।

কিরীটী উঠে টেবিলফ্যানটা একটু ঘুরিয়ে দিল রজতবাবুর দিকে। বললে, ইনসিওরেন্সের ব্যাপারে বোধ হয়?

না। দাদামশাইয়ের একটা বাড়ি আছে বর্ধমানে। মা যতদিন বেঁচে ছিলেন ঐখানেই তো ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে বাড়িটা তালা দেওয়াই পড়েছিল। কথাগুলো বলে একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, কলকাতায় আর নয় ভাবছি, এবার সেখানে গিয়েই থাকবো।

কাজকর্মের আপনার অসুবিধা হবে না কলকাতা ছেড়ে গেলে?

না মশাই। কলকাতা শহর তো নয় যেন একটা বাজার। ঘেন্না ধরে গিয়েছে আপনাদের এই ধুলো বালি ধোঁয়া আর ছত্রিশ জাতের মানুষের ভিড়ের কলকাতা শহরের ওপরে। মানুষ থাকে এখানে!

কিরীটী আজকে রজতবাবুর কথাগুলো শুনে যেন বেশ একটু অবাক হয়। কারণ কয়েকদিন আগেও রজতবাবুকে কিরীটী বলতে শুনেছে, ছোঃ ছোঃ আপনাদের গ্রাম্যজীবন আর সুবার্ব মাথায় থাক আমার! বেঁচে থাক আমার এ কলকাতা শহর। কথাটা বলছিলেন রজতবাবু সিনেমার গেটকীপার জীবনবাবুকে। আজকাল মানুষের সেরা তীর্থস্থান হল কলকাতা আর বোম্বাই —এই দুটি শহর, বুঝলেন মশাই!

কিন্তু কিরীটী মুখে জবাব দেয়, তা যা বলেছেন।

হঠাৎ পরক্ষণেই রজতবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, আচ্ছা চলি মশাই। দক্ষিণ পাড়ায় একটা জরুরী কাজ আছে, সেরে আসি।

রজতবাবু আর দাঁড়ালেন না। বের হয়ে গেলেন। হঠাৎ যেমন এসেছিলেন তেমনি হঠাৎই যেন প্রস্থান করলেন।

কেনই বা এলেন আবার হঠাৎ কেনই বা চলে গেলেন কিরীটী যেন ঠিক বুঝতে পারে না।

বর্ধমানে গিয়েছিলেন এই সংবাদটুকুই মাত্র কিরীটীকে দেবার এমনই বা কি প্রয়োজন ছিল! না, ভদ্রলোকের আরো কিছু বলবার বা কিছু জানাবার ছিল কিরীটীর কাছে। অন্যমনস্ক ভাবে কিরীটী তাসগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে।

দ্বিপ্রহরের স্তব্ধ নির্জনতায় একটা ক্লান্ত রিক্‌শার ঘণ্টির ঠুং ঠুং শব্দ নীচে গলির পথে ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে গেল।

বাইরে বারান্দায় রেলিংয়ের ওপরে বসে একটা কাক কর্কশ স্বরে কা কা করে ডাকছে।

॥ ৪ ॥

ঐদিনই রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা হবে।

নিত্যনৈমিত্তিক রাতের টহল সেরে কিরীটী ন্যায়রত্ন লেনের বাসায় ফিরছিল। নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে পাড়াটা। গলির মুখে গ্যাসের বাতিটাও যেন স্তিমিত মধ্যরাত্রির ক্লান্ত রাতজাগা প্রহরীর মত একচক্ষু মেলে পিট্ পিট্ করে তাকিয়ে আছে একান্ত নির্লিপ্ত ভাবে।

গলিপথের শেষ পর্যন্ত শেষ গ্যাসের আলোটি পর্যাপ্ত নয়। অস্পষ্ট ধোঁয়াটে একটা আলোছায়ায় যেন রহস্য ঘনিয়ে উঠেছে গলিপথের শেষপ্রান্তে।

মধ্যগ্রীষ্ম রাতের আকাশের যে অংশটুকু মাথা তুলে উপরের দিকে তাকালে চোখে পড়ে সেখানে শুধু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঝকঝকে তারা।

অন্যমনস্ক ভাবে শ্লথ পায়ে কিরীটী ফিরছিল। হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়াল কিরীটী। গলিপথের শেষ প্রান্তের প্রায় সমস্তটাই জুড়ে একটা কালো রঙের সিডন বডি গাড়ির পশ্চাৎ দিকের অংশটা যেন সামনের শেষ পথটুকুর সবটাই

প্রায় রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

আবছা আলো-আঁধারিতে গাড়ির পেছনের প্রজ্বলিত লাল আলোটা যেন শয়তানের রক্তচক্ষুর মত ধক্‌ধক করে জ্বলছে।

এবং পথের মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কিরীটীর অন্য-মনস্ক নিষ্ক্রিয়তাটা কেটে যায়।

সমস্ত ইন্দ্রিয় তার সজাগ ও সক্রিয় হয়ে ওঠে মুহূর্তে।

এই পরিচিত অপ্রশস্ত গলির মধ্যে এত রাত্রে অত বড় চক্‌চকে গাড়িতে চেপে কার আবার আবির্ভাব ঘটলো!

সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর মনে পড়ে, ইতিপূর্বে আরো দু'দিন এই গলিপথেই কোন গাড়ি ঠিক আসতে বা যেতে তার নজরে না পড়লেও—গাড়ির টায়ারের কাদা-মাখা ছাপ তার চোখে পড়েছে।

তবে হয়ত এই গাড়িরই টায়ারের ছাপ ও দেখেছে!

গাড়ির পিছনের নাম্বার-প্লেটটার দিকে ও তাকাল।

W. B. B. 6690।

আবছা আলো-অন্ধকারেও গাড়ির কালো মসৃণ বডিটা চক্‌চক্ করছে।

হঠাৎ কিরীটী আবার সর্তক হয়ে ওঠে গাড়ির দরজা খোলা ও বন্ধ করার শব্দে।

তারপরই কানে এলো দুটি কথা।

আচ্ছা, তাহলে ঐ কথাই রইল। একটি চাপা পুরুষ-কণ্ঠ।

দ্বিতীয় কণ্ঠটি কোন নারীর হলেও কথাগুলো স্পষ্ট শোনা গেল না।

সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যায়। গাড়িটা ব্যাক করছে।

দ্রুতপদে কিরীটী পিছিয়ে গিয়ে ঐ গলির মধ্যেই বাড়ির মধ্যবর্তী সরু অন্ধকার প্যাসেজটার মধ্যে আত্মগোপন করে দাঁড়াল।

গাড়িটা ধীরে ধীরে ব্যাক করে গলিপথ থেকে বের হয়ে গেল।

দামী গাড়ি, ইঞ্জিনের বিশেষ কোন শব্দই শোনা গেল না।

আরো চার-পাঁচ মিনিট বাদে কিরীটী আবার অগ্রসর হল বাসার দিকে অন্যমনস্কভাবে ভাবতে ভাবতে।

এবং একটু এগিয়ে যেতেই তার নজরে পড়লো নীচের তলায় কবিরাজ মশাইয়ের বাইরের ঘরের খোলা জানালাপথে তখনও আসছে আলোর একটা আভাস।

সদর দরজাটা বন্ধ কিন্তু গলির দিককার জানালা খোলা।

হঠাৎ কৌতূহলকে দমন করতে না পেরে কিছুমাত্র দ্বিধা না করে সতর্ক পদসঞ্চারে শিকারী বিড়ালের মত পা টিপে টিপে আলোকিত বাইরের ঘরের জানালাটার সামনে এগিয়ে গেল কিরীটী।

জানালার নীচের পাট বন্ধ, উপরের পাটটা খোলা।

রাস্তা থেকে জানালা এমন কিছু উঁচু নয়, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকালেই ভিতরের সব কিছু সহজেই নজরে পড়ে।

জানালার কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ত্যারচাভাবে কিরীটী আলোকিত কক্ষমধ্যে দৃষ্টিপাত করল। রোমশ ভল্লুকের মত উদ্‌লো গায়ে জোড়াসন হয়ে কবিরাজ ভিষগ্‌রত্ন ফরাসের উপরে বসে আছেন।

আর তাঁর অদূরে ঘরের মধ্যেকার পার্টিশনের পর্দাটা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন

চিত্রার্পিতের মত অপরূপ লাবণ্যময়ী এক নারী। বয়স কিছুতেই ত্রিশ-বত্রিশের বেশী হবে না বলেই মনে হয়।

পরিধানে ধব্‌ধবে্‌ সাদা কালো চওড়া শান্তিপুরী শাড়ি। মাথার অবগুণ্ঠন খসে কাঁধের উপরে এসে পড়েছে।

গলার চক্‌চকে সোনার হারের কিয়দংশ দেখা যায়। হাতে সোনার চুড়ি। কপালে দুই টানা বঙ্কিম ভ্রূর ঠিক মধ্যস্থলে একটি সিন্দুরের টিপ, কিন্তু ঐ সামান্য বেশভূষাতেও তার রূপ যেন ছাপিয়ে যাচ্ছে।

কোন মানুষ নয়, যেন পটে আঁকা নিখুঁত একখানি চিত্র। মুগ্ধ কিরীটীর দুচোখের দৃষ্টি যেন বোবা স্থির হয়ে থাকে।

হঠাৎ চাপাকণ্ঠে সেই নারীচিত্র যেন কথা বলে উঠলো, যথেষ্ট তো হয়েছে, আর কেন! এবারে ক্ষমা দাও।

নিঃশব্দ কুৎসিত হাসিতে ভল্লুকসদৃশ ভিষগ্‌রত্নের মুখখানা যেন আরো বীভৎস হয়ে উঠলো মুহূর্তে। কেবল একটি কথা সেই নিঃশব্দ কুৎসিত হাসির মধ্যে শোনা গেল, পাগল!

আচ্ছা তুমি কি! শয়তান না মানুষ!

আবার সেই কুৎসিত নিঃশব্দ হাসি ও সেই পূর্বোচ্চারিত একটিমাত্র শব্দ, পাগলী!

ছিঃ ছিঃ, গলায় দড়ি জোটে না তোমার!

দুঃসহ ঘৃণা ও লজ্জায় যেন ছিঃ ছিঃ শব্দ দুটি নারীকণ্ঠ হতে উচ্চারিত হল।

এবারে আর প্রত্যুত্তরে হাসি নয়।

সেই পরিচিত দুটি কথা।

মাগো! করালবদনী নৃমুণ্ডমালিনী সবই তোর ইচ্ছা মা—

কবিরাজ মশাইয়ের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, যাও। যাও—ভিতরে যাও। পাগলামি করো না, আমার পূজার সময় হল।

এরপর আর ভদ্রমহিলা দাঁড়ালেন না। কেবলমাত্র তীব্র তীক্ষ্ণ একটা কটাক্ষ হেনে মাথায় ঘোমটাটা তুলে দিয়ে নিঃশব্দে অন্দরেই বোধ হয় প্রস্থান করলেন। এবং যাবার সময় তাঁর দুচোখের দৃষ্টিটা যেন মুহূর্তের জন্য ধারালো ছুরির ফলার মত ঝিকিয়ে উঠলো বলে কিরীটীর মনে হলো।

ভিষগ্‌রত্ন মহিলাটির গমনপথের দিকে বারেকমাত্র তাকিয়ে আবার সেই নিঃশব্দ কুৎসিত হাসি হাসলেন দন্তপাটি বিকশিত করে। এবং নিম্নকণ্ঠে বললেন, মাগো করালবদনী নৃমুণ্ডমালিনী!

ভদ্রমহিলাটি কে?

ইতিপূর্বে কিরীটী ওঁকে কখনও দেখেনি।

তবে কি উনিই কবিরাজ মশাইয়ের সেই অন্তঃপুরচারিণী সদা-অবগুণ্ঠনবতী সহধর্মিণী! কিন্তু যদি তাই হয়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খুব একটা প্রীতির সম্পর্ক আছে বলে তো মনে হল না কিরীটীর, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ক্ষণপূর্বের কথাগুলো শুনে!

আর অতবড় চক্‌চকে গাড়ি হাঁকিয়েই বা এই গভীর রাত্রে কে এসেছিল কবিরাজগৃহে!

দিনের বেলায় তো কখনো কাউকে অতবড় গাড়ি হাঁকিয়ে কবিরাজ-ভবনে

কিরীটী আসতে দেখেনি আজ পর্যন্ত। এবং যেই হোক আগন্তুক, তাকে গাড়িতে বিদায় দিতে গিয়েছিল নিশ্চয়ই ঐ মহিলাই। কবিরাজ মশাই যাননি।

তিনি ঘরের মধ্যেই ছিলেন।

অনেক রাত পর্যন্ত কিরীটীর মাথায় ঐ চিন্তাগুলোই ঘোরাফেরা করতে থাকে বারংবার। কে ঐ মহিলা!

আর কেই বা সেই আগন্তুক নিশীথ রাত্রে গাড়ি হাঁকিয়ে এসেছিলেন কবিরাজ-ভবনে!

কিরীটী এই কয়দিনে পাড়ার দুচারজনের কাছ থেকে ও অন্নপূর্ণা রেস্তোরাঁয় চায়ের কাপ নিয়ে বসে বসে কবিরাজ মশাইয়ের সম্পর্কে যে সংবাদটুকু আজ পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পেরেছে তাতে করে এইটাই বোঝা যায় যে ভিষগ্‌রত্ন লোকটি মন্দ নয়। নির্বিবাদী, শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক ; পাড়ায় কারো সঙ্গে কোন ঝগড়া-বিবাদ নেই। কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। নিজের কবিরাজী ব্যবসা ও ঔষধপত্র নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত।

মিতভাষী কবিরাজ মশাই পাড়ার কারো সঙ্গেই বড় একটা মেশামেশি করেন না। যদিও তাঁর পুত্রকন্যার সঙ্গে অনেকেরই আলাপ-পরিচয় আছে পাড়ার মধ্যে।

কবিরাজ মশাইয়ের কথা ভাবতে ভাবতে নতুন করে আবার কিরীটীর অনিলবাবুর কথা মনে পড়ে।

কিরীটীর ঘরেই ভদ্রলোক ছিলেন।

ঐ মধ্যরাত্রির শান্ত নিস্তব্ধতায় একাকী ঐ ঘরের মধ্যে অদ্ভুত একটা অনুভূতি যেন কিরীটীর মনকে অক্টোপাশের ক্লেদাক্ত অষ্টবাহুর মত চারপাশ থেকে জড়িয়ে ধরতে থাকে।

মাত্র মাস দেড়েক আগে হঠাৎ একদিন প্রত্যুষে তাঁকে এ ঘরে আর দেখা গেল না—এবং পরে তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হল শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর পিছনের রাস্তায়। ভদ্রলোকের প্রেম ছিল একটি তরুণীর সঙ্গে।

বাগনান গার্লস স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রী। নাম বিনতা দেবী।

আচ্ছা, ভদ্রমহিলা অনিলবাবুর আজ পর্যন্ত কোন খোঁজখবর নিলেন না কেন?

হঠাৎ মনে হয় কিরীটীর, বাগনানে গিয়ে বিনতা দেবীর সঙ্গে একটিবার দেখা করলে কেমন হয়!

কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটী ঠিক করে ফেলে, কাল সকালে উঠেই সোজা সে একবার বাগনানে যাবে সর্বপ্রথম।

দেখা করবে সে বিনতা দেবীর সঙ্গে একবার।

সত্যি সত্যি পরের দিন সকালে উঠে কিরীটী সোজা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে গোমো প্যাসেঞ্জারে উঠে বসল বাগনানের একটা টিকিট কেটে। বেলা সাড়ে নয়টা নাগাদ কিরীটী বাগনান স্টেশনে এসে নামল।

গার্লস স্কুলটির নাম 'বিদ্যার্থী মন্ডল'। এবং স্কুলটা স্টেশন থেকে মাইলখানেক দূরে ছোট্ট শহরের মধ্যেই।

ভাঙাচোরা কাঁচা মিউনিসিপ্যালিটির সড়কটি বোধ হয় শহরের প্রবেশের একমাত্র রাস্তা।

লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে বেলা এগারটা নাগাদ কিরীটী স্কুলে গিয়ে পেঁছাল।

এম. ই. স্কুল।

ছোট একতলা একটা বাড়ি। শতখানেক ছাত্রী হবে।

স্কুল তখন বসেছে।

অফিস-ঘরে গিয়ে ঢুকল কিরীটী।

চোখে পুরু কাঁচের চশমা সুতা দিয়ে মাথার সঙ্গে পেঁচিয়ে বাঁধা, মাথায় টাক এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটা ভাঙা চেয়ারের উপর বসে টেবিলের ওপরে ঝুঁকে একটা মোটা বাঁধানো খাতায় কি যেন একমনে লিখছিলেন। সামনে আরো খান-দুই ভাঙা চেয়ার ও একটা নড়বড়ে ভাঙা বেঞ্চ।

ও মশাই শুনছেন! কিরীটী এগিয়ে গিয়ে ডাকে।

ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন পুরু লেন্সের ওধার থেকে।

ভদ্রলোক একটু বেশ কানে খাটো, কিরীটীর গলার শব্দটাই কেবল বোধ হয় গোচরীভূত হয়েছিল, বললেন, বগলাবাবু চলে গেছেন।

বগলাবাবু! বগলাবাবু আবার কে?

কী বললেন, কাকে?

বলছি শুনছেন—, কিরীটী এবারে কানের কাছে এসে একটু গলা উঁচিয়েই বলে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে স্মিতহাস্যে।

ভদ্রলোকও বোধ হয় এবারে শুনতে পান।

বললেন, কি বলছেন?

বিনতা দেবী বলে কোন শিক্ষয়িত্রী আপনাদের স্কুলে আছেন?

আছেন। কি প্রয়োজন?

প্রয়োজন আমার তাঁরই সঙ্গে।

তাহলে বসুন, এখন তিনি ক্লাসে। টিফিনে দেখা হবে।

টিফিন কখন হবে?

ঠিক একটায়। বলেই ভদ্রলোক আবার নিজ কাজে মনোনিবেশ করলেন।

অগত্যা কী আর করা যায়, কিরীটীকে বসতেই হল। একটা চেয়ার টেনে কিরীটী তার উপরে বসে আসবার সময় স্টেশন থেকে কেনা ঐদিনকার সংবাদ-পত্রটা খুলে চোখ বুলাতে লাগল। সবে বেলা এগারটা। এখনো টিফিন হতে দু'ঘণ্টা দেরি!

খবরের কাগজটা খুলে বসলেও তার মধ্যে কিরীটী মন বসাতে পারছিল না।

বিনতা দেবীর কথাই সে ভাবছিল। হঠাৎ তো মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে এখানে চলে এলো!

ভদ্রমহিলা কোন্ টাইপের তাই বা কে জানে!

তাকে কি ভাবে তিনি নেবেন তাও জানা নেই।

ভাল করে তিনি যদি কথাই না বলেন, কোন কথা না শুনেই যদি তাকে বিদায় দেন!

কিন্তু কিরীটী অত সহজে হাল ছাড়বে না। যেমন করে হোক তাঁর কাছ থেকে সব শুনে যেতেই হবে।

কিরীটী বসে বসে ভাবতে থাকে কি ভাবে ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা শুরু

করবে।

কিন্তু বেলা একটা পর্যন্ত সৌভাগ্যক্রমে কিরীটীকে অপেক্ষা করতে হল না।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই একটি নারীকণ্ঠে আকৃষ্ট হয়ে কিরীটী মুখ তুলে তাকাতেই তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়স্কা এক তরুণীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

পাতলা দোহারা চেহারা। গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। চোখ মুখ চিবুক বেশ ধারালো। মাথায় পর্যাপ্ত কেশ এলো খোঁপা করা। দুহাতে একগাছি করে সরু তারের সোনার বালা। পরিধানে সরু কালাপাড় একখানি তাঁতের শাড়ি।

কিরীটীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তরুণী দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে অদূরে লিখনরত উপবিষ্ট বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বললেন, অবিনাশবাবু, আমার মাইনেটা কি আজ পাবো?

অবিনাশবাবু বোধ হয় শুনতে পানিনি, বললেন, জমানো—জমানো টাকা আবার কোথা থেকে এলো আপনার?

জমানো টাকা নয়, বলছি মাইনেটা আজ মিলবে?

না, আজও ক্যাশে টাকা নেই। কাল-পরশু নাগাদ পেতে পারেন। হ্যাঁ—ঐ ভদ্রলোকটি আপনাকে খুঁজছিলেন বিনতা দেবী।

আমাকে খুঁজছেন!

বিনতা দেবী যেন কতকটা বিস্ময়ের সঙ্গে কিরীটীর মুখের দিকে ঘুরে তাকালেন।

কিরীটী উঠে দাঁড়াল এবং নমস্কার করে বললে, আপনি অবিশ্যি আমাকে চেনেন না বিনতা দেবী। আমার নাম কিরীটী রায়। কলকাতা থেকে আসছি। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।

আমার সঙ্গে!

হ্যাঁ। অবশ্য বেশী সময় আপনার আমি নেবো না।

কি বলুন তো?

কথাটা একটু মানে—, কিরীটী একটু ইতস্তত করতে থাকে।

বিনতা দেবী বোধ হয় বুঝতে পারেন। বললেন, চলুন পাশের ঘরে যাওয়া যাক।

পাশের ঘরটি ঠিক বসবার উপযুক্ত নয়। স্কুলের বাড়তি জিনিসপত্র ভাঙাচোরা চেয়ার বোর্ড ইত্যাদিতে ঠাসা ছিল।

একপাশে একটা ছোট বেঞ্চ ছিল, তারই উপরে কিরীটীকে বসতে বলে বিনতা দেবীও তার পাশেই বসলেন নিঃসংকোচেই।

কিরীটী বিনতা দেবীর সপ্রতিভ ব্যবহারে প্রথম আলাপেই বুঝে নিয়েছিল ভদ্রমহিলার বিশেষ কোন সঙ্কোচের বালাই নেই।

বলুন কি বলছিলেন!

কিরীটী কোনরূপ ভণিতা না করেই স্পষ্টাস্পষ্টি সোজাসুজিই তার বক্তব্য শুরু করে, দেখুন আপনাকে আগেই বলেছি বিনতা দেবী, আমি আসছি কলকাতা থেকে এবং অনিলবাবুর আকস্মিক রহস্যজনক মৃত্যু সম্পর্কে—

অনিল! চমকে কথাটা বলে বিনতা কিরীটীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

হ্যাঁ। অনিলবাবু আপনার যে বিশেষ পরিচিত ছিলেন তা আমি জানি।

কিন্তু আপনি—

আমার একমাত্র পরিচয় একটু আগেই তো আপনাকে আমি দিয়েছি। তার বেশী বললেও তো আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না। তবে ঐ সঙ্গে সামান্য একটু যোগ করে বলতে পারি মাত্র যে অনিলবাবুর মৃত্যুরহস্যটা জানবার আমি চেষ্টা করছি।

বিনতা অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। প্রায় মিনিট দুয়েক। তারপর মুখ তুলে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তা সেজন্য আমার কাছে আপনি এসেছেন কেন? আপনি কি পুলিসের কোন লোক?

না না—পুলিসের লোক ঠিক আমি নই। তবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে আমার।

কিন্তু সেজন্য আমার কাছে না এসে পুলিসের সাহায্য নিলেই তো আপনি পারতেন!

কথাটা ঠিক তা নয়।

তবে?

পুলিস অনেক সময় অনেক কিছুই জানতে পারে না। ঐ ধরনের হত্যা-রহস্যের সঙ্গে এমন অনেক কিছুই হয়ত রহস্য থাকে যা জানতে পারলে পুলিসের পক্ষেও অনেক জটিলতার সমস্যা হয়তো সহজেই মিলতে পারত। বুঝতে পারছেন বোধ হয় আমি ঠিক কি বলতে চাইছি আপনাকে!

বিনতা দেবী চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ।

কিরীটী আবার ডাকে, বিনতা দেবী?

বলুন।

আপনি তাঁর বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাই আপনার কাছে এসেছি যদি তাঁর সম্পর্কে এমন কোন বিশেষ খবর—

কি জানতে চান আপনি কিরীটীবাবু?

আমি কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে করবো, তার জবাব পেলেই আমি সন্তুষ্ট হবো।

কিন্তু—, বিনতা দেবী ইতস্ততঃ করতে থাকেন।

আপনি কি তাঁকে—কিছু মনে করবেন না, ভালবাসতেন না?

প্রশ্নোত্তরে বিনতা দেবী কোন জবাব দেন না।

কেবল কিরীটী দেখতে পায় তাঁর চোখের কোল দুটি যেন হঠাৎ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

তাই বলছিলাম, আপনি কি চান বিনতা দেবী, তাঁর মৃত্যুর রহস্যটা উদ্ঘাটিত হোক?

চাই।

তবে বলুন, অনিলবাবুর মৃত্যুর কয়দিন আগে শেষবার কবে আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল?

তার মৃত্যুর আগের দিন রবিবার কলকাতায় আমি গিয়েছিলাম। সেই সময়েই শেষবার আমাদের দেখা হয়েছিল'

আচ্ছা তাঁর মৃত্যুর আগে ইদানীং এমন কোন কথা কি তাঁর মুখে আপনি শুনেছেন বা তিনি আপনাকে বলেছেন বা তাঁর ঐ সময়কার ব্যবহারে এমন কোন কিছু আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল যেটা আপনার অন্যরকম কিছু মনে হয়েছিল! বুঝতে পারছেন নিশ্চয় আশা করি কি আমি বলতে চাইছি?

একটু চুপ করে থেকে বিনতা বললেন, না, তেমন কিছু মনে পড়ছে না। তবে—

তবে? কিরীটী একটু যেন কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

তবে শেষবার দেখা হওয়ার আগে এক শনিবার সে এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে কথায় কথায় বলেছিল, ন্যায়রত্ন লেনের বাসা নাকি—

কি! কি বলেছিলেন অনিলবাবু?

বলেছিল ন্যায়রত্ন লেনের বাসা নাকি সে ছেড়ে দেবে।

একথা কেন বলেছিলেন?

তা তো জানি না। তবে বলেছিল বাসাটা নাকি ভাল না।

অন্য কোন্ কারণ বলেননি বাসাটা ছেড়ে দেবার?

না।

আচ্ছা বাড়িওয়ালা কবিরাজ মশাই সম্পর্কে বা তাঁর ফ্যামিলির অন্য কারো সম্পর্কে কোন কথা কি তিনি আপনাকে বলেছিলেন কখনো কোনদিন কোন কথাপ্রসঙ্গে?

না, তবে—

তবে কি?

তবে কবিরাজ মশাইয়ের পরিবারের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল শুনেছিলাম তারই মুখে একদিন কথায় কথায়।

ও। আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই জানেন, অনিলবাবু কতদিন ঐ ন্যায়রত্ন লেনের বাড়িতে ছিলেন ঘর নিয়ে?

তা মাস আষ্টেক হবে।

তার আগে কোথায় ছিলেন?

এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাসায় যাদবপুরে।

আর একটা কথা বিনতা দেবী, অনিলবাবুর ইদানীং আয় কি একটু বেড়েছিল?

কিরীটীর প্রশ্নে বিনতা ওর মুখের দিকে বারেকের জন্য চোখ তুলে তাকালেন এবং তাঁর ভাবে বোধ হল যেন একটু ইতস্তত করছেন। কিরীটী তাঁর ইতস্তত ভাবটা বুঝতে পেরে বলে, ভয় নেই আপনার বিনতা দেবী, নির্ভয়ে আমার কাছে সব কথা বলতে পারেন।

মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন এবারে বিনতা দেবী, হ্যাঁ। অন্তত মুখে সে না বললেও হাবে-ভাবে-আচরণে সেটা আমার কাছে চাপা থাকেনি, তাছাড়া—, কথার শেষাংশে পৌঁছে বিনতা যেন আবার একটু ইতস্তত করতে থাকেন।

তাছাড়া কি বিনতা দেবী?

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে বিনতার মুখের দিকে তাকিয়ে কিরীটী শেষের কথা-গুলো উচ্চারণ করল।

তাছাড়া অবস্থার সে উন্নতি করতে পারছিল না বলেই আমাদের বিবাহের ব্যাপারটা সে পিছিয়ে দিচ্ছিল বার বার এবং নিজে থেকেই উপযাচক হয়ে

যেদিন সে আমার কাছে এসে আমাদের বিবাহের কথা তোলে আমি সেদিন একটু অবাক হয়েই তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সত্যিই কি এতদিনে তাহলে সে অবস্থার উন্নতি করতে পেরেছে?

তাতে তিনি কি জবাব দিলেন?

বিনতা প্রশ্নের জবাবে এবারে চুপ করে থাকেন।

হুঁ। তা আপনি আর কিছু জিজ্ঞাসা করেননি? কেমন করে অবস্থার উন্নতি হলো?

না।

কেন?

কারণ আমি আশা করেছিলাম সব কথা সে নিজেই খুলে বলবে। তা যখন বললো না, আমিও আর কিছু ও সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি।

নিজে থেকেও নিশ্চয়ই আর কিছু তিনি বলেননি?

না।

সামান্য আলাপ-পরিচয়েই কিরীটী বুঝতে পারে যথেষ্ট বুদ্ধি রাখেন ভদ্রমহিলা। এবং ভদ্রমহিলার সঙ্গে পরবর্তী কথাপ্রসঙ্গে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, অনিলবাবুর ইদানীংকার ব্যবহারটা একটু কেমন যেন রহস্যজনক হয়ে উঠেছিল। অর্থ জন প্রতিপত্তির লিপ্সা মানুষ মাত্রেরই থাকে। তবে অনিল-বাবুর যেন একটু বেশীই ছিল। কতদিন বিনতা বলেছেন, বেশী দিয়ে আমাদের কি হবে! তার জবাবে নাকি অনিলবাবু বলেছেন, সাধারণ ভাবে জীবনযাপন তো সকলেই করে। তার মধ্যে thrill কোথায়! এমনভাবে বাঁচতে আমি চাই যাতে দশজনের মধ্যে মাথা উঁচু করে আমি থাকতে পারি, সত্যিকারের সুখ ও প্রাচুর্যের মধ্যেই। অতি সাধারণ ভাবে বাঁচার মধ্যে জীবনের কোন মাধুর্য উপভোগ করবার মত কিছু নেই। সেটা একপক্ষে মৃত্যুরই নামান্তর।

বিনতা দেবী আরো অনেক কথাই কিরীটীকে বললেন, যা থেকে কিরীটীর বুঝতে কষ্ট হয় না, তিনি অনিলবাবুকে সত্যি সত্যিই ভালবাসতেন। সে ভালবাসার মধ্যে কোন খাদ ছিল না। যদিচ অনিলবাবুর ইদানীংকার ব্যবহারের মধ্যে তাঁর দিক থেকে একটা স্বার্থপরতার ভাব দেখা দিয়েছিল, তথাপি বিনতার ভালবাসায় কোন তারতম্য হয়নি।

বরং মনে মনে একটু আঘাত পেলেও মুখে কখনো সেটা অনিলবাবুকে জানতে দেননি তিনি।

আর অনিলবাবুকে বিনতা সত্যিকারের ভালবাসতেন বলেই তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর স্মৃতি নিয়েই কাটাচ্ছেন।

আড়াইটের ফিরতি ট্রেনটা না ধরতে পারলে ফিরতে রাত হবে তাই কিরীটী অতঃপর বিনতা দেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নমস্কার জানিয়ে স্টেশনের দিকে পা বাড়ায়।

॥ ৫ ॥

দুপুরের ট্রেনেই কিরীটী কলকাতা ফিরে এল।

ঐদিনটা শনিবার থাকায় অফিসের ছুটি হয়ে গিয়েছিল। সত্যশরণ তার

ঘরেই ছিল।

কিরীটীকে তার ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সত্যশরণ কিরীটীর ঘরে এসে ঢুকল। কিরীটী জামার গলার বোতামটা খুলছে তখন।

কিরীটী!

কে, সত্যশরণ, এসো—এসো—

গিয়েছিলে কোথায়?

এই কলকাতার বাইরে একটু কাজ ছিল—

এদিকে পাড়ার ব্যাপার শুনেছো তো সব?

না, কি বল তো?

আজ সকালে যে আবার একটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে এই পাড়ায়!

বল কি? কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী সত্যশরণের দিকে ফিরে তাকায়।

জামার বোতাম আর খোলা হয় না।

হ্যাঁ, এবারে অবিশ্যি একেবারে ট্রাম-রাস্তার উপরে—ঐ যে মোড়ে চার-তলা ব্যালকনীওয়ালা লাল বাড়িটা আছে, তারই বারান্দার নীচে মৃতদেহ পাওয়া গেছে এবারে।

বল কি? বাঙ্গালী?

হ্যাঁ।

এবং পোশাক দেখে মনে হয় বেশ ধনীই লোকটা ছিল। বাঁ হাতের দুই আঙুলে দুটো ধীরে-বসানো সোনার আংটি ছিল—

কিরীটী রীতিমত উৎসাহী হয়ে ওঠে।

তারপর?

তারপর আর কি! পুলিস এসে মৃতদেহ রিমুভ করে—

মৃতদেহের গলায় তেমনি সরু কালো দাগ ছিল?

সরু কালো দাগ!

কথাটা সত্যশরণ বুঝতে না পেরে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ।

তা তো জানি না ঠিক।

ওঃ—

হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে কিরীটীও বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিল।

সত্যশরণ জিজ্ঞাসা করে, মৃতদেহের গলায় কি সরু কালো দাগের কথা বলছিলে কিরীটী?

কিরীটী অগত্যা যেন কথাটা খোলাখুলি ভাবে না বলে একটু ঘুরিয়ে বলে, সংবাদপত্রে তোমরা লক্ষ্য করেছো কিনা জানি না, এর আগের আগের বার মৃতদেহের description প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল মৃতদেহের গলায় একটা সরু কালো দাগের কথা। তা পুলিস কাউকে arrest করেছে নাকি?

না। তবে আশেপাশের বাড়ির লোকদের অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছে শুনলাম।

মৃতদেহ প্রথম কার নজরে পড়ে?

তা ঠিক জানি না।

সন্ধ্যার দিকেই কিরীটী থানায় গেল বিকাশের সঙ্গে দেখা করতে।

বিকাশ তখন ঐ এলাকারই একটা মোটর-অ্যাকসিডেণ্টের রিপোর্ট নিচ্ছিল। কিরীটীকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে বললে, এই যে কিরীটী, এসো—বসো, এই রিপোর্টটা শেষ করে নিই—কথা আছে।

রিপোর্ট শেষ করে ঘর থেকে সকলকে বিদায় করে দিয়ে বিকাশবাবু বললেন, শুনেছো নাকি তোমাদের পাড়ার সকালের ব্যাপারটা?

সকালের ট্রেনেই কলকতার বাইরে একটু গিয়েছিলাম। এসে শুনলাম।

আমি তো ভাই আজকের ব্যাপারে একেবারে তাজ্জব বনে গিয়েছি। এই কয় মাসে চার-চারটে মার্ডার একই এলাকায়—বলে একটু থেমে যেন দম নিয়ে আবার বললেন, বড় সাহেবের সঙ্গে আজ তো একচোট হয়েই গিয়েছে। Inefficient, অমুক-তমুক, কত কি ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে যাচ্ছেতাই করে বললেন অফিসের মধ্যে।

কিরীটী বুঝতে পারে অফিসে বড়কর্তার কাছে মিষ্টি মিষ্টি বেশ দুটো কথা শুনে বিকাশ বেশ একটু চঞ্চল হয়েই উঠেছে। সত্যই তো, একটার পর একটা খুন হয়ে যাচ্ছে অথচ আজ পর্যন্ত তার কোন কিনারা হল না!

কিরীটী হাসতে থাকে।

বিকাশ বলে, তুমি হাসছ রায়—

ব্যস্ত হয়ে তো কোন লাভ নেই। ব্যাপার যা বুঝছি, বেশ একটু জটিলই। সব কিছু গুছিয়ে আনতে একটু সময় নেবে। কিরীটী আশ্বাস দেয়।

বিকাশ কিরীটীর শেষের কথায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, কিছু বুঝতে পেরেছো নাকি?

না, মানে—

দোহাই তোমার, যদি কিছু বুঝতে পেরে থাকে তো সোজাসুজি বল। আমি ভাই সত্যিই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তাড়াহুড়োর ব্যাপার তো নয় ভাই এটা। খুব ধীরে ধীরে এগুতে হবে।

তারপর আবার জিজ্ঞাসা করে কিরীটী বিকাশকে, হ্যাঁ ভাল কথা—মৃত-দেহের identification হয়েছে?

না, কই আর হলো! এখন পর্যন্ত কোন খোঁজই পড়েনি!

মৃতদেহ তো মর্গেই এখনো আছে তাহলে?

হ্যাঁ। কাল পোস্টমর্টেম্ হবে।

মৃতদেহের আশেপাশে বা মৃতদেহে এমন কিছু নজরে পড়েছে তোমার suspicion হওয়ার মত, বা কোন clue?

না, তেমন কিছু নয়—তবে কাল শেষরাত্রে বোধ হয় বৃষ্টি হয়েছিল, যেখানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে সেই বাড়ির ব্যালকনির ধার ঘেঁষে গাড়ির টায়ারের দাগ পাওয়া গিয়েছিল রাস্তায়।

আর কিছু? মানে মৃতদেহের জামার পকেটে কোন কাগজপত্র বা কোন রকমের ডকুমেণ্ট বা—

না।

মর্গে গিয়ে একবার মৃতদেহটা দেখে আসা যেতে পারে?

তা আর যাবে না কেন!

আজ এখুনি?

এখুনি!

হ্যাঁ।

বিকাশবাবু কি একটু ভেবে বললেন, বেশ চল।

দুজনে থানা থেকে বের হয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ময়নাঘরে এলেন।

ময়নাঘরের ইনচার্জ ডোমটা ময়নাঘরের সামনেই একটা খাটিয়া পেতে শুয়ে ছিল। ইউনিফর্ম পরিহিত বিকাশকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম দিল।

আজ সকালে শ্যামবাজার থেকে যে লাশটা এসেছে সেটা দেখবো, ভিতরে চল।

কোমর থেকে চাবির গোছা বের করে ডোমটা দরজা খুলতেই একটা উগ্র ফর্মালীন ও অনেকদিনের মাংসপচা চামসে মিশ্রিত গন্ধ নাসারন্ধ্রে এসে ঝাপটা দিল।

হলঘরটা পার হয়ে দুজনে ডোমের পিছনে পিছনে এসে ঠাণ্ডাঘরে প্রবেশ করল।

একটা স্ট্রেচারের উপরে সাদা চাদরে ঢাকা মৃতদেহটা মেঝেতেই পড়েছিল।

ডোমটা চাদরটা সরিয়ে দিল। বেশ হৃষ্টপুষ্ট মধ্যবয়সী একজন ভদ্রলোক।

মুখটা যেন কালচে মেরে গিয়েছে। নিখুঁতভাবে দাড়ি-গোঁফ কামানো। ডান গালের উপরে একটা মটরের মত কালো আঁচিল।

পরিধানে ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি ও সরু কালোপাড় মিহি মিলের ধুতি।

আদ্দির জামার তলা দিয়ে নেটের গেঞ্জি চোখে পড়ে।

কিরীটী নীচু হয়ে দেখলে, গলায় আধ ইঞ্চি পরিমাণ একটা সরু কালো দাগ গলার সবটাই বেড় দিয়ে আছে।

চোখ দুটো যেন ঠেলে কোটর থেকে বের হয়ে আসতে চায়, চোখের তারায় সাব-কনজাংটাইভ্যাল হিমারেজও আছে।

মুখটা একটু হাঁ-করা; কষ বেয়ে ক্ষীণ একটা লালা-মিশ্রিত কালচে রক্তের ধারা জমাট বেঁধে আছে।

মৃতদেহ উল্টেপাল্টে দেখল কিরীটী, দেহের কোথাও সামান্য আঘাতের চিহ্নও নেই।

স্পষ্টই বোঝা যায় কোন কিছু গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করেই হত্যা করা হয়েছে।

ডান হাতের উপরে উল্কিতে 'A' ইংরাজী অক্ষরটি লেখা।

কিরীটী উঠে দাঁড়াল, চলুন বিকাশবাবু, দেখা হয়েছে।

মর্গ থেকে বের হয়ে কিরীটী আর বিকাশবাবুর সঙ্গে গেল না। বিকাশবাবুর ভবানীপুরের দিকে একটা কাজ ছিল, তিনি ভবানীপুরগামী ট্রামে উঠলেন।

কিরীটী শ্যামবাজারগামী ট্রামে উঠল।

রাত বেশী হয়নি। সবে সাড়ে আটটা।

কলকাতা শহরে গ্রীষ্মরাত্রি সাড়ে আটটা তো সবে সন্ধ্যা!

ট্রাম থেকে নেমে কিরীটী সোজা একেবারে অন্নপূর্ণা হোটেল রেস্তোরাঁয় এসে উঠলো।

এক কাপ চা দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিতে হবে।

রেস্তোরাঁ তখন চা-পিপাসীদের ভিড়ে বেশ সরগরম।

কিরীটী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। একপাশে নিত্যকার মত ছোট একটা টেবিল নিয়ে কাউণ্টারের মধ্যে বসে আছেন অন্নপূর্ণা হোটেল ও রেস্তোরাঁর আদি ও অকৃত্রিম একমাত্র মালিক ভূপতিচরণ।

রেস্তোরাঁটায় পাড়ার ছেলেদেরই বেশী ভিড়। নানা আলোচনা চলছিল খদ্দেরদের মধ্যে চা-পান করতে করতে ঐ সময়টায়।

হঠাৎ কানে এলো কিরীটীর, তার ডান পাশের টেবিলে চারজন সমবয়সী ছোকরা চা-পান করতে করতে সকালের ব্যাপারটাই আলোচনা করছে।

কিরীটী উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

লাচুলওয়ালা পাঞ্জাবি ও সার্টের কম্বিনেশন জামা গায়ে ৩০।৩২ বৎসরের একটি যুবক তার পাশের যুবকটিকে বলছে, তোদের বাড়ি তো একেবারে সাত নম্বর বাড়ির ঠিক অপজিটে, আর তুই তো শালা রাত্রিচর, তোরও চোখে কিছু পড়েনি বলতে চাস ফট্‌কে?

সম্বোধিত ফটিক নামধারী যুবকটি প্রত্যুত্তরে বলে, একেবারে যে কিছুই দেখিনি মাইরি তা নয়, তবে ধেনোর নেশার চোখে খুব ভাল করে ঠাওর হয়নি।

কিরীটীর শ্রবণেন্দ্রিয় শিকারী বিড়ালের কানের মত সতর্ক সজাগ হয়ে ওঠে।

ধেনো! বলিস কি ফট্‌কে! তোর তো সাদা ঘোড়া চলে না রে!

ফটিক তার বন্ধু রেবতীর কথায় ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হাসতে থাকে। বোঝা যায় কথাটা তার মনে লেগেছে। তারপর বলে, কি করি ভাই! জানিস তো অভাবে স্বভাব নষ্ট। গত মাস থেকে মা আর দুশোর বেশি একটা পয়সা দেয় না। শালা দুশো টাকা মাসের পনের তারিখেই ফুটুস ফুঃ! তাই ঐ ধেনোই ধরতে হয়েছে। কাল রাত্রে নেশাটাও একটু বেশী হয়েছিল—

মুখবন্ধ ছেড়ে ব্যাপারটা বল্ তো! রেবতী বলে ওঠে।

তখন বোধ করি ভাই সাড়ে তিনটে হবে। নেশাটা বেশ চড়চড়ে হয়ে উঠেছে—

ফটিকের শেষের কয়েকটা কথা কিরীটী শুনতে পেল না, কে একজন খরিদ্দার চপের কিমার মধ্যে নাকি কাঠের গুঁড়ো পেয়েছে, সে চেঁচাচ্ছে, বলি ওহে বংশীবদন! আজকাল কিমার বদলে স্রেফ বাবা কাঠের গুঁড়ো চালাচ্ছ? ধর্মে সইবে না বাবা, ধর্মে সইবে না। উচ্ছন্নে যাবে।

ভূপতিচরণ হোটেলের মালিক হন্তদন্ত হয়ে প্রায় এগিয়ে এলেন, কি বলছেন স্যার! অন্নপূর্ণা হোটেল রেস্তোরাঁর প্রেস্টিজ নষ্ট করবেন না!

খানিকটা গোলমাল ও হাসাহাসি চলে। হোটেলের সবেধন নীলমণি ওয়েটার বংশীবদন একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে বোকার মত। ফটিক তখন বলছে, এক পসলা তার আগে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে আছি।

দিব্যি ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে—দেখলাম পূর্বদিক থেকে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল—তারপর সেই গাড়ি থেকে একজন লোককে দেখলাম কি একটা ভারী মত জিনিস ধরে গাড়ি থেকে রাস্তায় নামিয়ে রাখল। তবে শালা গাড়িটা যখন চলে যায় না তখন দেখছি গাড়িটা একটা ট্যাক্সি—

বলিস কি ফট্‌কে! ট্যাক্সি!

হ্যাঁ। আর এ পাড়ারই ট্যাক্সি।

মাইরি!

তবে আর বলছি কি! W. B. T. 307। গঙ্গাপদর সেই কালো রঙের চক্‌চকে প্রকাণ্ড ডিসোটো ট্যাক্সি গাড়িটা—

তারপর?

তারপর আর কিছু জানি না বাবা। কোথায় মাঝরাতে কে কি করছে না করছে জেনে লাভ কি! সোজা গিয়ে বিছানায় লম্বা। ঘুম ভাঙল আজ সকালে প্রায় আটটায়, তখন আমার বোন চিনুর কাছে শুনি আমাদের বাড়ির সামনে নাকি হৈ-হৈ কাণ্ড! সাত নম্বর বাড়ির করিডরের সামনে কাল একটা লাশ পাওয়া গিয়েছে। পুলিস এসেছে—সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল গত রাত্রির কথা। তাড়াতাড়ি উঠে আগে শালা জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। তবু কি বেটারা রেহাই দেয়! ধাওয়া করেছিল আমার বাড়ি পর্যন্ত। বললে, সামনের বাড়িতে থাকেন, দেখেছেন নাকি কিছু? স্রেফ বলে দিলাম—মাল টানা অভ্যাস আছে মশাই। অত রাত্রে কি আর জ্ঞানগম্যি থাকে!

কথাটা শেষ করে শ্রীমান ফটিক বেশ রসিয়ে রসিয়ে আবার হাসতে লাগল।

কিরীটীরও মনে পড়ে ন্যায়রত্ন লেনের মোড়ে অনেক দিন ওর নজরে পড়েছে ঝক্‌ঝকে ডিসোটো ট্যাক্সি গাড়িটা। নম্বরটা যার W. B. T. 307।

ড্রাইভিং সীটে মোটা কালোমত যে লোকটাকে বসে বসে প্রায়ই ঝিমুতে দেখা যায়, তার বসন্তের ক্ষতচিহ্নিত গোলালো মুখখানাও কিরীটীর মানসনেত্রে উঁকি দিয়ে গেল ঐ সঙ্গে।

ডিসোটো ট্যাক্সি গাড়ি, W. B. T. 307—

গাড়ির কথাটা ও নম্বরটা বার বার কিরীটীর মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকে।

এই পাড়ায় গত কয়েক মাস ধরে যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আজ পর্যন্ত চার-চারটি রহস্যময় মৃত্যু কেবলমাত্র লাশের মধ্যে প্রমাণ রেখে গিয়েছে, ঐ W. B. T. 307 নম্বরের গাড়ির সঙ্গে কি তার কোন যোগাযোগ আছে?

পরের দিনও সন্ধ্যার পর কিরীটী আবার থানায় গেল।

বিকাশ একটা জরুরী কাজে যেন কোথায় বের হয়েছিলেন, একটু পরেই ফিরে এলেন।

কিরীটীকে বসে থাকতে দেখে প্রশ্ন করলেন, এই যে কিরীটী! কতক্ষণ?

এই কিছুক্ষণ। তারপর ময়না-তদন্ত হল?

বিকাশ বসতে বসতে বললেন, হ্যাঁ, ময়না-তদন্তও হয়েছে—লোকটার identityও পাওয়া গিয়েছে।

পাওয়া গিয়েছে নাকি?

হ্যাঁ। লোকটার নাম অরবিন্দ দত্ত। এককালে চন্দননগরের ঐ দত্তরা বেশ

বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিল। এখন অবিশ্যি পড়তি অবস্থা। তিন ভাই—বীজেন্দ্র, মহেন্দ্র, অরবিন্দ। ঐ মানে অরবিন্দই ছোট সবার।

হ্যাঁ, তা লোকটার স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল ইত্যাদি কোন-কিছু খোঁজ-খবর পেলে?

পেয়েছি, আর সেইখান থেকে মানে বীজেন্দ্রবাবুর ওখান থেকেই আসছি। বীজেন্দ্রবাবু আজ বছর দশেক হল আলাদা হয়ে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ হিসাবে কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের বাড়িখানা নিয়ে বসবাস করছেন।

তা বীজেন্দ্রবাবুর সংবাদ পেলে কি করে?

সেও এক আশ্চর্য ব্যাপার!

কি রকম?

সেও এক ইতিহাস হে! বলে বিকাশ বলতে শুরু করেন, বলেছি তো বীজেন্দ্রবাবুরা চন্দননগরের বাসিন্দা। বছর আষ্টেক আগে বীজেন্দ্রবাবুদের এক বিধবা বোন ছিলেন—সুরমা। সেই বোন ও দুই ভাই মহেন্দ্র ও অরবিন্দ কাশী যান। কাশীতে দত্তদের একটা বাড়ি আছে বাঙালীটোলায়। তাঁরা গিয়েছিলেন মাস দুই কাশীতে থাকবেন বলেই। মধ্যে মধ্যে তাঁরা ঐভাবে দু'এক মাস কাশীর বাড়িতে গিয়ে নাকি কাটাতেন। যা হোক সেবারে চার মাস পরে দুই ভাই তাঁদের স্ত্রী পুত্র নিয়ে যখন ফিরে এলেন সুরমা ফিরল না তাঁদের সঙ্গে। ফিরে এসে ওঁরা রটালেন সুরমা নাকি কাশীতে হঠাৎ দুদিনের জ্বরে মারা গিয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তা নয়—সুরমা মরেনি, গৃহত্যাগ করেছিল এক রাত্রে।

বীজেন্দ্রবাবু বললেন নাকি ও-কথা?

হ্যাঁ, শোন—বললাম তো একটা গল্প! অরবিন্দ মধ্যে মধ্যে কলকাতায় এসে দাদার এখানে উঠতেন। দু'চার দিন থেকে আবার চলে যেতেন। শুকনো জমিদারীর কোনরূপ আয় না থাকলেও অরবিন্দবাবুর অবস্থাটা কিন্তু ইদানীং বছর আষ্টেক মন্দ যাচ্ছিল না। বরং বলতে গেলে বেশ একটু অর্থসচ্ছলতাই ছিল তাঁর। যাহোক যা বলছিলাম, এবারে অরবিন্দবাবু গত শনিবার মানে প্রায় আটদিন আগে কলকাতায় আসেন চন্দননগর থেকে। এবং অন্যান্য বারের মত দাদার ওখানেই ওঠেন। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার হঠাৎ রাত্রি দেড়টায় বাড়ি ফিরে দাদা বীজেন্দ্রবাবুকে ডেকে বলেন, সুরমার খোঁজ তিনি পেয়েছেন। এবং তখনই তিনি তাঁর দাদাকে সুরমা সম্পর্কে আট বছর আগেকার সত্য কাহিনী খুলে বলেন। বীজেন্দ্রবাবু এর আগে আসল রহস্যটা সুরমা সম্পর্কে জানতেন না।

তারপর?

তারপরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত —

কি রকম?

বৃহস্পতিবার রাত্রের পর শেষ দেখা হয় অরবিন্দবাবুর সঙ্গে বীজেন্দ্রবাবুর শুক্রবার সকালে। তারপর আর দেখা হয়নি। এবং রবিবার সকালের ডাকে একখানা খামের চিঠি পান বীজেন্দ্রবাবু।

চিঠি! কার?

সুরমা দেবীর।

কি চিঠি?

এই দেখ সে চিঠি—, বলতে বলতে বিকাশ চিঠিটা বের করে কিরীটীর হাতে দিলেন। খামের উপরে ডাকঘরের ছাপ আছে। শ্যামবাজার পোস্ট অফিসের ছাপ।

কিরীটী ছেঁড়া খাম থেকে ভাঁজকরা চিঠিটা টেনে বের করল। সংক্ষিপ্ত চিঠি।

শ্রীচরণেষু বড়দা,

ছোটদা মারা গিয়েছেন। তাঁর মৃতদেহ বেওয়ারিশ লাশ হিসাবে পুলিস মর্গে চালান দিয়েছে। সৎকারের ব্যবস্থা করবেন। ইতি—

আপনাদের হতভাগিনী বোন সুরমা

একবার দুবার তিনবার কিরীটী চিঠিটা পড়ল।

সুরমা গৃহত্যাগিনী বোন মৃত অরবিন্দ দত্তের! কিন্তু সে অরবিন্দর মৃত্যু-সংবাদ জানলে কি করে?

নিশ্চয়ই অকুস্থানে সুরমা উপস্থিত ছিল, না হয় তার জ্ঞাতেই সব ব্যাপারটা ঘটেছে। অন্যথায় সুরমার পক্ষে ঐ ঘটনা জানা তো কোনমতেই সম্ভবপর নয়। লাশ পাওয়া গিয়েছে শ্যামবাজারেই।

চিঠির ওপরে ডাকঘরের ছাপও শ্যামবাজারের। তবে কি পলাতকা সুরমা শ্যামবাজারেই কোথায়ও আত্মগোপন করে আছে!

কিরীটীর চিন্তাসূত্রে বাধা পড়ল বিকাশের প্রশ্নে, কি ভাবছে কিরীটী?

কিছু না। হুঁ, ময়না-তদন্তের রিপোর্ট কি?

Throttle করে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি কিরীটী, বীরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পরে থেকে সমস্ত ব্যাপারটা যেন আরো গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে—

কিরীটী বলে, কিছু clue তো আমাদের হাতে এসেছে। এইবার তো মনে হচ্ছে আমরা তবু এগুবার পথ পেয়েছি!

কি বলছো তুমি কিরীটী?

আমি তোমাকে আরো একটা clue দিচ্ছি—এই অঞ্চলে একটা ডিসোটো ট্যাক্সি গাড়ি আছে। নম্বরটা তার W. B. T. 307। ট্যাক্সিটার ওপরে একটু নজর রাখ। হয়তো আরো এগিয়ে যেতে পারবে।

বিকাশ যেন বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান, কি বলছো তুমি! ট্যাক্সির ড্রাইভার গঙ্গাপদ যে আমার বেশ চেনা লোক হে! অনেকবার আমার প্রয়োজনে ভাড়ায় খেটেছে। তাছাড়া গঙ্গাপদ লোকটাও spotless, ওর সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন রিপোর্টই তো পাইনি।

কিন্তু সেইটাই বড় কথা নয় বিকাশ। মৃদু হেসে কিরীটী বলে।

কিন্তু—, বিকাশ তবু ইতস্তত করতে থাকেন।

বললাম তো, প্রদীপের নীচেই বেশী অন্ধকার। যাহোক আজ উঠি—আবার দেখা হবে।

কিরীটী আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে ঘর ছেড়ে বের হয়ে এলো।

কিরীটী বাসায় ফিরে এলো যখন রাত প্রায় নটা।

রজতবাবুর ঘরে আলো জ্বলছে দেখে কিরীটী দাঁড়ালো দরজাগোড়ায়। রজতবাবু তা হলে ফিরেছেন! পরশু যে সেই দক্ষিণ কলকাতায় কাজ আছে বলে চলে গিয়েছিলেন, এ দুদিন আর ফেরেননি। রজতবাবুর গলা কানে এলো, বেশ ভালো করে বাঁধ—রাস্তায় যেন আবার খুলে না যায়।

রজতবাবুর ঘরের দরজাটা অর্ধেকটা প্রায় খোলাই ছিল। সেই খোলা দ্বারপথে উঁকি দিয়ে কিরীটী দেখল, রজতবাবু মেসের ভৃত্য রতনের সাহায্যে বাক্স-বিছানা সব বাঁধাছাঁদা করছেন।

ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল কিরীটী, কি ব্যাপার রজতবাবু—বাঁধাছাঁদা করছেন সব?

হ্যাঁ মিঃ রায়, এ বাসা ছেড়ে আমি আজ চলে যাচ্ছি।

চলে যাচ্ছেন!

তা নয়ত কি? মশাই অপমান সহ্য করেও পড়ে থাকবো?

তা কোথায় যাচ্ছেন?

বালিগঞ্জে—একেবারে লেক অঞ্চলে। দোতলার ওপরে একটা চমৎকার ফ্ল্যাট্ পাওয়া গিয়েছে—ভাড়াটা অবশ্য কিছু বেশী। তা কি করা যাবে, এ হতচ্ছাড়া জায়গায় কোন ভদ্রলোক থাকে? যেমন বাড়ি তেমনি বাড়িওলা! বেটা অভদ্র ইতর—

কবিরাজ মশাইয়ের ওপরে বড্ড চটে গিয়েছেন দেখছি—

চটবো না! অভদ্র ইতর কোথাকার!

মেসের দ্বিতীয় ভৃত্যও এসে ঘরে প্রবেশ করল, ট্যাক্সি এসে গেছে, বাবু!

ট্যাক্সি গলির মধ্যে এনেছিস তো?

হ্যাঁ স্যার—একেবারে দোরগোড়ায় নিয়ে এসেছি। বলতে বলতে ভৃত্যের পশ্চাতে যে লোকটি ঘরে এসে প্রবেশ করল, কিরীটী কয়েকটা মুহূর্ত তার মুখের দিকে নিজের অজ্ঞাতেই তাকিয়ে থাকে।

বসন্ত-ক্ষতচিহ্নিত সেই গোলালো মুখ গঙ্গাপদর। W. B. T. 307-এর ড্রাইভার গঙ্গাপদ।

জিনিসপত্র কি কি যাবে? গঙ্গাপদ আবার প্রশ্ন করে।

বিশেষ কিছু নয়। এই যে দেখছো ঐ দুটো সুটকেস, ঐ বেডিংটা, ব্যাস!

অতঃপর ভৃত্যের সঙ্গে ধরাধরি করে গঙ্গাপদই মাল ট্যাক্সিতে নিয়ে গিয়ে তুলল।

রজতবাবুর ঘরটা খালি হয়ে গেল।

রাত দশটার সময় ঐ রাত্রেই সিঁড়িতে কবিরাজ মশায়ের খড়মের খট্‌খট্ শব্দ ধ্বনিত হয়ে উঠলো।

কৌতূহল দমন করতে না পেরে কিরীটী বাইরে এসে দেখলে ভিষগ্‌রত্ন রজতবাবুর খালি ঘরটার দরজায় একটা তালা লাগাচ্ছেন। কিরীটীকে দেখে কবিরাজ মশাই বললেন, শূন্য ঘর থাকা ভাল নয় রায় মশাই। তাই তালাটা

লাগিয়ে দিয়ে গেলাম। মূষিকের উপদ্রব হতে পারে।

আরো দিন দুই পরে। বেলা দ্বিপ্রহর। মেসের ভৃত্য বলাই আগেই চলে গিয়েছে, রতনও যাবার জন্য সিঁড়িতে নেমেছে, পিছন থেকে কিরীটীর ডাক শুনে রতন ফিরে দাঁড়াল।

রতন!

কি বলছেন? রতনের মুখে সুস্পষ্ট বিরক্তি। ভাবটা—যাবার সময় আবার পিছু ডাকা কেন!

যাবার পথে অন্নপূর্ণা রেস্তোরাঁয় বংশীবদনকে বলে যেও তো এক কাপ চা আমার ঘরে দিয়ে যেতে।

আজই প্রথম নয়। মধ্যে মধ্যে এরকম দ্বিপ্রহরে কিরীটীর চায়ের প্রয়োজন হয় এবং বখশিশের লোভে বংশীবদন দিয়েও যায় চা।

চার পয়সা চায়ের কাপের দামের উপর আরো তিন আনা উপরি লাভ হয় বংশীবদনের। পুরো একটা সিকিই দেয় কিরীটী।

যে আজ্ঞে। বলে রতন সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল।

মিনিট কুড়িক বাদেই বংশীবদন এক কাপ চা নিয়ে এসে কিরীটীর ঘরে প্রবেশ করল।

বাবু, চা—

চা-পান করতে করতে কিরীটী বংশীবদনের সঙ্গে আলাপ চালাতে লাগল।

দু'চারটা সাধারণ কথাবার্তার পর হঠাৎ কিরীটী প্রশ্ন করে, এ পাড়ার ট্যাক্সি-ড্রাইভার গঙ্গাপদকে চিনিস্ বংশী?

কোন্ গঙ্গাপদ? ঐ যে হুদকো মোটা কেলে লোকটা?

হ্যাঁ।

খুব চিনি। ডেকে দেবো নাকি লোকটাকে? গাড়ি চাই বুঝি?

হ্যাঁ, তোর সঙ্গে আলাপ আছে নাকি?

না। তবে কত্তার সঙ্গে খুব ভাব। মাঝে মাঝে রাত্রে কত্তার ঘরে আসে যে!

কে, ভূপতিবাবুর সঙ্গে?

হ্যাঁ।

তোর কত্তার ঘরে রাত্রে আর কে কে আসে রে?

ঐ গঙ্গাপদই আসে বেশী। আর কই কাউকে তো আসতে দেখিনি বড় একটা, তবে মাঝে মাঝে এই মেসের রজতবাবু যেতেন।

রজতবাবু যেতেন!

হ্যাঁ।

ট্যাক্সি বুঝি গঙ্গাপদরই?

না বাবু, শুনেছি কোন এক বাবুর। গঙ্গাপদ তো মাইনে-করা লোক।

খুব ভাড়া খাটে ট্যাক্সিটা, নারে?

ছাই! ভাড়া আর খাটে কোথায়? তবে হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যারাত্রে চলে যায়—ফেরে পরের দিন আবার সন্ধ্যায়!

ভাবছি কাল একবার ট্যাক্সিটা ভাড়া নেবো। পাঠিয়ে দিতে পারিস ওকে একবার?

কাল বোধ হয় ও যেতে পারবে না বাবু!

কেন?

কাল রাত্রে গঙ্গাপদ যে বলছিল, পরশু মানে কাল রাত্রে ভাড়ায় যাবে। ফিরবে পরদিন—সারা রাত ভাড়া খাটালে অনেক পায় কিনা।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল।

একটা সিকি ও চায়ের কাপটা নিয়ে বংশীবদন চলে গেল।

পরের দিন রাত তখন সোয়া আটটা হবে। কিরীটী এক কাপ চা নিয়ে রেস্তোরাঁর দরজার ধারে একটা টেবিলের সামনে বসে স্থির দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল।

W. B. T. 307 ট্যাক্সিটা খোলা দরজা বরাবর রাস্তার ওধারে ফুটপাত ঘেঁষে লাইটপোস্টটার অল্প দূরে পার্ক করা আছে। এতদূর থেকেও আবছা অস্পষ্ট বোঝা যায় গাড়ির চালকের সীটে বসে আছে একজন ছায়ামূর্তি। কিরীটী অন্যমনস্কের মত চা-পান করলেও তার সদাজাগ্রত দৃষ্টি ছিল W. B. T. 307 ট্যাক্সিটার ওপরেই। বড় রাস্তার ঠিক মোড়েই সেই সন্ধ্যা থেকে আরো একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

ক্রমে ক্রমে রাতের প্রহর গড়িয়ে চলে। একটি দুটি করে রেস্তোরাঁর খরিদ্দার চলে যেতে থাকে। রাত প্রায় দশটার সময় কিরীটী হঠাৎ যেন চমকে ওঠে।

আপাদমস্তক চাদরে আবৃত্ত একটি নারীমূর্তি এসে W. B. T. 307 ট্যাক্সি গাড়িটার সামনে দাঁড়াতেই নিঃশব্দে ট্যাক্সির দরজাটা খুলে গেল।

নারীমূর্তি ট্যাক্সিতে উঠে বসল এবং উঠে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাক্সি স্টার্ট দিয়ে চলতে শুরু করে।

কিরীটীও আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে রেস্তোরাঁ থেকে উঠে সোজা গিয়ে দ্রুতপদে বড় রাস্তার মোড়ে যে দ্বিতীয় ট্যাক্সিটা অপেক্ষা করছিল তার মধ্যে গিয়ে উঠলো।

বড় রাস্তায় পড়লেও W. B. T. 307 ট্যাক্সিটা ট্রামের জন্য আটক পড়ে তখনও বেশীদূর এগোতে পারেনি। কিরীটী ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাক্সিটা চলতে শুরু করে। ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে ট্যাক্সিটা প্রস্তুত হয়েই ছিল পূর্ব হতে সঙ্কেতমত। কিরীটী চাপা গলায় ড্রাইভার মনোহর সিংকে কি যেন নির্দেশ দিল।

গ্রীষ্মের রাত্রি দশটায় কলকাতা শহর এখনো লোকজনের চলাচল ও যান-বাহনের বৈচিত্র্যে সরগরম।

আগেকার গাড়িটা সোজা কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট ধরে এগিয়ে গিয়ে বৌবাজারের কাছাকাছি বাঁয়ে বাঁক নিয়ে শিয়ালদহের দিকে এগিয়ে চলল। শিয়ালদহের মোড়ে এসে ডাইনে বেঁকে এবারে চলল সারকুলার রোড ধরে সোজা। জোড়াগির্জা ছাড়িয়ে সারকুলার রোডের কবরখানা ছাড়িয়ে বাঁয়ে বেঁকল।

আগের গাড়িটা চলেছে এবারে আমীর আলি অ্যাভিনু ধরে।

হঠাৎ একসময় আগের গাড়ির স্পীডটা কমে এলো। সঙ্গে সঙ্গে মনোহরও তার পা-টা তুলে নেয় গাড়ির অ্যাকসিলারেটারের ওপর থেকে।

ট্রাম ডিপোটা ছাড়িয়ে বাঁ-হাতি একটা সরু গলির মুখে গাড়িটা

দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে পূর্ববর্তী সর্বাঙ্গে চাদরে আবৃত মহিলাটি নেমে গেলেন এবং ট্যাক্সিটাও সামনের দিকে চলে গেল। হাত-দশেক ব্যবধানে মনোহর তার ট্যাক্সি দাঁড় করিয়েছিল। বিকাশ প্রশ্ন করেন, ব্যাপার কি কিরীটীবাবু?

কিরীটী ট্যাক্সির দরজা খুলে নামতে নামতে বললে, নামুন—এবং মনোহরের দিকে ফিরে তাকে ও কনস্টেবলকে অপেক্ষা করতে বলে এগিয়ে চলল।

বিকাশ কিরীটীকে অনুসরণ করেন। সরু গলিপথ, গলির মুখে একটি-মাত্র লাইটপোস্ট। গলির পথ জুড়ে অদ্ভুত একটা আলোছায়ার লুকোচুরি চলছে যেন।

কিন্তু গলির মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না কিরীটী। তবু কিন্তু কিরীটী গলির মধ্যে ঢুকে এগিয়ে চলে। ব্লাইন্ড গলি। কিছুটা এগুতে শেষ হয়ে গিয়েছে। সামনেই নিরেট দেওয়াল। গলির দু-পাশে দোতলা তিনতলা সব বাড়ি আলোছায়ায় যেন স্তূপ বেঁধে আছে।

সব কয়টি বাড়িরই দরজা বন্ধ। মাত্র একটি বাড়ির খোলা জানালাপথে খানিকটা আলোর আভাস লাগছে গলিপথে।

জানালাপথে উঁকি দিয়ে দেখল কিরীটী, সাহেবী কেতায় সোফা-সেটী-কাউচে সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। এবং সেই ড্রয়িংরুমের মধ্যে একটি সোফার উপরে পাশাপাশি বসে একটি তরুণবয়স্ক পুরুষ ও একটি নারী।

চমকে ওঠে কিরীটী। কারণ পুরুষটিকে না চিনলেও নারীটীকে চিনতে তার কষ্ট হয়নি দেখা মাত্রই। সেই ভদ্রমহিলা! যাকে মাত্র কয়েকদিন পূর্বে রাত্রে ভিষগ্‌রত্নের বাইরের ঘরে অনবগুণ্ঠিতা দেখেছিল সে।

কিন্তু ভদ্রমহিলাটির আজকের সাজসজ্জার ও সে-রাত্রের সাজসজ্জার মধ্যে ছিল অনেক তফাৎ। গা-ভর্তি জড়োয়া গহনা, পরিধানে দামী সিল্কের শাড়ি।

অপূর্ব রূপ খুলেছে দামী সিল্কের শাড়ি ও জড়োয়া গহনায়। চোখ যেন একেবারে ঝল্‌সে যায়। আর পুরুষটির পরিধেয় সাজসজ্জা দেখলে মনে হয় ধনী কোন গুজরাট দেশীয় লোক। কিন্তু চিনতে পারল না চোখে কালো চশমা থাকায়। পুরুষটি হঠাৎ স্পষ্ট বাংলায় বলে, এসেছ?

আমার গাড়ি বাইরে অপেক্ষা করছে--চল—

কিন্তু মাল?

মালও গাড়িতেই আছে।

বেশ, তবে চল।

কিন্তু টাকাটা?

ও হ্যাঁ হ্যাঁ—ভুলে গিয়েছিলাম একদম—বলতে বলতে জামার পকেটে হাত চালিয়ে একতাড়া নোট বের করে মহিলার হাতে তুলে দিল পুরুষটি।

গুনতে হবে নাকি?

তোমার খুশি—

মহিলাটি মৃদু হেসে নোটগুলো এক এক করে সত্যই গুনে দেখল। সব একশো টাকার নোট। নোটগুলো গুনে ব্লাউজের মধ্যে চালান করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

চল—

আর একটু বসবে না?

একটু কেন—সারারাতই তো থাকবো সঙ্গে সঙ্গে। চল—ওঠ।

যুবকটি উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু মহিলাটি হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে, একটু বোস, আসছি।

মহিলাটি ভিতরে চলে গেল। যুবকটি বসে আছে। হঠাৎ পা টিপে টিপে কে একজন কালো মুখোশে মুখ ঢেকে সোফার উপরে উপবিষ্ট যুবকের অজ্ঞাতেই তার পশ্চাতে এসে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে দপ্ করে ঘরের আলো গেল নিভে।

কি হল! আলো নিভে গেল যে! বিকাশ চাপা কণ্ঠে বলেন।

চুপ! কিরীটী সাবধান করে দেয়।

অন্ধকারে একটা চাপা গোঁ গোঁ শব্দ, একটা ঝটাপটি শোনা যাচ্ছে।

পরক্ষণেই কিরীটী আর দেরি না করে গিয়ে বন্ধ দরজার উপরে ধাক্কা দেয়।

দরজায় ধাক্কা দিতেই বুঝলে দরজা ভিতর হতে বন্ধ।

প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিতে দিতে একসময় মট্ করে শব্দ তুলে ভিতরের খিলটা বোধ হয় ভেঙে দরজা খুলে গেল।

দুজনে হুড়মুড় করে অন্ধকার বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করে। পাশের ঘরে ঢুকে অন্ধকারে হাতের টর্চের আলো ফেলতেই কিরীটী চম্‌কে উঠলো।

মেঝের উপরে পূর্বদৃষ্ট তরুণ যুবকটি উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

ঘরের আলোর সুইচটা সন্ধান করে আলোটা জ্বালানো হল। ভূপতিত যুবকটিকে তুলে ধরতে গিয়েই বোঝা গেল সে আর বেঁচে নেই। কিন্তু তার চোখের চশমাজোড়া খুলে ফেলতেই কিরীটী চমকে ওঠে। অস্ফুট কণ্ঠে তার শব্দ বের হয় একটি মাত্র, এ কি! রজতবাবু! এবং মৃত্যু তার পূর্বপূর্বের মতই। গলায় সেই সরু কালো দাগ।

বিকাশ বললেন, চেনো নাকি লোকটাকে?

হ্যাঁ। রজতবাবু—আমাদের মেসেই ছিল!

কিন্তু সেই মহিলাটি গেলেন কোথায়?

চল, বাড়িটা খুঁজে একবার দেখি। যদিও মনে হচ্ছে পাওয়া যাবে না আর।

সত্যিই তাই। বাড়ির মধ্যে দোতলার ও একতলার সব ঘরগুলিতেই তালা-বন্ধ। কোথাও মহিলাটির সন্ধান পাওয়া গেল না।

চল, ফিরি।

কিরীটী ও বিকাশ দ্রুতপদে নিজেদের ট্যাক্সিতে এসে উঠে বসতেই মনোহর ইঙ্গিত করে দেখাল ওধারে ফুটপাথে W. B. T. 307 ট্যাক্সিটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে। কিরীটী ঠিক করলো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে।

বেশীক্ষণ কিন্তু অপেক্ষা করতে হল না। দেখা গেল দুটো বাড়ির পরের গলির ভিতর থেকে একজন চাদরে আবৃত মহিলা বের হয়ে সোজা তাদের ট্যাক্সির দিকেই এগিয়ে আসছে।

নেহাৎ হিসাবেরই ভুল বোধ হল কিরীটীর।

অন্ধকারে ভুল ট্যাক্সির খোলা দরজা-পথে ট্যাক্সির মধ্যে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহিলাটি ভুল বুঝতে পারলেও তখন আর ফিরবার পথ ছিল না। বিকাশের হাতে উদ্যত লোডেড পিস্তল।

কিন্তু মহিলাটি যেন নির্বিকার।

গোলমাল করে কোন লাভ হবে না। চুপটি করে বসে থাকুন। বলেই কিরীটী মনোহরকে নির্দেশ দিল সোজা থানার দিকে গাড়ি চালাতে।

ট্যাক্সিটা এসে থানার সামনে দাঁড়াতেই, সর্বাগ্রে কিরীটী বিকাশকে ডেকে চুপি চুপি কি কতকগুলো নির্দেশ দিয়ে ভদ্রমহিলাটিকে নিয়ে থানার ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। ভদ্রমহিলাটি এতক্ষণ গাড়িতে সারাটা পথ একটি কথাও বলেননি। ওরাও তাঁকে কোন কথা বলবার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেনি। কিরীটীর চোখের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে সচল পাষাণমূর্তির মত ভদ্রমহিলা কিরীটীকে অনুসরণ করে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

কিরীটী একটি চেয়ার দেখিয়ে বললে, বসুন। যদি ভুল না হয়ে থাকে তো মনে হচ্ছে আপনিই বোধ হয় বীজেন্দ্রবাবু ও নিহত অরবিন্দবাবুদের বোন সুরমা দেবী!

ভদ্রমহিলা কিরীটীর কথায় বারেক চমকে ওর মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে একটি কথাও বললেন না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনি দাঁড়িয়েই রইলেন।

বসুন সুরমা দেবী!

ইতিমধ্যে বিকাশ এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে আর একটা চেয়ার টেনে বসলেন।

বসুন! আবার কিরীটী অনুরোধ জানাল।

এবং সুরমা দেবী এবারে একটা চেয়ারে উপবেশন করলেন।

বুঝতেই পারছেন নিশ্চয়, নেহাৎ ভাগ্যচক্রেই আপনি আমাদের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছেন! শুনুন সুরমা দেবী, আপনি হয়তো এখনো বুঝতে পারেননি যে আমরা আট-ঘাট বেঁধেই আপনাকে আজ সন্ধ্যার পর অনুসরণ করেছিলাম যখন আপনি ন্যায়রত্ন লেনের বাসা থেকে বের হয়ে ট্যাক্সিতে গিয়ে চাপেন।

কিরীটীর শেষের কথায় সুরমা উপর দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

হ্যাঁ, আপনি মুখ বুজে থাকলেও অবশ্যম্ভাবীকে আপনি ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না সুরমা দেবী। আমরা জাল যে মুহূর্তে গুটিয়ে আনবো সেই মুহূর্তেই আপনাদের দলের অন্যান্য সকলের সঙ্গে আপনাকেও তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু আমি তা চাই না। আপনি যদি স্বেচ্ছায় সব স্বীকার করেন, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—সকলের মধ্যে টেনে এনে আপনাকে দাঁড়াবার লজ্জা ও অপমান হতে নিষ্কৃতি দেবো। কারণ আমি বুঝতে পেরেছি, এই বিশ্রী ব্যাপারের মধ্যে যতটুকু আপনি আপনার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক জড়িত হয়ে পড়েছেন, সেটা হয়ত আপনাকে একপ্রকার বাধ্য হয়েই হতে হয়েছে। আরো একটা কথা আপনার জানা দরকার। আমীর আলি অ্যাভিনুর বাড়িতে আজ কিছুক্ষণ পূর্বে রজতবাবুর হত্যা-ব্যাপারটাও আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।

দ্বিতীয়বার চমকে সুরমা কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

কয়েকটি মুহূর্ত অতঃপর স্তব্ধতার মধ্যে দিয়েই কেটে গেল।

কিরীটী সুরমা দেবীর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিল সোজাসুজি আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার আর তাঁর ক্ষমতা নেই। কোন নারীই ঐ অবস্থায় নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারে না!

নিঃশব্দে মুখ তুলে তাকালেন সুরমা দেবী কিরীটীর মুখের দিকে আবার।

দুজনের চোখের দৃষ্টি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হল।

কিরীটী চোখে চোখ রেখেই প্রশ্ন করল, তাহলে কি ঠিক করলেন সুরমা দেবী?

সুরমা দেবী নিশ্চুপ।

বুঝতেই পারছেন আর চুপ করে থেকে কোন লাভ হবে না! মাঝ থেকে কেবল পুলিশের টানা-হেঁচড়াতে কেলেঙ্কারিই বাড়বে।

কি বলবো বলুন?

আপনার যা বলবার আছে—

আমার?

হ্যাঁ!

কয়েকটা মুহূর্ত আবার নিঃশব্দে মাথা নীচু করে বসে রইলেন সুরমা দেবী, তার পর মাথা তুলে ধীরে ধীরে বললেন, হ্যাঁ, বলবো।

তবে বলুন।

হ্যাঁ বলবো, সব কথাই বলবো। নইলে তো আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

বলতে বলতে সুরমা দেবীর দু'চোখের কোল বেয়ে দুটি অশ্রুর ধারা নেমে এলো।

সুরমা দেবী বলতে লাগলেনঃ

আপনারা তো আমার পরিচয় জানতেই পেরেছেন। তাই পরিচয় দিয়ে মিথ্যা সময় আমি নষ্ট করতে চাই না। সব বলছি, পনের বছর বয়সের সময় আমার বিবাহ হয়। এবং বিবাহের ঠিক দশ দিন পরেই, দুর্ভাগ্য আমার, সর্পাঘাতে আমার স্বামীর মৃত্যু হয় তাঁর কর্মস্থল ময়ূরভঞ্জে। তিনি ছিলেন ফরেস্ট অফিসার। আমার স্বামীর একটি ছোট জাঠতুত ভাই ছিল সত্যেন। সত্যেন মধ্যে মধ্যে আসত আমাদের বাড়িতে। স্বামীকে চেনবার আগেই তাঁকে ভাগ্যদোষে হারিয়েছিলাম। আমার তখন ভরা যৌবন। সেই সময় সত্যেন এসে আমার সামনে দাঁড়াল। শ্বশুরবাড়ির দিক দিয়ে আমার বৃদ্ধা শাশুড়ী ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাই বিধবা হবার পরও মধ্যে মধ্যে সেখানে আমায় যেতে হতো। এবং গিয়ে দু'চার মাস সেখানে থাকতামও। ক্রমে সত্যেনের সঙ্গে হলো ঘনিষ্ঠতা। বলতে বলতে সুরমা দেবী চুপ করলেন।

সুরমা দেবীর জবানবন্দীতেই বলি।

সত্যেনের সঙ্গে সুরমার ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতায় যা হবার তাই হল। সুরমা যখন নিজে বুঝতে পারল তার সর্বনাশের কথা, ব্যাকুল হয়ে উঠলো সে এবং লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে তখুনি সত্যেনকে একদিন ডেকে সব কথা খুলে বলতে একপ্রকার বাধ্য হল!

সত্যেন লোকটা ছিল কিন্তু আসলে একটা শয়তান। সে বললে, আরে তার জন্যে ভয়টা কি। সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!

ব্যবস্থা! কিসের ব্যবস্থা?

কিসের আবার! গোলমাল সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছু ভেবো না তুমি। তার জন্যে ভয়টা কি! সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সুরমা সত্যেনের কথায় রাজী হয় না। ইতস্তত করে বলে, দেখ একটা কাজ করলে হয় না?

কি?

আমি রাজী আছি। বিবাহটাই হয়ে যাক।

বিয়ে!

হ্যাঁ। কেন, তুমি তো—

ক্ষেপেছো! বিয়ে করবো তোমাকে!

তার মানে?

ঠিক তাই।

কিন্তু এতদিন তো তুমি—

পাগল না ক্ষেপা! ওসব বাজে চিন্তা ছেড়ে দাও সুরমা। আমার ব্যবস্থা তোমায় মেনে নিতেই হবে।

লোহার মত কঠিন ও ঋজু হয়ে এল সুরমার দেহটা মুহূর্তে। তীক্ষ্ন গম্ভীর কণ্ঠে সে কেবল বলল, ঠিক আছে, তোমায় কিছু ভাবতে হবে না।

সুরমা ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল।

শোন শোন সুরমা—, সত্যেন ডেকে বাধা দেয় সুরমাকে।

সুরমা কেবল বললে, চলে যাও এখান থেকে!

পরের দিনই সুরমা চন্দননগরে দাদাদের ওখানে চলে এলো।

মা ও অরবিন্দ সমস্ত ব্যাপারটাই জানতে পারল। কেবল জানতে পারল না আসল ব্যক্তিটি কে। সুরমা কিছুতেই প্রকাশ করল না।

বোন সুরমাকে নিয়ে তারা চলে এলো কাশীতে।

সেইখানেই একদিন কবিরাজ চন্দ্রকান্তর সঙ্গে আলাপ হয় অরবিন্দর।

চন্দ্রকান্তকে দিয়েই তারা কাঁটা তুলবার ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু চন্দ্রকান্ত সে-পথ দিয়েই গেলেন না। কাশীতে তিনি মুক্তাভস্ম নাম দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চোরাই কোকেনের কারবার চালাচ্ছিলেন। এবং ঐ সময়টায় পুলিশ অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠায় চন্দ্রকান্তও কাশীর ব্যবসা গুটিয়ে অন্যত্র কোথাও সরে যাবার মতলব করছিলেন। তাঁর সংসারে ছিল আগের পক্ষের একটি ছেলে ও মেয়ে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, শোন সুরমা, তুমি যদি রাজী থাকো আমি তোমাকে বিবাহ করতে রাজী আছি—কেন ও মহাপাপে মা হয়ে নিজেকে জড়াবে! ভ্রূণ-হত্যা মহাপাপ।

সুরমা প্রথমটায় কবিরাজের প্রস্তাবে বিহ্বল হয়ে যায়। চন্দ্রকান্ত তাকে বিবাহ করে সম্মান দেবে! পরে অনেক ভেবে রাজী হয়ে গেল সুরমা চন্দ্রকান্তরই প্রস্তাবে। কারণ সে নিজেও ওই কথাটা ভাবতে পারছিল না।

এক রাত্রে সে গৃহ থেকে পালাল কবিরাজ চন্দ্রকান্তর সঙ্গে।

কবিরাজ সুরমাকে নিয়ে এসে একেবারে কলকাতায় উঠলেন কাশীর সমস্ত ব্যবসাপাট তুলে দিয়ে। কিন্তু যে আশায় সুরমা গৃহত্যাগ করলো সে আশা তার ফলবতী হল না।

জন্মমুহূর্তেই সন্তানটিকে সেই রাত্রেই চন্দ্রকান্ত যে কোথায় সরিয়ে দিল তার অজ্ঞাতে সুরমা তা জানতেও পারলে না আর।

বিবাহও হল না এবং সন্তানও সে পেল না। অথচ বন্দিনী হয়ে রইলো সুরমা চন্দ্রকান্তর গৃহে তারই কূট চক্রান্তে।

সন্তানকে একদিন ফিরে পাবে, এই আশায় আশায় চন্দ্রকান্ত সুরমার গতিরোধ করে রাখল। শুধু তাই নয়, অতঃপর চন্দ্রকান্ত সুরমাকে দিয়েই তার ব্যবসা চালাতে লাগল। সুরমাকে টোপ ফেলে বড় বড় রুই-কাতলা গাঁথতে লাগল। সুরমা প্রথম প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছে, তার জবাবে চন্দ্রকান্ত বলেছে, আমার কথামত যদি না চল তো তোমার ছেলেকে একদিন হত্যা করে তোমার সামনে এনে ফেলে দেব।

চোখের জলের ভিতর দিয়েই সুরমা বলতে লাগলেন, সেই ভয়ে আমি সর্বদা সিঁটিয়ে থাকতাম কিরীটীবাবু। আর আমার সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সে যত কুৎসিত জঘন্য কাজ আমাকে দিয়ে করিয়ে নিত। শেষটায় ওই চোরাই ব্যাপারে এলো একদিন সত্যেন।

সত্যেন!

হ্যাঁ। রজতবাবুর আসল নাম সত্যেন। ঘোমটার আড়ালে সে আমাকে দেখতে পায়নি, কিন্তু আমি তাকে চিনেছিলাম। আর ওই সত্যেনের সাহায্যেই ওই চন্দ্রকান্ত, যাকে আপনারা শশিশেখর বলে জানেন, তার অন্য এক অংশীদার অন্নপূর্ণা রেস্তোরাঁর মালিক ভূপতি চাটুয্যের সাহায্যে অতর্কিতে একটা কালো ফিতের সাহায্যে পিছন থেকে ফাঁস লাগিয়ে চোরাই কারবারের ব্যাপারটা যার কাছে এতটুকু জানাজানি হয়ে যেত বা আমার ওপরে যারই লোভ পড়ত তাকে হত্যা করতো। এমনি করেই দিনের পর দিন চলছিল নারকীয় কাণ্ড, এমন সময় একদিন আমার দুর্ভাগ্য ছোড়দাও এর মধ্যে এসে পড়লেন ঘটনাচক্রে।

লজ্জায় মুখ ঢাকলেন সুরমা।

তারপর আবার বলতে লাগলেন, এদিকে শয়তান সত্যেন তখন চন্দ্রকান্তর মেয়ে অমলাকে ভুলিয়েছে। সত্যেনের মিষ্টি কথায় অমলা ভুললেও আমি তো জানি তার মানে, সত্যেনের আসল ও সত্যকারের পরিচয়। আমি সতর্ক করে দিলাম চন্দ্রকান্তকে। চন্দ্রকান্ত আমার মুখে সব কথা শুনে কি যেন কী ভেবে রজতকে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিল। তারপরই আমার হতভাগ্য ছোড়দাকে এক রাত্রে রেস্তোরাঁর মধ্যেই সেই ফিতের সাহায্যে ফাঁস দিয়ে হত্যা করলে ওরা। এবং রজতকে শেষ করার মতলব করলে। এদিকে ছোড়দার মৃত্যুতে আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। দাদাকে চিঠি দিয়ে জানালাম তার মৃত্যুর কথা।

আমরা জানি সে চিঠির কথা। কিরীটী বলে।

জানেন?

হ্যাঁ। তারপর বলুন।

রজতকে তাড়াবার পর সে আসবে না জানতাম। তাই আমিই তাকে একটা চিঠি দিই চন্দ্রকান্তর পরামর্শমত—যে আমি নিজে টাকার বিনিময়ে ভুলিয়ে নিয়ে তার হাতে অমলাকে তুলে দেবো; এই আশ্বাস দিয়ে পার্ক সার্কাসের গার্ডেনের রজতের সঙ্গে ঝগড়ার পর তাকে ডেকে পাঠাই। এদিকে রজতের দ্বারা অনিষ্ট হতে পারে এই ভেবে চন্দ্রকান্তও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল তাকে তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলার জন্য। আর সেই সঙ্গে আমারও ছিল প্রতিহিংসা। আমার আজকের এই চরম দুর্গতির জন্য তো সে-ই দায়ী। সে-ই তো আমাকে লোভে ফেলে এই চরম সর্বনাশের পথে একদা টেনে এনেছিল। তাই প্রতিজ্ঞা

করলাম মনে মনে, যেতেই যদি হয় তাকে শেষ করে যাবো এবং এইবারই সর্বপ্রথম ও শেষবার চন্দ্রকান্তর দুষ্কৃতিতে তাকে সাহায্য করতে সর্বান্তঃকরণে এগিয়ে গিয়েছিলাম। আমার কাজ শেষ হয়েছে। আপনি কিরীটীবাবু এখানে এনে আমাকে বলেছিলেন, নিয়তি-চালিত হয়েই নাকি আপনাদের গাড়িতে এসে আমাকে উঠতে হয়েছে, কিন্তু তা নয়।

কি বলছেন আপনি সুরমা দেবী? বিকাশ প্রশ্ন করেন।

ঠিক তাই। স্বেচ্ছায় আমি আপনাদের গাড়িতে উঠেছি।

সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ। আপনারা যে ট্যাক্সি করে আমাদের অনুসরণ করছেন সেটা আমি পূর্বাহ্নেই টের পেয়েছিলাম। আজ রাত্রে রজতকে শেষ করে পুলিশের কাছে এসে সব বলে দেবো পূর্ব হতে সেটা মনে মনে স্থির-সংকল্প হয়েই আমি প্রস্তুত হয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম। কথাটা বলতে বলতে কিসের একটা পুরিয়া হঠাৎ সুরমা দেবী হাতের মুঠোর থেকে নিয়ে মুখে পুরে দিলেন চোখের পলকে।

বাধা দেবেন না কিরীটীবাবু আর। আমাকে যেতে দিন। সত্যই কলঙ্কিনী আমি।

আর কথা বলতে পারলেন না সুরমা দেবী।

শেষের কথাগুলো জড়িয়ে তাঁর অস্পষ্ট হয়ে গেল।

কিরীটী বললে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে, কিন্তু আর তো দেরি করা চলে না। আমাদের এখুনি যেতে হবে। নচেৎ পাখী উড়ে যেতে পারে।

সুরমার মৃতদেহ ঐখানেই পড়ে রইলো। ওরা থানা থেকে বের হয়ে গেল।

॥ ৭ ॥

থানা থেকে একজন এ. এস. আই. ও জনাতিনেক কনস্টেবলকে অন্নপূর্ণা রেস্তোরাঁয় ভূপতিচরণকে গ্রেপ্তার করতে পাঠিয়ে দিয়ে কিরীটী ও বিকাশ নিজেরা গেল ন্যায়রত্ন লেনের বাসার দিকে সোজা।

রাত প্রায় আড়াইটে নাগাদ বিকাশ ও কিরীটী সাধারণ বেশেই এসে ভিষগ্‌রত্নের সদর দরজায় ধাক্কা দিল।

দ্বিজপদ এসে দরজা খুলে দিল চোখ মুছতে মুছতে।

কবিরাজ মশাই আছেন?

হ্যাঁ—উপরে ঘুমোচ্ছেন।

যাও, তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো গে। বলো এক ভদ্রলোক বিশেষ জরুরী কাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

একটু পরেই খড়মের খট্‌ খট্‌ শব্দ শোনা গেল।

খালিগায়ে কবিরাজ ভিষগ্‌রত্ন ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন, ব্যাপার কি মশাই!

আপনার ডিসপেনসারী সার্চ করবো। ওয়ারেণ্ট আছে, আমি থানা থেকে আসছি। বিকাশ রায়ই বললেন।

কবিরাজ মশাই তখন ফ্যালফ্যাল করে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। এবং বিকাশের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে কিরীটীকেই সম্বোধন করে বললেন, আমাদের রায় মশাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ। চিনতে পেরেছেন দেখছি তাহলে!

হ্যাঁ। এসবের মানে কি?

ওঁর মুখেই তো শুনলেন। কিরীটী জবাব দেয়।

কিন্তু কেন, তাই তো জিজ্ঞাসা করছি।

সে-কথাটা ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন না।

জিজ্ঞাসা আর করতে হল না, বিকাশবাবুই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জবাব দিলেন, মুক্তাভস্ম বলে যে মূল্যবান বস্তুটি এখানে আপনার বিক্রি হয়, শুনলাম সেটার অন্য একটি পরিচয়ও আছে—অর্থাৎ আবগারীতে নিষিদ্ধ মাদক-পদার্থের লিস্ট অনুযায়ী যাকে বলা হয় কোকেন।

কোকেন! আমার এখানে? কবিরাজ মশাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

হ্যাঁ—কোকেন। কোথায় হে দ্বিজপদ, মুক্তাভস্মর যে প্যাকেটগুলো তোমাদের এখান থেকে চালান যায় সর্বত্র, সেগুলো বের কর তোবাবা!

মশাই কি রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে এনে আমার সঙ্গে রসিকতা শুরু করলেন? ভিষগ্‌রত্ন বলেন।

অনেক রসিকতাই এই ক-বছর ধরে করেছেন কবিরাজ মশাই আমাদের সঙ্গে আপনি—এবারে আমরা একটু-আধটু যদি করিই! বিকাশ ব্যঙ্গোক্তি করেন।

জানেন, এ ধরনের অত্যাচার নীরবে আমি সহ্য করব না? কবিরাজ মশাই গর্জে ওঠেন।

হিসাবে একটু ভুল করছেন শশিশেখরবাবু। সুরমা দেবী ইতিপূর্বেই সব আমাদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছেন। এবং তিনি এখনো থানাতেই বসে আছেন।

মানে? কি বলছেন যা-তা?

এবারে কিরীটী কথা বললে, কবিরাজ মশাই, মহাভারতখানা আপনার নিশ্চয়ই পড়া ছিল, তবে এ ভুল করলেন কেন? শকুনির হাড়ের পাশা অমোঘ ছিল সত্য, কিন্তু সেই পাশাই কি শেষ পর্যন্ত শকুনির মৃত্যুর কারণ হয়নি? পাশার সাহায্যে যে কুরুক্ষেত্র রচিত হয়েছিল সেই কুরুক্ষেত্রেই কি শকুনিকেও শেষ নিঃশ্বাস নিতে হয়নি? আপনার সেই হাড়ের পাশা, সুরমা দেবীই সব স্বীকার করেছেন। অমোঘ সে হাড়ের পাশার দান—যখন একবার পড়েছে, আর তো তা ফিরবে না। অনেক দিন ধরে জুয়োখেলায় জিতে আসছিলেন, কিন্তু এবার আপনার হারবার পালা কবিরাজ মশাই!

কিরীটীর কথায় মুহূর্তে শশিশেখরের মুখের সমস্ত রক্ত কেউ যেন ব্লটিং-পেপার দিয়ে শুষে নিল। নির্বাক স্থাণুর মত শশিশেখর দাঁড়িয়ে রইলেন।

তা ছাড়া পাঁচটা মার্ডার—

মার্ডার! কথাটা উচ্চারণ করে চমকে তাকালেন বিকাশ ও কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ। এ পাড়ার সব কটি মার্ডারের মূলেই কবিরাজ মশাইয়ের মুক্তাভস্ম। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। যারা প্রাণ দিয়েছে তারাও এই মুক্তাভস্মেরই চোরা-কারবারী ও অংশীদার ছিল। তাছাড়া আইন নিশ্চয়ই জানেন, মার্ডার ও abatement of murder দুটোরই শাস্তি পিনালকোডে একই ধারায়।

সত্যি নাকি!

হ্যাঁ, চলুন থানায় সব বুঝিয়ে দেবো।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥